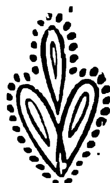
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী



বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।

সাড়ে পাঁচ টাকা



প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড দুই মাসের (ভাদ্র, ১৩৫৪) মধ্যে বেরুবে। উহার মূল্য স্থিরীকৃত হয়েছে তিন টাকা।

ভূমিকা

এই উপন্যাসটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "শৃঙ্খল" নামে প্রবাসীতে ধাবাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। জায়গায় জায়গায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবার পব মনে হইল, নামটা ঠিক খাপ খাইতেছে না। তাছাড়া, একটু দীর্ঘায়ত নাম আজকালকার পাঠকদের পছন্দ। তাই বই করিয়া ছাপিবার সময় নামটা বদলাইয়া কতকটা আধুনিক-রুচি-সম্মত কবিযা দিলাম।

গ্রন্থকার।

১

শরতের প্রভাত। মৃদুস্নিগ্ধ বাতাসে শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তরের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

বহুকণ্ঠের সমবেত গুঞ্জন।

নিরামিষ রন্ধনশালার প্রশস্ত বারান্দায় এক ঝলক রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। ভিতরে মুগ ডাল সিদ্ধ হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার সুগন্ধ পল্লীলক্ষ্মীর অদৃশ্য অঞ্চলগন্ধের সঙ্গে মিশিতেছে। নিস্তার বড় বড় চারটি ঝুড়ি হইতে তরকারী বাছিয়া নামাইতেছে। নিস্তার কৃশকায় শ্যামাঙ্গী রূপসী। ক্ষেন্তি রূপসী নহে, তাহারও গায়ের বর্ণ শ্যাম, সে পরিপূর্ণ-দেহা। বাছা তরকারীগুলিকে সে ভাগে ভাগে বঁটির মুখে আগাইয়া দিতেছে। বেগুন, পেঁপে, বাঁধাকপি, শসা, ডাঁটা, লাউডগা, কুমড়োফুল, জলপাই,—হালকা গভীর নানা সুরের সবুজ, লাল, বেগুনী, হলদে, নানারঙের কাটা তরকারী থাক থাক হইয়া তিন ভাগে জমিতেছে। বাবুদের জন্য একভাগ, কাছারীবাড়ীর আমলাদের জন্য একভাগ, ঝি-চাকরদের জন্য একভাগ, এই তিন ভাগে রান্না, ইহার উপর রাধাগোবিন্দজীর ভোগের এক ভাগ আছে। ভোর না হইতে সুরু হইয়াছে, একপ্রহর বেলা বহিয়া গেল, তবু বঁটি চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রসনারও বিরাম নাই।

অন্য দিন হাঁক ডাক করিয়া কথা চলে। আজ মুখ চলিতেছে, গলা তেমন খুলিতেছে না। শান-বাঁধানো প্রকাণ্ড উঠান পার হইয়া ভিতর মহলের দেউড়ি, উপরের সমস্তগুলি শাসি খড়খড়ি বন্ধ, তবু সকলেরই চোখের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বারবার সেইদিক্ হইতেই ঘুরিয়া আসিতেছে। বঁটি লইয়া যাহারা বসিয়াছে তাহাদের মধ্যে মুক্তোর পিসী সেকেলে মানুষ, ক্ষেন্তি যখনই একটু বেসামাল হইবার উপক্রম করিতেছে বৃদ্ধা চাপা গলায় শাসন করিয়া তাহাকে

থামাইয়া দিতেছে। তারপর ক্ষেন্তিরই কথার ধুয়া ধরিয়া, গলার স্বর যথাসম্ভব মৃদু করিয়া নিজেই বারবার বলিতেছে, "ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার। মুখে ঝাড়ু মারতে হয় বই কি. মুড়ো ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটা। পোড়াকপাল আবাগীর।"

একরাশ তরকারীর খোসা জমিয়াছিল। শ্রোত্রীদের ঔৎসুক্য অপেক্ষা উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে ক্ষেন্তি উঠিয়া পড়িল। খোসাগুলিকে একটা বারকোষে স্তূপাকার করিয়া তুলিয়া লইয়া সে অন্দরের দীঘির ওপারে গোয়ালঘরের দিকে চলিল।

পশ্চিমের ঘাটে সরকারদের ছোট-বউ জল লইতে আসিয়াছে। এ গ্রামে ক্ষেন্তির সম্মানিত স্থান প্রায় কর্ত্রীঠাকুরাণীর পরেই। সে দাঁড়াইল না, বউটির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া, "এত বেলা ক'রে জল নিতে এসেছ কেন গা," বলিতে বলিতে দীঘির কোণ পার হইয়া গেল।

মুলতানী ও দোআঁশলা মন্থর রোমন্থনরত কয়েকটি গাই আর ছটফটে তেজীয়ান গোটাদুই ষাঁড় ঘরের দুইদিকে দুই সার করিয়া বাঁধা। এক পাশে বাঁশের ঘেরা খোঁয়াড়ের মধ্যে ছোটবড় নানা রঙের বাছুরের ভিড়। উদ্‌গ্রীব হইয়া সেগুলি বেড়ার উপর মাথা জাগাইয়া আছে।

একটি খয়ের রঙের বাছুর বাহিরে। বংশীধর এক হাতে তার গলার দড়ি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছে এবং অন্যহাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ তাড়াইতেছে। দুই হাঁটুর মধ্যে একটা বালতি চাপিয়া বসিয়া অপর্ত্ত চাঁদকপালে গাইটাকে দুহিতেছে।

চাঁদকপালে গাইটাকে ক্ষেন্তি দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। এই গাইটা দুধ দেয় সবচেয়ে বেশী, কিন্তু ফাঁক পাইলেই তেঁতুলতলার ছোট মাঠটি পার হইয়া ক্ষেন্তির বড় আদরের তরকারীর বাগানে গিয়া ঢোকে, তারপর লাউমাচা ভাঙিয়া, কপির চারা মাড়াইয়া, ডাঁটাক্ষেত নির্ম্মূল করিয়া রাখিয়া আসে। তদুপরি ক্ষেন্তিকে সে ভয় ত করেই না, দেখিতে পাইলেই উল্টিয়া শিং বাগাইয়া

গুঁতাইতে আসে। তাই তরকারীর খোসা, ভাতের ফেন ইত্যাদি উপরি খাবার-গুলি অন্ততঃ ক্ষেন্তির হাতে চাঁদকপালীর চাঁদকপালে বড় একটা জুটিত না। আজ বাবকোষ সুদ্ধ সমস্তগুলি সুখাদ্য তাহারই উৎসুক মুখের সম্মুখে ধপ্ করিয়া ধরিয়া দিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "শুনেছিস্?"

বংশীধর বাছুরটাকে টানিয়া লইয়া একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। অপর্ত্ত দুধ দোওয়া বন্ধ না করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "শুনেছি ত সবই, কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখিনি?"

ক্ষেন্তি বলিল, "সে কি আর এক কথায় বলা যায়? রাধাগোবিন্দজীর মনে এতও ছিল তা কে জানত?"

বংশীধর যে-হাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ তাড়াইতেছিল, সেই হাতে চট্ করিয়া একটা খালি বালতি উল্টাইয়া ক্ষেন্তির বসিবার ঠাঁই করিয়া দিল। আড়চোখে একবার বাহিরেব দিকে দেখিয়া লইয়া ক্ষেন্তি কাপড় চোপড় টানিযা গুছাইয়া বসিল। কিন্তু সবে সে কথা সুরু করিতে যাইবে এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। আহারের সময় ক্ষেন্তির এত নিকট সান্নিধ্যে চাঁদকপালে গাইটার সুস্থ বোধ না করিবার যথেষ্ট কাবণ ত বিদ্যমান ছিলই, হঠাৎ ক্ষেন্তি অপর্ত্তের কানের কাছে মুখ লইয়া ঝুঁকিয়া বসিতেই সেটা বিষম ভড়কাইযা ঘাড় নীচু করিয়া ক্ষেন্তিকে ঢুঁ মারিতে গেল। বংশীধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিযা যেই ক্ষেন্তিকে আড়াল করিতে গেল, তাহাব অসতর্ক হাত হইতে ছাড়া পাইয়া খয়ের রঙের বাছুরটা এক গোত্তায় অপর্ত্তের দুই হাঁটুব মধ্য হইতে দুধের বালতিটাকে উল্টাইয়া দিল। দুধে প্রায় স্নান করিয়া অপর্ত্ত উঠিয়া দাড়াইল; পাঁচ-ছয় সের দুধ, এখনই কোথাও হইতে জোগাড় না হইলে হয়ত রাধাগোবিন্দজীর ভোগ দেওয়াতেই বাধা ঘটিয়া যাইবে। খুব একটা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। অপর্ত্ত বলিল, "বাছুর ত নয়, নরপিচেশ। দেব নাকি শালাকে এক ঘা?" বলিয়া লাথি মারিতে পা উঠাইয়াই চট্ করিয়া পা নামাইয়া লইল। মনে পড়িল, বাছুব হইলেও সে

গোক্ষুরই জাত, দেবী ভগবতীর অংশ, দেবতা। কহিল, "দেখেছিস্ কি দশা হয়েছে আমার কাপড়টার, এঃ!"

ক্ষেন্তি বলিল, "দুধ যা নষ্ট করেছিস্ তাতে এমন দশ জোড়া কাপড় হয়, চুপ কর্ দেখি তুই।"

বকাবকি চেঁচামেচি, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ চলিতেছে, এমন সময় নিস্তার আসিয়া ক্ষেন্তিকে ডাক দিল, বলিল, "এতক্ষণ তোকে খুঁজতে পাইক-বরকন্দাজ বেরোল বোধ হয়। যা শীগগির, মা তোকে ডাকছেন।"

খালি বারকোষটাকে একটা হেঁচকা টানে উঠাইয়া লইয়া ক্ষেন্তি শশব্যস্তে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

সরকার-বউ জল লইয়া কলসী কাঁখে ফিরিয়া চলিয়াছে। রৌদ্রপ্লাবিত বাঁধা-ঘাটের কাছে তারিণী খুড়া হুঁকা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে ক্ষেন্তি, সত্যি?"

ক্ষেন্তি না থামিয়াই বলিল, "দাঁড়াও বাপু, আমার এখন এত কথা বলবার সময় নেই। মা কি জন্যে ডাকছেন দেখি আগে, তারপর যদি নিরামিষ-বাড়ীতে এস ত সব শুনবে এখন।"

তারিণী খুড়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ না একটা ব'লে যা না?"

ক্ষেন্তি যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া বলিল, "দেশ ছেড়ে ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না? মানে মানে ফিরে আসি আগে, তারপর শুনো।"

কিন্তু দেখা গেল, দেশ ছাড়িয়া যাওয়াই অন্ততঃ সম্প্রতিকার মত তার ললাটের লিখন। কাতুর মা দু'তলার সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, ক্ষেন্তিকে দেখিবা মাত্র বলিল, "এই যে ক্ষ্যান্ত, তোমাকে খুঁজে খুঁজে সব হয়রান। মার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, শীগগির ক'রে তৈরী হয়ে নাও গে।" তারপর ক্ষেন্তির কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "এ সংসারের অন্ন আর নয়, বুঝেছ? রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ পেয়ে নৌকোয় উঠবেন, ঠাকুরকে ভাড়া দিতে চলেছি।"

এমন যে ক্ষেন্তি, সেও নীরবেই কপালে হাত ঠেকাইল, তারপর ত্রস্তপদে সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

হেমবালার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ঠোঁটের কোণদুটা একটু শক্ত হইয়া আছে, তাও ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে বোঝা যায় না। একটি মাত্র খোলা জানালায় যে রোদটুকু ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, সেটুকুকে পিঠে করিয়া একটা জলচৌকি লইয়া বসিয়া তিনি স্নানান্তে আর্দ্র চুলের রাশ শুকাইতেছিলেন। ক্ষেন্তি দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই চকিতে তাহার দিকে একবাব চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "ভেতরে আয়।"

ক্ষেন্তি ভিতরে ঢুকিল মাত্রই, চৌকাঠের এপাশে কপাট ঘেঁষিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। হেমবালা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারবি ত?"

ক্ষেন্তি বলিল, "কেন পারব না মা? অবিশ্যি পারব। আপনার হুকুমের গোলাম। যেখানে যেতে বলবেন যাব, কলকাতা ত ভাল জায়গা। সংসারে আমার আর কেই বা আছে, আপনার পা-দুটি আশ্রয় ক'রেই বেঁচে আছি।"

হেমবালা আঙুল চালাইয়া ভিজাচুলের জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "কথা ত বেশ গুছিয়ে বলতে শিখেছিস্, কলকাতায় কাজে লাগবে। তা বেশ, তোর জিনিষপত্র চট্ ক'রে সব গুছিয়ে নিগে যা। খাওয়া দাওয়া সেরেই নৌকোয় উঠব।"

ক্ষেন্তি পায়ের নখে পাথর-বাঁধানো মেঝে খুঁড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে অনভ্যস্ত মৃদুগলায় বলিতে লাগিল, "সেই কথাই ত বলছি মা,—জিনিষপত্র কিই বা আমার আছে যে গোছাব? দুটি বই কাপড় নেই; সেবারে কলকেতা থেকে ফিরে এসে সব ঝিদের একটা ক'রে কামিজ দিয়েছিলেন, সে ত কোন্‌কালে ছিঁড়ে গিয়েছে। শীত এসে পড়ল, একখানা গায়ের কাপড় নেই। হাজার হোক, আমরা রাজবাড়ীর ঝি-চাকর, লোকের কাছে আমাদের মুখ রেখে চলতে হবে ত মা?"

হেমবালা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নে, নে, সে-সব কলকাতায় গিয়ে হবে এখন। তুই যা ত, শীগগির ক'রে গিয়ে তৈরী হ'। আর দেখ্, দেওয়ানজীকে আগে একটু ডেকে দিয়ে যাবি।"

"আচ্ছা মা," বলিয়া ক্ষেন্তি বাহির হইয়া গেল। পথে আবার তারিণীখুড়া, অপর্ণা, গোবিন্দর মাসী, কাতুর মা, মোক্ষদা, চাঁপা, নিস্তার, সরকার-গিন্নী, মুক্তোর পিসী। ক্ষেন্তি এবার আর তাহাদের হাত এড়াইবার কোন চেষ্টাই করিল না, নীচে ভিতর-বারান্দার একপাশে সকলকে ডাকিয়া ভিড় জমাইল। বক্তৃতা সুরু করিবে, এমন সময় উপরে সিঁড়ির মুখ হইতে হাঁক আসিল, "ক্ষ্যান্ত!"

আলগোছে সিঁড়ির নীচে হইতে সরিয়া গিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "মা!"

"কি করছিস্ তুই ওখানে? যা শীগগির দেওয়ানজীর কাছে।"

"যাচ্ছি মা," বলিয়া ইসারায় অন্যদের কাছ হইতে ছুট লইয়া ক্ষেন্তি এবার প্রায় ছুটিয়াই বাহির-মহলের দিকে চলিয়া গেল।

কাছারীবাড়ীর দক্ষিণদিকের একটা ঘরে ময়লা মসীচিহ্নিত একটা ফরাসের উপরে স্তূপাকার নথি-খাতা-পত্র লইয়া দেওয়ানজী বসিয়া ছিলেন, ক্ষেন্তি আসিয়া একপাশে দাঁড়াইলে প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে সে যে ক্ষেন্তি, সে যে মনিব-বাড়ীর খাস চাকরাণী, এবং তাহার যে কিছু বক্তব্য থাকা সম্ভব, এই উপলব্ধিগুলি রাশিরাশি ইজাজের-আদায়-ওয়াশীল-বকেয়া-বাকীর ভিড় কাটাইয়া তাঁহার মস্তিষ্কে একে একে প্রবেশ লাভ করিল। সহসা সচকিত হইয়া চোখ হইতে নিকেলের চশমাটি খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "কি ক্ষ্যান্ত?"

ক্ষেন্তি বলিল, "রাণীমা কি বলতে চান, আপনি একবার আসুন।"

দেওয়ানজী বিপুল দেহভার লইয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া-পড়িলেন, ত্রস্তে চটিজুতায় পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিলেন, "আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, তুমি তাঁকে বলগে যাও।"

ভিতর-বারান্দার দিকের দরজার এপাশ হইতে দেওয়ানজী গলা খাঁকারি দিলে ওপাশ হইতে পরিষ্কার কণ্ঠে শোনা গেল, "আমার যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ মা, ব্যবস্থা সব করা হয়ে গিয়েছে। মাঝিরা কাল রাত্রেই রাণী-বজরা ধুয়ে মুছে ঠিক ক'রে রেখেছে, পাল-দুটো দু-একজায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিল, সারিয়ে নিতে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাকবে।"

হেমবালা কহিলেন, "বজরায় গেলে কাল রাত্রের আগে নাসিরগঞ্জে পৌঁছনো যাবে না। আমি ভোরের ষ্টীমার ধরতে চাই, জমিদারী চালের চাইতে তাড়াতাড়ির চালটা আমার এখন বেশী দরকার।"

দেওয়ানজী একলা ঘরেই ঘামিয়া উঠিলেন, কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "তা ত বটেই, এখন তাহলে কি করব মা?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "সেও কি আমায় ব'লে দিতে হবে? ঘাসি, ডিঙি, যাহোক একটা হলেই হবে, দু-একটা মাল্লা বেশী নিতে বলবেন।"

"আজ্ঞে আচ্ছা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি। খাওয়াদাওয়ার পরেই কি বেরবেন?"

"হাঁ, কিন্তু তার ত বেশী দেরী নেই? আপনি নিজে তৈরী হয়ে নিয়েছেন?"

"আজ্ঞে আমি ত তৈরীই, কেবল এই সদর খাজনার বাকী হিসাবটা বাবুকে বুঝিয়ে—"

"কলকাতা থেকে ফিরে এসে বোঝাবেন।"

দেওয়ানজী নীরবে নতমস্তকে তাঁহার বিরল কেশে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিলেন। হেমবালা একটু পরে কহিলেন, "আমি উপরে যাচ্ছি, নৌকো এবং পাল্‌কির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমাকে খবর পাঠাবেন।"

এতক্ষণ হেমবালা অপরদের তাড়া দিয়াছেন. এবার মনে পড়িল, তাঁহার নিজেরই যাবার জোগাড় বিশেষ-কিছু এখনও করা হইয়া উঠে নাই। এবাড়ী

হইতে এক-কাপড়েই বাহির হইয়া যাইবেন, কাল সন্ধ্যা অবধি তাহাই ঠিক ছিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতায় নিজের মনের সঙ্গে নূতন করিয়া তাঁহার বোঝাপাড়া হইয়াছে। অনাবশ্যক রূঢ়তা-প্রকাশের দ্বারা নিজের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করা হইবে। মূল্যবান্ কিছুই লইবেন না, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহারের যাহা-কিছু সামগ্রী তাহা সঙ্গে লইতে কোনও দোষ নাই। তেইশ বৎসর আগে এ সংসারে যখন প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন শূন্যহাতে আসেন নাই; তারপর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সংসারের কাছ হইতে গ্রাসাচ্ছাদন হিসাবে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের কর্ম্মনিষ্ঠায় কর্ম্মিষ্ঠতায় তাহার বহুগুণ মূল্য তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন; আজ যখন স্বেচ্ছায় এই গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবেন তখনই বা শূন্যহাতে তাঁহাকে কেন যাইতে হইবে? লোক-জানাজানি যাহা হইবার তাহা হইবেই, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার দেবোপম ভ্রাতার নিকট হইতে কথাটা যতদিন গোপন রাখা যায় রাখিবার চেষ্টা তিনি করিবেন, এ সঙ্কল্পও তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার বয়স্থা কন্যা ঐন্দ্রিলা কলিকাতায় মামার কাছে থাকিয়া পড়াশোনা করে, মামী নাই, মেয়ের অভিভাবিকারূপে এখন কিছুদিন তাঁহারই সেখানে থাকা আবশ্যক, সেজন্যই তিনি আসিয়াছেন, কলিকাতায় ভাইকে এবং অন্যান্য সকলকে ইহাই তিনি বুঝিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন।

দূরে ঠাকুরদালানের পাশে আমলকি গাছের নীচে খাস বৈঠকখানার বারান্দার কতকটা চোখে পড়িল। সবগুলি দরজা বন্ধ, মনে হইল সকাল হইতে বন্ধই আছে, চাকরবাকরদেরও কেহ সেদিক মাড়াইতেছে না। চকিতে চোখদুটাকে ফিরাইয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে শানবাঁধানো উঠানটা পার হইলেন। ঐন্দ্রিলা কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন; ভোরে মায়ের ডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া সেই যে ফিরিয়া গিয়া নিজের বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, হেমবালা তাহাকে বাধা দেন নাই, কিন্তু তারপর মেয়ের কাছে একবারও আর তাঁহার যাওয়াও হয় নাই।

অন্দরের উঠান পার হইয়াই তাঁহার মনে হইল, উপরে তাঁহার শয়নঘরের পূর্বদিক্কার জানালাটা কে যেন বন্ধ করিয়া দিল। ভাবিলেন, ঐন্দ্রিলা হইবে। কিন্তু সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে মন কেমন যেন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। যেন উপরে জুতার শব্দ অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। ভাবিলেন, ফিরিয়া যাইবেন, এক মুহূর্ত্ত থামিলেনও, কিন্তু পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে এবং দৃঢ়পদে উপরে গিয়া উঠিলেন।

ভিতরে খাটের একপাশে চিরাভ্যস্ত স্থানটিতে নতমস্তকে নরেন্দ্রনারায়ণ বসিয়া ছিলেন। হেমবালার বুকটা এক মুহূর্ত্ত দুর্‌দুর্ করিয়া উঠিল।

প্রশস্ত কক্ষের দূরতম কোণে মেহগনির বিশাল ড্রেসিং টেবিল। হেমবালা ছোট দেরাজ হইতে চাবির গোছা বাহির করিলেন। একদিক্কার দেরাজে কেশরচনার সরঞ্জাম, অপরদিকে নিজের এবং ঐন্দ্রিলার নানাপ্রকারের প্রসাধন-দ্রব্য, ব্রোচ দুল ইত্যাদি ছোটজাতীয় গহনা। নীচের দেরাজদুটিতে সর্ব্বদা ব্যবহারের কাপড়-চোপড়। এক এক করিয়া সেগুলি বাহির করিয়া একপাশে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

স্বামীর দিকে তিনি দৃক্‌পাত-মাত্র করেন নাই, নরেন্দ্রনারায়ণও বহুক্ষণ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তারপর অকস্মাৎ এক সময় কম্পিতপদে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিলেন। হেমবালার অমনোযোগে বাধা পড়িল। পশ্চাৎ হইতে আয়নায় নরেন্দ্রের ছায়াপাত হইবামাত্র চকিতে নিজের মুখ তিনি নামাইয়া লইলেন। ফিরিয়া চাহিলেন না, কিন্তু তাঁহার জিনিষ-গোছানো বন্ধ হইয়া গেল।

নরেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি এই শেষবার তোমাকে বলতে এসেছি।"

হেমবালার ঠোঁটের কাছটা একটু কাঁপিয়া গেল। ঘরে ঢুকিবার সময় কিছু চিন্তা করিয়া আসেন নাই, এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ, শেষবারই বল।"

"কিছুতেই কি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই ?"

"যে সংসার থেকে তুমি আমাকে এনেছিলে সেখানে এ-ধরণের অপরাধ ক্ষমা করতে কেউ আমায় শেখায়নি।"

কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তিভরা নীরবতা, তারপর নরেন্দ্র আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "মেয়ের দিক্‌টাই না-হয় ভাবো, আমাদের ঐ একমাত্র—".

হেমবালা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি যা করছি, একমাত্র তার কথা ভেবেই করছি। এখানকার হাওয়া তার গায়ে কিছুতেই আমি আর লাগতে দিতে পারব না। নিজের কাছে কখনও তার মাথা হেঁটনা হয় তাও অবশ্য আমি দেখব।"

"বুঝিয়ে বলবার অনেক কথা ছিল, তুমি কিছু বলতেও দিলে না।"

"যতটা বুঝেছি তাই ঢের। আরও বুঝবার আগ্রহ আমার নেই।"

নরেন্দ্র কেবল বলিলেন, "ও!" গভীর বেদনার ছায়ার সঙ্গে তাঁহার মুখে অস্ফুট করুণ একটু হাসি খেলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপর হঠাৎ একসময় মুখ তুলিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যদি কথা দিই, জীবনে কখনও আর কোনো অপরাধ তোমার কাছে করব না ?"

এবারে হেমবালা একটু হাসিলেন, তারপর কহিলেন, "তাতে লাভ হবে, কথা রাখতে না-পারার আরও একটা অপরাধ তোমার বাড়বে। কথা যে রাখতে পারে সে এমন অপরাধ করে না।"

নরেন্দ্র নতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন, একথা সত্য। কথা যে রাখিতেই পারিবেন জোর করিয়া তাহা বলিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ-জীবনে নিজেকে কতবার এ ধরণের কত কথা দিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি কথা রাখিতে পারেন নাই। তবু একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে কহিলেন, "যদি কথা রাখতে পারি, তুমি ফিরে আসবে ব'লে যাও।"

হেমবালা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মেয়েমানুষ যখন যায়, ফেরবার পথ আর রেখে যায় না।"

কথাটা যুক্তির মত শোনাইল, কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যে কোথায় কেমন যেন একটা অস্পষ্টতার শৈথিল্য রহিয়া গেল। অন্ততঃ বলিয়া হেমবালার মন খুশী হইল না। চূড়ান্ত যুক্তি কিছু যেন আরও ছিল।

"এই তাহলে শেষ?"

"তুমি জানো। আমি অনেক আগেই শেষ করেছি।"

"ঐন্দ্রিলা?"

"সে আমার কাছেই থাকবে।"

"সে যদি আমাকে ক্ষমা করে?"

"আমি বাধা দেব না, কিন্তু তার ওপর আমার শাসন যতদিন চলবে, আমার কাছেই তাকে রাখব।"

"বাপকে দেখতে আসাও তার বারণ?"

"আমি বারণই করব।"

নরেন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, ফিরিয়া গিয়া খাটের একদিকটায় বসিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুমি জানো এইখানটায় আমার জবরদস্তি চলে?"

হেমবালা এবার চকিতে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর কহিলেন, "জবরদস্তি আরও অনেক জায়গায় তোমার হয়ত চলে, কিন্তু খুব একটা লোক-জানাজানি হলে তাতে তোমার কিছু লাভ হবে? ইনু এখন অবধি কিছু জানে না, যখন জানবে তোমার প্রতি তার প্রীতি কিছুমাত্র বাড়বে না।"

মুদিতচক্ষে নরেন্দ্র দুই ভুরুর মাঝখানটা আঙুলে চাপিতে লাগিলেন। বলিবার বা শুনিবার আর কোন কথাই অবশিষ্ট নাই। বাহির হইয়া যাইবার আগে নিত্যকার মত স্বাভাবিক গলা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে?"

"দেওয়ানজীকে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাকবে।"

"টাকাকড়ি—"

"আমার হাতে যা আছে তাই যথেষ্ট। ইলুকে পড়াখরচ ব'লে কলকাতায় যা পাঠান হত সেটা অবশ্য যাবে।"

"নাসিরগঞ্জ অবধি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"দরকার হবে না।"

ধীরপদে নতমস্তকে নরেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। কঠিন পরীক্ষায় এত সহজে উত্তীর্ণ হইবেন, হেমবালা বুঝিতে পারেন নাই। মনে মনে অনেক কঠিন কথার মহড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া কিছু বলা হইল না বলিয়া কোথায় যেন একটু ক্ষোভও রহিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়াছিলেন, জিনিষ গোছানোর কাজ অসমাপ্ত ফেলিয়া রাখিয়া ঐন্দ্রিলার সংবাদ লইতে প্রস্থান করিলেন।

২

নিজের ঘরে গোটা-দুই খোলা সুটকেসের সামনে মাদুরের উপর ঐন্দ্রিলা বসিয়াছিল। মায়ের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

ছুটির পর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ঐন্দ্রিলা চিরকালই অত্যন্ত দুঃখ পায়, কিন্তু কান্নাকাটি করা তাহার স্বভাবে নাই। নিজের কোনও দুর্ব্বলতাকে কোথাও প্রকাশ হইতে দিতে অতি শৈশব হইতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। আজ তাই তাহার অশ্রুপ্লাবিত চোখের দিকে চাহিয়া হেমবালার মনে হঠাৎ একটা বড়রকম দোলা লাগিল। সহসা মনে পড়িল, এতদিন ঐন্দ্রিলাকে অকারণেই তিনি অপরিণতবুদ্ধি বালিকা কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যের সীমা বহুকাল তাহার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকা বয়সেই কলিকাতায় মামার কাছে

থাকিয়া সে পড়িতে গিয়াছিল। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান বলিয়া, দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে পুত্রস্থানীয় করিয়া মানুষ করিবার এই ব্যবস্থাতে নরেন্দ্রনারায়ণ বাধা দেন নাই, উৎসাহ সহকারেই রাজি হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর কখনও দুইবার কখনও বা তিনবার দেশে পিতামাতার কাছে ঐন্দ্রিলা ছুটি কাটাইতে আসিয়াছে; স্বল্পস্থায়ী সেই মিলনোৎসবের দিনগুলিতে তাহার গভীরতর মনের কোনও পরিচয় লইবার সুযোগ হেমবালার হয় নাই। যে-বয়সে সে মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিল, মায়ের স্নেহান্ধ দৃষ্টিতে সেই বয়সটাই তাহার চিরন্তন হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আজ ঐন্দ্রিলার চোখের দৃষ্টির মধ্যে তাকাইয়া হেমবালা পলকের মত অনুভব করিলেন, এ আর বালিকা নহে, ইহার পরিণত মনের নিকট হইতে কোনও কথা লুকাইবার চেষ্টা করা হয়ত বৃথা, হয়ত কেহ না বলিতেই সহজে সে সব বুঝিয়াছে।

বলিলেন, "তোর জিনিষ গোছানো শেষ হযে গিয়েছে ইলু

"এই হয়ে গেল মা," বলিয়া ঐন্দ্রিলা পাট করা শাড়ীজামাগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সুটকেসের মধ্যে ঠাসিয়া রাখিতে লাগিল। বাসন্তী-রঙের বেনারসীটি গত পূজায় তাহার বাবা তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেটিকে এক মুহূর্ত্ত কোলে লইয়া রহিল। এই কাশ্মীরী শালটি এবার জন্মদিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পাওয়া, অন্যমনেই তাহার উপর সস্নেহে সে হাত বুলাইল। এই মুক্তার কণ্ঠী ম্যাট্রিকে বৃত্তি পাওয়ার পর পিতার পাঠানো পারিতোষিক। এই গোল্ডটিস্যু শাড়ীটি সে যতবার পরে তাহার বাবা তাহাকে রাণী-মা বলিয়া ছাড়া সম্বোধন করেন না। এগুলিকে এতদিন যে স্নেহ-গর্ব্বিত আনন্দের চোখে সে দেখিয়াছে, অতঃপর আর তাহা দেখিতে পাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে ঐন্দ্রিলার চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ঠোঁটের কোণ-দুটা অবাধ্য হইয়া কাঁপিতে লাগিল, গলার কাছটা কিসে যেন চাপিয়া ধরিতেছে। হেমবালা দাঁড়াইয়া ছিলেন, কন্যার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাহার জিনিষ গোছানোতে সাহায্য করিবার ছলে নিজেও

একটা সুটকেস টানিয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। যেন কিছুই হয় নাই, এমনই ভাবে কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, "হাঁরে, কলকাতায় কি এখনই শীত প'ড়ে গিয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা নিজেকে অনেকখানি সম্বরণ করিয়াছিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

"পূজোর পরেও গরম থাকে?"

ঐন্দ্রিলা মাথা দুলাইয়া জানাইল, হ্যাঁ।

"কখন থেকে তা হ'লে শীত সুরু হয়?"

ঐন্দ্রিলা এ কথার কোনও জবাব দিল না। হেমবালা বলিলেন, "কথা বলছিস না কেন? কি হয়েছে তোর?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া ঐন্দ্রিলা কষ্টে উচ্চারণ করিল, "কই, কিছু ত হয়নি!"

"বীণা এখন আর কলেজে যায় না?"

"মেয়েকে নিয়ে সময় পায় না বুঝি?"

"না।"

"কে মেয়েকে দেখে, ও নিজেই?"

"হুঁ, আয়াও আছে।"

"কি ব'লে ডাকে মেয়েটিকে? কতবার যে তুই বলেছিস্, কিন্তু কেমন ভুলে যাই।"

"মন্দিরা।"

"মন্দিরা, ঐটেই ওর আসল নাম ত নয়? ভাল নামটা যেন কি? অ—"

"অপর্ণা।"

"বীণা আবার কি বিয়ে করবে? আজকালকার দিনে ত বাধা নেই। তুই শুনেছিস্ কখনও কিছু?"

ঐন্দ্রিলা নীরব রহিল।

"তোর মামা ওর বিয়ের কথা কিছু বলেন না ?"

"কখনও ত শুনিনি কিছু বলতে।"

"ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কেউ আসে-টাসে ? খোঁজ-খবর নেয় ?"

"উঁহু।"

"বীণা যদি আবার বিয়ে করে, ওরা কেউ আপত্তি করবে না বোধ হয় ?

"ওরা কেন আপত্তি করতে যাবে ?"

এমনই করিয়া ঐন্দ্রিলার সুটকেস গোছানো শেষ হইতে হইতে অনেক কথাই হইল। শেষ অবধি ঐন্দ্রিলার মনের ভারটা অনেকটা লঘু হইয়া গেল। তাহার কথার জড়তা কাটিয়া গেল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিজেও দুএকটা কথা সে বলিয়া ফেলিল। ইহাতে হেমবালা যতটা খুশী হইলেন সে নিজে তাহা হইতে কিছুমাত্র কম খুশী হইল না। কোন জিনিষ লইয়াই বাড়াবাড়ি করাটাকে সে আশৈশব অপছন্দ করে। আজ শেষ-অবধি আবাধ্য অশ্রুকে সে যে শাসন করিতে পারিল ইহাতে মনে মনে আরাম অনুভব না করিয়া পারিল না। হেমবালা কহিলেন, "আমি দেখছি ওদিকে কতদূর হ'ল, তুই চট ক'রে স্নানটা সেরে নে।"

ঐন্দ্রিলার স্নান শেষ না হইতেই বড় বড় দুইটি রূপার থালায় সারি সারি জয়পুরী বাটি ভরিয়া রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ আসিল। হেমবালা পায়সের বাটি হইতে দু-আঙুলের ডগায় করিয়া একটু পায়স লইয়া কপালের কাছে তুলিয়া জিভে ঠেকাইলেন, অসুখের ছল করিয়া কিছুই খাইলেন না। ঐন্দ্রিলাও আসনে অসিয়া বসিল মাত্রই, অন্ন তাহার গলায় বাধিয়া যাইতে লাগিল। শেষ অবধি সেও কিছুই প্রায় না-খাইয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরের দেউড়িতে দেওয়ানজী অপেক্ষা করিতেছেন। জিনিষপত্র নদীর ঘাটে পাঠানো হইতেছে, ক্ষেন্তিও খাইয়া-দাইয়া তৈরী হইয়াছে। নীচে সিঁড়ির কাছে গ্রামের বর্ষীয়সী এবং অবিবাহিতা নারীদের ভিড়। উঠানের একপাশে দুইটি পাল্‌কি এবং একটি ডুলি অপেক্ষা করিতেছে। লাট্টু এবং লাটাই হাতে পাড়ার যত

ছেলের দল সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। কেহ কেহ পাল্‌কির ভারা কাঁধে করিতে গিয়া বেহারাদের কাছে তাড়া খাইতেছে। অন্যেরা তাহাতে আমোদ পাইয়া হৈ-হৈ করিয়া উঠিতেছে।

ঐন্দ্রিলা নীচে নামিয়াই একবার চকিতের মত চারিপাশটা দেখিয়া লইল। আর ত সময় নাই। প্রতিবেশিনীরা তাহার মায়ের সিঁথিতে কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছে। পাল্‌কির মধ্যে বিছানা পাতা হইতেছে। হেমবালা ডাকিলেন, "ইলু, তোর কাতু-পিসিমাকে প্রণাম করেছিস্?"

জ্ঞাতি সম্পর্কে পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী আরও কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সকলকে প্রণাম করিয়া, সম্পর্কে যাহারা ছোট তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, হেমবালা একদল প্রতিবেশিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। লুকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সে একবার উপরের সব-ক'টা ঘর দেখিয়া আসিল। নীচে নামিয়া অভ্যাগতদের কৌতুকদৃষ্টি বাঁচাইয়া একতলার ঘর-ক'টাও দেখিল। দ্রুতপদে উঠান অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই শুনিতে পাইল, পাল্‌কির খোলাদরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হেমবালা ডাকিতেছেন, "ইলু, কি করছিস্ তুই?"

কলিকাতায় মামার সঙ্গে পরিচয় হইয়া অবধি ঐন্দ্রিলা রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে পারতপক্ষে যাইত না, আজ ঘটা করিয়া পূজা-দেউলের ভিত্তিগাত্রে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর ফিরিবার পথে নরেন্দ্রের বসিবার ঘরটায় একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া স্থিরপদে হেমবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাল্‌কি-দুটির দরজা খুলিল, বন্ধ হইল। ক্ষেন্তির ডুলির উপর মশারির কানাত পড়িল। বেহারারা পাল্‌কি ডুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইতেই স্ত্রীকণ্ঠে হুলু-ধ্বনি হইল, ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিল।

বাড়ী হইতে নদীর ঘাট দেড়মাইল-টাক দূরে। খানিকটা পথ আসিয়া

ঐন্দ্রিলা একবার পাল্‌কির দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই বিশেষ দেখিতে পাইল না। জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া পাল্‌কি চলিতেছে, ঘরবাড়ী গাছপালার ভিড়ে পিছনের পথ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এক প্রৌঢ়া জেলেনী মলিন শতছিন্ন একখানি কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া বসিয়া আঁকশি-বাড়ি হাতে রোদে-ঝুলানো মাছ পাহারা দিতেছিল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পথের পাশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পথের এক পাশে দুটি ছোট ছোট মেয়ে, পরনে গামছা, নাকে নোলক, একজনের কাঁখে প্রায় তার নিজেরই সমান ওজনের একটা উলঙ্গ ছেলে, ভয়কৌতুকভরা দৃষ্টি লইয়া গলাগলি জড়সড় তামাসা দেখিবার লোভে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাৎ হইতে কে-একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "গড় কর্, হতভাগীরা গড় কর্।" মেয়ে দুটি থতমত খাইয়া কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, ততক্ষণে ঐন্দ্রিলার পাল্‌কি তাহাদের অতিক্রম করিয়া গেল।

নদীর ঘাটে আসিয়া পাল্‌কি নামিলে ঐন্দ্রিলা বাহির হইয়া প্রথমেই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ছোট মাঠটির ওপারে আম-জাম-কাঁটাল-জলপাই-লিচুগাছের নিবিড় যবনিকার ঊর্দ্ধে তাহাদের ভিতর মহলের দুতলার একটি দিক্ চোখে পড়িতেছে। শাদা চুণকামের উপর দুপুরের রোদ পড়িয়া জ্বলিতেছে, হঠাৎ চাহিলে চোখ ফিরাইয়া লইতে হয়, তবু আগ্রহভরা দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল। মা যখন ডাকিলেন তখন তাহার চমক ভাঙিল। তবু নৌকায় উঠিতে গিয়াও বারবার পশ্চাতে তাকাইল, পা ধুইতে অকারণেই ইচ্ছা করিয়া দেরি করিল; অবশেষে যখন উঠিল, অবাধ্য অশ্রু কিছুতেই আর বারণ মানিতেছে না। নিজের দুর্ব্বলতা পাছে কাহারও চোখে পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভার একটু লঘু হইলে অনুভব করিল, হেমবালা নীরবে আসিয়া পাশে বসিয়া তাহার গায়ে একটি হাত রাখিলেন। সে প্রাণপণে

ক্রন্দনবেগ রোধ করিল, কিন্তু উঠিল না, মুখ তুলিয়া হেমবালার মুখের দিকে দেখিলও না। পাল তোলা হইতেছে, মাঝিমাল্লাদের কোলাহল। দেওয়ানজী চাকরবাকরদের লইয়া অপর একটি নৌকায় উঠিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। গম্ভীর গলায় মাঝিদের তিনি প্রতি পদে উপদেশ দিতেছেন, প্রত্যেকটি কাজের সমালোচনা করিতেছেন। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অবহেলিত হইতেছে বলিয়া তাহারা মাঝে মাঝে তাড়া খাইতেছে। কিন্তু নিজেদের কাজ তাহারা দেওয়ানজী অপেক্ষা বেশী বোঝে, তাঁহার কোনও কোনও উপদেশ অমান্য না করিয়া তাহাদের উপায় নাই।

নীচে সহসা জলস্রোত অধীর উচ্ছ্বাসে কলকল করিয়া উঠিল। নৌকার মুখ ঘুরিয়া যাইতেছে, তীব্র গতিতে ঘুরিতেছে। ঠিক কতটা ঘুরিল ঐন্দ্রিলা অনুভব করিতে পারিল না, একবার মনে হইল মুখটা ঘুরিয়া ঠিক যেন আবার আগেরই জায়গায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু থরথর গতিবেগের স্পন্দন সমস্ত দেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া সলিলস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে লাগিতেছে, নীচে নৌকার বাতায় প্রতিহত স্রোতোজলের একটানা কলকল শব্দ, অশ্রুভারাক্রান্ত মনের চিন্তায় নিস্পৃহতা, সমস্ত মিলিয়া ঐন্দ্রিলার চেতনার উপর একটি আর্দ্র করুণ তন্দ্রার যবনিকা রচনা করিয়া দিল।

যখন ঘুম ভাঙিল দেখিল, হেমবালা একটা চাদর মুড়ি দিয়া বিছানার একপাশে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছেন। বাহুর আড়ালে মুখটা ঢাকা পড়িয়াছে, তবু ঐন্দ্রিলার বোধ হইল তিনি জাগিয়া আছেন। মাকে ডাকিয়া সন্দেহের নিরসন করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। ধীরে ঝাপ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। আধখানা ঝাপকে আড় করিয়া বসাইয়া মাল্লাদের কৌতূহল-দৃষ্টি হইতে নিজেকে সে আড়াল করিল, তারপর সম্মুখে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বাতাস পড়িয়া আসিয়াছে। পাল নামানো হয় নাই, কিন্তু দাঁড়ের টানে দমকে দমকে নৌকা অগ্রসর হইতেছে। দাঁড়ের ফলার আঘাতে আলোড়িত জলের আবর্ত্ত ঐন্দ্রিলার শূন্যতানিবদ্ধ অলস দৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। মনে মনে কখন সে একটি আবর্ত্তের সঙ্গে আর-একটির তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সে জানে না। ক্রমে যেন সেই সূত্র ধরিয়াই চিন্তার আবর্ত্ত তাহার মনে ঘনাইয়া আসিল।

যাহা অপরিহার্য্য নির্বিরোধে তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার চিরকালের স্বভাব ছিল, আজও সে তাহাই করিয়াছে। নচেৎ যদি ইচ্ছা করিত, বিরোধ করিয়া, গোল বাধাইয়া পিতাকে শেষ একবার দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আসা তাহার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু বিরোধ করিয়া অপ্রীতিকর অবস্থাটাকে আরও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা করে নাই। এই শেষ মুহূর্ত্তের অদর্শনের বেদনা কোনোদিন হয়ত সে ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু এমন আরও কত বেদনাই ত তাহার হৃদয়ের গোপনে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, নিজ হাতে তাহাদের প্রতিকার-চেষ্টা কোনোদিন সে করে নাই। নিজেকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগে না। তাছাড়া পিতাকে দেখিতে বা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে কোনও বাধা আছে এমন কথা হেমবালা একবারও তাহাকে বলেন নাই। বিরোধ কাহার সঙ্গে সে করিবে? মায়ের ইচ্ছা মন দিয়া অনুভব করিয়া সে জানিয়াছে; বুঝিয়াছে, বাধা আছে, অতি দুস্তর বাধাই কিছু আছে। কেন বাধা, কিসের বাধা তাহা সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিতে কেন যেন তাহার ইচ্ছা হয় নাই। নিজের মনেও এ-রহস্যের সমাধানের চেষ্টা বেশীদূর অবধি সে করে নাই, অকারণেই তাহার অত্যন্ত ভয় ভয় করিয়াছে। সে কেবল ইহা বুঝিয়াছে, নরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং এবিষয়ে হেমবালার নির্দ্ধারণকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, গত দুই দিন তাঁহার পলাইয়া বেড়ানোর

আর-কিছু অর্থ হয় না। একাকী পিতামাতার সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে কি করিবে?

সহসা সম্মুখে একটি ছবি। একটি ধূসর বালুচর ঘেরিয়া নদীটি বাঁক ঘুরিয়া গিয়াছে। স্থির নীলজলের উপর চকিত ছায়া ফেলিয়া এক ঝাঁক গাঙচিল উড়িতেছে। যেন রূপালী আগুনের ফুল্‌কি। উপরে দিনের আলো ক্রমশঃ স্বর্ণময় হইয়া আসিতেছে। কেমন যেন করুণ ভারাতুর, যেন সোনার ভার বহিতে পারিতেছে না। দূরে তীরবনের ছায়াস্তরাল হইতে ঘুঘুর ডাক শোনা যাইতেছে। ঐন্দ্রিলা ছবি আঁকিত, সব-কিছু ভুলিয়া এই সৌন্দর্য্যের রসসমুদ্রে ক্রমে তাহার মন নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর গঞ্জের হাটে নৌকা ভিড়াইয়া আহারাদি করা হইল। পথে জেলে-নৌকা ধরিয়া মাছ আদায় হইয়াছিল, চালডাল সঙ্গে ছিল।—দেওয়ানজীর নৌকায় রান্না হইয়াছিল, ক্ষেন্তি দুজনের জন্যই খাবার আনিল। এবার স্বামীর সংসারের অন্ন ঠিক নয়, ক্ষেন্তিও অনেক সাধাসাধি করিল, তবু হেমবালা খাইতে পারিলেন না। ঐন্দ্রিলার একটু ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল, নীরবে বসিয়া সামান্য-কিছু আহার করিল। আহারের পর মাঝিরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিল, গুয়াপান এবং এক ছিলিম তামাক খাইল, তারপর আর-এক ছিলিম খাইল। বাতাস একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, তাছাড়া গঞ্জের পাশেই বড় নদী, স্রোত কম, এবার দাঁড়ের টানের উপরই একমাত্র ভরসা। সমস্ত রাত আর বিশ্রাম মিলিবে না, সকলে প্রস্তুত হইয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া যে যাহার স্থানে গেল। নৌকা বড় নদীতে পড়িবার মুখে গলুইয়ে জল দিয়া সকলে সমস্বরে বদর বদর করিয়া উঠিল।

পরের দিন ভোরে নাসিরগঞ্জ ষ্টীমারের ঘাট। দেওয়ানজীর নৌকা পিছনে পড়িয়াছিল, দণ্ডদুই অপেক্ষা করিবার পর তিনিও আসিয়া পড়িলেন। তখন তাড়াহুড়া করিয়া সকলে ডাঙায় উঠিল। ষ্টীমার আসিতে আর দেরি নাই,

মাঝিরা যাত্রীদের কাছে খবর লইয়া জানিয়াছে, দূরে বহুক্ষণ আগেই ধোঁয়া দেখা গিয়াছে। ষ্টেশনের বারান্দার এক পাশে যেখানে মাঝিরা তাহাদের জিনিষপত্র স্তূপাকার করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, সেখানে একটা স্যুট্‌কেসের উপর জায়গা করিয়া বসিতে গিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, একটু দূরে একটা লিচু গাছের নীচে ঘোড়ার লাগাম হাতে করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণের আর পথশ্রমের ক্লান্তি তাঁহার মুখে চোখে সুপরিস্ফুট। ঐন্দ্রিলাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহার দিকে চাহিতেছেন না, এই অভিমানটুকুর অধিকার তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।

উদ্যত অশ্রু প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলা তাঁহাকে প্রণাম করিল, নরেন্দ্র নীরবে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নরেন্দ্রের বলিবার মত কথা কিছুই ছিল না, পাছে অশ্রুর স্রোত বাধা না মানে এই ভয়ে ঐন্দ্রিলাও কোনো কথা কহিল না, নীরবে পিতার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমবালা আসিতে আসিতে সেদিকে একবারমাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রস্তপদে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। ষ্টেশনঘর হইতে একটি মোড়া সংগ্রহ করিয়া সঙ্গের চাকরদের একজন তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটিয়া গেল। আর-একজন নরেন্দ্রের হাত হইতে সসম্ভ্রমে ঘোড়ার লাগামটা চাহিয়া লইল।

দেওয়ানজী পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। টিকিট করিয়া লিচুগাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পথে কি কি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, কলিকাতায় কতদিন থাকিবেন, হেমবালাদের পৌছাইয়া দেওয়া ছাড়া সেখানে আরও কি কি কাজ তাঁহার করিবার আছে, এইসব বিষয়ে নরেন্দ্র তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জাহাজ আসিয়া পড়িল।

আবার হাঁকডাক হুল্লোড় তাড়াহুড়ার পালা। জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না,

চাকরবাকরও মাঝি-মাল্লা মিলিয়া হাতাহাতি সব জিনিষপত্র উঠাইয়া ফেলিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ঐন্দ্রিলার সঙ্গে একটিও কথা কহেন নাই, বিদায়মুহূর্ত্তেও কি কথা বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। "চিঠি লিখিও" এই চিরাভ্যস্ত কথাটি মুখের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া বাধিয়া গেল ; কন্যার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলিবে কি-না পত্নীর সঙ্গে সে-বিষয়ে বোঝাপড়া করা হয় নাই। পিতাকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঐন্দ্রিলার মাথাটার কেবলই দেরি হইতে লাগিল।

জাহাজের সিঁড়ি তুলিবার সময় হইয়াছে। সারেঙ দুতলার ছাতের পুল হইতে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া "পাসিন্দার"দের তাড়াতাড়ি করিতে বলিতেছে।

ঐন্দ্রিলার জন্য অপেক্ষা না করিয়া হেমবালা জোড়াতক্তার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের মন এই বিদায়কে একবারও শেষ বিদায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তবু এই ক'দিনেই তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাঁহার এই বিরলভাষিণী কন্যার নিগূঢ়তর বেদনা তাঁহার নিজের বেদনা হইতে বড় হইল। হেমবালার দিকে শেষ মুহূর্ত্তটিতে তিনি চাহিতে ভুলিলেন, কন্যাকে দুই হাতে করিয়া উঠাইলেন, বুকে টানিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিলেন. কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হইল।

ক্ষেন্তির সঙ্গে ঐন্দ্রিলাও উঠিয়া পড়িয়াছে। নীচে কলঘরে টুর্‌র্‌র্‌ং করিয়া সারেঙের ঘণ্টা বাজিতেছে। গম্ভীর সিটির শব্দের স্পন্দনে কাঠের ডেক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ডেকের রেলিঙের উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া ঐন্দ্রিলা একদৃষ্টে পিতার দিকে চাহিয়া আছে।

অন্ধকার কেবিনটার মাঝখানে একাকী দাঁড়াইয়া সহসা হেমবালা উপলব্ধি করিলেন, এই শেষ! এ জীবনেই আর কখনও দেখা হইবে কি-না, কে জানে? চকিতের মত তাঁহার বিবাহিত-জীবনের বিগত তেইশটা বৎসর ছোটবড় সহস্র আনন্দবেদনা জয়-পরাজয় বিরহমিলনের স্মৃতি লইয়া তাঁহার মনের চতুর্দ্দিকে ভিড়

করিয়া আসিল। নিজেকে লইয়া পলাইবার পথ একমুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইল। দুইহাতে কেবিনের জানালা মেলিয়া ধরিয়া সাগ্রহ সোৎসুক দৃষ্টিকে তীরের দিকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উদ্বেলিত অশ্রু আসিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিল।

জাহাজ দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে।

৩

অজয় পলাইতেছে।

জীবনে আরও অনেকবার সে পলাইয়াছে, কিন্তু আজিকার যে ভয়াবহতা সে-রকম কিছুর সঙ্গে এই চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহার আর পরিচয় হয় নাই।

সে পলাইতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরে মাধুর্য্যের স্পর্শ। নিশান্ধকার, মেঘহীন আকাশে অগণিত নক্ষত্রের স্পন্দন, নদীতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরের কুয়াসা-মণ্ডিত নিস্তব্ধতা, সবকিছু যেন কোন্ জন্মান্তর-পরিচয়ের ভাষায় তাহার সঙ্গে আজ কথা কহিতেছে। সে-ভাষা সে বুঝিতেছে না, কিন্তু তাহার হৃদয় সাড়া দিতেছে।

আজিকার এই মধুর ভয়াবহতার পশ্চাতে এক রূপসী অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণী। পথে আসিতে দূর হইতে তাহাকে কয়েকবার সে দেখিয়াছে। শেষরাত্রির দিকে চাঁদ উঠিলে জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া অপরিচিতার মুখখানি কেমন তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে, এই আশা প্রথম হইতেই তাহার মনে ছিল, কিন্তু চাঁদ উঠিতে বহু বিলম্ব আছে বুঝিতে পারিয়া সে আর ততক্ষণ অপেক্ষা করে নাই।

আর-কিছু ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছে না, তবু বিগত-সন্ধ্যার সেই মহা-

উত্তেজনার মুহূর্ত্ত-ক'টা পলায়নপর অজয়ের মনে পড়িয়া গেল।...জাহাজের গতিবেগের স্পন্দনের সঙ্গে শিরায় শোণিত-স্রোতের স্পন্দন অলক্ষ্যে কখন সমতালে মিশিয়া গিয়াছে। সহসা কোথাও-কিছু-নাই. প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, সেইসঙ্গে জাহাজের গতি এবং শিরাতে রক্তগতি সমস্বরে একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িয়া থামিয়া গেল। তারপর বহুকণ্ঠের চীৎকার-চেঁচামেচি, "দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনি,"...শিশুদের ক্রন্দন, নারীদের কোলাহল। ভয়ার্ত্ত যাত্রীদের ক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যকে কতকটা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে দোতলার ডেক হইতে একতলায় নামিবার সব-ক'টা সিঁড়িকে খালাসীরা কাছি জড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপর নিজেরা সারেঙের উচ্চকণ্ঠের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কখনও একতলায় কখনও বা দোতলার ছাতে, কাছি-রেলিং-রেলিঙের-থাম বাহিয়া, লাফাইয়া, ঝুলিয়া, দ্রুতগতিতে ছুটিয়া ছিটকাইয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ-শিশুবৃদ্ধ যে-ই পড়িতেছে তাহাকে কঠোরহস্তে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

মজ্জিত বালুচরে ঠেকিয়া জাহাজ প্রায় উল্‌টিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। যাত্রীদের বহুভাগ্যবলে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয় নাই, কেবল বিপরীত পথযাত্রী আর-একটা জাহাজের কয়েকঘণ্টাব্যাপী টানাটানির ফলে বালুচর ছাড়িয়া সে যখন গভীরতর জলে নামিয়া আসিল তখন দেখা গেল, একদিক্‌কার চাকা দুম্‌ড়াইয়া ভাঙিয়া সে-যাত্রার মত সে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া কলকব্জাও কোথাও কোথাও বিগ্‌ড়াইয়াছে। নিকটতম ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোনোগতিকে জল কাটিয়া আসিয়া যাত্রীদের সে নামাইয়া দিয়াছে তারপর কাৎ-হইয়া-পড়া বিপুলাকার দেহটাকে টানিয়া লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি সন্তর্পণে খিদিরপুরের দিকে প্রস্থান করিয়াছে।

নদীতীরে খোলা আকাশের নীচে বিচিত্রবর্ণের সতরঞ্চের উপর শাদা ধবধবে চাদর বিছাইয়া উত্তেজনা-ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবার আয়োজন

করিতেছে, এমন সময় অদূরবর্ত্তিনী সেই সুন্দরী অপরিচিতা অজয়ের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। মাঝখানে মাত্র কয়েক-হাত জমি এবং কতকগুলি স্তূপাকার জিনিষপত্রের প্রাচীরের ব্যবধান। অজয়ের দুর্ব্বল অপরিণত দেহে সে সাধ্য ছিল না যে, গুরুভার ট্রাঙ্ক্-সুটকেস্ ইত্যাদি টানাটানি করিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারে। অত রাত্রিতে সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে মুটের সাহায্যও মিলিত না। অগত্যা খালাসীরা যেখানে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেইখানেই সে রহিয়া গেল।

ঘুমাইবার চেষ্টা সে সত্যসত্যই করিয়াছিল ; কিন্তু অপরিচিত স্থানে অনভ্যস্ত আবেষ্টনের মধ্যে সহজে চোখে ঘুম আসে না। আশেপাশে যাত্রীরা দলে দলে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে নারীও অনেকে ছিলেন। কেবল সেই তরুণী একাকী দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল। সেদিকে চাহিতে অজয়ের সঙ্কোচের অবধি ছিল না, কিন্তু ভাল করিয়া না চাহিয়াও সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, অবারিত আকাশের নীচে অপরিচিত-সমাবেশের মধ্যে নিদ্রার অতি-অন্তরঙ্গতার আরাধনা কবিতে তরুণীর লজ্জায় বাধিতেছে। তরুণী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে আর সে পাশে পড়িয়া ঘুমাইবে ইহা তাহার কেমন যেন সম্ভব মনে হইল না। সে না-ঘুমাইলে তরুণীর নিশাজাগরণেব ক্লেশের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না জানিয়াও সমস্ত রাত সে জাগিয়াই কাটাইবে স্থির করিল। পাছে অনবধানতায় নিদ্রাকর্ষণ হয় এই ভয়ে একবার বালিশের ভর ছাড়িয়া বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তরুণী অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলে না-জানি কি মনে করিবে ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তন্দ্রাঘন নিশান্ধকারে কি জাদু আছে, তাহার স্পর্শ দুঃসাহসের গায় আসিয়া লাগে, তারপর তাহাকে আর দুঃসাহস বলিয়া চেনা যায় না। অন্ধকার

রাত্রির আশ্রয়ে অজয়েরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া চলিল। বালিশে মাথা রাখিয়া তরুণীকে সে দেখিতেছে। অপলক দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতেছে।

তারকাখচিত অসীম আকাশের গায়ে অন্ধকারের রঙে আঁকা একখানি কবরী। তরুণীর ক্ষীণ হস্তের সযত্ন কেশ-রচনা। আকাশ যেন অপরিসীম আদরে ইহাকে আজ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই কবরীটিরই শোভাবর্দ্ধনের জন্য সে যেন আজ ইহাকে নক্ষত্রের মণি গাঁথিয়া ঘিরিয়াছে। একটি শুভ্র পেলব হস্তের একগাছি কঙ্কণের উপর পড়িয়া অস্ফুট একটু তারার আলো পরম কৃতার্থতার গৌরবে হাসিয়া উঠিতেছিল; অজয়ের মনে হইতেছিল, তাহার জানা ও অজানা পৃথিবীতে এ মাধুর্য্যের কোথাও যেন আর তুলনা নাই। যেন একাধারে স্বর্ণিম সুধা, জ্যোতিঃ এবং ঝঙ্কার। অজয়ের পক্ষ হইয়া বলা আবশ্যক যে সে লুকাইয়া কবিতা লিখিয়া থাকে। তদুপরি তাহার চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে কোনও নিঃসম্পর্কিতা তরুণীর এতখানি নিকট সান্নিধ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে লাভ করে নাই। আশৈশব যে-সমাজে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা শোভা-সম্পদ্‌হীন পুরুষের সমাজ, লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীরা সেখানে অন্তরালবর্ত্তিনী। সে শৈশবে মাতৃহীন, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র পুত্র। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইবার পর নিজের দূর ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনীরূপে সে একটি বিদ্যুৎবর্ণা যূথিকাপেলবা ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকামূর্ত্তি কল্পনা করিত মাত্র; কখনও তাহার অপরিমিত কেশরাজি বেণীবদ্ধ হইয়া পিঠে দুলিত, কখনও বা বর্ষার মেঘাড়ম্বরের মত গ্রীবামূল ছাইয়া অসম্বদ্ধ ভাবে বিরাজ করিত। আজ সহসা অদৃষ্টপূর্ব্বা তরুণীর বিশিষ্ট কবরীরচনা তাহার পূর্ব্বেকার সেই সৌন্দর্য্যস্বপ্নগুলির জগতে বিষম একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিল। যে বিপ্লবের আরম্ভ এমন মোহময় তাহার শেষ কোথায় জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের সীমা রহিল না।

কিন্তু রাত্রি যতই বহিয়া চলিল, সুপ্তিব্যাপ্ত রহস্যময় অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই অপরিচিতার এমন একান্ত সান্নিধ্যে ক্রমেই বেশী করিয়া সে নিজেকে বিপন্নও

বোধ করিতে লাগিল। অকারণেই ক্রমাগত তাহার মনে হইতে লাগিল, তরুণী যদিও একবারও মুখ তুলিয়া চাহে নাই, অজয় যে জাগিয়া আছে তাহা সে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেছে; কি সে মনে করিতেছে? ইংরেজীতে যে বস্তুকে শিভাল্‌রি বলা হয়, বাংলা দেশের কোনও তরুণী কোনও অপরিচিত তরুণের নিকট হইতে তাহা প্রত্যাশা করে না, প্রত্যাশা যে করিতে হয় তাহাও জানে না। অজয় যে তাহার প্রতি একমাত্র সাহনুভূতি বশতঃই ঘুমাইতে পারে নাই, ইহা কি একবারও তাহার মনে হইবে? সেই সঙ্গে ইহাও সে ভাবিল, যে, এতক্ষণ ধরিয়া এই মেয়েটির সম্বন্ধে মনে মনে সে যাহা অনুভব করিয়াছে তাহা সহানুভূতিই ত কেবল নহে। কিন্তু সে যে কিছু অপরাধ করিতেছে, কোনও অচিন্তিত কারণে ইহাও সে মনে করিতে পারিল না। বাহিরে যাহাকে অপরাধ বলিয়া জানি, মনের মধ্যে সে যখন মনোহরণ রূপ লইয়া দেখা দেয় তখন তাহার মার্জ্জনাপত্র সে সঙ্গে লইয়াই আসে। অজয়ের আবাল্য-সঞ্চিত সমস্ত সংস্কারের শাসনকে হার মানাইয়া দিতে পারে, তরুণীর সম্বন্ধে তাহার মনোভাবের মধ্যে সেই অপরিমেয় মোহময়তা ছিল।

কিন্তু যাহা অননুশোচনায় করা যায় তাহাই অসঙ্কোচে করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। তরুণী কিছুই বুঝিতেছে না, বারবার নিজেকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজয় ক্রমেই বেশী করিরা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না উঠিবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অস্বস্তি ততই বাড়িয়া চলিল। এতক্ষণ যে-মুহূর্ত্তটিকে মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সে কামনা করিতেছিল, এখন তাহারই আসন্নতা তাহাকে ভয়াতুর করিয়া তুলিল। কেন ভয় তাহা সে জানে না, কেবল অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, যেন অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ তাহার আত্মরক্ষা করিবার অবকাশ ছিল, এবার কোথাও কিছু আর রাখা ঢাকা থাকিবে না। যে-কথাকে মনের গোপনতায় নিজেও নিজের কাছে এতক্ষণ স্বীকার করে নাই, জ্যোৎস্নালোকে তাহা একেবারে অনাবৃত হইয়া এবার

ধরা পড়িয়া যাইবে! পূর্ব্বাকাশে অস্ফুট জ্যোতির্দীপ্তির বিকাশ হইবা-মাত্রই সে আর দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। স্থির করিল, সরিষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, অশ্বত্থ গাছের তলা বাহিয়া, দূরে বক্রদেহ ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ঐ কাঠের পুলটা পার হইয়া, বহুদূরের তরুবন-সমাচ্ছন্ন গ্রামপ্রান্ত ছুঁইয়া ঘুরিয়া আসিবে। ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দিবসের আলোতে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বহু লোকের ভিড়ে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলার মুখখানিকে নিজের স্বপ্নচারিণী মানসীর মুখটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবে।

শেষরাত্রির দিকে একটু শীত পড়িয়া আসিতেছিল, একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে সে নদীতীরের সেই নিভৃত মাধুর্য্যলোক হইতে পলাইল।

নদীর দিক্ হইতে তখন জলকরস্নুরভিত ঝিরেঝিরে একটুখানি বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার স্পর্শে জাগরণের ক্লান্তি অতি সহজেই দূর হইয়া গেল। নদী হইতে একটা ছোট খাঁড়ির মত আসিয়া অশ্বত্থগাছটির তলার কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে, বাতাসে তাহার জল তর্‌তর্ করিয়া কাঁপিতেছে। নামিয়া গিয়া অশ্বত্থগাছটার জলতলচুম্বী একটা শিকড়ের উপর বসিয়া সে ভাল করিয়া মুখ হাত ধুইল, তারপর কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া অপরিসীম তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া একটা নিঃশ্বাস লইল।

পুল বাহিয়া খাল পার হইবে স্থির ছিল, কিন্তু পুলের কাছাকাছি আসিয়া-পড়িয়া অকারণেই তাহার মতের বদল হইল। কাপড় গুটাইয়া পুলের নীচেকার অগভীর জল ভাঙিয়া সে খাল অতিক্রম করিল। ওপারে গিয়া তাহার চলার ছন্দে অলক্ষ্যে নৃত্যের তাল লাগিয়া গেল। মনের মধ্যে সেই তালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া কোন্ একটা অত্যন্ত পরিচিত গানের সুর

গুঞ্জরিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সেই গানের একটা কথাও তাহার মনে আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে ক্রমাগত একই পথ বাহিয়া চলায় অরুচি ধরিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অসংশয়িতরূপ অপথগুলি বাছিয়া বাছিয়া চলিতে লাগিল। শিশিরসিক্ত জুতাদুইটির তলা মরা ঘাসের টুকরা আর আর্দ্র বালির আস্তরণে ভার হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রান্তর পার হইয়া যখন গ্রামের কাছাকাছি পৌছিল তখন পূর্ব্বদিগন্তে অস্পষ্ট রঙের আভাস চোখ পড়িতেছে। আমজাম-কাঁটাল-নারিকেলের বন ভরিয়া পাখীর কূজন সুরু হইয়াছে। বাতাসে উগ্র-মধুর নানাপ্রকারের পরিচিত-অপরিচিত গন্ধের সঞ্চার। যে-পথ এতক্ষণ কোমল ধূলিময় ছিল, তাহা ক্রমেই বেশী করিয়া শানের টুক্‌রা এবং মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষে আকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহুদূরে, পূর্ব্বদিগন্তের প্রায় কাছাকাছি জায়গায়, অশ্বত্থগাছটার আড়ালে করুগেটেড টিনে ছাওয়া ক্ষুদ্র ষ্টেশনঘরটার দিকে সে চাহিয়া দেখিল। অতি সন্তর্পণে সমস্ত-কিছুর উপরে প্রত্যূষের আলো নামিয়া আসিতেছে। এতদূর হইতে কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু তাহার মনে হইল, সেখানেও যেন দুইএকটি করিয়া মানুষের নড়াচড়া সুরু হইয়াছে। কল্পনা প্রখর হইয়া উঠিল, তাহার আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটি সুন্দর মুখ নদীর জলে প্রক্ষালিত ও উষার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে মার্জ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আজিকার প্রভাত যে চোখ মেলিয়াই সেই মুখটিকে দেখিতে পাইবে তাহা যেন সামান্য ঘটনা নহে, অসীমতা যেন তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। লজ্জা-বিপন্নতার স্মৃতি ম্লান হইয়া আসিতেছিল, মনে হইল, কেন অনেক আগেই ফিরিয়া যায় নাই, একটি পরিপূর্ণ সূর্য্যোদয় তাহার জীবনে ব্যর্থ হইল। স্থির করিল, গ্রামের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ভিন্নপথে ষ্টেশনে ফিরিবে, কতকগুলি ফুল কোথাও চোখে দেখিয়া যাওয়া চাই। তাহার

জীবনে অলক্ষ্যে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার দুইখানি পায়ে সেইগুলির অর্ঘ্য মনে মনে সে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

নানাজাতি গাছে ছাওয়া কতকগুলি উঁচু মাটির ঢিবি, একটু দূরে গাছের ভিড়ে প্রায় ঢাকাপড়া একটি বাড়ী। তারপর বেড়া দেওয়া একটা ফলের বাগান, ছোট ডোবা, তারপর আবার একটি বাড়ী। নাটমন্দির, দোলমঞ্চ, গোশালা, ধানের মরাই, খানিকটা পড়ো জায়গা, তারপর আমজাম নারিকেল সুপারি বনে ঘেরা আবার একটি বাড়ী। শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন পল্লী। হালের গোরুগুলি রাত্রিশেষে ছাড়া পাইয়া বাহির হইতেছে। গাভীদের মুক্তিলাভে এখনও বিলম্ব আছে, যদিও দুগ্ধ-দোহনের শব্দ কোথাও কোথাও শোনা যাইতেছে। একদল হাঁস কলরব করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। গ্রামের মধ্যেকার পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও পরিসর, কোথাও বা অতি সঙ্কীর্ণ। স্থানে স্থানে গোপাট ছাড়িয়া কাহারও বাড়ীর আঙ্গিনায় উঠিয়া পড়িতে হয়, কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে। কাজলজলের দীঘি। গ্রামের বধূরা তত সকালেই স্নান সারিয়া কলসীতে জল লইয়া ভিজা কাপড়ে ঘোম্‌টা টানিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, কেহ বা দীঘির ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছে, অপরেরা ঘোমটা মাথায় ডুব দিতেছে। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা ধারে নামিয়া গিয়া অজয় ক্লান্ত পা দুইটাকে ধুইয়া লইল। জল দেখিলেই কোনো অজুহাতে তাহা স্পর্শ করা তাহার স্বভাব ছিল। উঠিয়া আসিয়া রুমালে পা মুছিল, জুতার তলার আবর্জ্জনা ঘাসের উপর ঘসিয়া ছাড়াইল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এইখানে তৃণতটের উপর কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়, কিন্তু স্নানার্থিনীরা লজ্জিত হইবে ভাবিয়া আবার সে পথ চলিতে লাগিল।

ফুলের গন্ধ পাইতেছিল, কিন্তু ফুল কোথাও দেখিতে পাইল না। কাহারও বাড়ীর পশ্চাতে অযত্নবর্দ্ধিত বনের মধ্যে ফুটিয়া থাকিবে, ফুলের বাগান কোথাও চোখে পড়িল না।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট একটি খাঁড়ির ধারে বাজার, ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকার গায়ের আল্‌কাতরা ধুইয়া জল তৈলাক্ত হইয়া বহিতেছে, ঘোলাটে জলের গায়ে অস্ফুট সবুজ ও লাল রঙের নানা বিচিত্র নক্সা আঁকা হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। এক সঙ্গে শুকনা লঙ্কা, তামাক এবং গুড়ের গন্ধের ঝাঁজ অজয়ের নাকে আসিয়া লাগিল। তখন ধুনা জ্বালাইয়া দোকানপাট সবে খোলা হইতেছে, বাজার বসে নাই। ভোরের হাওয়ায় অনেকখানি বেড়াইয়া ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। খাবারের দোকান একটা রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একখানা কাঁসার রেকাবীতে খান-কয়েক বাসি কচুরি এবং গোটা-দুই সন্দেশ লইয়া সে সবে আহারে প্রবৃত্ত হইবে এমন সময় বাহিরে হঠাৎ কে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবেন না, খাবেন না, ফে'লে দিন্, ফে'লে দিন্!"

এ আবার কি অভিনব স্পর্দ্ধিত অভব্যতা ভাবিয়া অজয় বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যাহাকে দেখিতে পাইল, সে যে পল্লী-সমাজের কেহ এমন মনে হইল না। গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহ, মার্জ্জিতশ্রী উজ্জ্বলকান্তি যুবা, তাহার বেশ সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি, তাহার মুখভাবে চোখের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিগর্ব্বিত সভ্যতাদীপ্ত আভিজাত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। করজোড়ে অভিবাদন করিয়া সে সহাস্যে কহিল, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিন্তু এ অঞ্চলে কিছুদিন থেকে একটু-আধটু ওলাউঠা হচ্ছে, বাজারের খাবার কিছুতেই খাওয়া চলতে পারে না।"

অজয় খাবার ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। আগন্তুককে প্রত্যভিবাদন করিল, বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছেন, তা না হ'লে খুবই বিপদ্ হতে পারত।"

যুবক বলিল, "আমি ওপারের চেরিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে কয়েকটা

দরকারী ওষুদ নিয়ে এইদিক্ দিয়ে ফিরছিলাম, আপনাকে খাবারের দোকানে ঢুকতে দে'খে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছি।"

দোকানীর খাবারের দাম চুকাইয়া দিয়া দুজনে বাহির হইয়া আসিল। অজয় কহিল, "ধন্যবাদ।"

যুবক কহিল, "ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আপনি খেতে বসেছিলেন, বাধা দিলাম, এবারে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন।"

"বাধা দেওয়াটা কি আপনার বিবেচনায় অপরাধ হয়েছে ?"

"এই অবস্থাতেই যদি আপনাকে ছেড়ে দিই তাহ'লে অপরাধ হবে। আমার বাড়ী এই কাছেই। মাখন জুটবে, রুটি জুটবে না। ডিম, কলা আর চা দিতে পারব। আসুন দয়া ক'রে।"

অজয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলিল, কিন্তু যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না।

দীঘির পার ঘুরিয়া গিয়া একটি ছোট মাঠ। তারপর বেত এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া শীতস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন পথ। একটা ভাঙা মন্দির বাঁয়ে রাখিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘনবিন্যস্ত সুপারিবনের মধ্যে কয়েকটি পরিপাটি খড়ে-ছাওয়া ঘরের সমষ্টি। যুবক কহিল, "এই আমাদের বাড়ী।"

বাহিরে আটচালা প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী। ভিতরের সবঞ্জাম দেখিয়া বোঝা গেল, বৈঠকখানা হিসাবেই সেটির এখন বেশী ব্যবহার। চতুষ্পাঠীর পর সদরের উঠান। একপাশে ঠাকুরঘর। অজয়কে লইয়া বিপরীত দিকের ঘরটিতে ঢুকিতে গিয়া যুবক কহিল, "চলুন, আগে বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ক'রে দিই।"

ঠাকুরঘরের দরজার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া যুবক ডাকিল, "বাবা !"

ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর অসিল, "কি, ভদ্র !"

"তুমি একটুখানি বাইরে এস, আমার এই বন্ধুটি তোমায় প্রণাম করবেন।"

গৌরকান্তি প্রৌঢ় এক ব্রাহ্মণ ত্রস্তে বাহির হইয়া আসিলেন, কহিলেন, "এস, বাবা এস। তুমি সুভদ্রের বন্ধু, তুমি আমাদের ছেলের মত।"

প্রণাম সারিয়া উঠিয়া অজয় দেখিল, একটি স্নিগ্ধ সৌজন্যের প্রসন্ন অমায়িক হাসিতে প্রৌঢ়ের মুখটি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উঠান অতিক্রম করিয়া সুভদ্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, ব্রাহ্মণ পূজা শেষ না-করিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে জুতা না-ছাড়িয়াই সে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, তিনি ফিরিয়া ঠাকুরঘরে ঢোকেন নাই, স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বারান্দা হইতে স্নানের ঘটিটি উঠাইয়া লইতেছেন।

অজয়কে নিজের ঘরে খাটের উপর বসাইয়া সুভদ্র চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। ওষুদগুলিকেও সব যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া চাই। বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজের হাতে করিয়া দিয়া আসিবে ইহাই স্থির ছিল, কিন্তু অতিথি জুটিয়া যাওয়াতে চাকরদের শরণাপন্ন হইতে হইল।

৪

অজয় দেখিল, সুভদ্রের ঘরটি ঠাকুরঘরেরই মত পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। ধবধবে বিছানাটিতে কেহ যে কখনও শুইয়াছে এমন মনে হয় না। বেড়ার গায়ে ঝোলানো একটি মাঝারি-গোছের আয়নার সামনে একটুকরা শাটিনে ঢাকা একটি কাঠের তাকের উপর সুভদ্রের দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম, নখ কাটিবার যন্ত্র, চুলের তেল, চিরুণী, বুরুশ, সাবানের বাক্স, একটি য়াল্‌কহলের শিশি। এগুলিকে কেহ যেন কখনও ব্যবহার করে নাই। ঘরে খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নাই। জানালার গা ঘেঁষিয়া কয়েকটা ট্রাঙ্ক ও সুটকেসকে উপরি

উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটা ছিটের কাপড় ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। সেইখানে ছোট একটি পিরামিডের আকারে ছোটবড় কতকগুলি বই, সেগুলিকে কখনও যে কেহ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অজয় মনে মনে কলিকাতায় নিজের মেসের ঘরটিকে এই ঘরটির পাশে ধরিয়া দেখিয়া লইল। পরিচ্ছন্নতা তাহারও ভাল লাগে, তাহার ঘরটিতে আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামের অভাব নাই, ক্রমে ক্রমে সুদৃশ্য ছোটবড় বইও তাহার প্রচুর জমিয়াছে, কিন্তু কি নিদারুণ অবহেলায় আবর্জ্জনার মত স্তূপাকার হইয়া সেগুলি সেখানে পড়িয়া আছে। কতবার কোমর বাঁধিয়া সেগুলিকে সে গুছাইয়াছে, কিন্তু একসঙ্গে দুইদিনের বেশী গোছানো অবস্থায় কখনও সেগুলি থাকে নাই।

সুভদ্র ফিরিয়া আসিলে চা-ও আসিয়া পড়িল। একখানা বড় পিতলের রেকাবীতে ধূমায়িত চা দুধ, চিনি, দুইটি পেয়ালা, কয়েকটা ডিম, কিছু ফলমূল, গঙ্গাজলী লাড়ু, ভাজা চিঁড়া ও বাতাসা। বিছানার উপরেই গোটাদুই খবরের কাগজ বিছাইয়া সুভদ্র সেগুলির জায়গা করিয়া দিল।

চাকর চলিয়া গেলে অজয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া এবং নিজে এক পেয়ালা লইয়া সুভদ্র কহিল, "তারপর, আমাদের এলাকায় কি ক'রে এসে পড়লেন বলুন আগে।"

অজয় চায়ের চিনিটাকে চামচে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বাড়ীতে ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরছিলাম, জাহাজ বিগড়ে রাস্তার মাঝখানে আটকা পড়েছি। সন্ধ্যার আগে আর ষ্টীমার নেই শুনেছি?"

সুভদ্র কহিল, "সন্ধ্যার আগে ত নেইই, কোনো-কোনোদিন বেশ রাত ক'রেও আসে। আপনাদের জাহাজ বিগড়াবার খবর আমরা কাল রাত্রেই ষ্টেশনমাষ্টার ভুবনবাবুর কাছে পেয়েছিলাম, গিয়ে খোঁজ নেব একবার ভেবেও-ছিলাম, একটি রোগীকে নার্স করতে যেতে হ'ল ব'লে ওদিকে আর গিয়ে উঠতে পারিনি। রাত্রে খুব কষ্ট হয়নি ত?"

"কিছু না, নদীর ধারে খোলা হাওয়ায় বেশ আরামেই কাটিয়েছি।"

"বৃষ্টি-বাদল হ'লে খুব মুস্কিলে পড়তে হ'ত! ঐ ত ছোট্ট একটি ঘর, তারপর আর দুকোশের মধ্যে কোনো দিকে কোথাও মাথা গুঁজবার জায়গা নেই।"

অজয় চকিতে একবার খোলা জানালায় বাহিরে আকাশটাকে দেখিয়া লইল। যদি এরপর বৃষ্টি হয়? তাহার পথসঙ্গিনী অপরিচিতা তাহা হইলে খোলা মাঠের মধ্যে হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ধারাজলে স্নান করিবে, কিছুতেই বহুলোকের ভিড়ে স্বল্পপরিসর ষ্টেশন ঘরটির মধ্যে ঢুকিতে রাজি হইবে না। অজয়কে খাইতে তাড়া দিয়া তারপর সে খাইতেছে কিনা না দেখিয়াই সুভদ্র বলিল, "তা ভাল হয়েছে। আমিও আর কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরতাম। আপনাকে সঙ্গী পাওয়া গেল, আর ভাবনা নেই। আমিও আপনার সঙ্গেই আজ বেরিয়ে পড়ব।"

অজয়ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাহলে ত খুব ভালই হয়।"

চা খাওয়া শেষ হইলে অজয় কহিল, "এবারে অন্য যাত্রীগুলির কথা একটু ভাবতে হয়। যা তা খাবার খেয়ে সবাই মিলে না অসুখে পড়ে। আমি তা হলে এখন উঠি।"

সুভদ্র কহিল "আপনি কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, সে-সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা সমস্ত রাত জেগে প্রচুর খাবার জল ফুটিয়েছে আর সদ্য ভাজা মুড়ি আর বাতাসার অভাব নেই এ অঞ্চলে। ভুবন মাষ্টারের ওপর ভার রয়েছে, ভোর হতেই যাত্রীদের মধ্যে সেসব বিতরণের ব্যবস্থা সে করবে। আমি এমনি একবার ঘুরে আসব ভেবেছিলাম কিন্তু তার দরকার কিছু নেই।"

অজয় কহিল, "দুজনে মিলেই যাওয়া যাক চলুন না। এত লোককে খাওয়াবার ভার নিয়েছেন, আপনি উপস্থিত না থাকলে আপনার দলের লোকেরাই বা কি মনে করবে?"

সুভদ্র কহিল, "কেউ কিছু মনে করবে না, আপনি বসুন।"

কয়েক মিনিট কাটিবার পর কোনও এক অবকাশে উঠিয়া পলায়ন করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, তাহার বাক্স-বিছানার মোট মাথায় করিয়া গামছা পরা এক ব্যক্তি উঠানে দাঁড়াইয়া দাদা-বাবুকে মহা উৎসাহে ডাকাডাকি সুরু করিয়াছে। বিরক্তিতে অজয়ের বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল, বলিল, "এ কিন্তু আপনার বাড়াবাড়ি, তা যাই বলুন। মোট নামাতে বারণ করুন, আমি যাচ্ছি। আমাকে এখুনি যেতে হবে। নমস্কার!"

সুভদ্র প্রতিনমস্কার করিল না, খাট ছাড়িয়া উঠিলও না, কহিল, "বাড়াবাড়িটা আপনি করছেন। আমার কথা নাহয় ছেড়েই দিন, বাবাকে খুব ভালমানুষ ভেবেছেন, কিন্তু ভালমানুষিতেই ওঁর মত একরোখা মানুষ আর দুটি নেই। তারপর আমার মা আছেন, প্রভা আছে, আমি ছাড়লেও তাঁরা আপনাকে ছাড়বেন না। আপনি আজ অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে এঁরা হয়ত সকলে অনাহারে থাকবেন, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করবেন না।"

অজয় কহিল, "তবু বলবেন বাড়াবাড়িটা আমি করছি? ডিম, কলা, প্রায় আধখানা পেঁপে, আনারস, এতগুলো মিষ্টি, দুপেয়ালা চা, সব খেয়ে গেলাম, এর নাম হল অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া? আপনিও কি অতিথির চেয়ে আতিথ্যকে বড় করবেন?"

সুভদ্র সত্যই একটু দমিয়া গেল, আস্তে কহিল, "অতিথির চেয়ে আতিথ্য বড় হলে সেটা অত্যাচার হয় জানি; কিন্তু আপনার উপর কোনো অত্যাচার করা আমার অভিপ্রায় নয়। দুপুরের রোদে খোলা মাঠের মাঝখানে আপনার সত্যিই খুব কষ্ট হবে, আপনি বুঝতে পারছেন না।"

এমন সময় ষোল-সতেরো বৎসর বয়সের একটি মেয়ে পিছনের দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রায় ছুটিয়া ঢুকিয়া জিভ কাটিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া

গেল। সুভদ্র দরজাটাকে ফাঁক করিয়া ধরিয়া ডাকিল, "প্রভা, প্রভা, পালাচ্ছিস্ কেন? কি চাস্ ব'লে যা-না?"

অনেকখানি দূর হইতেই উত্তর আসিল, "সে হবে এখন অন্য সময়।"

সুভদ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল অজয় একখানা বই টানিয়া লইয়া একমনে তাহার পাতা উল্টাইতেছে।

ইহার পর যথারীতি অতিথি-সৎকারের পালা।

অন্দরের বড়ঘরের বারন্দায় আসন পাতিয়া অজয়কে বসিতে দিয়া সুভদ্রের মাতা তাহার প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাহার মাথায় ধানদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চোখের উপর অবধি ঘোমটা টানিয়া নিজে একটু দূরে বসিয়া সুভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর বন্ধুটি এত রোগা কেন?"

অজয় নীরবে একটু হাসিল। সুভদ্র কহিল, "একবেলার বেশী উনি থাকবেন না, তা না-হলে খাইয়ে দাইয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতে মোটা করতে পারো কি-না।"

তাহার মা বলিলেন, "তুই নিজে যা-না পালোয়ান; তাছাড়া কি যে যা-তা বলিস্, ওর মা বুঝি ওকে খাওয়াতে কিছু ত্রুটি করেন?"

অজয় নতমস্তকে বসিয়াছিল, কহিল, "খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার মা নেই, খেতে অবিশ্যি আমি সমানই পেয়েছি।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুভদ্রের মা কহিলেন, "বেচারা! মা নেই, তাই ত এমন দশা!"

অজয় বিব্রত বোধ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুভদ্র তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বহুক্ষণ তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। কোথাও কেহ ওলাউঠায় ভুগিতেছে, কাহারও ম্যালেরিয়া, কেহ বা জমিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত। কোথাও একদল অনাথ শিশুকে দেখিবার কেহ নাই। কাহারও বা পৃথিবীর সর্ব্বশেষ সম্বল একখানি খড়ের ঘর দুইদিন

হইল আগুনে পুড়িয়া ভষ্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও জন্ম কিছুই তৎক্ষণাৎ করিতে পারিল না, কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুভদ্র সকলের সংবাদ লইল। যে মেয়েটি ওলাউঠায় ভুগিতেছিল তাহার স্বামী কিছুতেই সুভদ্রের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছিল না, সুভদ্র তাড়া দিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। তারপর অজয়কে ইস্কুল দেখাইল, ছেলেদের খেলিবার মাঠ, ধ্বসিয়াপড়া বহুপ্রাচীন দেবমন্দির, রথতলা। কিন্তু অজয় সে-সমস্ত কিছুই দেখিল না, তাহার সমস্ত চৈতন্য জুড়িয়া চতুর্দ্দিক্‌কার নগ্নতা, নিঃস্বতা, ব্যাধিজীর্ণতা কি এক আসন্ন অকল্যাণের আভাসের মত নিদারুণ অবসাদের সুরে বাজিতে লাগিল। অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, স্বল্প পরিচয়েই সুভদ্রকেও তাহার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এই পীড়িত পল্লীর বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া সুভদ্রকে তাড়া দিয়া সে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

খাইতে বসিয়া মনের অন্ধকার অচিন্তিত উপায়ে অনেকখানি কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিল, যে-দুইখানি হাত অন্ন পরিবেষণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে স্নিগ্ধতা যেন আর ধরিতেছে না। পা-দুইখানি সুগঠিত সুন্দর সুডৌল, আর তাহাদের মধ্যে এমন একটি জিনিষের প্রকাশ আছে যাহাতে মাথা আপনা হইতেই সেই কুসুম-কোরকের মত অঙ্গুলিরাজির উপর লুণ্ঠিত হইতে চায়। মাথা নীচু করিয়াই যতটুকু সে দেখিতে পাইল, তাহাতেই তাহার মনে হইল, কি এক অপরিসীম স্নিগ্ধতার তপস্যা সেই দেহটিকে আপনার শ্যামল দীপ্তিতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অন্নে চক্ষের নিমেষে অমৃতের স্বাদ কোথা হইতে আসিয়া লাগিল। সুভদ্র সকালে প্রভা প্রভা বলিয়া ডাকিয়াছিল, নিজের মনে নামটা সে কয়েকবার উচ্চারণ করিল।

হঠাৎ শুনিল, সুভদ্র বলিতেছে, "আমিও আজকেই যাব ঠিক করেছি, বাবা।"

তাহার পিতা হাতের গ্রাস মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকেই? কিন্তু ভাইফোঁটার ত আর দেরি নেই?"

বাড়ীতে সুভদ্রের প্রতিপত্তি সাধারণ ছিল না। তাহার কথার উপর সহজে কেহ কথা কহিত না। কিন্তু তখন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর পাঁচ-ছয় দিন মাত্র বাকী, প্রভা তখন হইতেই নানাভাবে সেজন্য প্রস্তুত হইতেছে, ছুটি ফুরাইতেও বেশ কিছুদিন দেরি। তাছাড়া কলিকাতায় সুভদ্রের পড়াশোনা নামে মাত্রই, রোগী দেখা এবং রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় সে সময় কাটায় তাহার দশগুণ। এ-সমস্ত জড়াইয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবটা সুভদ্রের নিজের কানেও অত্যন্ত দুরূহ শোনাইল। কিন্তু হৃদয়ের শাসন মানিয়া চলা কোনও কালে তাহার স্বভাব নহে, সে কখন কেন যে কি করে হৃদয়বান্ লোকে সেই জন্যই তাহার অর্থ খুঁজিয়া পায় না।

হাতের গ্রাসটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার পিতা আবার কহিলেন, "প্রভাকে বলেছ ?"

সুভদ্র কহিল, "প্রভা জানে, মাকেও বলেছি।"

তাহার পিতা কহিলেন, "আচ্ছা।" কিন্তু বেশ বোঝা গেল, ইহার পর আর তাঁহার আহারে রুচি রহিল না।

খাওয়ার পর সুভদ্র নিজের ঘরে প্রভাকে ডাকিয়া অজয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিল। পিতা দেখিতে না পান সে-বিষয়ে বিধিমত সতর্কতা অবলম্বন করিল। প্রভা কহিল, "দাদা বৃথাই পুরুষ-মানুষ, অল্পেতেই এত ভয় পায়।"

অজয় সঙ্কোচ কাটাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই একটি শ্যামল গভীর দৃষ্টির স্নিগ্ধতা তাহার দৃষ্টিকে অভিনন্দিত করিল। সে বুঝিল না, সেই মুখটিতে, সেই দৃষ্টির মধ্যে কি আছে। বুঝিবার চেষ্টামাত্রও করিল না। লক্ষ্য করিল না, একটুখানি গোপন অশ্রুর অবশেষ এখনও একটি চোখের কোণে লিপ্ত হইয়া আছে। কেবল এইটুকু মাত্র অনুভব করিল, এই মানুষটির মধ্যে বিধাতা নিজের কোনও বিশেষ একটি রূপকে এমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাহা হইতেও বেশী আর-কিছু আশা করিবার কথা কল্পনাতে আসে না।

মুখখানিকে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহ কতকগুলি ত্রুটি বাহির হইবে। দেহের বর্ণ শ্যাম, নাসিকা সমস্ত মুখটির তুলনায় যেন ঈষৎ একটু ছোট; কিন্তু দেখিবামাত্র ইহাকে অকারণেই চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়, আর মন বলিতে থাকে, তুমি সুন্দর হয়ত নও, হয়ত নওই, কিন্তু তুমি, মনোরম, তুমি মনোরম, তুমি মনোরম!

একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় করে না?"

প্রভাও হাসিয়াই বলিল, "বাবাকে তাই ব'লে ভয় পাই না।"

অজয় বিজ্ঞভাব ভাণ করিয়া বলিল, "বাইরের পৃথিবীটাকে ত জানেন না, সেখানে ভয় করবার মত অনেক কিছুই আছে।"

প্রভা কহিল, "জানি না, দেখলে বলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না, দাদা যেখানে ভয় পায় না আমি ভয় পাব।"

সুভদ্র কহিল, "অজয়বাবুকে তোর ভয় করছে না?"

প্রভা অজয়ের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আঁচলে মুখ চাপিয়া একটু হাসিল, কহিল, "উঁহু।"

"সকালে তাহলে পালিয়েছিলি কেন?"

"পালাব না ত কি? ভয় পেয়ে ত আর পালাই নি।"

সুভদ্র কহিল, "আচ্ছা, তুই ত খাস্‌নি এখনও, খেগে যা, এবারে ফিরবার সময় তোর জন্যে একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস জোগাড় ক'রে আনব।"

কাপড়ের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রভা সুভদ্রের একটা ট্রাঙ্ক খুলিল, সেটার মধ্যে তার বইগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, "তোমার ক্ষুর-টুর রাখবার ছোট চামড়ার বাক্সটা ভুলুর কাছে আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি," বলিয়া বাহির হইয়া গেল। অজয় নমস্কার করিয়াছিল, প্রতিনমস্কার করার বদলে সে হাসিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ অবধি সকলে অজয়কে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে সে একেবারে দৃষ্টির অগোচর

হইয়া গেল। সুভদ্র কি কি খাইতে ভালবাসে, আচার, মোরব্বা, বড়ি, সরু-ধানের চিঁড়া, মুগের লাড্ডু, সে-সমস্তের যোগাড় হইতে লাগিল। তাহার ছোট ভাইবোনরা দীর্ঘকালের মত দাদাকে বিদায় দিবার আগে তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইতে লাগিল। একজন সংবাদ দিল, দিদি কাঁদিতেছে। চাকরেরা কলরব করিয়া সুভদ্রের জিনিষ বাঁধাছাঁদা করিতে লাগিল। গুছাইবার যাহা তাহার সমস্ত গোছগাছ করিয়া তবেই প্রভার কাঁদিবার অবসর জুটিয়াছে। সুভদ্রের মাতা চোখ মুছিতে মুছিতে সব-কিছুর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহার পিতার মুখ ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর। পাড়াপ্রতিবাসীরা অনেক আসিয়াছে, অজয় সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কেবলই তাহাদের পথে বাধা হইতে লাগিল। তাহার দিকে ইহার পর আর কেহ ফিরিয়াও দেখিল না।

সেই পীড়িতা মেয়েটির স্বামী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভয়ার্ত্ত কাতর মুখে কহিল, "দুপুর অবধি ত বেশ ভালই ছিল দাদাবাবু, ঘণ্টাখানেক হ'ল আবার বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে। সেই ওষুদটা আধঘণ্টা পর পর দিচ্ছি। কমছে ব'লে মনে ত হচ্ছে না।"

কখন্ কোন্ অবস্থায় কি করিতে হইবে সে বিষয়ে বিশদ ভাবে উপদেশ দিয়া সুভদ্র প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। অজয়কে কহিল, "চ'লে যেতে হচ্ছে, কিন্তু কি করব বলুন। যেখানে যাব সেখানেই ত এই অবস্থা, যখন যাব তখনই এই অবস্থা, তাই মায়া কাটাবার সময় হ'লেই কাটিয়ে ফেলি। যখন যেখানে থাকি, যতটুকু করতে পারি করি, দূরে গেলে আর মনে রাখি না।"

সেদিন সকাল সকাল ষ্টীমারের শিটি শুনিতে পাওয়া গেল। সুভদ্রের সঙ্গে অজয় যখন ষ্টেশনের পথে বাহির হইল, তখন তাহার মন কি একটা অপরিচিত বেদনায় ভার হইয়া আছে। কোথায় কি একটা আনন্দের সূত্র বাঁধা হইতে হইতে যেন তাহার নিজের অসাবধানতায় হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল, কোন্ একটা

করুণ সুরের রেশকে নিজে অকারণ কোলাহল করিয়া ডুবাইয়া দিল, পরমাত্মীয় কাহাদের ভাল করিয়া চিনিবার আগেই ছাড়িয়া আসিতেছে, এমনইধারা আরও কত কি, কিন্তু কিছুই তাহার মনের উপলব্ধিতে খুব স্পষ্ট নয়। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত করিল, সুভদ্রকে যে সে ভালবাসিতেছে ইহাই তাহার এই বেদনা-বোধের মূলে। স্বজনবিচ্ছেদে সুভদ্রের বেদনা কোনও অলক্ষিত উপায়ে তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই তাহারা দূরে ধোঁয়া দেখিতে পাইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো সেই পুলটার উপর যখন আসিল, তখন শিটি দিয়া জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার উপক্রম করিতেছে। প্রাণপণ দ্রুত পথ চলিতে চলিতে অজয় নিজের মনকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ষ্টীমার ধরা হয়ত যাইবে না, তখন পশ্চাতে ঐ বনরেখার পারে নিভৃত একটি ছায়ানীড়ের মধ্যে আবার কিছু কালের জন্য ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে, এই সম্ভাবনাতেই কেন তাহার বুকে এমন করিয়া দোলা লাগিতেছে? মনের গোপনে সেই ইচ্ছাকেই কি নিজেরও অজ্ঞাতে সারা পথ সে বহন করিতেছে? অথচ অল্প কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সেই নীড়টিরই আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অবধি ছিল না!

গভীর রাত্রিতে ট্রেনের এক প্রায়ান্ধকার কামরায় স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গায় হাত-পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, এই একটি দিনের পসরা বোঝাই করিয়া তাহার অদৃষ্টদেবতা কি অদ্ভুত বিপ্লবই না তাহার জীবনে বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে যেন কোনও অর্থেই আর সেই আগেকার মানুষ নহে। যাহাদের চিরকাল পরমাত্মীয় বলিয়া জানিয়াছে, এই দুইটি দিন মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের কথা তাহার মনে পড়ে নাই, অপরিচয়ের অন্ধকার কুক্ষিতল হইতে কাহারা উঠিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার ইহকাল পরকাল জুড়িয়া বসিয়াছে। সুভদ্র, প্রভা,

কবরীভারপীড়িতা জ্যোতির্ম্ময়ী অপরিচিতা।...হঠাৎ তাহার মনে হইল, সেই অপরিচিতার মুখখানি কেমন, তাহার অনেকখানিই সে ভুলিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে স্মৃতির টুকরাগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া বহু চেষ্টাতেও সেই মুখখানিকে সে আর গড়িতে পারিল না। ষ্টীমারে আসিতে বারদুই খুব কাছে হইতেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আভাস-ভরা একটি বিশেষ মুখভাব যেন অশরীরী হইয়া একটি বিদ্যুদুজ্জ্বল গৌরবর্ণকে তাহার মনের উপর ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, কেন এমন হইতেছে। পাছে স্মৃতির গড়া মুখটিতে কোথাও একটু ত্রুটি হয়, পাছে সেই মুখখানির অনিন্দ্যতায় ভুলের কলঙ্কের স্পর্শ লাগে, সেই ভয়েই কি তাহার মগ্ন মন স্মৃতির পথ এড়াইয়া বেড়াইতেছে? না, সেই এক পলকের দেখাতে তাহার চোখদুটি নিজেদের তৃপ্তির দাবি মিটাইয়া স্মৃতির জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট রাখে নাই, তাই স্মৃতি এমন রিক্ত?

ঘুম আসিয়াছিল, গাড়ীর ঝাঁকানিতে হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া মনে হইল, ট্রেনটা যেদিক্ হইতে আসিতেছিল, আবার সেইদিকেই হু হু করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। মনে মনে নিজেকে ঘুরাইয়া লইয়া ভুলটার সংশোধন করিয়া লইল, তারপর খুশী হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ ঘাট হইতে নোঙর তোলা হইল এবং কোন্ ঘাটে ফেলা হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। পৃথিবীতে দিগ্বিদিকে কোনই প্রভেদ আসলে নাই। অত্যন্ত গভীর নিশ্চিন্ততার একটা নিঃশ্বাস লইয়া স্বল্পপরিসর বিছানাটাতে পাশ ফিরিয়া শুইল।

মনে আশা জাগিয়া রহিল, প্রভাতে কলিকাতায় নামিয়া কোনও অবকাশে অপরিচিতার মুখখানি আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে।

চৌরঙ্গীর কাছাকাছি একটা পাড়ার একটি বড় বাড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া একদল তরুণী কলকণ্ঠের শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতে করিতে পথে নামিয়া আসিল। পথযাত্রীদের ধূলিমলিনতার মধ্যে কোথা হইতে এক পশলা রঙ ঝরিয়া পড়িল, দিনান্তের কর্ম্মক্লান্ত অবসাদক্লিষ্ট আনাগোনার মাঝখানে এক পলকের নৃত্যচপলতা, একঝলক হাসি।

একটি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল, ছুটাছুটি করিয়া সকলে তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বসিবার আসনে সকলের বসিবার ঠাঁই হইল না, কেহ-বা অপর কাহারও কোলে বসিল, কেহ কেহ ড্রাইভারের হেলান দিবার জায়গায় উল্টা হইয়া চড়িয়া বসিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই শেষোক্তাদের একজন পুরোবর্ত্তিনীদের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, খুব একটা হাসির রোল উঠিল।

উহাদের হইতে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রক্ষা করিয়া উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি যুবক নামিয়া আসিয়াছিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাতের রোল্ড্‌গোল্ড বাঁধানো ছড়িটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কি সে ভাবিয়া লইল, তারপর ছড়ির ইঙ্গিতে একটা ট্যাক্সি ডাকিল। গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিবর্জ্জিত সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন মুখশ্রী, দেহের বর্ণ শ্যাম, দীর্ঘায়ত চক্ষু, সুকুমার নাসিকার উপর চওড়া কালো ফিতায় বাঁধা, কালো খোলার ফ্রেমে আঁটা পাঁস্নে, গায়ে সদ্য পাটভাঙা মুগার পাঞ্জাবী, গলায় জড়ানো একটি পাট-করা জরীপাড় কটকী চাদর, পরিধেয় মুগাপাড় ধুতির গিলে-করা কোঁচা সারাক্ষণ বাঁ হাতে সম্বরণ করিতে হয়, নতুবা ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, পায়ে মুগার কাজকরা শুঁড়-তোলা চটি। বাংলার তরুণ-তরুণী মহলে যুবক সুপরিচিত, তাহার নাম বিমান বসু, সে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ চিত্রকর,

কিন্তু উহাই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়। যদিও তাহার কোনওপ্রকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ট্যাক্সিওয়ালার পরিচয় ছিল না, তবু শুদ্ধমাত্র তাহার পোষাক-আষাক, চেহারা এবং চলার ভঙ্গি দেখিয়াই একহাতে অত্যন্ত অনভ্যস্ত শ্রদ্ধায় সে তাহাকে সেলাম করিল এবং অপর হাত পশ্চাতে বাড়াইয়া ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিল।

সম্মুখের যে মোটরটিতে কলহাস্যমুখরা তরুণীরা যাইতেছিল, ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইটির অনুসরণ করিতে বলিয়া বিমান পিছনের আসনে বেশ গদিয়ান হইয়া গুছাইয়া বসিল। ঐ যে সোনালী-জরিপাড় সিঁদুরে রঙের শাড়ীপরা মেয়েটি ছাপা-গরদের নীল শাড়ী-পরা অপেক্ষাকৃত স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটির পাশে বসিয়াছে, উহাকে আজ সমস্ত অপরাহ্ণ ধরিয়া তাহাদের ছবির প্রদর্শনীতে সে দেখিয়াছে, তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের আঁকা ছবি বাহির করিয়া করিয়া তাহাকে দেখাইয়াছে, ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে-ছবির প্রশংসা প্রাপ্য তাহার নিন্দা করিয়াছে, যাহা সত্যই নিন্দনীয় তাহার স্তুতিবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও সূত্র ধরিয়াই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমানো হইয়া উঠে নাই! মেয়েটি বড় বেশী সাবধানী, বিমানের দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহে নাই পর্য্যন্ত। কাহাদের মেয়ে, কোথায় থাকে সে-খবর লইয়া আসিতে হইতেছে। বিমান বেশ জানে, ঘুরিয়া আসাই সার হইবে। মেয়েটি কোথায় থাকে জানিতে পারিলেও সে-জানাকে অতঃপর সে আর কাজে লাগাইবে না, রাত্রি প্রভাত না হইতেই ইহার কথা সে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াই ভুলিয়া যাইবে। পরের দিন এক-পলকের-দেখা আর-কোনও একটি তরুণীর পরিচয়ের সন্ধানে আবার সে ঠিক এমনই করিয়া শহরের পথে পথে অস্থির আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইবে। তবু এমন অবস্থায় কিছুতেই সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিত না, আজও পারিল না।

ধর্ম্মতলার একটি গলি বাহিয়া আর একটি গলি, তার পর আর-একটি,

এমনই করিয়া গাড়ী বৌবাজারে আসিয়া পড়িল। বৌবাজার হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার ডানদিকে রাখিয়া আবার একটি গলি, তারপর আরও কয়েকটি গলি পার হইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীট।...আগের দিন সমস্তরাত জাগিয়া বিমান থিয়েটার দেখিয়াছিল, গাড়ীর ঝাঁকানিতে এবং খোলা হাওয়ার স্পর্শে কখন সে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল, ট্যাক্সি যথাসম্ভব দ্রুত চলিতেছে বটে, কিন্তু সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় অগ্রগামী মোটরটির কোনও চিহ্ন কোথাও নাই। পাস্নে সে পরিত বটে, সব মিলাইয়া আরও পাঁচ-ছয় জোড়া চশমা তাহার ছিল, কিন্তু কলিকাতার কোনও ট্যাক্সিওয়ালা হইতে তাহার দৃষ্টি কম প্রখর ছিল না। ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি আঙুলে ট্যাক্সিওয়ালার ঘাড় ছুঁইয়া সে বলিল, "ব্যস্, ঢের হাওয়া খাওয়া হয়েছে, এইবার থামো দেখি।" বাঁদিকের ফুটপাথ ঘেঁষিয়া গাড়ী দাঁড়াইলে গদির কাপড়ে আঙুলটিকে মুছিয়া লইয়া সে নামিয়া পড়িল, কহিল, "কেমন ভাল চালাতে শিখেছ তাই দেখাচ্ছিলে? তা বেশ, কত ভাড়া উঠেছে?"

দেখা গেল, দুই টাকা ছয় আনা ভাড়া উঠিয়াছে। মুগার পাঞ্জাবীর পকেট হইতে রংকরা চামড়ার মনীব্যাগটি সে সন্তর্পণে বাহির করিল। অজন্তার গুহাচিত্রের ধরণে সুকুমার করপল্লবের ভঙ্গি করিয়া তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী প্রবেশ করাইয়া সে অর্থের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হায় অনর্থ, দেখা গেল, মনীব্যাগে মাত্র একটি টাকা, পাঁচটি পয়সা, একটি চুলের কাঁটা এবং কয়েকটি শুক্‌নো ফুলের পাপ্‌ড়ি মাত্র আছে। হাসির আপ্যায়নে মুখ ভরিয়া কহিল, "তাই ত হে, একেবারে এতটা উঠবে আশা করিনি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটাকা পাঁচ পয়সা হচ্ছে, লাগে?"

ট্যাক্সিওয়ালা একটু নড়িয়া বসিয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, তাহার কাছে দশ টাকার নোটের ভাঙানি হইবে।

বিমান কহিল, "তা কি আমি বলেছি, হবে না? আমার কাছে নোট

আব ভাঙানি হিলিয়ে একটাকা পাঁচ পয়সাই কেবল আছে। আমি ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, যখন হোক আমার বাড়ী এসে টাকা নিয়ে যেও।”

ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপার বুঝিয়া বক্তৃতা সুরু করিল। বিমান পাঞ্জাবী ভাষা বুঝিত না, কিন্তু কতগুলি বক্তব্য যে-কোনো ভাষাতেই বেশ বোধগম্য হইয়া যায়। বিমানও বুঝিল, কেবল বক্তৃতাতে ব্যাপারটা শেষ হইবে না, বাকী এক টাকা সওয়া পাঁচ আনার প্রত্যেকটি পয়সাও হিসাব করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বাড়ীর ঠিকানা দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু বেশ জানিত, বাড়ীতে একটি পয়সাও তাহার আর নাই। ছাড়া পাঞ্জাবীর পকেটে একটা মেকি বোবা টাকা কিছুদিন যাবৎ পড়িয়া আছে বটে, রোজ দুইবার করিয়া সেটাকে চালাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি সে একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং অগত্যা আবার সেই ট্যাক্সি লইয়াই সে প্রদর্শনীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সোজা পথে আসিল, ভাড়া বাড়িয়া কিছু কম চারটাকা হইল। ট্যাক্সিওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সিঁড়ি উঠিতেছিল, কিন্তু সে ভরসা করিয়া বিমানকে চোখের আড়াল করিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি উঠিল এবং দোতলার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেজেতে আগাগোড়া চিত্রিত মাদুর বিছান একটি বড় হল ঘর। বিলাতির সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতি মিলাইয়া তৈরি কতকগুলি চৌকি এবং সেটি ইতস্তত: ছড়ানো। সেই ধরণেরই গুটিকয়েক টেবিল আর্ট-সম্বন্ধীয় নানা বিলাতি বই এবং দেশী ও বিলাতি ছবির এলবামে ভাবাক্রান্ত। পাটিমোড়া দেয়ালে বিলম্বিত ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য ছবি, তাহাদের পরস্পর-সংস্থানে কোনও সঙ্গতি নাই। নানা বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়া বিমানের বন্ধু চিত্রকরের দল জটলা এবং কোলাহল করিতেছিল, বাহিরের লোক যাহারা তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিঃশব্দে ছবি দেখিতে ব্যস্ত। বন্ধুদের একজনকে একটু আড়ালে

ডাকিয়া বিমান কহিল, "এই, তোর কাছে পাঁচটা টাকা থাকে ত দে, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে পারছি না।" বিমানের বন্ধুমহলে এ ধরণের বিপদ্ অনেকেরই কখনও না কখনও ঘটিয়াছে, পাঁচটা টাকা সে সহজেই পাইল। ডানদিকের পকেটে টাকাকয়টা গুঁজিয়া সে তখনই বাহির হইয়া গেল না। দূরে কয়েকজন বন্ধু গোল হইয়া বসিয়া সে-বৎসরের Photograms-এর পাতা উল্টাইতেছিল, তাহাদের একজনকে জোর করিয়া টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিল, "এই, পাঁচটা টাকা থাকে ত দে শীগ্গির, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে পারছি না" বন্ধু একবার দরজার বাহিরে তাকাইয়া ট্যাক্সিওয়ালার দাড়ি আর পাগ্ড়ির বহর দেখিয়া লইল, বলিল, "আমার কাছে তিনটে টাকা আছে দিচ্ছি, বাকীটা আর কারও কাছ থেকে চেয়ে নাও বাপু।" টাকা তিনটা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া দিয়া সে আবার Photograms-এর ছবি দেখিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিমানের সাহস বাড়িয়া চলিতেছিল, তাহার এক বন্ধু সুজিত এক কোণে একটা সেট্টিতে আধ-শোয়া হইয়া বসিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে মুখ হইতে বলয়াকারে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছিল, আচমকা তাহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া দিয়া তাহার পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, "ওরে, ভয়ানক বিপদে পড়েছি, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পারছি না, পাঁচটা টাকা দে ত শীগ্গির।"

হাত হইতে সিগারেটটা পড়িয়া গিয়াছিল, হেঁট হইয়া সেটাকে কুড়াইয়া ঠোঁটের এক কোণে গুঁজিয়া সঙ্কীর্ণতর স্থানটুকুতে যতটা সম্ভব আয়েস করিয়া বসিয়া সুজিত বলিল, "ট্যাক্সিতে আর কে আছে?"

"কেউ না, কে আবার থাকবে?"

"আহা, ন্যাকা!"

"সত্যি বলছি, কেউ নেই। চল্ না-হয় দেখবি?"

"কোথায় তাহলে আছে?"

"কোথায় কে আবার থাকবে? সত্যিই বলছি সে-সব কিছু না।"

"বেশ, না বলতে চাও ব'লো না, টাকাও পাবে না তাহলে।'

"আঃ, কি পাগলামো করছিস? কিছু বলবার মত থাকলে ঠিকই বলতাম, দে পাঁচটা টাকা।"

সুজিত বড় বড় চোখ-দুইটাকে পাকাইয়া বিমানের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "আরে ক্ষেপেছিস, কোথায় পাব টাকা? এইমাত্র নীরেনের কাছ থেকে একটা টাকা ধার ক'রে নীচে থেকে চা খেয়ে এসেছি।"

বিমান তাহার দিকে আর দৃক্পাত মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িল। আরও দু-এক জায়গায় ব্যর্থকাম হইয়া সর্ব্বশেষে নীরেনকে পাকড়াইয়াই আরও চারটা টাকা সে পাইল। নীরেন বলিল, "আচ্ছা নাও, কিন্তু সাতাশ টাকা হ'ল, মনে থাকে যেন। Next ছবি বিক্রী হ'লে একসঙ্গে সবটা দিয়ে দিও।"

"সে আর বলতে," বলিয়া বারোটা টাকা পকেটে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সে ট্যাক্সি ভাড়া চুকাইল। তারপর পকেটে হাত ঢুকাইয়া বাকী টাকাগুলি একবার গুনিয়া লইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং শিস দিতে দিতে পথ চলিতে লাগিল।

ম্যাডান থিয়েটারের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, "Ben Hur" দেখানো হইতেছে। হাত দিয়া বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকিয়া মনে মনে কহিল, 'বাবাঃ, মথি-লিখিত সুসমাচার। ও আমার পোষাবে না।' ফিরিয়া পিকচার প্যালেসের কাছে আসিল, দেখিল, বাহিরে বিরাট পোষ্টারে জন গিলবার্টের বাহুবন্ধনে ধরা পড়িয়া গ্রেটা গার্বো এলাইয়া পড়িতেছেন। কিছুক্ষণ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্তিমিত নেত্রে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ছবিটিকে সে দেখিল, অগ্রসর হইয়া গিয়া পিতলের ফ্রেমে আঁটা stillগুলির উপরেও একবার চোখ বুলাইয়া লইল, তারপর আরও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, 'দুত্তোর, শুধু শুধু কতগুলি ছবি দে'খে কি হবে? ক্রমাগত ছবি এঁকে এঁকে আর ছবি দে'খে দে'খে হাড়ে ঘুণ ধ'রে

গেছে, জলজ্যান্ত কিছু যে পৃথিবীতে আছে তাই প্রায় ভুলে যাবার জোগাড়। কিন্তু যাবই বা কোন চুলোয়? দেখি ভেবে।' একটা ইংরেজী গান প্রায়ই গাহিত, তাহার সুরটা গুন্‌গুন্‌ করিয়া আওড়াইতে আওড়াইতে চলিল:

"I try to be good, but the girls won't let me,
I ain't trying any more⋯"

ধর্মতলা দিয়া এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া চলিতে চলিতে আবার একবার নিজের মনে সে বলিয়া উঠিল, 'বাবাঃ কি dreary! কে বলবে এদেশে মেয়ে ব'লে একটা জাত আছে? যত রাজ্যের কেরাণী, কলেজের ছোকরা, কুলী-মজুর আর ভিখিরী। আর কি-সব চেহারা, কি-সব পোষাক! তার ওপর চলছে, না গড়াচ্ছে বোঝবার জো নেই। এর জন্যে এত হাঙ্গাম ক'রে এত সুন্দর পথঘাট, পথের পাশে শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়া, একটু দূরে দূরে ফুলের কেয়ারী করা পার্ক, স্কোয়ার, দরকার কি ছিল বাপু?' ফিরিয়া চৌরঙ্গীর দিকে চলিল, ভাবিল, সেদিক্‌টায় অন্ততঃ দু-একজন সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখিয়া পীড়িত চোখ-দুইটাকে স্নিগ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। মোড়ের কাছে বোম্বাইয়ের সত্যাগ্রহের খবর ফেরি হইতেছিল, একজন ফেরিওয়ালার কাছ হইতে একটা কাগজ চাহিয়া তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সেটাকে আবার বিনা বাক্যব্যয়ে সে ফিরাইয়া দিল, তারপর ফিরিয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, 'ইংরেজের রাজত্ব আর বেশীদিন নয় তা বুঝতে পারা যাচ্ছে, পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটাই বা চিরস্থায়ী হয়? কিন্তু আমি ভাবছি ওরা যখন যাবে, ওদের স্ত্রীকন্যাদের কিছু আর ফে'লে রেখে যাবে না। আর যা ঘটবার ঘটুক, কলকাতার রাস্তায় তখন বেড়িয়ে আর সুখ থাকবে না, সেটা মানতে হবে।'

দীপালোকিত একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া গতিবেগ মন্দা করিয়া দিল। ভাবিল, 'ঢুকব কি? রাতও ত হয়ে এল, বেশ একটু ঠাণ্ডাও প'ড়ে গিয়েছে। কালেভদ্রে ওরকম একটু-আধটুতে আর্টিষ্ট মানুষের দোষ নেই, বিশেষ

ক'রে এই হতভাগা দেশে। মাঝে মাঝে চারপাশটাকে একটু ভুলে থাকতে না পেলে লোকে ছবি আঁকতে পারবে কেন? সাধে কি আজকালকার আর্টিষ্ট ছোকরারা কেবল শিব আঁকে, এইজন্যেই আঁকে, কি আর আঁকবার আছে? আমি আর সব অপকর্ম্ম করেছি, শিব আজ অবধি আঁকিনি, তাঁর অনুচরেরা আমার ওপর সদয় থাকুক, আর আঁকবও না।' বাড়ীতে সুভদ্র আছে বটে, তা তাহাকে বিশেষ ভয় নাই, সে ত জানেই। মাঝে মাঝে বিমানের লিভারটাতে সে কষিয়া টিপুনি দেয়, তখন অবশ্য বেজায় লাগে, বাকী সময়টা নিজের খামখেয়াল লইয়াই তাহার কাটে। ভয় অজয়কে। সুভদ্র এবার দেশ হইতে ফিরিবার সময় এইটিকে কোথা হইতে জুটাইয়া লইয়া আসিয়াছে। বলে, 'তিনের মাহাত্ম্য ত জানো, তুমি আর আমি একেবারে দুই আলাদা আকাশের দুই গ্রহ, পরস্পরের কাছে নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে এক-আধটা ধূমকেতুর আবির্ভাব হ'লে অন্ততঃ ঠোক্কর খাওযার ভয়েও পরস্পর সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হয়ে চলব।' অজয় ছোক্‌রা লোক কিছু মন্দ নয়, দুদিনেই এমন কবিয়া নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে যেন চিরজন্ম তাহাদের এই বাড়ীটাতেই সে থাকিত; বরং ভালর দিকেই তাহার বাড়াবাড়ি। এমন সুন্দর পরিষ্কার গলা, কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া কিছু গায় না। অবশ্য জানিতে পারিলেও সে কিছুই বলিবে না, কিন্তু এমন মুখের চেহারা করিবে যেন ভূতপ্রেত জাতীয় কিছু একটা দেখিতেছে। তা তাহার মুখের চেহারা যেমনই হউক, মুখ ফুটিয়া যতক্ষণ কিছু সে না বলিতেছে ততক্ষণ বিমানের কিছুই আসিয়া যাইবে না। তাহার মুখের দিকে না চাহিলেই চলিবে। টাকা-কয়টা ইত্যবসরে কেহ পকেট মারিয়া লইল কি না একবার দেখিয়া লইয়া সে হোটেলে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় পথের উজ্জ্বল দীপালোকে চাহিয়া আবাক্ হইয়া দেখিল, যেন সত্যই ভূত দেখিয়াছে এমনই মুখ করিয়া অজয় দ্রুতপদে তাহারই দিকে আসিতেছে। ও-রকম ভয়ব্যাকুল মুখের চেহারা কাহারও দেখিলে

নিতান্তই না চাহিয়া থাকিতে পারা যায় না, বিমান ছড়িতে ভর দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অজয় সত্যই ভয় পাইয়াছিল। কেন ভয় এবং কাহাকে ভয় বুঝাইতে হইলে সকাল হইতে সুরু করিয়া সমস্ত দিনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হয়।

আজ ছয় দিন হইল অজয় কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু যেদিনকার কথা হইতেছে সেদিনও ভোরে ঘুম ভাঙিয়া কিছুক্ষণ সে মনে আনিতে পারিল না, সে কোথায় রহিয়াছে। এবারে কলিকাতায় ফিরিয়া অবধি এই-রকম হইতেছে, ঘুম-জড়ানো চোখে চাহিয়া চারিদিক্‌টাকে অদ্ভুত অপরিচিত বলিয়া মনে হয়, তারপর ক্রমে সেই অপরিচয়ের যবনিকা স্বচ্ছ হইয়া আসিতে থাকে।

আজও সকালের আলোয় বিছানায় পড়িয়া-পড়িয়া বেশ কিছুক্ষণ মনের মধ্যকার একটা ঘনান্ধকার কুজ্ঝটিকার সঙ্গে তাহাকে লড়িতে হইয়াছে। ক্রমে কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, প্রভাতসূর্য্য তাহার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পথে জ্যোতিঃশিখা বিকীর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য ভরিয়া ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ঐ তাহার পায়ের দিকে এক সারে সুভদ্রের তিনটি বুক্‌-কেস্‌। সুভদ্র ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, একটিতে সেই সম্পর্কিত নানা পাঠ্য কেতাব, কতক তাহার নিজের, কতক কলেজ এবং অন্যত্র হইতে ধার করা। মাঝের বুক্‌-কেস্‌টির খোলা তাকগুলিতে নানা দেশের উপন্যাস, কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রাচীন এবং আধুনিক, সারবান্‌ এবং অসার, এলোমেলো কেতাবের রাশি। জানালার দিকে লিখিবার ডেস্কটার ঠিক পাশেই যে বুক্‌-কেস্‌, সেইটির সঙ্গেই সুভদ্রের নিত্যকার ঘনিষ্ঠতম কারবার। সেইটির উপরকার তিনটি তাক ভরিয়া আয়ুর্ব্বেদ, হোমিওপ্যাথি, দেশীয় টোট্‌কা, Christian Science, বাইওকেমী, Psycho-analysis, পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। নীচের দুইটি তাকে পুঁটুলি বাঁধা দেশীয় নানা

গাছগাছড়া, শিশিবোতল, তৌলযন্ত্র প্রভৃতি। দরজার বিপরীত দিক্‌কার দেয়ালে বিমানের আঁকা একটিমাত্র ওয়াটার-কালার ছবি, একটি বিকশিত শুভ্র পদ্মের বক্ষলগ্ন একটা কালো কুৎসিত বক্রদেহ ভ্রমর। সুভদ্র এতদিন এই ঘরটিকে নিজের ষ্টাডি হিসাবে ব্যবহার করিত, যদি অজয় শেষ অবধি থাকিয়া যাওয়াই স্থির করে তাহা হইলে এইটাই হইবে তাহার শয়নকক্ষ, সুভদ্র তাহার জিনিষপত্র কতক পাশেই তাহার শুইবার ঘরে সরাইয়া লইবে, এবং দোতলার বারান্দার একটা দিক্ পার্টিশন দিয়া আড়াল করিয়া নিজের সখের ডিস্‌পেন্‌সারীর স্থান করিয়া লইবে।

অজয় কিছুই স্থির করে নাই। সুভদ্র রোজ দুইবেলা তাহাকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করে, প্রতিবারেই অজয় জোরের সঙ্গে আপত্তি জানায়, কিন্তু চলিয়া যাইতেও যে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আজ কলেজ খুলিবে; অজয় জানে, বৌবাজারে যে-মেস্‌টাতে সে এত বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে সেখানকার প্রত্যেকটি অধিবাসী আজ সেখানে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে. কিন্তু মেসের ছেলেদের একটা পোষ্টকার্ড্ লিখিয়াও সে জানায় নাই যে সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

আরও অনেক-কিছুই তাহার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সে করে নাই। নিরাপদে পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদ দিয়া দেশে বৃদ্ধ পিতাকে একটা চিঠি লেখে নাই। অথচ পৃথিবীতে এক পিতা ভিন্ন তাহার আত্মীয় বলিতে আর কেহ ছিল না। ছেলেবেলায় তাহার দিদিমা তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, দৌহিত্রকে তিনি সেই শৈশবেই বেশ চিনিতে পারিয়াছিলেন, বলিতেন, অজয়ের স্বভাবে মায়ামমতা বলিয়া কোনও জিনিষের অস্তিত্বই নাই, যখন যে দুধের বোতল হাতে করিয়া তাহার কাছে আসে তখনকার মত সে-ই তাহার পরমাত্মীয়। বড় হইয়াও সেই স্বভাবের তাহার বিশেষ-কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, কাহার নিকট হইতে কি জিনিষ কতখানি পাইতেছে তাহাই দিয়া এখনও সে পৃথিবীর বিচার করে,

কাহাকে অন্তরের মধ্যে লইবে এবং কাহাকে লইবে না তাহা স্থির করে। পিতা তাহার আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও তাহার বিলাত যাইবার ব্যয় বহন করিতে সম্মত হন নাই, এজন্য তাঁহার প্রতি তাহার মন যে প্রসন্ন ছিল না তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহাকে চিঠি না লিখিবার তাহা অপেক্ষাও গভীরতর কারণ এবারে বিদ্যমান্ ছিল।

কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য সমস্ত-রকম কাজেই এবারে তাহার কি এক মর্ম্মান্তিক নিরুৎসাহ দেখা দিয়াছে।

আশৈশব অকারণেই সে বিশ্বাস করিত যে সে নিতান্ত তাহার নিজেরই মত করিয়া পৃথিবীকে কিছু দিয়া যাইবে। কোন্ সূত্র ধরিয়া কি সে করিবে, কোন্ পথে সার্থকতার সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হইবে, এ চিন্তার তখন প্রয়োজন ছিল না। অনির্দ্দিষ্টের আশায় বুক বাঁধা তখন সহজ ছিল। চারিদিকে সময়ের প্রসারকে অনির্দ্দেশ্যতা হেতুই তখন অসীম মনে হইত এবং তাহার মধ্যে যে-কোনও অসম্ভব-সম্ভাবনার অতি অনায়াসেই স্থান হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া চিরকাল সুনির্দ্দিষ্ট বস্তুমাত্রকেই তাহার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অকাম্যযোগ্য মনে হইত, তাই কতকটা ইচ্ছা করিয়াও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণাকে এতদিন সে মনে স্থান দেয় নাই। কিন্তু আজ চতুষ্পার্শ্বে সম্ভাবনার পরিসর অত্যন্ত ছোট হইয়া দেখা দিয়াছে, এবার আর অনির্দ্দেশ্যকে লইয়া দিনাতিপাত করা চলিবে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ যাহা তাহা একটি মানবীর রূপ ধরিয়া অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে, কোনও অস্পষ্টতার কুহেলিকায় তাহাকে আবৃত করা যাইবে না। কিন্তু নিজেকে তাহার কাছে লইয়া যাইবার আগে কৃতার্থতার যে-কোনও একটা আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে। সময়ের পরিসরও এবার সঙ্কীর্ণ, কেন-না, মন আর তাহার যথেচ্ছ-বিস্তারকে মানিতেছে না। যাহা চাই অবিলম্বে চাই এবং কি যে চাই সে-বিষয়েও আর কোন সংশয় থাকিলে চলিবে না।

তাহার জীবনের সমস্ত সমস্যা আজ একটি স্রোত অবলম্বন করিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্যকে প্লাবিত বিপর্য্যস্ত করিয়া বহিয়া আসিয়াছে, বেহিসাবী বাজে খরচ করিবার সময় এ নহে। কিন্তু কি তাহার করিবার আছে? শেষ অবধি সেদিন কলেজে সে আর গেল না। কোনও প্রকারে সুভদ্রের পাহারা এড়াইয়া মনভরা নিদারুণ শূন্যতা লইয়া নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল। স্থির করিল, ময়দানের জনবিরল অংশগুলি বাছিয়া যথেচ্ছ-বিহারে সমস্তদিন নিজেকে লইয়া কাটাইয়া একেবারে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।

ভোর হইতেই আকাশময় স্বর্ণস্রোত বহিতেছিল, মেঘগুলি তাহাতে সাঁতার কাটিয়া অবগাহন করিয়া ক্লান্তি মানিতেছিল না। অজয় যখন পথে বাহির হইল তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল যাহার মধ্যে নীলাকাশের অতল গভীরতার বিশেষ একটি স্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অজয়ের আজ এ-সমস্ত লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না। সমস্তদিক্ হইতে চিত্তগতিকে নিবৃত্ত করিয়া সে একমাত্র নিজেরই মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

সে কি চায় তাহা জানে না, যাহা-কিছু করিবার আছে তাহা করিবার মত নয়, যাহা হওয়া সম্ভব তাহা হইয়া নিজের মনুষ্যত্বকে অপমান করিতে সে চায় না। সমস্ত দিক্‌কার অসংখ্য অপরিণতি, অভাব, অক্ষমতা যেন সপ্তরথীর মত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাকে আজ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এই দেহ, এই অসুস্থ অপরিণত শরীর লইয়া কোন্ দুঃসাহসিক সংগ্রামে সে প্রবৃত্ত হইবে? যে শিক্ষা এতদিন ধরিয়া এত প্রাণান্ত প্রয়াস এবং অর্থব্যয়ের বিনিময়ে সে লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীতে কাহার কোন্ কাজে আজ লাগিবে? প্রথমেই এই অবস্থার জন্য তাহার পিতাকে সে দায়ী করিল, কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিল, দায়ী সত্যই তিনি নন। সুভদ্র দৃষ্টান্ত, তাহার টাকার অভাব নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউরোপে সে যাইবে না, গিয়া কি করিবে? সে পড়িতেছে

ইংরেজীতে এম-এ, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া অবধি কায়মনোবাক্যে সে চিকিৎসক। তাহার সেদিক্‌কার শিক্ষার পরিণতিতে বিদেশে গিয়া তাহার কিছুমাত্র সাহায্য হইবে না, অন্ততঃ সহজে হইবে না। সুতরাং পিতার মন এবং আর দশজনের কাছে নিজের মান রাখিবার জন্য ইংরেজীর ক্লাস সে করিয়া চলিয়াছে, যদিও সারাক্ষণ তাহার মন পড়িয়া আছে তাহার পড়িবার ঘরে ডাক্তারী বইয়ে বোঝাই আলমারীটার মধ্যে।

অজয় এম-এ পড়ে ইতিহাসে, বিদেশে গিয়াই বা সে কি শিখিবে? ফিরিয়া আসিয়া তাহারই মত আরও কয়েকটি অপদার্থ তৈয়ারী করা ছাড়া আর কোন্‌ কাজে সে লাগিবে? সাময়িক পত্রে মাঝেমাঝে সে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেদিকেও কোন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা তাহার অদৃষ্টে আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার এই প্রবন্ধগুলি প্রশংসা যত না লাভ করিয়াছে, উপহসিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী। তাহার মধ্যে গবেষণা-বৃত্তির অভাব। ইতিহাস তাহার ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু টুকরা টুকরা তথ্যের সঙ্গে তথ্য জুড়িয়া সে ক্লান্ত হয়। একটুখানি মশলা হইতে চট্‌পট্‌ অনেকখানিকে গড়িয়া লইতে পারিলে সে তৃপ্তি বোধ করে। সাংসারিক বিচারে ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা অতিবড় মারাত্মক দোষ।

ট্রামে বালিগঞ্জ অবধি গিয়াছিল, সমস্তদিন অনাহারে গুরুভার শূন্যতা মনে বহিয়া পদব্রজে নগরোপকণ্ঠের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া যখন ফিরিয়া ট্রামে উঠিল তখন আর চিন্তা করিবার ক্ষমতাই তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পথের ধারে ধারে দীঘির জলে আকাশের ছায়া পড়িয়াছে, বাতাসে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিয়া সূর্য্যের আলোয় কাঁপিতেছে, তীরের কাছাকাছি দু-একটি জলজ লতাপাতা এবং ফুলকে ঘিরিয়া নীলজল ধ্যানস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় দূরস্বপ্নের স্মৃতির মত কোন্‌ অজানা ফুলের অস্ফুট সৌরভ নিজের সর্ব্বাঙ্গে

বহন করিয়া একটি তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী লীলামন্থর গতিতে অজয়ের পাশে আসিয়া উপবেশন করিল। যে বিপুল অবসাদের নাগপাশ অজয়ের মনকে এতক্ষণ ধরিয়া শতপাকে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়াছিল, এই একটু সৌরভ, দুইটি নীলাভ নয়নের চকিত দৃষ্টি, একটি অপরূপ দেহভঙ্গীর তরঙ্গের আঘাতে তাহা নিমেষে শিথিল হইয়া গেল। অজয় দেখিল, শরতের আকাশের মত নির্ম্মল নীলবাস তরুণীর দেহলাবণ্যকে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া একটি মরকতমালা শুভ্র মেঘমালার মত দীপ্তি পাইতেছে, ঘননীল শিরো-ভূষার একদিক্ তাহার মুখের একটি দিক্‌কে আড়াল করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, যে দু-একটি চূর্ণকুন্তল অসম্বৃত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাও শরতের শস্য-ক্ষেত্রকেই মনে পড়াইয়া দেয়। অজয়কে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, শরতের এমন পরিপূর্ণ রূপ কোনও মানবীর মধ্যে ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নাই। পথে চলিতে চকিতের মত যাহাদের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে বর্ষার সকরুণ স্নিগ্ধতা, কাহারও মধ্যে বসন্তের লীলা-উচ্ছল সৌন্দর্য্য-হিল্লোল, কাহারও সৌন্দর্য্যকে ঘেরিয়া হেমন্তের রহস্য-কুজ্ঝটিকা, শীতরাত্রির স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মত কাহারও কাহারও রূপকে সে ভাবিতে পারিল। কিন্তু এ যেন শরতের জ্যোতিঃপ্লাবিত পরিপূর্ণ একটি দিবস, ইহার সৌন্দর্য্য অকুণ্ঠিত কিন্তু সংযত, সম্বৃত কিন্তু স্বপ্রকাশ, উজ্জ্বল কিন্তু জ্বালাহীন। তরুণী যখন প্রজাপতির মত রঙীন ছাতার ডানা মেলিয়া জনস্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার সুকুমার দেহটিতে গতিচ্ছন্দের লীলায়িত তরঙ্গ উঠিল, তাহাব নীলিম পবিচ্ছদে, নীবিবন্ধে, সুডৌল পা-দুখানির উজ্জ্বল স্বচ্ছ আবরণে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলো লুটাইয়া পড়িয়া হাসিয়া উঠিল তখন অজয়ের মনে হইল, এ যেন সত্যই সৌন্দর্য্যের একটি স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নহে, কোন্ গোপন উৎসবের উন্মাদনায় নিখিল-চিত্তকমলকে মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে, আবার মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে। ইহাকে ইচ্ছামত দুই চোখ ভরিয়া দেখা যায়, ইহার

পশ্চাতে অন্তরের গহনতম বাসনাকে ধূলিকর্দ্দমে লুণ্ঠিত করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে পৃথিবীর কাহারও কিছু মনে করিবার থাকে না।

হঠাৎ এই মাধুর্য্যের অবলম্বন ধরিয়া তাহার প্রবাসপথের যাত্রাসঙ্গিনী সেই কবরীভারপীড়িতা অপরিচিতা অষ্টাদশীর মুখখানির বেশ স্পষ্ট একটি আভাস যেন এক পলকের মত তাহার স্মৃতিতে ধরা পড়িল, পরক্ষণেই সেই অস্ফুটতাকে জোর করিয়া ধরিতে গিয়া কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না, যেন জলের বুকের প্রতিবিম্ব অস্থির করস্পর্শে শত টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল। শরতের আসন্ন সন্ধ্যা তখন দিগন্তে স্বর্ণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বর্ণের তীব্রতা নাই, মৃদু কুয়াসায় চতুর্দ্দিক্ অত্যন্ত স্নিগ্ধ-কোমল রূপ ধারণ করিয়াছে। ময়দানের পরপারে আকাশের দূরান্তে চাহিয়া প্রায়-অপরিচিত এক-পলকের দেখা একখানি প্রিয়মুখকে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাওয়ার বেদনায় এ-সমস্তই অজয়ের কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ লাগিল।

সন্ধ্যার ছায়া যখন বেশ নিবিড় হইয়া পৃথিবীর গায়ে সংলিপ্ত হইতেছে, দূরে নগরের কোলাহল কিছুমাত্র আর কানে আসে না, তরুশ্রেণীর অন্তরালে প্রান্তর-পথের শেষ আলোর চিহ্নটিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সেই রহস্যগভীর অন্ধকারে নির্জ্জন সন্ধ্যার স্তব্ধতা অকস্মাৎ অজয়ের কানে কানে কথা কহিল।

পরিচয় এবং অপরিচয়ের মধ্যেকার সীমারেখা কোনদিনই তাহার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না, আজ নিজের অতি-অন্তরঙ্গতায় দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া অকস্মাৎ নিজের কাছে নিজেকেই তাহার অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। এই ধরণের উপলব্ধি আজ তাহার নূতন নহে, কতদিন চতুর্দ্দিক্কার পরিচিত মানুষগুলির দৃষ্টিতে নিজের বিশেষ রূপটি দেখিয়া লইয়া নিজের সঙ্গে পরিচয়ের যোগকে নূতন করিয়া সে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হইতেই পরিচয়ের আশ্রয় কাছাকাছি কোথাও কিছু তাহার ছিল না, তাই আজ মন

হইতে আত্মোপলব্ধির অভ্যস্ত আবরণগুলি একটির পর একটি নিরবলম্ব হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল।

অস্ফুট স্বরে নিজের নামটি কয়েকবার সে উচ্চারণ করিল, কিন্তু তাহাতে অপরিচয়ের ঘন যবনিকা একটুও নড়িল না। তাহার চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনের নিবিড়তম সুখদুঃখে ভরা ঘটনা-পর্য্যায়কে বারংবার নিজের মনের পটে স্মৃতির তুলি বুলাইয়া সে আঁকিয়া আঁকিয়া মুছিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে নিজেকে কোথাও আর অন্তরতম করিয়া সে অনুভব করিতে পারিল না। যেন এতকাল যে-জীবন সে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার নিজের জীবন নহে, যেন তাহার এই দেহ আশ্রয় করিয়া আর কোন্ অপরিচিত আত্মা এতকাল বাঁচিয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল, কেমন করিয়া এমন অন্তরতম নিজেকে এতদিন সে মনে করিত। এই একটুখানি পঙ্গু চিন্তা, তীব্রতা-সহনকুণ্ঠ একটু সুখদুঃখের উপলব্ধি, বৃষ্টিধরা জলের মত অর্থহীন চঞ্চল এতটুকু একফোঁটা চৈতন্যের স্বচ্ছতা, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া সে অসীমতাতে লোভ করিয়াছিল! একদিকে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সমস্ত বিশ্ব এবং সেই বিশ্বের দেবতা, অপরদিকে তাহার নিজেকে সে স্থাপন করিয়াছিল।

স্তব্ধতা তাহার সঙ্গে কথা কহিল। তাহার কর্ণে মর্ম্মান্তিক হইয়া এই প্রশ্ন বাজিল, "তুমি কে, তুমি কতদিনের, তুমি কতটুকু?" তাহার দেহ, তাহার ইন্দ্রিয়োপলব্ধি, তাহার স্মৃতিচিহ্নিত মন সেই প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোনও উত্তর দিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন ভিতরের এবং বাহিরের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার অবকাশে নিজেরই মধ্যেকার এক অসীম অনির্দ্দেশ্যতার অন্ধকারে কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত যতিহীন প্রখর গতিতে সে ডুবিতে লাগিল।

সে ডুবিতে লাগিল, কিন্তু কিছু অনুভব করিল না, কেবল বুঝিল, দেহমনের প্রত্যেকটি অভ্যস্ত আত্মোপলব্ধি বহু পূর্ব্বেই সেই গভীরতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নিমজ্জিত সর্ব্বস্বধনের সন্ধানে সর্ব্বহারার মত নিরুপায় হইয়াই

যেন সে নিজেও প্রথমে ডুবিতে লাগিল। তারপর মজ্জমান্ ব্যক্তি যেমন করিয়া যাহাকিছুকে হাতের কাছে পায় তাহাকেই প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরে, সেও তেমনই নিজেরই দেহের মধ্যে একটুখানি পরিচয়ের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। হাতদুইটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কয়েকবার দেখিল, নখদর্পণে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত দেখা তাহার স্বভাব ছিল, সেইগুলির মধ্যে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া সে নিজের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ফল কিছুই শুভ হইল না। বিবর্ত্তনের ধারাপর্য্যায়ের মধ্য দিয়া চাহিয়া সেগুলির মধ্যে কোন্ বিকট-দর্শন প্রাগৈতিহাসিক জীবের কুৎসিত থাবা-দুইটাকে দেখিল। কল্পনায় চিতার আগুনে সেগুলিকে গলিয়া গলিয়া পুড়িতে দেখিল। দেহমনইন্দ্রিয়ের সবটুকু আলোককে সে প্রাণপণে উস্কাইয়া ধরিয়াছিল, মৃত্যুকে মনে পড়িতেই সেই আলোতে যেন চিতানলের আভা লাগিয়া গেল। সবচেয়ে প্রিয়মানুষটি যেমন মৃত্যুতে আড়াল হইয়া মুহূর্ত্তে সবচেযে ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহারও তেমনই ইহার পর নিজের দিকে আর চাহিতে সুদ্ধ ভয়ভয় করিতে লাগিল। নিজের কাছ হইতে পলাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, কিন্তু পলায়ন সম্ভব নহে জানিয়াই ভয় বহুগুণ বেশী হইল।

তবু সে পলাইতে লাগিল। অন্ধকার প্রান্তর বহিয়া, ঝোপঝাড় খানাখন্দ ত্রস্তপদে অতিক্রম করিতে করিতে পড়িতে পড়িতে সে লোকালয়ের দিকে ছুটিল। স্তব্ধতা তাহার পশ্চাতে তাড়া করিল। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যেই কোন্ এক নিদারুণ অপরিচয়ের প্রেত-যোনিকে সে বহন করিতেছে, কোথায় পলাইয়া ইহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিল না, কিন্তু পলাইতে লাগিল।

বিমান কহিল, "কোন্‌দিকে চলেছ অজয়? কি হয়েছে তোমার?"

অজয় থমকিয়া থামিয়া নিজেরই অজ্ঞাতে একটা নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস লইল, কহিল, "কই, কিছু ত হয়নি।"

বিমান কহিল, "এমন ক'রে ছুটছ যেন কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে।"

অজয় একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, "তাড়া কে আবার করবে? কেউ তাড়া করেনি।"

বিমান দুই চোখ বুলাইয়া ভাল করিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া লইল, মনে মনে কহিল, 'উঁহু, এর অবস্থাটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। একটু কবির ধাঁচের মানুষ, কোন্ ভাবের হাওয়া গায় লেগেছে কে জানে? জানতে চেয়েও লাভ নেই কিছু।' মুখে কহিল, "আচ্ছা, যাও। তবে অত বেশী তাড়াতাড়ি ক'রো না। আর পায়ের নীচে থাকে ব'লেই পথটাকে এতবেশী অবজ্ঞা করা ঠিক নয়, মাঝে মাঝে একটু তাকিও, কখন্ হোঁচট খেয়ে পড়বে।"

বিমান ছড়ি ঘুরাইয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই অজয় ত্রস্তে কহিল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বিমান কহিল, "আমি? এই ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়, ততক্ষণ একজায়গায় স্থির হয়ে থাকা চলে না ব'লে এম্‌নিই ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু।"

অজয় তাড়াতাড়ি কহিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

বিমান যেন অন্যমনেই কহিল, "তুমিও যাবে?" ভাবিল, কি গেরো রে বাবা। একটু আগে যে গানের সুরটা আবৃত্তি করিতেছিল তাহারই একটা কলি আবার গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,

"All those glad eyes peepin' everywhere…"

তারপর হঠাৎ কহিল, "আচ্ছা, তাই চল, তোমাকে এক জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে আসছি। সঙ্গে টাকাকড়ি আছে কিছু?"

টাকাকড়ির কথা বলিয়া বিমান যেন অজয়কে তাহার ভয়কল্পনার প্রেতলোক হইতে এক ঝট্‌কায় একেবারে পরিচিত পৃথিবীর ধূলিমাটির উপর টানিয়া

নামাইয়া দিল। বিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, কহিল, "কত টাকা?"

বিমান কহিল, "এই দু-দশ টাকা, যাওয়া আসার গাড়ীভাড়াটা হয়?"

অজয় কহিল, "তা হবে।"

ছড়ি তুলিয়া বিমান আবার একটা ট্যাক্সি ডাকিল। ট্যাক্সি আসিয়া কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিজেই দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া অজয়কে বলিল, "ওঠ।"

অজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিল।

বিমান বসিতে বসিতে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে কহিল, "ঘুমাও।"

৬

ছোট একটি বাগানের পথে একসার রজনীগন্ধার পাশ কাটাইয়া দীপালোকিত একটি গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া ট্যাক্সি দাঁড়াইল। বিমান নামিয়া-পড়িয়া নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ভাড়া চুকাইল, তারপর একমুহূর্ত্ত অজয়ের দিকে ফিরিয়া কেবলমাত্র "এস" বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তাহাকে প্রশ্ন করিবারও অবসর দিল না। অন্যদিন হইলে অজয় তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া তর্ক করিত। বলিত, বিনা নিমন্ত্রণে অথবা বিনা প্রয়োজনে কোনও অপরিচিত-গৃহে প্রবেশ করা তাহার রীতি নহে, কিন্তু আজ পরিচয়-অপরিচয়ের মধ্যকার সীমারেখা সত্যই অনেকখানি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, তদুপরি আজ বিমান ইচ্ছা করিবে এবং সে নীরবে মান্য করিবে, ইহা পূর্ব্ব-হইতে স্থির করিয়াই তাহার সঙ্গে সে পথে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং নামিয়া-পড়িয়া বিনা বাক্যব্যয়েই তাহার অনুসরণ করিল।

ভবানীপুরের এক বিরলবাস পল্লীতে তিনতলা সুদৃশ্য এক বাড়ী। দুতলার প্রায় সমস্তটা জুড়িয়াই মাঝারিগোছের একটা হল। প্রথমদৃষ্টিতে গৃহসজ্জা অজয়ের কিছুই প্রায় চোখে পড়িল না, তীব্র বিদ্যুতের আলো সবকিছুতে আগুন ধরাইতেছে। অগ্নিশিখারই মত চঞ্চল প্রদীপ্ত রূপজ্যোতিঃর কয়েকটি শিখাকে সে অপরিস্ফুট কিন্তু নিদারুণভাবে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অনুভব করিল মাত্র।

বিমান তাহাকে উপরে পৌছাইয়া দিয়াই কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল, সম্মুখে যে শূন্য আসন পাইল তাহাতেই বসিয়া-পড়িয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, নীচে হইতে পলাইতে পারিলেই ছিল ভাল। কোনও দিকে ভাল করিয়া না তাকাইয়া কেমন অকারণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, অত্যন্ত অচিন্তিত উপায়ে আজ এইখানে তাহার প্রবাস-প্রিয়ার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে। এই জ্যোতিঃপ্লাবিত উৎসবক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী অদূরেই কোথায় যেন রহিয়াছে, অজয়কে সে দেখিতেছে, কৌতুক অনুভব করিতেছে। হাসিলে তাহাকে কেমন দেখায় অজয় জানে না, অন্য-সকলের মত আত্মবিস্মৃত হইয়া সে হাসিতেছে অজয় তাহা ভাবিতে পারে না, তবু অজয়ের মনে হইল, হাসির আবেগে তাহার সুকুমার অধর-প্রান্ত কাঁপিতেছে। অপরিচিতা নারীদের সান্নিধ্যে নিজেকে বিপন্ন বোধ করা অজয়ের চিরকালের স্বভাব, কিন্তু আজ সে যথারীতি অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। জোর করিয়া মনটাকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে আগ্রহের অত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও চতুর্দ্দিকটাকে সে দেখিয়া লইতে লাগিল।

ঘরের মেঝেতে কার্পেটের উপর ধবধবে শাদা চাদর পাতিয়া মস্ত ফরাস তৈয়ারী হইয়াছে। ফরাসের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র। একটি যুবক ফরাসের এক কোণে বসিয়া কোলের উপর একটা সেতার টানিয়া সুর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। অজয়ের মনে হইল, বারেবারেই ঠিক সুরটিতে ঘা পড়িতেছে, কিন্তু অকারণেই যুবকের মন উঠিতেছে না। অনাবশ্যক খানিকটা নামাইয়া আবার সে সুর কষিয়া বাঁধিতেছে, কখনও বা অনাবশ্যক

অনেকখানি চড়া করিয়া বাঁধিয়া তারের টান আল্‌গা করিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বিরক্তিতে অজয়ের ঠোঁটের কাছটা শক্ত হইয়া উঠিল, এক ঝট্‌কায় সেদিক্ হইতে সে চোখ-দুইটাকে ফিরাইয়া লইল। ফরাসের মাঝামাঝি জায়গায় আর একটি যুবক কোলের কাছে একট পাখোয়াজ লইয়া অত্যন্ত হতাশ মুখে বসিয়া আছে। একদিকে বেশ অনেকখানি দূরে প্রায় দেয়াল-জোড়া একটা পিয়ানোর সম্মুখে একটি তরুণী একমনে কি একটা গানের বইয়ের পাতা উল্টাইতে ব্যস্ত, অজয় যেখানে বসিয়াছে সেখানে হইতে তাহার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিমানের সঙ্গে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে যন্ত্রসঙ্গীতের অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা থামিয়া গিয়াছে, মৃদু কথার গুঞ্জন উঠিতেছে।

যাহারা কথা বলিতেছে তাহারা মোটামুটি দুই দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়াছে। ফরাস ঘেরিয়া তিন দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া কুড়ি-পঁচিশটি বেতের তৈয়ারী আসন, শুভ্র লেসের আস্তরণে ঢাকা। এক কোণে এক-খণ্ড শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত টিপয়ের উপর বড় পিতলের বাটিতে একরাশ টকটকে লাল গোলাপ। প্রায় সব-ক'টি আসনই খালি। অজয় যেদিকে বসিয়াছে, সেদিকে একসারে আরও চারজন যুবক এবং হলের একেবারে দূরতম প্রান্তে পিয়ানোর সব-চেয়ে কাছের আসনগুলি অধিকার করিয়া বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মহিলা বসিয়া আছেন। কিন্তু বাহিরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে আধ-অন্ধকারে যাহারা পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে তাহারা সংখ্যায় কম নয় এবং চকিতদৃষ্টিতে একবারমাত্র চাহিয়াই অজয় বুঝিতে পারিল, তাহারা সকলেই তরুণী। সেদিক্ হইতে মৃদু কিন্তু অজস্র হাসি দিয়া মণ্ডিত কোন্ গোপন রসালোচনার রেশ রহিয়া রহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। হলের ভিতরের দিক্‌কার একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে সুভদ্রের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে আসিতেছে, বুঝা যাইতেছে সেখানে যুবকদের ভিড়।

অজয়ের মনে পড়িল, কলিকাতায় আসিয়া অবধি এই স্থানটির কথা সুভদ্রের

কাছে কয়েকবারই সে শুনিয়াছে। সমাজ-স্রোতকে সুস্থগতিতে প্রবহমান্ রাখিতে হইলে স্ত্রীপুরুষের অবাধ কিন্তু বিধিবিহিত মিলনের ধারায় প্রতিপদে তাহার পরিপুষ্টি আবশ্যক, তর্কের ক্ষেত্রে চিরকালই অজয় তাহা স্বীকার করিত; কিন্তু সুভদ্রের আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে তাহার এই নব-প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটিতে আসিতে কিছুতেই সে রাজি হয় নাই। দেনা-পাওনার হিসাবে গোল বাধিয়াছে। এই স্থানটিতে মনের খোরাক নিজে অত্যন্ত বেশী পাইবে আশা করিতেছিল বলিয়াই প্রতিদানে বেশী কিছু যে দিতে পারিবে না এই সঙ্কোচ তাহার বড় হইয়াছে। কিন্তু এই নাকি স্ত্রীপুরুষেব বিধিবিহিত মিলনের নমুনা? হরি, হরি! অজয়ের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতেও সুভদ্রের এত আগ্রহান্বিত সমাজসৃষ্টিপ্রয়াসের নিষ্ফলতা অত্যন্ত হাস্যকর কিন্তু করুণ হইয়া ধরা পড়িল।

একটি অপরিচিত যুবক ভিতরের দিক্ হইতে আসিয়া তাহার পাশের আসনটি অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িল, কহিল, "বিমানবাবু আপনাকে পৌঁছে দিয়ে স'রে পড়েছেন বুঝি? ওঁর ঐরকম স্বভাব। বাইরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়, ডেকে দেব?"

ভাল করিয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই অজয় কহিল, "থাক্, দরকার নেই।"

যুবক কহিল, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, যদিও আমি আপনাকে খুব ভাল ক'রেই জানি। আমার নাম রমাপ্রসাদ ঘোষ। আমাদের এই ক্লাবটা হয়ে এই একটা লাভ হ'ল দেখুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, যা আর কোনও রকমে হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।"

অজয়ের মনটা একেবারেই ভিজিয়া গেল, চেয়ারটাকে অল্প একটু টানিয়া রমাপ্রসাদের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "ক্লাবগুলোর এই একটা মস্ত সুবিধা আছে বটে। কিন্তু আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত?"

রমাপ্রসাদ কহিল, "কোথাও দেখেছেন কিনা বলতে পারব না, দেখলেও লক্ষ্য করেননি নিশ্চয়ই, আপনাকে দু-একবার আমি দেখেছি। তাছাড়া

কাগজে আপনার লেখা পেলেই আমি পড়ি। আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে আপনার কতগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ গত বৎসরের ষোড়শীতে বেরিয়েছিল, সেগুলি যে আমার কি ভাল লেগেছিল তা আর কি বলব! কি নাম যেন ছিল প্রবন্ধগুলোর—'আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার পূর্ব্বাভিমুখীনতা' না? কোল দ্রাবিড় আর তিব্বতী-বর্ম্মা খিচুড়ী পাকিয়ে বাঙালী জা'ত তৈরী হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে এই ত কেবল শুনে আসছি, কিন্তু ভারতের বহুপ্রাচীন আর্য্যসভ্যতার আমরা বাঙালীরাই যে সত্যিকারের উত্তরাধিকারী একথা জোরের সঙ্গে আপনিই বোধ হয় প্রথম বলেছেন। ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে সিন্ধুতীরে যে-সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত তারই কেন্দ্র ক্রমাগত পূর্বদিকে স'রে স'রে ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, বারাণসী, পাটলিপুত্র হয়ে আজকের দিনের কলকাতায় এসে শেষ পরিণতি পেয়েছে, আপনার লেখা পড়লে একথাটাকে কেবল থিওরী ব'লে একটুও আর মনে হয় না। অন্ততঃ বাঙালী জাতের আত্মসম্মান-বোধ একটু বাড়াবার জন্যেও এ-ধরণের থিওরীর প্রয়োজন ছিল।"

অজয় কহিল, "সম্প্রতি থিওরীটাকে অল্প একটু বদলেছি। আর্য্যাবর্ত্তে দুটি একেবারে আলাদা সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এই বিশ্বাস এখন আমার হয়েছে। সিন্ধুতীরের বহুপ্রাচীন যে সভ্যতা, সিন্ধুস্রোতেরই মত তার গতি ছিল দক্ষিণে, এখনকার দক্ষিণ-দেশীয়েরা সেই সভ্যতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। আর্য্যসভ্যতা যেটাকে আমরা বলি সেটা গঙ্গাতীরের জিনিষ, তার সমস্ত চেহারাটাই সিন্ধুতীরের সভ্যতার থেকে আলাদা। এই গাঙ্গেয় সভ্যতাই ছিল গঙ্গাস্রোতের মত পূর্ব্বাভিমুখী।"

রমাপ্রসাদ কহিল, "আমরা ক্লাব থেকে একটা কাগজ বের করব কিছুদিন থেকে আবার ভাবছি। কাগজটা যদি হয়, আপনার সব নতুন লেখা আমরা ছাপতে পারব, একটা সত্যিকারের বড় কাজ হবে।"

পাশের ঘর হইতে যুবকদলকে প্রায় তাড়াইয়া লইয়া এই সময় সুভদ্র

আসিয়া ঢুকিল, টানাটানি করিয়া সকলকে বসাইয়া দিতে দিতে কহিল, "না, প্রকাশ, কথা শোন।...নৃপেন, তোমার অন্ততঃ একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে ব'লে আমি ভাবতাম।...তোমরা সবাই মিলে রোজ যদি এই রকম কর তাহলে ক্লাব-টাব করার মানে হয় না কিছু। এদিকটাও ত দেখছি একেবারে খালি। বৌদি, তোমার অন্য বন্ধুরা সব গেলেন কোথায়?"

ঘরোয়া ধরণে ঢাকাই শাড়ী পরা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া গৌরবর্ণা একটি মহিলা চাবি-বাঁধা আঁচলটা কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "ধ'রে রাখা কি যায়? ঘরের মধ্যে গরম হচ্ছে ব'লে বীণা যেই উঠে বাইরে গেল, এক এক ক'রে সব-ক'জন সেইখানেই গিয়ে জুটেছে। চল, দেখি, পাকড়ে আনা যায় কিনা। বীণাকে ধরে আনতে পারলেই অবিশ্যি হবে।"

অজয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া রমাপ্রসাদ কহিল, "ইনি হচ্ছেন স্থলতা দেবী। এঁর স্বামীকে আপনি চেনেন বোধ হয়, ডাক্তার প্রিয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ডাবলিনের এল্ এল্-ডি, অক্সফর্ডের বি-এ, বি-সি-এল্, স্থভদ্রবাবুর কিরকম দূর সম্পর্কের ভাই। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই আসলে অবিশ্যি বড।...বাড়ীটা এঁদেরই তা জানেন বোধ হয়। ক্লাবের ঘরের জন্যে ভাড়া একটা ঠিক করা আছে। প্রায় এক বছর হ'তে চলল, কিছুই আমরা এখনও দিয়ে উঠতে পারিনি যদিও।...এত বড় একটা কাজে মাসে ষাটটা টাকা বাড়ীভাড়াও যদি না জোটে তবে তার চেয়ে বড় কলঙ্ক দেশের ও সমাজের আর কি হ'তে পারে? কাগজটা হ'লে প্রোপাগাণ্ডা ক'রে দেখা যায় কিছু কাজ হয় কি না।"

বাহির হইতে পালা করিয়া স্থলতার এবং স্থভদ্রের কণ্ঠের অনেক কাকুতি-মিনতি কানে আসিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ কহিল, "আমি ক্লাবের সেক্রেটারী তা জানেন না নিশ্চয়ই। অবিশ্যি এঁরা থাকাতে আমার কাজের ভার অনেকখানিই হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

এঁদের এতই বেশী সৌজন্য, যে, বাড়ীটা যে তাঁদেরই, ক্লাবে এসেও সেটা তাঁরা ভুলতে পারেন না। বিশেষ ক'রে সুলতা দেবী। চেনা-অচেনা সমস্ত সভ্য-সভ্যাদের অতিথি-অভ্যাগত হিসেবেই তিনি সম্বর্দ্ধনা ক'রে থাকেন। ঐ আসছেন বোধ হয় আপনারই সন্ধানে। আচ্ছা বসুন, আমি পালাই। ক্লাবের গত মাসের হিসেবটা আজ একটু দেখতে হবে।"

ততক্ষণ যুবকের দল ফরাস অধিকার করিয়া প্রায় উপাসনার ভঙ্গীতে গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে। গাড়ী-বারান্দা হইতে তরুণীরা আসিয়া পিয়ানোর দিক্‌কার চেয়ারগুলিতে বসিল, যাহারা বাকী রহিল তাহারা পিয়ানোর উপর ঝুঁকিয়া পিয়ানোবাদিনীর দুই পাশে এবং পিছনে ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া সার দিয়া দাঁড়াইল। সুভদ্র করজোড়ে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাহাদের সেখান হইতে নড়াইতে পারিল না। তখন অগত্যা গোটাতিনচার সেতারে সঙ্গীতের মৃদু তরঙ্গ উঠিল, পাখোয়াজে অতি মৃদু করাঙ্গুলির ঘা পড়িল। ক্লাবের কাজ সুরু হইল।

দেখা গেল, ক্লাবের সভ্যেরা সভ্যাদের এবং সভ্যারা সভ্যদের অস্তিত্বকে কায়মনোবাক্যে অস্বীকার করিতেই ব্যস্ত। মেয়েদের সারে ছেলেদের আসনগুলির দিকে সবশেষে যাহার স্থান হইয়াছে সে নিজের চেয়ারটিকে বেশ অনেকখানি ঘুরাইয়া লইয়া সেদিকে প্রায় পিছন ফিরিয়া বসিয়াছে। মাঝে পাঁচ-ছয়টি শূন্য আসনের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের দিকে সব-শেষে যে বসিয়াছে, নত-মস্তকে নিজের নখ খুঁটিতেই তাহার মন। এক, দেখা গেল, বিমানের ভয়ডর বলিয়া কিছু নাই। মেয়েদের এলাকাতেই সারাক্ষণ বেশ সপ্রতিভ ভাবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ তাহার সঙ্গে হাসিয়া দু-একটা কথা কহিতেছে, কেহবা মাথার ইঙ্গিতে হাঁ-না করিয়া সারিতেছে, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতেছে না।

সুভদ্রকে বাহিরে পাইয়াই সুলতা তাহার নিকট হইতে অজয়ের পরিচয়

লইয়াছিলেন। তাহাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপের উদ্দেশ্যেই এই সময়ে রমাপ্রসাদের পরিত্যক্ত আসনটিতে ধীরে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু অজয় অকস্মাৎ তাহার অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি অপরিচিত তরুণের সঙ্গে কোন্ গভীর তথ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, একবারও তাহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া সুলতার দিকে চাহিল না।

অপর দিক্ হইতে সুলতার একটি সখী অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে বন্ধুর এই অপ্রস্তুতি লক্ষ্য করিতেছিল। সুলতা আর বসিবেন, না, পরিচয় করিয়া দিবার জন্য সুভদ্রকে জুটাইয়া লইযা আসিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া সে ডাকিল, "সুলতা-দি!" তারপর চকিতে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার সেই হাসির ছোঁয়াচটি নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে, ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, অজয় যদিও মুখ তুলিল না তবু ইহা তাহার চোখ এড়াইল না। অত্যন্ত অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অত্যন্ত চঞ্চল লালিমা মিশিয়া যখন তাহার মুখখানি অপরূপ দেখিতে হইয়া উঠিয়াছে তখন সুলতা কহিলেন, "অজয়বাবু, নিজের ওপর একটুও দরদ যদি থাকে ত এইবেলা ফিরুন আর কথা বলুন।"

অজয় ফিরিল কিন্তু নিজের প্রতি প্রীতির আতিশয্যটা স্বীকার করিল না। অতি দ্রুত অভিবাদন সারিয়া লইয়া অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তির মত সহাস্যে কহিল, "আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

সুলতাও হাসিয়াই কহিলেন, "আমি না দেখালেও আপনি নিজেই দেখতে পেতেন।"

"ফাঁড়াটা কি কাটিয়েছি?"

"কি ক'রে বলব? আপনি এর পর কিরকম ব্যবহার করবেন তার ওপর সেটা নির্ভর করছে।"

"কোন্‌দিক্ থেকে বিপৎপাত আশঙ্কা করব?"

"চারদিক্ থেকেই, তবে বিপদের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিটিকে যদি প্রত্যক্ষ করতে

চান ত ঐ দেখুন।" বলিয়া তিনি অজয়ের দিক্ হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া ডাকিলেন, "বীণা।"

কোনও ঝঙ্কার জাগিল না। করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বীণাও পরম অভিনিবেশ সহকারে তাহার এক পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে কোন্ গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। স্থলতা অজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখছেন?"

স্থলতা তাহাকে যাহা দেখাইতে চাহিলেন অজয় তখন ঠিক তাহাই দেখিতেছিল না, সে বীণাকেই দেখিতেছিল। স্থলতার আহ্বানে বীণা যে মুখ ফিরাইল না ইহাতে সে-পক্ষে তাহার স্থবিধাই হইল। সে দেখিল, প্রগল্‌ভ হাসির দীপ্তিমণ্ডিত কপট গাম্ভীর্য্য-ভরা কমনীয় একখানি মুখ, হীরকের মত উজ্জ্বল চোখ-তুইটির দৃষ্টিতে, দেহভঙ্গিতে, কোথাও কোন আড়ষ্টতা নাই। দেহবর্ণ নবোদ্গত আম্রপল্লবের মত হাল্‌কা লালের আভা জড়ানো স্বচ্ছ-শ্যামল, সেই স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া শিরা উপশিরার রক্তগতির স্বচ্ছন্দ আনাগোনা চোখে পড়ে যেন। দেহ-সৌষ্ঠব, মুখের গড়ন অসাধারণ কিছুই নহে, হয়ত মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়া চলে না কিন্তু তুলির রঙে তাহাকে আঁকা চলে। হঠাৎ দেখিলে এমনও মনে হইতে পারে, সৌন্দর্য্য যেন কতকটা দূর হইতেই তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, রূপের ডালি বিধাতা তাহাকে উজাড় করিয়াই দিতে চাহিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে নিজেই সে লয় নাই। সৌন্দর্য্যকে প্রতিযুগের মানুষ নিজ রুচি অনুযায়ী মাপকাঠির সহযোগে মাপিয়াছে, নিয়ম দিয়া বাঁধিয়াছে, কাব্যে-সঙ্গীতে-শিল্পে তাহাকে প্রীতির সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু এই তরুণীর মধ্যে তাহার আসল সৌন্দর্য্য যেটুকু, সেটুকুকে কোনও পরিচিত মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অজয়ের মনে হইল, ইহা যেন সেইহেতুই অপরিমেয়, ইহা যেন সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত একটি অপার্থিব বস্তু, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছাপাইয়া অতিক্রম করিয়া ইহা যেন কেবলমাত্র একটি অশরীরী

লাবণ্য। এই লাবণ্য কোন্ গোপন উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেই রহস্যই ইহার মায়া।

সুলতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিপজ্জনক কিছু দেখলাম না।"

সুলতা কহিলেন, "সেই ত আসল বিপদ্। পৃথিবীর সেরা বিপদ্‌গুলোর নিয়মই হচ্ছে, তাদের চেহারা দেখে চট্ ক'রে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন, একটু সাবধান হবেন। আজ পর্য্যন্ত এমন ত একজনকেও দেখলাম না, যে বীণার পরিচয় একটুও পেয়েছে অথচ তার ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপে না।"

বীণা যে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে তাহার লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, তদুপরি সে যেখানে বসিয়াছিল ততদূর হইতে সেতারের স্বরালাপ অতিক্রম করিয়া অজয়দের গলার স্বর তাহার শুনিতে পাইবার কথা নয়, তবু অকস্মাৎ দৃঢ় হইয়া ঘুরিয়া বসিয়া দুষ্টামিভরা কণ্ঠ কঠোর করিয়া সে ডাকিল, "সু-ল-তা-দি!"

সুলতা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কি গো, কি?"

বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত আহত অভিযোগের সুরে কহিল, "কি ছেলেমানুষি সুরু করেছ, থামো।"

সুলতা অজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখেছেন ওর রকম? ওর ধারণা বিশ্বসুদ্ধ লোকের ওর কথা ছাড়া আর কথা নেই।"

অজয় হাসিয়া কহিল, "বিশ্বসুদ্ধর কথা জানি না, কিন্তু আমাদের বেলায় ত অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি তিনি ভুল করেননি।"

সুলতা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভুল করবার ও মেয়ে কিনা, অর্থাৎ যেখানে ওর নিজেকে নিয়ে কথা। কেবল আমাদের বেলায় ব'লে নয়, ও জানে, ও যেখানে উপস্থিত থাকে সেখানে প্রায়ই বিশ্বসুদ্ধর ওর কথা ছাড়া আর কথা থাকে না, আর ঠিকই জানে।"

বাহিরে কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি হাস্যময়ী এই মেয়েটির এই নিদারুণ অহঙ্কার অজয়ের অহঙ্কারী মনকে একটি আন্তরিক পরিচয় লইয়া স্পর্শ করিল।

হঠাৎ শুনিল, পিয়ানোর পাশে একদল শ্রোত্রীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিমান ইউরোপীয় শিল্পকলার উপর ফরাসীবিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার বাঁ-কাঁধে একটা বেহালা, হাতের ছড়টাকে তরবারির ধরণে শূন্যে সঞ্চালন করিতে করিতে, ভারতীয় শিল্পকলাকে গতানুগতিকতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এদেশেও যে তদনুরূপ বিপ্লবের কত প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাহার অভিমত বীরদর্পে সে ব্যক্ত করিতেছে। ছড়টা তাহার মাথার উপরকার আলোর শেডটাকে বারম্বার প্রায় ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া, কখন্ আলোটা না-জানি ভাঙিয়া পড়ে ভাবিয়া অজয় আবার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বীণা এবার সত্যকার অভিনিবেশের সঙ্গেই বিমানের বক্তৃতা শুনিতেছিল, কহিল, "বিমানবাবু আর্টিষ্ট্ মানুষ, বেশ আর্টিষ্টিক ধরণের বিপ্লব বাধাবার চেষ্টায় আছেন। তাঁর প্রথম রেক্রুটের দল নির্ব্বাচন দেখলেই সেটা বোঝা যায়। তোরা সব কটাক্ষের বিদ্যুৎ, হাসির ছুরি, অনুরাগের আগুন, এই-সমস্ত দিয়ে বিধিমতে লড়াই করবি, বিমানবাবু পেছনেই থাকবেন, ভয় করবি না।"

বিমান ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল, বীণার নিকট হইতে এধরণের আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত ছিল, কহিল, "আমি কেন, আমরা সবাই না-হয় পেছনেই থাকব। একা আপনি যদি সামনে থাকেন তাহলে আপনার বাক্যবাণই লড়াই জেতবার পক্ষে যথেষ্ট হবে।"

বীণা কহিল, "সে ত সব আপনাকে শাসনে রাখতেই খরচ হয়ে যাবে।"

বিমানকে শাসনে রাখার কাজটা সুভদ্রই আসলে সব-চেয়ে বেশী করিয়া করিত। বিমানকে সে-ই যদিও ক্লাবে আনিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একটা ভয় পোষণ করিয়া চলিত, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই

তর্ক করিয়া বকিয়া তাহাকে সংযত করিয়া রাখিত। বলিল, "আর্টকে নিজের মনের মত ক'রে বাঁচাবার জন্যে দেশব্যাপী একটা প্রলয় বাধিয়ে তুলতে চাও, এটা কি তোমার একটু বেহিসাবী ব্যবস্থা নয়?"

বিমান রুখিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, আর্ট ঠিক ততবড়ই জিনিষ এবং তাহার সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই বেহিসাবী ব্যবস্থা নয়। মেয়েদের অস্তিত্বকে ভুলিয়া গিয়া সহজ বোধ করিবার একটা উপলক্ষ্য মিলিবা-মাত্র ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ বিমানের দিকে, কেহ কেহ বা সুভদ্রের দিকে যোগ দিল, ক্রমে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া গেল, এত অন্ধকার জমা হইল, যে, কোনও কথার আর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অজয় এই অবকাশে সুলতার নিকট হইতে ক্লাবটির নানা পরিচয় সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেখিল, প্রচুর মমতা থাকা সত্ত্বেও ইনি ক্লাবটিকে এখন পর্য্যন্ত সুভদ্রের খেয়াল-প্রসূত একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন। সমাজে ইহাকে লইয়া ইতিমধ্যেই কথা উঠিয়াছে এবং কোনও কোনও অভিভাবক মেয়েদের এখানে আসা বারণ করিয়া দিয়াছেন ইহা জানাইয়া তিনি ইহার দীর্ঘায়ু বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, যে, শিক্ষিত-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন অধিকাংশের ঘটকালী বিবাহে রুচি বর্ত্তমান নাই অথচ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থল ভিন্ন ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পতিপত্নী-নির্ব্বাচনের সুযোগ করিয়া দিতেও অভিভাবকদের বাধিতেছে, তখন অন্ততঃ বিবাহার্থী স্ত্রীপুরুষদের জন্যও এইজাতীয় একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা ভাবিবার প্রয়োজন আছে। ঘটকালীকেও মানিব না অথচ যাহাকে চিরজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের সঙ্গী করিব তাহাকে ভাল করিয়া যাচাইয়া দেখিয়াও লইব না, ইহার ফল সমাজের পক্ষে শুভ হইতেছে না। এরূপ অবস্থা হইতে ঘটকালীও নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

অজয় কহিল, "আমার ধারণা ছিল, আপনাদের সমাজে—"

সুলতা কহিলেন, "ছেলেমেয়েদের মেলবার পথে বাধা নেই, এই ত? পর্দার বাধাটাই কি কেবল বাধা? এই সেদিন আমাদের এক বন্ধু দুঃখ ক'রে বলছিলেন, যে, কোনও ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের আলাপ করিয়ে দেবার কল্পনাই তাঁকে এখন ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাড়ীতে যখনই কাউকে ডাকেন, সমাজের দশজন নির্ব্বিচারে ধ'রে নেয় মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, শেষ অবধি বিয়ে যখন হয় না তখন তা নিয়ে এমন-সমস্ত কথা ওঠে যা সেই মেয়ে বা ছেলে কারও পক্ষেই প্রীতিকর নয়।"

অজয় কহিল, "সমাজে নতুন ধারার প্রবর্ত্তন যাঁরা করবেন তাঁদের উচিত নয় অন্যেরা কি বলছে বা ভাবছে তা নিয়ে বেশী বিচলিত হওয়া।"

সুলতা একটু হাসিলেন, বলিলেন. "সে-অবস্থায় আপনি এখনও পড়েননি তা বুঝতেই পারছি। বিপদ্ কি কেবল দশজনকে নিয়েই? একটি মেয়ের কথা আপনাকে বলতে পারি, কোনও একটি ছেলেকে নানা-কারণে তার একটু ভাল লেগেছিল। তার দোষের মধ্যে তার দিদিকে ব'লে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডেকে সে পরিচয় করবার চেষ্টা করেছিল। বাস্, আর যাবে কোথায়? সেইটুকুকেই তার প্রতি মেয়েটির গভীর পূর্ব্বরাগের অতি নিশ্চিত লক্ষণ ধ'রে নিয়ে ছেলেটি তারপর তার সঙ্গে এমন ব্যবহার সুরু করল যা সেই অবস্থায় যে-কোনও ভদ্র এবং প্রকৃতিস্থ মেয়ের পক্ষেই একেবারে অসহ্য। যে-জিনিষটি হয়ত যথাকালে অনুরাগ পর্য্যন্ত পৌঁছতেও পারত, নিতান্ত বিশ্রী একটা রাগারাগির ধরণের ব্যাপারে সেটা সম্প্রতি শেষ হয়েছে, শুনলাম।"

অজয় কহিল, "কিন্তু সুভদ্র এইসব ভেবেই যদি ক্লাব ক'রে থাকে তবে এটাকে তার খেয়াল আপনি কেন বলছেন?"

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ, সুভদ্রবাবু ত এ-সব কথা কতই ভেবেছেন। এগুলো ওঁর খেয়ালকে একটা ভদ্রগোছের চেহারা দেবার জন্যে আমরা এখন বানিয়ে বানিয়ে ভাবছি। ওঁর ত ধারণা ছেলেমেয়েদের মিশতে পারাটাই

আসল কথা, বিবাহটা গৌণ। উনি বলেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যে লজ্জা না ক'রে পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারে না সেইটেই তাদের আসল লজ্জা, আর তাব কারণটা তাঁর মতে এই যে পরস্পরের সঙ্গে চিন্তায় ও ব্যবহারে সহজ স্বাভাবিকতার সীমা রক্ষা ক'রে চলতে তারা অভ্যস্ত নয়। আর আমাদের সামাজিক অস্বাস্থ্য কেবল নয়, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শারীরিক অস্বাস্থ্যের মূলেও নাকি সেই জিনিষটাই সব-চেয়ে বেশী আছে।"

অজয় কহিল, "শুনতে খুবই ভাল শোনাচ্ছে, কিন্তু সুভদ্র ত তাঁর মতামত ব'লেই খালাস, তার ঝুঁকিটা সামলাতে হচ্ছে বুঝি একলা আপনাকে?"

সুলতা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, না, সে আবার কি কথা? এখানে যাদের দেখছেন, তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যাকে আমাদের বাড়ীতে অত্যন্ত খুশির সঙ্গে আমরা ডাকতে না পারি। সুভদ্রবাবুর ক্লাবের কথা শুনে এরা সবাই কেমন উৎসুক হয়ে উঠল তা ত আপনি দেখেননি? বেশ বোঝা গেল, এ জিনিষের একটা সত্যিকারের অভাবই এদের জীবনে ছিল। ওরা সবাই যখন আগ্রহ ক'রে আসতে চাইল তখন তাদের কি ব'লে আমি 'না' বলতে পারি? আর তা বলবই বা কেন? সুভদ্রবাবুর ক্লাবই এটা যদি কেবল হ'ত তাহলে ওরা অনেকেই হয়ত আসত না, সেইসঙ্গে এটা আমার বাড়ী ব'লেই আসছে। এ ত আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা।"

ফরাসী-বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করিয়া সুভদ্রদের যে-তর্ক সুরু হইয়াছিল তাহা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে আর-একটু হইলে সেইখানেই ছোটখাট একটা বিপ্লব বাধিয়া যায়। অজয় কহিল, "সুভদ্রের আসল উদ্দেশ্য যাই হোক, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মিলনের চেয়ে পুরুষে-পুরুষে অসামাজিক বিরোধটাই অন্ততঃ আজকের প্রোগ্রামে বড় দেখছি।"

সুলতা একটু হাসিলেন, কহিলেন, "এ বিষয়ে আপনার বন্ধুর অভিমতটা বুঝি আপনি জানেন না? তিনি বলেন, 'তোমাদের জাতের কেউ শুনছে না

জানলে বৌদি, তর্ক ক'রে আমাদের সুখই হয় না।' ওঁর বিবেচনায় এ দেশে ছেলেদের কোনও শক্তি যে যথেষ্ট স্ফূর্তি পায় না সে কেবল আমরা মেয়েরা তাদের চারপাশ ঘিরে ব'সে তাদের বাহবা দিতে উপস্থিত থাকি না ব'লে।"

অজয় কহিল, "সেটা হয়ত সত্যি, কিন্তু সুভদ্রের তর্কশক্তি স্ফূর্তি না পেলে পৃথিবীর খুব বেশী ক্ষতি হ'ত ব'লে কি তার বিশ্বাস?"

সুলতা কহিলেন, "ওঁর মতে মানুষের মধ্যে তার শক্তির রূপ সব মিলিয়ে একটাই। তার কাছ থেকে সত্যিকারের কাজ আদায় করতে হ'লে সেইসঙ্গে তার খুশি মত অনেকখানি বাজে কাজ করবার সুবিধা তাকে দিতে হয়।"

অজয় কহিল, "সুভদ্র তাহলে বলতে চান, মানুষের মধ্যে তার খুশিটাই একটা খুব বড় জিনিষ?"

একটু থামিয়া একেবারে অজয়ের চোখে চোখে চাহিয়া সুলতা বলিলেন, "আপনি কি তা মনে করেন না?"

অজয় মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। খুশি বলিয়া কোনও জিনিষকে কোথায়ও আমল না দিয়াই ত জীবনের এতখানি পথ সে চলিয়া আসিয়াছে, কত সুখ হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজেকে নিজে সে বঞ্চিত করিয়াছে। এ কি নিদারুণ কঠোর অহঙ্কার স্বভাবে দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, নিজেকে ভালবাসে বলিয়াই নিজেকে উপবাসী রাখিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার উপায় থাকে না। পাছে কোথাও তাহার পাওয়ার দাবীকে কেহ অগ্রাহ্য করে, চাহিতে গিয়া কোথাও পাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়, এই ভয়ে নিজের ন্যায্য পাওনাকেও চিরকাল সে ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিয়াছে। আজ অভ্যাস তাহাকে এমনই করিয়া গড়িয়াছে, যে, যে-আনন্দ আপনি আসিয়া তাহার দ্বারে করাঘাত করে তাহাকেও আহ্বান করিয়া ভিতরে লইতে সে কুণ্ঠিত হয়। সে ত্যাগী, কোনও কিছুর জন্য তাহার অপেক্ষা নাই, নিজের এই বিশিষ্টতাটিকে বহু অশ্রুজলের নিষেক দিয়া গোপনে সে লালন করে।

আজ চতুর্দ্দিকে আনন্দ যখন মনোহরণ রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে তখন সামান্য একটি কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার বহুকালের এই অভ্যস্ত বৈরাগ্যে অতি গভীর সংশয়ের একটা দোলা লাগিল। এই ত একটু আগে নিজেরই মধ্যে নিজের আশ্রয় সে হারাইতে বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহার আশৈশবের পরিচিত সুন্দর যে-আমিটি পৃথিবীর সঙ্গে নানা মধুর সম্পর্কের বন্ধনে তাহার হৃদয়-মনকে বাঁধিয়াছিল, বারম্বার পীড়িত হইয়া, বঞ্চিত হইয়া, উপবাসে ক্লিষ্ট হইয়াই কি সে আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছিল? যে-শূন্যতা, যে-অন্ধকারের সঙ্গে মহাভয়ের মধ্য দিয়া একটু আগে তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, সেইদিকে মুখ ফিরাইবার সাহস কি তাহার আছে? আর সেদিক্ হইতে কি সে পাইতে আশা করে? আজ এই যে সৌন্দর্য্য-লোকের ডাক আসিতেছে, শোভায়-সঙ্গীতে-সৌজন্যে জীবনের বিচিত্র মাধুর্য্য দিগন্তে জ্যোতির্ম্ময় মায়ালোক রচনা করিতেছে, সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়াই কি সে চরিতার্থতার তীরে উত্তীর্ণ হইবে না? ঐখানে যতখানি পাওয়া সম্ভব এজীবনে তাহার বেশী কি আর সে পাইতে আশা করিতে পারে?

সুলতা কহিলেন, "অজয়বাবু, চলুন, পরিচয় ক'রে দিই।"

পরিচয় কাহার সঙ্গে তাহা বোঝা কিছুই কঠিন ছিল না, অজয়ের বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে সে কোনওপ্রকারে এড়াইত, কিন্তু আজ কোনও-কিছুকে বাহির হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইবে না ঠিক করিয়াছিল, তাহা ছাড়া সুলতার সৌজন্যে সত্যই সে মুগ্ধ হইয়াছিল, মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে 'না' বলাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জরীর পাড় বসানো শাদা গরদের জামার উপর জরীপাড় শাদা মান্দ্রাজী শাড়ী সেই-দেশীয় ধরণে পরিয়া বেতের চেয়ারে দেহ এলাইয়া বীণা বসিয়াছিল, অজয় আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার দেহের লাবণ্য-চুয়ানো দুইটি লোহিতাভ পাথরের দুল দুটি কানে অতি মৃদু দুলিতেছিল,

সে যে কি পাথর অজয় তাহা জানে না। গলায় সরু সোনার সুতায় সেই পাথরেরই একটি দুলুনি, হাতে সেই পাথর বসানো দুগাছি মাত্র সোনার কঙ্কণ।

বীণার সম্বন্ধে ভয়ের ছোঁয়াচ অজয়কেও একটু লাগিয়াছিল, সুলতার পরিচয় দেওয়ার উত্তরে সে কিছুই বলিল না, শুধু নীরবে একটি নমস্কার করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বীণা দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া নত হইয়া তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল। সুলতা একটা কোন কাজের অজুহাতে অতি-সন্তর্পণে সেখানে হইতে সরিয়া গেলেন। বীণা কহিল, "সুভদ্রবাবু বলছিলেন, আপনি একজন মেয়ে-বিদ্বেষী, আমাদের ক্লাবে আসতে কিছুতেই রাজি নন্। সেই থেকে আপনাকে ধ'রে নিয়ে আসবার জন্যে রোজ তাঁকে জ্বালাচ্ছি।"

অজয়ের মাথার মধ্যেটায় সব কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল, কোনওরকমে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "ও তাহলে দুদিক্ দিয়েই আমার প্রতি অবিচার করেছে। প্রথমতঃ আমার না-আসার কারণটা ঠিক ক'রে আপনাকে বলেনি, তারপর আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবার পরোয়ানা যে আপনার কাছ থেকে পেয়েছে তা একবারও আমাকে বলেনি।"

বীণা কহিল, "বলেননি আমারই মান বাঁচাতে। পরোয়ানা পেলেই যে আপনি এসে হাজির হতেন আপনাকে ত একটুও সে রকম মনে হচ্ছে না।"

অজয় কহিল, "আমাকে দেখবা মাত্রই আমার স্বভাবের অনেকখানি পরিচয় আপনি পেয়েছেন দেখছি।"

গলার সুর একটুখানি নামাইয়া বিদ্যুদুজ্জ্বল চঞ্চল চোখ-দুইটিতে হাসি ভরিয়া বীণা বলিল, "আমারও অনেকখানি পরিচয় আমাকে দেখবা-মাত্রই কি আপনি আজ পাননি বলতে চান?"

বীণার গলার সুরে, কথা বলার ভঙ্গিতে কি ছিল, অজয়ের ভয়ের ভাবটা অনেকখানিই হঠাৎ কাটিয়া গেল, কহিল, "আজ না পেয়ে থাকি, ক্রমে পাব আশা করি।"

বীণা কহিল, "আশা করবার দরকার হবে না, আমার পরিচয় এম্নিতেই যথেষ্ট পাবেন।"

বীণা যেখানে বসিয়াছিল সেখানে আর বসিবার আসন খালি ছিল না। একপাল মেয়ের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে অজয়কে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আর বেশীক্ষণ গল্প করা চলে না দেখিয়া সেও উঠিয়া পড়িল। কহিল, "ভিতরে সত্যিই খুব গরম, নয়? চলুন বাইরে গিয়ে একটু বেড়ানো যাক্।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অজয় তাহার অনুসরণ করিল। ক্লাব সুদ্ধ মানুষ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে একথা একবার সে ভাবিল না।

বাহিরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে দুইজনে পাশাপাশি বেড়াইতে বেড়াইতে কেহ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। নীরবতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া অজয় অবশেষে ক্লাবেরই প্রসঙ্গ তুলিল। আজ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, কোনও-না-কোন রকমে এখানকার সব-কয়টি মানুষের সম্পর্কে এই মেয়েটি এই ক্লাবের একেবারে মর্ম্মস্থানটি অধিকার করিয়া আছে। এখন দেখিল, ক্লাবটিকে ক্লাব বলিয়া বীণা চিন্তা করে নাই, সে কেবল মানুষ-ক'জনকে জানে এবং অত্যন্ত নিবিড় করিয়া এই মানুষ-ক'টিকেই সে অনুভব করিয়াছে। ক্লাবের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতি কি, অজয় তাহা জানিতে চাওয়াতে সে কহিল, "জানি না। ওরা সব একদিন ব'সে কি-সমস্ত ঠিক করেছিল, আইন-কানুনগুলোর কার্বন কপিও একটা আমাকে দিয়েছিল। প'ড়ে আমি এত বেশী হেসেছিলাম যে একমাত্র তাতেই ভীষণ দ'মে গিয়ে আর কখনও অন্ততঃ আমার কাছে সে-বিষয়ে কেউ কিছু বলেনি। আমি ওদের বলেছি, আইন-কানুন চুলোয় যাক, সম্প্রতি ক্লাবটিকে টিঁকিয়ে রাখাটাই সকলের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তারপর আমরা এখানে কি করব না-করব, নানা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে নিজেদের রুচি এবং প্রয়োজন অনুসারে তা ঠিক ক'রে নেব। আজকের নিয়ম কাল চলতে হবে, আজকের যা

উদ্দেশ্য তা কালও বজায় থাকতে হবে, এর কিছু মানে হয় না।···আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, মানুষ নিজের ওপর যখন আস্থা হারায়, তখনই নিজেকে বাঁধবার জন্যে নিয়ম গড়তে বসে?"

বীণার শেষ কথাটা হঠাৎ অজয়কে কোথায় যেন আঘাত করিল।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য গলায় খানিকটা জোর দিয়া সে বলিল, "কিন্তু নিজের গড়া নিয়মকে মানতে পারব নিজের উপর এই গভীরতর আস্থা না থাকলে মানুষ নিয়ম বাঁধতে পারে না, এ কথাটাও ভাববেন।"

চোখের কোণে চকিতে অজয়কে একটু দেখিয়া লইয়া বীণা কহিল, "কথাটাকে সেদিক্ দিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। আচ্ছা, ভেবে দেখব।" তারপর গম্ভীর হইয়া গেল। অজয়ের সেই মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, তাহার কথাটাকে সে ফিরাইয়া লয়। বলে, 'না, তোমার ভেবে দে'খে কাজ নেই। তোমার অস্তিত্বের মধ্যে তুমি যে সুন্দর অনিয়মের সহজ নিয়মটিকে বহন করছ, তার নদীস্রোতের মত অবাধগতিকে শৃঙ্খলিত কর যদি তবে পৃথিবীর সমস্ত অন্তরাত্মা হঠাৎ একদিনে শুকিয়ে উঠবে।' এজীবনে প্রায় জীবনাতীত কোন্ দুর্ল্লভ ব্রতফল আশা করিয়া নিজেকে নিজের গড়া সহস্র নিয়ম-সংযমের নাগপাশে সে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়াছিল, সেইখান হইতে তাহার ক্লিষ্ট অন্তর যেন আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে চাহিল, 'নিয়ে চল, তুমি আমাকে নিয়ে চল। ঐ যেখানে তোমার অন্তরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার অপরিসীম মুক্তি, সেইখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেও তুমি মুক্তি দাও।'

এবারে নীরবতা বীণার অসহ্য হইল, কহিল, "চলুন এবার ভেতরে গিয়ে বসা যাক। নয়ত সুভদ্রবাবু এখুনি আবার পেয়াদা পাঠাবেন আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে।"

অজয়রা ফিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র সিঁড়ির দরজার বাহিরে

হঠাৎ অনেকগুলি শিশুকণ্ঠের কোলাহল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। "মা...পিসীমা··· এদিকে এসো না ···আমাকে নিয়ে যাও...আমাদের খেলা করা হয়ে গিয়েছে ·· রুণু আমার শেলেট দিচ্ছে না···সোনা আমার কিলিপ কেড়ে নিয়েছে···ছুতকু আমায় মেলেচে।"

দু-তিনজন কোনও বাধা না মানিয়া ভেজানো দরজাটা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একটি সাড়ে-তিন চার বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বীণার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কান্নার সুরে কহিল ,"মা, সোনা আমার কিলিপ কেড়ে নিয়েছে।"

সোনা সুলতার মেয়ে, তাহারও বয়স চার সাড়ে-চারের বেশী নয়। নিজের মায়ের আঁচলের আশ্রয় হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওটা ত আমার · কিলিপ, লাল কিলিপ, আমার মা আমাকে কিনে এনে দিয়েছে।"

সুলতা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহার ঠিক এমনই দেখিতে লাল ক্লিপ একটা আছে বটে, তবে সেটা উপরের শোবার ঘরে তাঁহার আয়নার দেরাজে বন্ধ করা আছে, কিন্তু সোনা কিছুতেই বুঝিল না। অগত্যা তাহাকে কাঁদাইয়া তাহার হাত হইাত ক্লিপটা কাড়িয়া লইয়া সুলতা সেটাকে যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিলেন, তারপর রোরুদ্যমানা কন্যাকে লইয়া আয়ার সন্ধানে উপরে প্রস্থান করিলেন। ক্লিপ ফিরিয়া পাইয়া ক্লিপের অধিকারিণীর কান্না থামিল বটে, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ফুটিল না। তাহাকে ভুলাইবার জন্য বীণা তাহার সঙ্গে অজয়ের ভাব করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। কহিল, "এটি আমার মেয়ে মন্দিরা, কেমন সুন্দর মেয়ে দেখেছেন? নীল পোষাকটাতে ওকে ভারি মানিয়েছে না?"

বীণা বিবাহিতা, বীণা জননী, ইহা জানিতে পারিয়া অকারণেই অজয়ের মনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত রকমের ঘা লাগিল। সে যে দুঃখিত হইল তাহা নহে, তাহার দুঃখিত হইবার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে

কোন্ একটা সুরসঙ্গতিতে হঠাৎ যেন তাল কাটিয়া গেল। হাসিয়া মন্দিরাকে কিছু-একটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহার বাক্স্ফূর্তি হইল না। মন্দিরা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না, আমি মন্দিরা না, আমার নাম অপর্ণা।"

অজয় এবার হাসিয়া বলিল "মায়ের দেওয়া নামটা ওর পছন্দ নয় দেখছি।"

বীণা বলিল, "আহা, অন্য নামটা উনি আকাশ থেকে পেয়েছেন কি না! অপর্ণা ওর ভাল নাম, মন্দিরা ব'লে ডাকি।"

অজয় মন্দিরাকে কাছে ডাকিতেই সে একেবারে তাহার কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পাঞ্জাবির গলার বোতামটা অজয় খুলিয়া রাখিত, দুপায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া মন্দিরা সেটা লাগাইয়া দিল, কহিল, "বোতাম খুলে রেখেছ কেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!"

হাসিয়া তাহার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া অজয় বলিল, "তুমি আমার মা, কেমন?"

মায়ের কোলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া বড় বড় গোলগোল চোখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মন্দিরা অজয়কে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে অজয়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, "তুমি আমার বাবা, কেমন?"

আশেপাশে একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠিয়া পলকেই থামিয়া গেল। মন্দিরার গালে মাঝারি-গোছের একটি চপেটাঘাত করিয়া শশব্যস্তে বীণা উঠিয়া পড়িল, কহিল, "আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে। একে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে দু-দণ্ড যে বসব তার উপায় নেই, দুধ-খাবার সময় হলেই যতরাজ্যের দুষ্টুমি ওর মাথায় আসে। আর কখনও আমার সঙ্গে আসতে চাইবি ত দেখবি।"

মন্দিরা কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, সুভদ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিল। এই দুইজনের বহুকালের বন্ধুত্ব, কানে কানে তাহাদের কি কথা হইতে লাগিল কেহ জানিল না। সুলতা তাঁহার কন্যারত্নটিকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটু আগে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বীণার কানে

কানে কহিলেন, "ওর বিশেষ দোষ নেই, তা যাই বল। সুরেশ সত্যিই খুব বেশী অজয়বাবুর মত দেখতে ছিল। অম্‌নি রোগা ছিপছিপে চেহারা, একমাথা চুল, তবে তার রঙ আর-একটু ফর্‌সা ছিল বটে।"

বীণা চকিতে একবার অজয়ের দিকে চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরেই কহিল, "সুলতাদির যে কথা! ওঁকে কি ওর একটুও মনে আছে নাকি?"

সুলতা কহিলেন, "ছবি-টবি ত সারাক্ষণই দেখছে। অবিশ্যি তোমারই ত মেয়ে, পাকামিও আছে প্রচুর।"

অজয়কে নমস্কার করিয়া "চললাম" বলিয়া বীণা দরজার দিকে চলিল। ক্লাবসুদ্ধ ছেলেরা সকলেই প্রায় তাহাকে বিদায় দিতে উঠিয়া আসিল। সুভদ্রের কোলে চড়িয়া সিঁড়ি নামিতে নামিতে মন্দিরা অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আসবে না আমাদের বাড়ী? চল-না? গাড়ী রয়েছে যে! এস-না··· এস···এস।"

অজয় রেলিঙে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, তারপর মন্দিরা কিছুতেই নামিতে চাহিতেছে না এবং সুভদ্রকেও নামিতে দিতে নারাজ দেখিয়া নিরুপায় হইয়া কহিল, "আচ্ছা আজ থাক, আর একদিন তোমাদের বাড়ী যাব, তাহলেই হবে ত?"

মন্দিরা রাজি হইয়া গেল। বীণা কলকণ্ঠের হাসিতে সিঁড়ি মুখরিত করিয়া বলিল, "ও যত দুষ্টুই হোক, বেশ কাজের মেয়ে। ওরই কল্যাণে আপনার কাছ থেকে এতবড় একটা কথা আদায় হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞাটা মনে থাকবে ত?

অজয় কহিল "থাকবে।" তারপর সেও হাসিতে লাগিল।

বিমান তাহার ঠিক পশ্চাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "আমি ওকে ধ'রে নিয়ে যাব-এখন।"

বীণা সিঁড়ি নামিতে নামিতে কহিল, "কেন, অজয়বাবুর কি

কলকাতার পথঘাট জানা নেই, ঠিকানা নিয়ে বাড়ী চিনে যেতে পারবেন না?"

বিমান একথার উত্তরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "যেতে খুবই পারবেন, কিন্তু ফিরতে ঠিক ততটা সহজে পারবেন কিনা ভেবে কথাটা বলেছিলাম।" বীণা তাহার সেকথা ইচ্ছা করিয়াই শুনিল না দেখিয়া সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়াইয়া হাতের ছড়িটাকে সে ঘুরাইতে লাগিল।

৭

বালিগঞ্জের এক নিভৃত প্রান্তে তিন বিঘা পরিমিত বিস্তৃত মাঠের একধারে ঘন-তরুসন্নিবেশের মধ্যে বীণার পিতা হৃষীকেশ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ তখন পাটের ব্যবসা করিতেন, সেই উপলক্ষ্যে বহু টাকা তাঁহার হাতে আসিত, আবার খরচ হইয়া যাইত। মিতব্যয়িতা সে-বয়সে তাঁহার অভ্যস্ত ছিল না। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, ব্যবসায়ী মানুষের টাকা আট্‌কা পড়িয়া থাকিলে চলে না। টাকার বীজ বুনিয়া যাহাদের ফসল উৎপাদন করিতে হয়, দু-হাতে করিয়া টাকা ছাড়াইবার সাহস তাহাদের থাকা চাই। দুঃখ ছিল এই, যত টাকা ছড়ানো হইত তাহার অতি অল্প অংশেই ফসল ফলিত, কেবল সেই ফসল তাঁহার ভাগ্যগুণে পর্য্যাপ্ত করিয়া ফলিত বলিয়া বহুকাল তাঁহার যুক্তির মধ্যেকার ভুলের ফাঁকটা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। চোখে পড়িয়াছিল সুরবালার। বহু-আয়াসে, প্রতিপদে স্বামীর বহুবিরক্তির বিনিময়ে, সেই অমিতাচারের সংসারেও লক্ষাধিক টাকা তিনি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামীর ব্যবসায়ের ভাঙন-ধরার মুখে, সে টাকাকে আর-কোনও উপায়ে রক্ষা করা যাইবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া, সঞ্চয়ের শেষ পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত এই

বাড়ীনির্ম্মাণে নিয়োগ করিতে হৃষীকেশকে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যে-বাড়ীর প্রতিটি ইঁটের গাঁথুনিতে চূণ সুরকির মশলার সঙ্গে তাঁহার অনেক-দিনের অনেক অশ্রুজল অলক্ষ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, নিজে সেই বাড়ীতে একটি দিনও বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যখন রঙের কাজ, আলোর মিস্ত্রীর কাজ শেষ হইয়া বাড়ী বাসযোগ্য হইতে আর দুই-তিন সপ্তাহ মাত্র বাকী তখন অকস্মাৎ এক মেঘভারাচ্ছন্ন অন্ধকার শ্রাবণ-রাত্রির শেষে বীণার ছোট ভাই রাহু পৃথিবীতে আসার সূত্রে এই পৃথিবীর কাছ হইতে তিনি নিজে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া গেলেন।

ছোটখাট প্রাসাদের মত বাড়ীটার গায়ে ছোট একটি একতলা বাংলা, এক-ইঁটের দেয়াল, টালির ছাত। এইটিতে হৃষীকেশ নিজে বাস করেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যে-বাড়ীর প্রতিটি দরজা-জানালা হইতে সুরু করিয়া সিঁড়ির প্রস্থ, রেলিঙের লোহার কাজের পরিকল্পনা, ভিতর এবং বাহিরের কারুকার্য্য পর্য্যন্ত নিজ হাতে মাপজোখ করিয়া আঁকিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিয়া এবং স্থপতিদের দেখাইয়া দিয়া, তাঁহার নিভৃত মনের বহু আশা-সাধ-প্রীতির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তিলে তিলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-বাড়ীতে তাঁহাকেই বাদ দিয়া একাকী নিজে প্রবেশ করিতে হৃষীকেশের মন উঠে নাই। চারিপাশে অনেকখানি করিয়া বারান্দা, ভিতরে ছোট ছোট তিনটি ঘর, অপরিহার্য্য আস্‌বাব-পত্র, একপাশে একটি স্নানের ঘর। নিজের পড়িবার ঘরেই পৃথক্ একটি ছোট টেবিলে একাকী তিনি আহার করেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এই স্বাধিকারের সীমা কদাচ লঙ্ঘন করেন না।

গাড়ীবারান্দার নীচে আর্ম্স্ট্রং সেডান্ হইতে নামিয়া মন্দিরার হাত ধরিয়া বীণা তাঁহার পড়িবার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

হৃষীকেশ একমনে সেদিনকার বিলাতী ডাকের প্রেততত্ত্ববিষয়ক একটি কাগজ পড়িতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্দিরা ছুটিয়া গিয়া "দাদুমণি আমরা এসেচি" বলিয়া

একেবারে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটু হাসিয়া অতিসন্তর্পণে চোখ হইতে চশমাটা খুলিতে খুলিতে হৃষীকেশ কহিলেন, "তোমাদের ক্লাবের মিটিং হয়ে গেল মা?"

বীণা কহিল, "শেষ হয়নি এখনও। মেয়েটাকে নিয়ে কি পারবার জো আছে, পালিয়ে আসতে হ'ল।"

হৃষীকেশ হাসিয়া সস্নেহে মন্দিরার পিঠে হাত বুলাইলেন। তাঁহার মাতৃহীনা কন্যা, পিতৃহীনা দৌহিত্রী!

পিতাপুত্রীতে আর-কোনও কথা হইল না। কাহারও সঙ্গেই একটি-দুইটির বেশী কথা বলা হৃষীকেশের স্বভাব নহে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিতার টেবিলে-পড়া বইকাগজপত্র অন্যমনে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বীণা নিঃশব্দে মন্দিরাকে লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, হৃষীকেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানা তোমার পিসীমাকে দিও, কেউ এদিকে ছিল না ব'লে এতক্ষণ পাঠাতে পারিনি।" হৃষীকেশ প্রয়োজন হইলেও দূর হইতে কাহাকেও ডাকিবেন না জানিয়া চাকরেরা পারতপক্ষে তাঁহার দৃষ্টিপথের কাছাকাছি কোথাও থাকিত না। বীণা চিঠিটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার আগেই তিনি আবার কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

দুতলাটার বেশীর ভাগ এতকাল খালি পড়িয়া ছিল। একটা ঘরে বীণার ভাই রাহু মাষ্টারের কাছে পড়া করিত, আর একটাতে ছিল মন্দিরার খেলার ঘরসংসার, বাকী ঘরগুলি বেশীর ভাগ সময়ই তালাবন্ধ থাকিত, অতিথি-অভ্যাগত কেহ আসিলে সেগুলির দরজা খোলা হইত, ধূলিঝুলে ঝাঁট পড়িত। হেমবালা আসার পর দুতলার সমস্তটা জুড়িয়া তাঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু এখন পড়াশোনার সময় ছাড়া দুতলাতেই তাঁহার কাছে দিনের অধিকাংশ সময় থাকে, তাঁহারই সঙ্গে শোয়। মন্দিরা এতকাল তেতলায় মায়ের ঘরের পাশে আয়ার

সঙ্গে শুইত, দুইদিন হইল ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া সেও দিদিমার সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে। ফলে রাহু এবং মন্দিরার প্রায় সমস্ত ভারই হেমবালা লইয়াছেন। তাঁহার মনটার এখন এই ধরণের আশ্রয়ের প্রয়োজনও ছিল কম নয়।

ভাইয়েব নিকট হইতে চাহিয়া-আনা ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক কি একখানি বই হাতে করিয়া হেমবালা তাহাতে মনঃসংযোগের বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। বীণা ঘবে প্রবেশ করিতেই দেয়ালে ঝুলান ঘড়িটার দিকে আডচোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার হাতে চিঠিটি এবং মন্দিরাকে অর্পণ করিয়া বীণা কহিল, "এই নাও তোমার চিঠি, আর এই নাও মেয়ে। আর কখনও যদি আমি ওকে সঙ্গে ক'বে কোথাও নিয়ে যাই ত কি বলেছি।"

হেমবালা হাত বাড়াইয়া চিঠিটি লইলেন, তারপর চিঠিসুদ্ধ হাত সেইভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়াই নতমস্তকে বইযের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বীণা কহিল, "তুমি এখনও খাওনি পিসীমা? ইলু যেন কি! সব ক'রে রেখে গেলাম, একটু হুঁস ক'রে তোমার খাবারটা এনে দেবে তাও পারে না?"

পাতাব ভাঁজের মধ্যে চিঠিটিকে রাখিয়া বই বন্ধ করিয়া হেমবালা বলিলেন, "ওর দোষ নেই, আমারই দেরি হয়ে গেল সব জিনিষপত্র গোছগাছ করতে। যা হযে ছিল সব! এসে অবধি ত ঐ করছি। রাত অবিশ্যি বেশ অনেকটাই হযেছে, তা তোমরাও ত না খেয়েই আছ সব? ঐ কচি বাচ্চাটা এত রাত অবধি শুকিয়ে আছে, ওকে ফেলে আমি নিজে খেয়ে নিলে সেটা দেখতে খুব বেশী ভাল হ'ত কি।"

হেমবালাব কথার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন তিরস্কারটুকুকে বীণা গায়ে মাখিল না। তাঁহাব পাশেই একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, কহিল, "হ্যাঁ পিসীমা, তোমাদের দেশে আমায় একবাব নিয়ে চল না। আমার একবার খুব পাড়াগাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কখনও যাইনি জন্মে অবধি। একবার কেবল বর্দ্ধমানে গিয়ে দিনকতক ছিলাম, তা সে ত শহর।"

হেমবালা গম্ভীর মুখেই কহিলেন, "তা বেশ ত, এবারে পাড়াগেঁয়ে বর দে'খে তোর আর-একটা বিয়ে দেব, তাহলেই হবে।"

দুটি হাতকে জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বীণা কহিল, "রক্ষা কর বাবা, ঢের হয়েছে, আর না।"

মন্দিরা দিদিমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আবদারের সুরে কহিল, "আমাকেও পাড়াগেঁয়ে বর দে'খে বিয়ে দিও দিদু।"

হেমবালার মুখে তবু হাসি ফুটিল না, কহিলেন, "তোকে কি করবে? তোকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে।"

মন্দিরা বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে একহাতে জড়াইয়া আরও কাছে টানিয়া তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টিতে বীণাকে চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া হেমবালা কহিলেন, "কেন বীণা, বাধাটা কি শুনি?"

বীণা খোলা জানালায় বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "বেশ ত সুখে আছি।" তারপর গম্ভীর হইয়া গেল। একটু পরে কহিল, "ইলু কি করছে দেখি একটু," বলিয়া ঘোমটার কাঁটা, চুলের কাঁটা খুলিতে খুলিতে উঠিয়া পড়িল।

তেতলায় ঐন্দ্রিলার পড়িবার ঘরে ঐন্দ্রিলা এবং বীণার ছোটভাই রাহু বসিয়া ছিল। রাহুর বয়স দশ-এগারোর বেশী নহে, তদুপরি সে আজন্ম রুগ্ন, দরজা হইতে তাহার শরীরের প্রায় সমস্তটাই ঐন্দ্রিলার আড়ালে পড়িয়া গিয়াছিল। "কি করছিস রে ইলু," বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া রাহুকে দেখিতে পাইয়া বীণা বলিল, "তোর যে আজ ভারি মনোযোগ দেখছি রে রাহু?"

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মনোযোগ ত কত! বই ছুঁড়ে ফে'লে এসে ছবি আঁকতে বসেছে।"

বীণা ঝাঁজিয়া কহিল, "এই বুঝি তোর এবার ফার্ষ্ট হবার নমুনা? পরীক্ষার আর ক'দিন বাকী রে তোর?"

রাহু ছবির পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আর ত দু-বৎসর পর আমি জিওমেট্রি করব, তখন ঢের ছবি আঁকতে হবে।"

বীণা কহিল, "তারও ক'বছর পরে ত ঘাস কাটবি, এখন থেকে নেংটি প'রে তাহলে মাঠে নেমে পড়্ না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "রাহু সর্দ্দার, যাও তোমার ঢের ছবি আঁকা হয়েছে, এখ্নরে খেয়েদেয়ে ঘুম দাও গে।"

রাহু বলিল, "বা রে, বাঘের যে ল্যাজ বাকী রইল!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এ বাঘটা ল্যাজ কেটে সভ্য হয়েছে।"

রাহু আবদার করিয়া বলিল, "না, ল্যাজ দিয়ে দাও।"

বীণা কহিল, "তোরটাই না-হয় কেটে ওকে দিয়ে দে না।"

রাহু বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'লো না।"

বীণা বলিল, "না বলতে হ'লে ত বাঁচি রে! তুই যা দেখি, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়্, দেখিস তোর সঙ্গে কেউ কথা বলতে যাবে না।"

রাহু রাগ করিয়া ছবির খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলে তাহার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসিয়া চুলের কাঁটা, ফিতা, ব্রোচ, কানের দুল, প্রভৃতি খুলিয়া খুলিয়া বীণা তাহার কোলের উপর রাখিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা কহিল, "কি হ'ল ক্লাবে?"

"হবে আবার কি ছাই, যা হয়।"

"সবাই গোল হয়ে ব'সে কেবল গল্প করলে?"

"আর কি করব, নাচব?"

"তাহলেও ত একটা কাজ হয়।"

"তুই গিয়ে একদিন নেচে দিয়ে আসিস্। খুব ত তুই কাজের মেয়ে, পিসীমাকে চাটি খেতে সুদ্ধ দিতে পারিস্ নি। যাবার সময় এত ক'রে ব'লে গেলাম।"

ঐন্দ্রিলা বসিয়া বসিয়াই বলিল, "এইরে, একেবারে ভুলে গেছি। রাহুসর্দ্দার একবার এসে জুটলে কিছু কি আর মনে থাকতে দেয়? আমি না-হয় এক্ষুণি যাচ্ছি।"

বীণা বলিল, "থাক্, তোকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি কাপড়চোপড় ছেড়ে।"

ঐন্দ্রিলা লুকাইয়া নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিল। কলিকাতায় ফিরিয়া অবধি পারতপক্ষে মায়ের কাছে সে ঘেঁষে না। হেমবালাও তাহাকে বড়-একটা কাছে ডাকেন না। ইহাতে সে মনে মনে খুশীই হয়। হেমবালা কলিকাতায় আসার সূত্রে তাহার জীবনে এবার যাহা বহন করিয়া আনিয়াছেন বহু চেষ্টা করিয়াও সে মহাপরিবর্ত্তনকে নিজের মনের মধ্যে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই, মাকে দূরে দূরে রাখিয়া সেই সংশয়াকুল অবস্থাটার বিরুদ্ধে নীরবে সে বিদ্রোহ জানায়। ঐটুকু বিদ্রোহই তাহার স্বভাবের পক্ষে ছিল প্রচুর, কিন্তু সেটুকুরও প্রয়োজন হইত না, পিতা অপরাধ করিয়াছেন ইহা যদি নিশ্চয় করিয়া সে বুঝিতে পারিত। মায়েরই নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া তাহার স্বভাবের কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা তাহার সমস্ত সংশয়-বেদনাকে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে আড়াল করিয়া দাঁড়াইত। হেমবালারই মত নিজের বিবেকবুদ্ধি দিয়া যাচাই করিয়া চিরকাল সে পৃথিবীর বিচার করিত, যেখানে শাস্তি পাওনা সেখানে শাস্তিবিধান করিতে কোনও দিনই সে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তাহার স্বভাবে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের স্বভাবের উপকরণও বড় কম ছিল না। পিতার নিকট হইতে একটি জিনিষ সে অত্যন্ত বেশী করিয়া পাইয়াছিল। তাহা সর্ব্বত্র সমস্ত অবস্থায় অত্যন্ত সরাসরি বিচারযুক্তিহীন একধরণের সত্যানুরক্তি। সত্য যাহা তাহা যে প্রকাশ পাইল না, নীরবতার আড়াল তাহাকে প্রবঞ্চনার মত হইয়া ঘিরিয়া রহিল, এজন্য কাহাকে সে দোষী করিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু তাহার সমস্ত মন তিক্ত হইয়া রহিল।

বীণা কাপড় ছাড়িতে শুইবার ঘরে ঢুকিলে ঐন্দ্রিলাও তাহার অনুসরণ করিল। শাড়ী জামা পাট করিয়া আলমারীতে উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে বীণা বলিল, "আজ একজন নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।"

তাহার বিছানার একপ্রান্তে আধশোয়া হইয়া বসিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "কে?"

"অজয় রায়।"

"সে আবার কে?"

"ঐ যে কাগজে লেখেন, গানও খুব ভাল করেন শুনেছি।"

"ছাপার অক্ষরে নামটা দেখেছি মনে হচ্ছে বটে, লেখা যদিও পড়িনি একটাও। গান যে শুনিনি তা জোর ক'রেই বলতে পারি।"

"নিশ্চয় পড়েছিস্, তোর মনে থাকে না। ভারতবর্ষে বাঙালীরাই চিরকাল সবচেয়ে লড়িয়ে জাত, এসম্বন্ধে এঁর একটা লেখা প'ড়ে আমরা খুব হেসেছিলাম, মনে নেই?"

"ও, হ্যাঁ, মনে আছে বটে। খুব কি বীরপুরুষের মত দেখতে?"

"ঠিক উল্টো, তালপাতার সেপাই, তার উপর আবার ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না।"

"তা ওরকম হয়।"

"তুই ত কতই জানিস। কটা মানুষকে দেখেছিস? একদিন আয় না।"

"কি হবে?"

"অজয়বাবুকে দেখবি।

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিল, কহিল, "তোমার বর্ণনা শুনে ত মনে হচ্ছে না খুব বেশী দেখবার মত।"

বীণা একখানি কোঁচানো ঢাকাই শাড়ী আলনা হইতে পাড়িয়া লইয়া পরিতে পরিতে বলিল, "আহা, দেখবার মত আবার কি, দুটো শিঙ আছে, না শুঁড় আছে? তবে ভারি মজার কিন্তু, তোর ঠিক ভাল লাগবে দেখিস।"

"আমার ভাল-টালো কাউকে লাগে না বাপু," বলিয়া ঐন্দ্রিলা গা-মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া পড়িল।

বীণা তাঁহার ঘর হইতে চলিয়া গেলে চিঠিসুদ্ধ বইখানিকে বালিশে চাপা দিয়া রাখিয়া হেমবালাও উঠিয়া পড়িলেন, দুতলার বারান্দার রেলিঙ হইতে ঝুঁকিয়া ডাকিলেন, "ক্ষ্যান্ত!"

ক্ষেন্তি তখন নীচে রান্নাঘরে বসিয়া ঠাকুরের রন্ধনের সমালোচনা করিতে ব্যস্ত ছিল।...কাঁচা লঙ্কা না দিয়ে কিরকম আবার নিরিমিষ তরকারী হচ্ছে··· তাতে আবার দুধ, এমন কাণ্ড কখনও কেউ বাপের জন্মে দেখেনি···দুধে নুনে মিশলে যে গোরক্তের সমান হয় গো! হেমবালার ডাক শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিল। কহিল, "আমায় ডাকছিলেন মা?"

হেমবালা মন্দিরাকে তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিলেন, "এর আয়া কোথায় আছে দেখ্, একে তার কাছে নিয়ে যা, কাপড় ছাড়িয়ে খাওয়াতে বল্।"

ক্ষেন্তি ভিন্ন অপর কোনও ঝি-চাকরকে হেমবালা পারতপক্ষে নিজের ঘরে ডাকিতেন না। ভাইয়ের সংসার হইতে কোনও দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু তিনি লইবেন না ইহা স্থির ছিল।

ক্ষেন্তি কহিল, "তা ত বলব মা, কিন্তু আমার কথায় এখানে কি কেউ কান দেয়? সব গা-টেপাটেপি ক'রে হাসে। এদের আদব দেখে গা জ্ব'লে যায় মা, আমরা রাজবাড়ীর ঝি-চাকর..."

হেমবালা তাহাকে তাড়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুই যা ত এখন।"

সে চলিয়া গেলে হেমবালা ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বালিশের তলা হইতে বইখানি বাহির করিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ অকারণেই তাহার কয়েকটা পাতা উল্টাইলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় চিঠিটিকে বাহির করিয়া কিছুমাত্র ইতস্তত: না করিয়াই খুলিয়া ফেলিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই পড়িতে

লাগিলেন, যেন বসিয়া পাঠ করিলে চিঠিটিকে অনাবশ্যক বেশী মর্য্যাদা দান করা হইবে। পরিচিত চিঠির কাগজ, পরিচিত হস্তাক্ষর।

'যে অপরাধের ক্ষমা নাই তাহার জন্য তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা আর করিতে চাহি না। কিন্তু ক্ষমা না করিয়াও ত মানুষে দয়া করে? তুমি দয়া করিয়াই ফিরিয়া আইস।

'তুমি কাছে না থকিলে বাঁচিয়া থাকার কোনও অর্থ থাকে না, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এক-একবার এমনও মনে হইতেছে, প্রলোভনে যে ভুলিয়াছিলাম তাহাও তোমাকে দিয়া আমার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই পারিয়াছিলাম। এই অদ্ভুত কথার কি যে অর্থ হইতে পারে তাহা তুমি বুঝিবে না, পৃথিবীর কেহই সম্ভবতঃ বুঝিবে না, এমন কি আমি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, কিন্তু ঈশ্বর রাধাগোবিন্দজী জানেন, আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আজ তুমি কাছে নাই, পৃথিবীতেও এমন-কিছু নাই যাহা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে।

'আমার যত দোষই থাকুক, জ্ঞান হইয়া অবধি কখনও আমি মিথ্যা কহি নাই। যদি ইচ্ছা করিতাম, খুব সহজে তোমাকে আমি ফাঁকি দিতে পারিতাম। কাহারও সাধ্য ছিল না আমার অপরাধ প্রমাণ করিতে পরে, এখনও সে সাধ্য কাহারও নাই। আমি না বলিলে আমাকে সন্দেহ করিবার কথাও তোমার মনে আসিত না। কিন্তু পৃথিবীতে তোমারই জানিবার অধিকার আছে বলিয়া নিজে হইতে অকপটে তোমাকে আমি সত্য কহিয়াছি, কিছু গোপন করি নাই। আজও আমি সত্য কথাই কহিতেছি।

'অপরাধী নিজে হইতে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার দণ্ড হ্রাস হয়। কিন্তু তুমি আমাকে আমার প্রাপ্য চরম দণ্ডই দিতেছ। নরেন্দ্রনারায়ণ।'

হেমবালা সত্যই কিছু বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার আগ্রহও তাঁহার ছিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিটিকে ভাঁজ করিয়া তবু নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই

ইহার মর্ম্মোদ্ধারের চেষ্টা কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া তিনি করিলেন। ঠোটের কোণ দুইটা অবাধ্য হইয়া কাঁপিতেছিল, দৃঢ়তার দ্বারা সেটুকুকে শাসন করিলেন। একবার চিঠিটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াও ছিঁড়িলেন না, ছেঁড়া টুকরা কোথায় ফেলিবেন, কে কোথায় কুড়াইয়া পাইয়া পড়িবে, দেরাজ হইতে চাবির গোছা লইয়া নিজের ছোট হাতবাক্সটি খুলিয়া সমস্ত কাগজপত্রের নীচে চিঠিটিকে রাখিয়া দিলেন। তারপর আলো নিবাইয়া দরজার শিকল টানিয়া দিয়া আস্তে হৃষীকেশের মহলে আসিয়া ঢুকিলেন।

হৃষীকেশ নড়িয়া বসিয়া চোখ হইতে চশমা নামাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "নরেন চিঠি লিখেছে ?"

হেমবালা অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হ্যা।"

"কেমন আছে ?"

"জানি না।"

হৃষীকেশ আবার একটু নড়িয়া বসিলেন।

হেমবালার এবারকার কলিকাতা আসাটা যে খুব স্বাভাবিক কারণে ঘটে নাই হৃষীকেশ গোড়াগুড়িই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হেমবালার ধরণধারণ দেখিয়া এতদুপরিও কিছু কিছু তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। হেমবালা লুকাইতেই চাহিতেছেন বুঝিতে পারিয়া নিজে তিনি কিছুই জানিতে চাহেন নাই, কিন্তু যতটা বুঝিয়াছিলেন তাহাতেই ভগিনীকে খুব বেশী আগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেও তাঁহার বাধিতেছিল, এবং এজন্য যতবেশী বেদনা পাইতেছিলেন ততবেশী নিজেকে লইয়া তিনি সকলের হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছিলেন। হেমবালা নিজে তাঁহার ঘরে না আসিলে ভ্রাতাভগিনীতে ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হইত। অবশ্য প্রতিদিন প্রভাতে হেমবালা সুনিয়মে একবার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে আসিতেন, তখন

কিছুক্ষণ করিয়া নীরবে তাঁহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া থাকিয়া যাইতেন, হৃষীকেশের পড়াশোনায় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আজ নিজেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটুখানি কাশিয়া তিনি কহিলেন, "নরেন সব-কিছুতেই ঐরকম। কোনো বিষয়ে গা করে না। জেনেশুনে যে অপরাধ করে তা মোটেই নয়, অন্যে অপরাধ নিতে পারে এই সহজ কথাটা কিছুতে তার মাথায় আসে না।"

হেমবালা কোনও কথা কহিলেন না, হৃষীকেশও কিছুক্ষণ নীরবেই স্নেহাবনত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ভগিনী হইলেও হেমবালা তাঁহার কন্যা-স্থানীয়া, তাঁহার নিজের বয়স এখন ষাটের প্রায় কাছাকাছি, হেমবালার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে না। পিতার মৃত্যুর পর কন্যাস্নেহেই ইঁহাকে তিনি লালন করিযাছিলেন। তাহা ছাড়া সত্যই হেমবালাকে দেখিলে ঐন্দ্রিলার মা মনে হইত না। ঐন্দ্রিলার দিদি বলিয়াই লোকে ভুল করিত। কানের কাছটিতে একদিকে দু-একটি চুলে পাক ধরানো ভিন্ন বিগত যৌবন তাঁহার দেহ হইতে যৌবনশ্রীর আর-কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার দিকে চাহিয়া সহজেই হৃষীকেশ মাঝখানকার কয়েক বৎসরের ব্যবধানকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত সুদূর অতীতের অনেকগুলি দিন হঠাৎ আজ আবার স্মৃতিপথে ভিড় করিয়া আসিয়া তাঁহার দুই চোখকে বারম্বার অশ্রুসিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিলেন, "তোমার বিয়ের বৎসর একবার বাপ-মাকে না ব'লেই তোমাকে নিতে এসে হাজির। আমি বললাম, 'তুমি হেমকে নিতে এসেছ, কই তোমার মা-বাবা ত সে-বিষয়ে কিছু লেখেননি।' বললে, 'আমি তাঁদের মন জানি, বউ বাড়ী গেলে তাঁরা খুব খুশীই হবেন।' আমি বললাম, 'তুমি ছেলেমানুষ, বুঝছ না, হেমকে নেবার প্রস্তাবটা তাঁদের কাছ থেকেই আসা দরকার।' সে কিছুতেই বুঝল না, রাগ ক'রে না-খেয়েদেয়েই চ'লে গেল। তারপর আমার বাড়ী আর বড় একটা সে আসেনি।"

হেমবালা নতমস্তকে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হৃষীকেশও ইহার পর অকস্মাৎ একসময় ঘুরিয়া বসিয়া কি একটা লেখার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। বীণা আসিয়া ডাকিল, "পিসীমা, খাবে না ?"

"না, আমি এইখানেই দাদার কাছে একটু বসছি। মন্দিরার খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে শুইয়ে দিতে আমাকে বল্‌গে যা। বিছানা করাই আছে।"

"তা ত বলব, কিন্তু তুমি খাবে না কেন ?"

"ক্ষিদে নেই মা, তুই যা।"

বীণা অত্যন্তই বিস্মিত হইল. কিন্তু পিতা এবং পিতৃষসার দিকে চাহিয়া আর-কিছু বলিতে তাহার সাহস হইল না। সে চলিয়া গেলে ভ্রাতাভগিনী যেমন বসিয়াছিলেন নীরবেই বহুক্ষণ সেইভাবে বসিয়া রহিলেন।

৮

খাইতে বসিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "এবার আসতে পথে তোমাদের সুভদ্র-বাবুকে দেখলাম।"

বীণা বলিল, "কই, আগে বলিসনি ত ? আলাপ হ'ল ?"

"উঁহু, কথা যদিও বললাম অনেকগুলো।"

"তোকে চিনতে পারলেন না ?"

"কি ক'রে চিনবেন ? সুলতাদিদের বাড়ীতে আমিই ওঁকে দেখেছি, আমার পরিচয় কেউ ওঁকে দিয়েছে ব'লে ত মনে হয় না।"

"কি কথা হ'ল ?"

"দেওয়ানজী প'ড়ে গিয়ে একটু চোট পেয়েছিলেন, তাঁকে ধ'রে তাঁর কেবিনে দিয়ে আসতে বললাম।"

"দিলেন ?"

"হুঁ।"

"তারপর তুই কি বললি ?"

"কি আবার বলব, একটু কেবল হাসলাম।"

"ধন্যি মেয়ে বাবা তুই, একটু ধন্যবাদ ত দিতে হয় ?"

"বাংলা ভাষায় সেটা ত আর দেওয়া চলে না, নয়ত দিতাম।"

"সুভদ্রবাবু তোর হাসি দে'খেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন বোধ হয় ?"

"সম্ভব।"

"কি বললেন ?"

"বললেন, আমার সঙ্গে টিংচার আইওডিন আছে দিচ্ছি, ওঁর পিঠে একটু লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

"উঃ, একেবারে পূরোদস্তুর রোমান্স ! তারপর কি হ'ল শুনি।"

"Exit এবং Curtain ।"

"এই নাকি তোর অনেকগুলো কথা ?"

"তা বই কি, কথা আবার লোকে কত বলে ?"

বীণা কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "সত্যি, আমার বদলে তুই আমার বাবার মেয়ে হ'লে পারতিস।"

ঐন্দ্রিলা সে হাসিতে যোগ দিল না, কি মনে করিয়া গম্ভীর হইয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া দু-জনে উঠিয়া-পড়িবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় খাবার ঘরের পাশে বাগানের সুরকি-ঢালা রাস্তায় মোটরের চাকার শব্দ শোনা গেল। বীণা বলিল, "এত রাত্রে কে আবার আসে রে বাবা !"

গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, তার পরেই স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বিমান আসিয়া একেবারে খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। ঐন্দ্রিলা অল্প একটু তাহার দিকে পিঠ দিয়া সরিয়া বসিল। বীণা অত্যন্ত বিস্মিত মুখ

করিয়াছিল। অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি এমন সময় হঠাৎ?"

বিমান নত হইয়া দুই বোনকে নমস্কার করিল, তারপর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আপনার এই বইটা ক্লাবে ফে'লে এসেছিলেন, দিতে এসেছি।"

হাত বাড়াইয়া বইটা লইয়া বীণা বলিল, "ক্লাবের দারোয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হ'ত, নিজে কেন এলেন কষ্ট ক'রে?"

বিমান কহিল "কষ্ট আবার কি, pleasure বলুন।"

বীণা হাসিয়া কহিল, "তথাস্তু।"

বিমান দাঁড়াইয়াই ছিল, কহিল, "একবার বসতেও যে বললেন না বড়?"

বীণা অবলীলায় কহিল, "বসতে বললেই খেতে বলতে হয়, কিন্তু খেতে দেবার মত কিছু আর দু-বোনে বাকী রাখিনি।"

বিমান একটা চেয়ার টানিয়া গুছাইয়া বসিল, কহিল, "খুব ভাল করেছেন। রাত্রের খাওয়া একটু সকাল সকাল সেরে ফেলেন বুঝি?"

বীণা কহিল, "হ্যাঁ, আর বেশী রাত করলে ভোরবেলার চা-খাওয়াটাও সঙ্গে সঙ্গে সেরে নিতে হয়।"

বিমান কহিল, "আমার দেখুন দিনের বেলাটা এতবেশী sordid লাগে, যে, বেঁচে থাকবার মত সময় যেটুকু রাত্রেই আমাকে ক'রে নিতে হয়। অন্ধকারে মনটা তবু অনেকখানি ছাড়া পায়, যে-দিকে যা-খুশি কল্পনা ক'রে নেওয়া চলে।"

বীণা কহিল, "তা ঠিক, কিন্তু রাত্রে উঠে মেয়ে যখন চেঁচায় তখন অন্ধকারে তার পায়ের দিকে মাথা কল্পনা করলে ব্যাপারটা তার বা আমার কারও পক্ষেই বিশেষ সুবিধের হয় না।"

বিমান উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ঐন্দ্রিলা পূর্ব্ব হইতেই উসখুস করিতেছিল, এই অবসরে উঠিয়া-পড়িয়া নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে একটু হাসিয়া বিমানকে নমস্কার করিল। বিমান ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতি-নমস্কার করিল।

বাহিরে আসিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, দরজার একপাশে, একতলার দুই সার ঘরের মধ্যেকার পথে, অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষিয়া হেমবালা দাঁড়াইয়া আছেন। ঐন্দ্রিলা বাহির হইয়া আসিতেই তিনি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন মনে হইল। ব্যাপারটা ঐন্দ্রিলার কেমন ভাল লাগিল না, তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই, তাঁহার পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতপদে দুতলার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

বিমান আবার গুছাইয়া বসিল। একটু আগে যে হাসি সুরু করিয়াছিল তাহারই জের টানিয়া কহিল, "বেচারা অজয়!"

বীণা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "কেন, তাঁর কি হ'ল আবার?"

বিমান ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "সেইটেই ত ভেবে পাচ্ছি না। পৃথিবীতে মেয়ে ব'লে যে একটা জাত আছে তাই যে জানত না, আজ তার ভাব দে'খে মনে হচ্ছিল, আর যে কিছু পৃথিবীতে আছে তাই যেন সে জানে না।"

বীণা নত মস্তকে চট করিয়া কি ভাবিয়া লইয়া হাসিয়াই বলিল, "ও রকম হয়। এ-নিয়ে আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না। খুব লাজুক আর ভীরু মানুষেরা বিপদে পড়লে হঠাৎ এক-এক সময় মারাত্মক-রকম সাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলে।"

"হুঁ, মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ ত অবিশ্যি ছিলই।"

"সেটা কি, শুনি?"

"আমার মুখ থেকে শুনলে আপনার কি আর ভাল লাগবে? যথাসময়ে ঠিক জায়গা থেকেই শুনতে পাবেন।"

"আঃ, আপনি এত বাজে কথাও বলতে পারেন," বলিয়া বীণা উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল।

বীণাকে এমন ভাল মেজাজে পাওয়া অন্ততঃ বিমানের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। কথার স্রোতকে ইহার পর কোন্‌দিকে মোড় ফিরাইলে আরও কিছুক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া যাইতে পারে তাড়াতাড়ি তাহা ভাবিয়া

লইতেছে এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়াই ধীরপদে হেমবালা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বিমান ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একেবারে বীণার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "তোর মেয়ের কি হয়েছে বলতে পারিস্? সেই থেকে ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করছে, কিছুতে ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না। তুই একবার এসে চেষ্টা ক'রে দেখবি?"

"এই যাচ্ছি। আচ্ছা, আসি তাহ'লে" বলিয়া দ্রুত নমস্কার সারিয়া বীণা বিমানকে বিদায় দিল, তারপর হেমবালার সঙ্গে তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া উঠিল। দেখা গেল, পরিপাটি করিয়া পাতা বিছানায় একটি পুতুল পাশে করিয়া মন্দিরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঝি-চাকরদের কেহ কোনও কাজে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়াছিল, যাইবার সময় মনে করিয়া সেটা নিবায় নাই। আলোটা নিবাইয়া আসিয়া নত হইয়া হইয়া ঘুমন্ত কন্যার কপালে বীণা একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিমান তাড়াতাড়ি ট্রামের রাস্তা ধরিল। আসিবার সময় বীণা-ঐন্দ্রিলাদের কেহ হয়ত দেখিবে আশা করিয়া ট্যাক্সি লইয়া আসিয়াছিল, কতক্ষণ থাকিতে পাইবে জানিত না বলিয়া সেটাকে অপেক্ষা করায় নাই। পথে আসিতে শুনিল, দূরে একটা গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে। মনে মনে বলিল, 'না, আজ সন্ধ্যাটা নিতান্তই বাজে খরচ হ'ল। এর পর কি করব? বাড়ী ফিরে গিয়ে ঘুম দেব কি? দুত্তোর, আমি কি জ্বরো রুগী, না আমার বাড়ীতে একটা ক্যাটকেটে বৌ আছে, যে, অন্ধকার না হতেই বাড়ী গিয়ে হাজির হব? কিন্তু কোথায়ই বা যাই?'...একটা বাস্ যাইতেছিল, চড়িল না। খানিকক্ষণ পরেই একটা ট্রাম, এবারেও চড়িল না। সকালে উঠিয়া যে-গানটা সুরু করিত সমস্ত দিন একনিষ্ঠভাবে সেইটাই গাহিয়া চলা তাহার স্বভাব ছিল, গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,

"I can't find a home till the morning time,

One two three and four.

I try to be good..."

এবারে আর-একটা বাস্ যাইতেছে, একটি সুন্দরী যাত্রিণীর কবরীর কতকটা দেখা গেল, উঠিয়া পড়িল।

একটু জায়গা করিয়া বসিয়া সহযাত্রী এবং সহযাত্রিণীদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছে, হঠাৎ চোখে পড়িল, যাহার পাশে বসিয়াছে সে ব্যক্তি নন্দ। শিবনেত্র হইয়া মনে মনে কহিল, 'নাঃ, আজ নিতান্তই শেয়াল বাঁয়ে ক'রে বেরিয়েছি, আজ কপালে সুখ নেই।' মুখে কহিল, "নন্দ যে! এত রাত্রে কোথায় চলেছ?"

নন্দ স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব একটি ছেলে, বয়স আঠারো-উনিশ। কলেজে পড়ে। কোমল, তরুণীজনোচিত চেহারা। বাঁ চোখের কোণে একটা কালো তিল সমস্ত মুখটিতে যেন একটা বিষাদকরুণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। তাহার ছোট দেহটি লইয়া সে খুব অল্প স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তবুও প্রাণপণে গাড়ীর দেয়াল ঘেঁষিয়া সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "পড়িয়ে ফিরছি।"

বিমান কহিল, "তুমি আবার ছেলে পড়াও বুঝি? ঝক্‌মারী কাজ।"

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া একটু হাসিল।

"কদ্দূর যাচ্ছ?"

"শেয়ালদা।"

"সেইদিকেই থাকো বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", নন্দ খুকখুক করিয়া কশিতে লাগিল।

বিমান দেখিল, নন্দের মুখ অতিশয় শুষ্ক দেখাইতেছে, সম্ভবত সমস্ত দিন সে কিছুই আহার করে নাই। ভাবিল 'রাতটা যখন মাটিই হ'ল তখন ভাল ক'রে ছেলেটার খবর নিতে হচ্ছে। যা ওর অবস্থা দেখছি, বেশীদিন আর

টি'কবে ব'লে ত মনে হয় না।' কহিল, "কোন্‌দিকে যাই ভাবছিলাম, তা বেশ ভালই হ'ল, তোমার ওখানে গিয়েই খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাক্‌।"

নন্দ অত্যন্ত উসখুস করিতে লাগিল।

বিমান কহিল, "কি হে, খেতে দিতে হবে মনে ক'রে ভয় পেয়ে গেলে নাকি? না-হয় ঘরে যা আছে দু-জনে ভাগ ক'রে খাব।"

নন্দ তথাপি নীরবে মাথা নীচু করিয়া আছে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "না, না, তুমি ভয় পেও না, আমি সত্যিই তোমার বাড়ী যাব মনে ক'রে কথাটা বলিনি।"

অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া নন্দ কহিল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, পারবার কথাও নয়।···আমার বাড়ী কোথায় যে আপনাকে নিয়ে যাব?"

বিমান কহিল, "সে কি হে? বাড়ী কোথায় কিরকম? এই যে একটু আগে বললে শেয়ালদার দিকে থাকো?"

কোলের উপর ময়লা কম্বল জড়ানো সরু বালিশের মত একটা জিনিষ দেখাইয়া নন্দ কহিল, "এই বিছানা নিয়ে শেয়ালদার প্লাটফর্মে শুতে চলেছি, রোজ তাই করি।"

"জিনিষপত্র কোথায় থাকে? খাওয়া-দাওয়া কোথায় কর?"

"যখন সুবিধে হয় একটা হোটেলে খাই, জিনিষপত্র বইটই তাদেরই কাছে থাকে, সেখানেই স্নানটানও করি।"

বিমান এমন বিস্মিত মুখ করিয়া নন্দের আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল, যেন এমন অসম্ভব কথা ইতিপূর্ব্বে জীবনে আর কখনও সে শোনে নাই। এই নিরীহ ছেলেটারও পেটে পেটে যে এত ছিল তাহা কে জানিত। কহিল, "কিন্তু শেয়ালদার প্লাটফর্মে রোজ রাত্রে নিয়ম ক'রে কেউ শুতে যায় এ আজ আমি এই প্রথম শুনছি।"

নন্দ একটু হাসিয়া বলিল, "মুটেমজুররা অনেকেই ত শোয়, তাদের মধ্যে মিশে যাই, কেউ লক্ষ্য করে না।"

"কলেজ পড়ছ, না পড়াশোনা খতম করেছ ?"

"পড়ছি।"

"কখন পড়, কোথায় ব'সেই বা পড় ?"

"প্লাটফর্মে বেশ আলো পাওয়া যায় সেখানেই শুয়ে শুয়ে পড়ি। দিনের বেলাটা বিশেষ-কিছু হয় না।"

বিমান কহিল, "সে বেশ কথা, ডেঁপোমি রেখে এইবার নামো দেখিনি, এখানে গাড়ী বদলাতে হবে।"

"কোথায় যাব ?"

"আপাতত: ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমাদের বাড়ী, তারপর দেখা যাবে।"

নন্দ কাকুতিমিনতি করিয়া তাহার নিজের ধরণে অনেক আপত্তি করিল, বিমান কিছুই কানে তুলিল না।

অজয় যখন সুভদ্রকে লইয়া ক্লাব হইতে বাহির হইল তখন মাধুর্য্যের প্লাবনে সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ভয়াবহতার চিহ্ন তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই এইরূপ হইত, যেমন অলক্ষ্যে এবং অকস্মাৎ নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিত, তেমনই অকস্মাৎ আবার ফিরিয়াও পাইত, নতুবা প্রকৃতিস্থ মন লইয়া সাধারণ মানুষের মত পৃথিবীতে বিচরণ করাই তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এই ত নিজেকে দিয়া তাহার বুক পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকের অন্ধকার ভরিয়া অদৃশ্য আলোর আবেশ কাঁপিতেছে। দুইটি দীপ্তি-সমুজ্জ্বল চোখ আজ যে তাহার চোখে চোখে চাহিল, একটি অপরূপ কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত হইয়া তাহার কানে বাজিল, ইহারই মধ্যে নিজের কোন্ অন্তরতম পরিচয় সে আজ যেন খুঁজিয়া পাইল। যেন এক নামহীন অস্ফুট কামনার উপলব্ধিকে বহু জন্মজন্মান্তর নিজের মধ্যে সে বহন করিয়াছে, মৃত্যু হইতেও বেশী অর্থপূর্ণ করিয়া ইহাকে সে আজ অনুভব করিল। যে কুৎসিত

প্রাগৈতিহাসিক জীবের থাবা-দুইটার সঙ্গে নিজের হাত দুইটির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সন্ধ্যায় সে ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল, তাহারও অস্তিত্বের কোন্ গহনতম কোণে এই মাধুর্য্যের উপলব্ধি যেন প্রদীপের মত জ্বলিয়াছিল, বহুযুগব্যাপী বিবর্ত্তনের অনিশ্চিত অন্ধকারে একবারও তাই সে পথ ভুল করে নাই।

সুভদ্র কহিল, "ক্লাব কেমন লাগল?"

অজয় কহিল, "বেশ।" আজিকার দিনে কি সে পাইয়াছে, এ জিনিষকে নিজের জীবনে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এ প্রশ্ন তাহার মনে জাগিল না। কেবল অনুভব করিল, নূতন সূর্য্যোদয়ের আয়োজন হইতেছে, কোন্ মায়াকাঠির স্পর্শে ধীরে এক জ্যোতির্লোকের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে, আলোকের মহোৎসব সুরু হইতে আর দেরি নাই। সেখান হইতে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে কি গভীর আহ্বান কানে আসিতেছে, কিন্তু সে কাহার আহ্বান তাহা জানিতে আজ তাহার মন ব্যগ্র হইল না। উৎসবের ক্ষেত্রে জ্যোতিরাসনে বিশেষ-কোন মানুষকে বসাইল না। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিত্তে নীরবে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্লাব অজয়ের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুভদ্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সারাপথ সেই বিষয়েই অনর্গল বক্তৃতা করিতে করিতে চলিল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা, ক্লাব ঠিকমত গড়িয়া উঠিলে তাহা হইতে দেশের ভাগ্যে কত অসংখ্য অসম্ভব-সম্ভাবনার সূত্রপাত হইবে তাহার হিসাব, কিন্তু অজয় শুনিল মাত্রই, সুভদ্রের একটা কথাও তাহার মনকে কোনও দিক্ দিয়া স্পর্শ করিল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক কোণে মস্ত কয়েকটা বাড়ীর আওতায় ছোট দুইতলা একটি বাড়ী। বাহিরটা অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর, আধুনিক স্থাপত্যের আদর্শে বড় বড় দরজা এবং জান্‌লা চারিদিক্‌কার দেয়ালের প্রায় চোদ্দ আনা জুড়িয়াছে। একপাশে দেয়াল-ঘেরা একফালি জায়গা, তাহারই এক প্রান্ত জুড়িয়া ভিতরে ঢুকিবার দরজা।

ঢুকিয়াই বাঁদিকে একতলায় বসিবার ঘর। দেয়ালে একই মাপের গুটি-দশবারো ওয়াটার-কালার ছবি, কয়েকটা বিমানের আঁকা, বাকীগুলি তাহার বন্ধুদের দিয়া আঁকানো। পোকায় খাওয়া জীর্ণ, চোপসানো পত্র-পল্লবের মধ্যে একগুচ্ছ তাজা বনমল্লিকা, এবং নীলাভ আকাশের গায়ে একটি রামধনুর বর্ণের জলবুদ্বুদ যে বিমানের আঁকা তাহা সহজেই বোঝা যায়। মেহগনি কাঠের মোটা চৌকা-ধরণের গুটি-কয়েক চৌকি এবং একটি টেবিল, সেগুলিতে রং অথবা পালিশ নাই। জানালায় নীল পর্দা, চৌকিগুলিতে নীল রঙের কুশন। এক পাশে একটি ছোট লিখিবার ডেস্ক।

সুভদ্র দুইবেলা স্নান করিত, চাকরকে গরম জল দিতে বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেলে অজয় চিঠির কাগজ এবং কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেশে পিতাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সে আজ বুঝিয়াছে, ভালবাসিয়া পৃথিবীর কোনও জিনিষকে অন্তরের পরম পরিচয়ের মধ্যে সে কখনও লয় নাই, নিজেরও মধ্যে অপরিচয়ের নিবিড় অন্ধকার এমন করিয়া তাই তাহাকে বারম্বার আচ্ছন্ন করে। স্থির করিয়াছে, এবারে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সবকয়টাই খুলিয়া দিতে হইবে। জীবনে যাহা-কিছু আসিবে, সমাদরে ডাকিয়া আনিয়া মনের চতুর্দ্দিকে দাঁড় করাইয়া দিবে। সর্ব্বদা সচেতন উপলব্ধিকে জাগ্রত করিয়া রাখিবে। পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসিবে।

কিন্তু চিঠি লিখিতে বসিলেই অজয়ের মাথায় যেন বাজ পড়িত। ঐতিহাসিক তথ্য এবং কবিতা ভিন্ন আর-কিছু যে কাগজের পাতায় কেমন করিয়া লেখা যাইতে পারে তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইত না। "শ্রীচরণেষু" পর্য্যন্ত লিখিয়া কলম হাতে করিয়া ক্রমাগত বাঁ-হাতের আঙুল-কয়টাকে মাথার রাশীকৃত চুলের মধ্যে সে চালনা করিতে লাগিল, অনেক ভাবিয়াও কি করিয়া সে সুরু করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। সুভদ্র আসিয়া তাহাকে উদ্ধর

করিল, বলিল, "প্রভা তোমাকে ভাইফোঁটার প্রণামী এই কাপড়খানা পাঠিয়েছে।

অজয় উঠিয়া কাপড়টি লইল। বাহিরের কোলাহলে আবৃত হইয়া ছোট ঘরটিতে যে-একটুখানি স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল তাহারই মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুদূরবর্ত্তিনী কল্যাণীর কল্যাণ-ইচ্ছাকে সে সমস্ত মন দিয়া অনুভব করিল।

ফিরিয়া লিখিবার ডেস্কে বসিতে যাইবে এমন সময় হাতের ছড়ি দিয়া ভেজানো দরজাটাকে ঠেলিয়া খুলিয়া বিমান আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দরজার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এস নন্দ!"

নন্দলাল বহিরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ইতস্তত: করিতে লাগিল। বিমান আবার কহিল, "এস না, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?" তখন সাবধানে বাদামী রঙের ক্যানভাসের জুতাজোড়া খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া, পাপোষে পা রগড়াইয়া অত্যন্ত আড়ষ্ট কাতর ভাবে কার্পেট-বিছানো ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

বিমান কহিল, "ইনি সুভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বন্ধু। আর ইনি অজয় রায়, লেখক।"

নন্দ অজয়ের লেখা পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্যে বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত সলজ্জ করুণ মুখে হাসিতে লাগিল।

সুভদ্র কহিল, "পরিচয়টা একতরফা শেষ ক'রো না।"

নন্দের সম্পূর্ণ নামটা বিমানের মনে ছিল না তবু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল, "এ নন্দলাল। আমর বিশেষ পরিচিত। আই-এস-সি পড়ে।"

নন্দ লজ্জিত মুখে কহিল, "আই-এ।"

সে-রাত্রে শুইয়া শুইয়া অজয়ের নিজেকে নিজের কাছে রূপকথার রাজপুত্রের মত অপরূপ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। পারসিক উড়ন-গালিচার মত একখানি জরীপাড় ঢাকাই ধুতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন কোন্ সুদূর সৌন্দর্য্যলোকে

উধাও হইয়া গেল এবং সেখানে রাশি রাশি রঙীন মেঘের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইল। সে জানিত, তাহাদের দেশের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী অল্পবয়স্ক অতিথিকে পরিধেয় উপহার দেওয়া অত্যন্তই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহা খুবই ভাবা যাইতে পারে, যে, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে আতিথেয়তার এই যেটুকু ক্রটি রহিয়া গিয়াছিল, সুভদ্রের মাতা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্য করিয়া প্রভাকে দিয়া তাহা সারিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার লোলুপ মন কিছুতেই এই ঘটনাটিকে সামান্য বলিয়া মানিতে চাহিল না। একটি স্নিগ্ধতরুণ মনের মধ্যে ভাইফোঁটার পবিত্র সুন্দর উৎসবালোকিত আসনটিতে তাহার স্থান হইয়াছে, প্রভা তাহাকে ভাবিতেছে, সেখানে তাহার মনের সৌন্দর্য্য-প্রস্রবণে সে আবগাহন করিতেছে, স্নেহমণ্ডনে স্নিগ্ধ হইতেছে, ইহা ভাবিতে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। কাপড়খানিকে বালিশের নীচে রাখিয়া সে শুইল। নিদ্রাভঙ্গে সমস্তরাত কি স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা মনে আনিতে পারিল না, কিন্তু দেখিল, তাহার সমস্ত দেহমন মধুময় হইয়া আছে।

৯

অর্থহীনতার ভারে মন্থর কয়েকটা দিন। আনন্দের ভাগে কম পড়িতেছে না, কিন্তু সে এমন আনন্দ যাহাকে নির্ব্বিচারে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। জীবনের ভিত্তি একেবারে মৃত্তিকার নীচে হইতে খসিয়া গিয়াছে, নূতন ভিত্তি গড়া হয় নাই, এই অবস্থার একটি আশ্চর্য্য শান্তিময় মোহ আছে। অতীতে যাহা সুখের বস্তু ছিল তাহা লইয়া আর সুখী হওয়া সম্ভবপর নহে, যাহা দুঃখের ছিল তাহা লইয়া দুঃখ করিতেও হাসি পাইতেছে, মনের এমনই নিরবলম্ব অবস্থায় নিত্যকার অপরিহার্য্য চৈতন্যরাশির উপর অজয় কর্ণধারহীন তরণীর মত তরঙ্গ-বাহিত হইয়া এই কয়দিন ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কলেজে ইহার মধ্যে কয়েকদিন সে গিয়াছে, কয়েকদিন যায় নাই। পুঁথির পাতায় কোনও চরিতার্থতার পথের সন্ধান নূতন করিয়া সে পায় নাই। তবু বই লইয়া রোজই বসিতেছে, ঐ পর্য্যন্ত। আর-কিছু তাহার করিবার নাই। সুভদ্রের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়াও কতকটা অনুরূপ কারণ বশতঃই ঘটিয়াছে; এবিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে যৎসামান্য একটা প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদানও হয় নাই। কোথায়ই বা সে যাইবে, পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া তাহার স্থান বলিয়া ত কিছু নাই? মাথার উপরে একটা আশ্রয়, দুইবেলা চারটি করিয়া রাঁধাভাত, ইহার বেশী আরকিছু কোথাও যাহার আশা করিবার নাই তাহার কাছে বৌবাজার আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তফাৎ আর কতটুকু?

চিরকাল নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া সম বা অসম বয়সীদের মধ্যে বন্ধু বলিতেও তাহার কেহ ছিল না। তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া নিরুপায় প্রতিভার এমন একটা জ্বালা ছিল যাহা অনিচ্ছিত অবজ্ঞায় অন্যদের বিমুখ করিত, কদাচ আকর্ষণ করিত না। যাহারা তাহা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিত তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্বভাবের নিদারুণ অক্ষমা এবং ক্রোধ-পরায়ণতার তাপ সহিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিত। এতদিন সে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকার পরিচিত পৃথিবী হইতে একটিও মানুষ একদিন আসিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যায় নাই।

নিশ্চিন্ত, নিরুদ্যম, অলস দিনগুলির সঙ্গে বাহিরের কোনও কিছুর কোথাও বিরোধ বাধিতেছে না। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতা। ধূলিধূম-কলুষ-কোলাহল। বৈভব এবং জীর্ণতার ভাগ লইয়া সমান কাড়াকাড়ি। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরামহীন সংঘাত। কিন্তু ইহার সমষ্টিজীবনে কি অদ্ভুত নিশ্চিন্ত নিরুদ্যম অর্থহীনতা। নিজেকে লইয়া কত সহজে এবং পরিপূর্ণভাবে এখানে একাকী হইয়া যাওয়া যায়, কোনও দিক্ হইতে কোনও আকর্ষণের রজ্জুতে এতটুকু টান পড়ে না। সমষ্টিগতভাবে এই মহানগরীর মানুষগুলির

কোনও ইতিহাস নাই, দিন হইতে দিনের অগ্রসর হইয়া চলার মধ্যে কোনও ছন্দ নাই, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেদের কোনও সমষ্টিগত সার্থকতার সন্ধানও ইহারা জানে না। এই মহামানবের যজ্ঞ, ইহার কেহ পুরোহিত নাই, মন্ত্র নাই, এ যজ্ঞের দেবতাও কেহ নাই। আছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অতি-সান্নিধ্যের ফলে অন্তহীন বিরোধ আর ব্যাধি, ব্যাধি, ব্যাধি। চতুর্দ্দিক্কার এই বিরাট্ ব্যাধিগ্রস্ত উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র একক জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা মানুষকে বেশীদিন পীড়িত করে না, অজয়কেও করিতেছে না।

কিন্তু সুভদ্রের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়ার আসল কারণটা যাহাই হউক, এই কয়দিনে সুভদ্রকে তাহার আরও একটু ভাল লাগিয়াছে।

সুভদ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ ঋজু দেহ, প্রশস্ত ললাট, সকরুণ সহাস্য চক্ষু, সহজেই সকলের মনোহরণ করে, অজয়েরও করিয়াছিল। মুখটি খুব সুন্দর নয়, চোখ-দুইটির রং কটা, মুখ ছাইয়া কোনও এক সময়ে ব্রণ হইয়াছিল, সেগুলির অবশেষ-চিহ্ন চোখের নীচে গালের উপরিভাগকে লোহিতাভ করিয়া রাখিয়াছে, উপর-পাটির মাঝখানকার দুটি দাঁত অল্প একটু উঁচু। কিন্তু এসমস্তই তাহার সমস্ত মুখশ্রীর সঙ্গে আশ্চর্য্যরূপে মানাইয়া যাওয়াতে তাহাকে দেখিতে বেশ ভালই লাগে। অন্ততঃ অজয় মনে করে, তাহার দাঁত-দুইটি ঐটুকু উঁচু না হইলে, চোখের নীচে গালের কাছটায় ঐটুকু লালের আভাস না থাকিলে তাহাকে মোটেই ভাল দেখিতে হইত না। স্বভাবের দিক্ দিয়া বিধাতা সুভদ্রকে এমন করিয়া গড়িয়াছিলেন, যে, অজয়ের মত তুষ্টিহীন মানুষও তাহার মধ্যে বিরক্ত হইবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় না। সুভদ্র সম্পূর্ণভাবেই নিরহঙ্কার বলিয়া অজয়ের অহঙ্কারী স্বভাব তাহার মধ্যে এমন একটা আশ্রয় পাইয়াছে যাহা আর কোথাও এতদিন পায় নাই।

পৃথিবীতে ঠিক বন্ধু বলিতে সুভদ্রেরও এতদিন কেহ ছিল না। অপরের জন্য প্রয়োজন হইলেই সে যদিও প্রাণপণ করিত, সে-প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে

অথবা চোখের আড়াল হইলেই কাহারও কথা তাহার আর মনে থাকিত না। যাহারা সম্মুখে থাকিত তাহাদের সেবার দাবী মিটাইয়া তাহার সময় এবং সামর্থ্যের কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকিত না, এবং সেবা করিয়া ছাড়া মানুষের সঙ্গে আর যে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন এবং রক্ষা করিতে হয় তাহাও সে জানিত না। দেহ-মনে যে একটা চূড়ান্ত নির্ভরের প্রয়োজনকে অজয় অলক্ষ্যে নিজের চতুর্দ্দিকে সারাক্ষণ বহন করিত, হইতে পারে কোনও অচিন্তিত উপায়ে সুভদ্র প্রথমদৃষ্টিতেই তাহার পরিচয় পাইয়াছিল, তাই প্রথম হইতেই অজয়কে তাহার ভাল লাগিতেছে।

মন্দিরার নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে অজয় আজও যায় নাই বটে, তবু এই ক'দিনেই আরও একটি মানুষের মধ্যে তাহার মনের একটা আশ্রয় গড়িয়া উঠিতেছিল, সে বীণা। কিন্তু বীণাকে তাহার ভাল লাগিতেছে ইহার বেশী তাহার সম্বন্ধে আর-কিছু সে একদিনও ভাবে নাই। এই মেয়েটি এমনই যে ইহাকে লইয়া ভাবিতে পারা যায় না, অলক্ষ্যে সে সমস্ত ভাবনার নিবৃত্তি করিয়া দেয়। সমস্ত ভাবনা-চিন্তার চূড়ান্ত-নিবৃত্তিই অজয়ের এখনকার মনের অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য।

দ্বিতীয়বার ক্লাবে যাওয়া লইয়া সে সুভদ্রের সঙ্গে যথারীতি তর্ক করিয়াছিল, বলিয়াছিল, "তুমি যেটাকে ক্লাব বলছ সুভদ্র, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি সেটা প্রিয়গোপালবাবুদের বাড়ীর বৈঠকখানা। অকারণে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে হঠাৎ কেন আমি যাতায়াত সুরু করব বুঝতে পারছি না।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "আমরা যে ক্লাবের জন্যে আলাদা বাড়ী ভাড়া করিনি, প্রিয়দার বাড়ীতে জায়গা চেয়ে নিয়েছি, সেটা আমার ইচ্ছাক্রমেই ঘটেছে।"

অজয় বলিয়াছিল, "তা জানি। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাই এক্ষেত্রে যদি একমাত্র ভাববার কথা হত তাহলে আমার কিছুই বলবার থাকত না।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "প্রিয়দাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে অত্যাচার সুরু করেছি, এই ধারণা কি তোমার জন্মেছে?"

অজয় বলিয়াছিল, "তা আমি বলতে চাইনি। হয়ত এই ক্লাব সম্বন্ধে তোমার যতখানি উৎসাহ, তোমার প্রিয়দাদের উৎসাহ তার চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু ভুলে যেও না, উৎসাহের অভাব যদি তাঁদের দিকে কোনদিন ঘটেও, তোমাকে সেটা জানতে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হবে না। তুমি সংসারী নও, সমাজের কাছে তোমার কোন বিষয়ে কোন দাবী-দাওয়া নেই, যদি এই ক্লাব থেকে কখনও কোনও অনর্থের সূত্রপাত হয়, তোমার কাছে তা নিয়ে কেউ জবাবদিহি তলব করবে না, তোমার প্রিয়দা এবং তাঁর স্ত্রীর কাছেই করবে। তাঁরা বুদ্ধিমান্ মানুষ, এ আশঙ্কার কখনও যে তাঁদের মনে উদয় হয়নি এ হতেই পারে না। এমনও ত হওয়া সম্ভব যে, অত্যন্ত সহৃদয় এবং অমায়িক ব'লেই নিজেদের কোনও কথায় বা ব্যবহারে এ আশঙ্কাকে তাঁরা প্রকাশ করছেন না? তুমি বলবে, ক্লাবের যারা মেম্বার তারা সকলেই তাঁদের পরিচিত ও বন্ধু। কিন্তু পরিচিত মানুষগুলিও ত মানুষ, ভুল তারাও ত করতে পারে?"

বিমান এককোণে বসিয়া একটা পেন্সিল স্কেচের উপর রবার ঘষিতেছিল, ময়লা কাগজের গুঁড়াগুলিকে ফুঁ দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিয়াছিল, "ভুল করবারও তারা একটা ক্ষেত্র পাক্। হয়ত একশবার ভুল করবে, একবার করবে না, সেই একবারকে নিয়েই সুভদ্রের ক্লাব করা সার্থক হবে।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "তুমি ভয়ের কথাগুলি খুব বেশী বাড়িয়ে ভাবছ অজয়। আমি যদি বলি, সব বিষয়ে ঠিক এইরকম অতিভয়ই আমাদের দেশকে, সমাজকে, এমন কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিত্বকে পর্য্যন্ত দেহমনে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, তাহলে তুমি রাগ করবে। কিন্তু আসলে যে ধরণের কুৎসিত ভয় থেকে পৃথিবীতে অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি, তার সঙ্গে তোমার এই-সমস্ত ভয়ের বিশেষ কিছু তফাৎই নেই।"

অজয়ের ইহার পর আর তর্ক করিতে ভাল লাগিতেছিল না। একটুক্ষণ

নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুভদ্র আবার বলিয়াছিল, "দেখ অজয়, তোমার মনটা নিশ্চয় আজ খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তুমি আজ কেবলই জবাবদিহির কথা ভাবছ, যেন কে সেটা করবে আর কা'র কাছে করবে, সেইটেই আসল কথা, অঘটন যেটা ঘটল সেটা কিছু নয়। আমি এই ক'টি কথা জানি, বাংলার ছেলেমেয়েদের মিলতে হবে, যতটা সম্ভব তাদের পরিচিত অভ্যস্ত জগতের মধ্যে এই মিলনকে ঘটাতে চেষ্টা করতে হবে, সতর্কতার সঙ্গে সব অঘটন-সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি জানি, প্রিয়দাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব খুব বেশী। আমার সব-চেয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়, যখন দেখতে পাই, নিজেদের অন্য-সমস্ত প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য ক'রেও ক্লাবের দিনে ঠিক সময়টিতে তাঁদের এসে বসতে হয়। আর সকলের ক্লাবে আসা-না-আসাটা তাদের নিজ নিজ খুশির ওপর নির্ভর করে, একমাত্র এঁদের করে না। তা বেশ ত, না-হয় করেই না। তাঁদের কাছ থেকে এই স্বার্থত্যাগের মূল্য আমি নিয়েইছি। আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটাকে একটুও ছোট কাজ ব'লে আমি মনে করি না, কাজেই এটা বিশ্বাসই করি যে, এজন্যে অন্ততঃ কতকগুলি মানুষের স্বার্থত্যাগ প্রথমে প্রয়োজনই হবে। প্রিয়দাদের কাছ থেকে এ স্বার্থত্যাগের মূল্য আমি যদি না নেব তবে কার কাছ থেকে নেব? আর, পাবই বা কার কাছ থেকে? সে মূল্য দেবার শক্তি আছে ক'জনের?"

বাহিরে হেমন্ত অপরাহ্ণের নির্মল রৌদ্রে শুভ্র মেঘখণ্ডগুলিকে কে যেন সেদিন ধৌতবস্ত্রের মত করিয়া মেলিয়া দিয়াছিল। অজয়ের ঘরের সম্মুখে যে ছোট বারান্দাটিতে বিমান ফুলের টব সাজাইয়া বাগান করিয়াছিল, সেখানে চড়ুই-দম্পতির প্রণয়বিহার অধীর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। একসারি বক পাখা ঝাপটাইয়া অজয়ের জানালার নীল অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গেল, কাহার নীলাম্বরীর ভাঁজে ভাঁজে যেন আলো পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। এতক্ষণ ক্লাব বসিবার আয়োজন হইতেছে। একটি জরীপাড়-বসানো গরদের জামা এবং

জরীপাড় অমল শুভ্র শাড়ী অজয়ের মনে পড়িল। দুটি নিটোল বাহুমৃণাল ঘেরিয়া লোহিতাভ পাথরের কঙ্কণ ঝলমল করিয়া উঠিল। সম্মুখের খোলা পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আজ হয়ত সে মভ্ পরিয়া আসিবে, কিম্বা পার্প্‌ল্, কিম্বা ময়ুরকণ্ঠী। হাতদুটি মুক্তার ব্রেস্‌লেটে জড়াইলে কেমন দেখাইবে। সেদিন সে কি কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়া আসিয়াছিল, হয়ত আসে নাই, কিছুতেই কেন মনে পড়িতেছে না? কিন্তু সিঁদুর পরিলে তাহার টলটলে সুন্দর কপালটিতে নিশ্চয় বেশ মানায়। ক্রমে তাহার পরিশ্রান্ত চৈতন্যকে ঘিরিয়া এস্রাজের সুর জমিয়া উটিল, পাখোয়াজে গুরু-গম্ভীর ঘা পড়িতে লাগিল, আর সমস্ত ধ্বনিকে আবৃত করিয়া, সমাচ্ছন্ন করিয়া, অলক্ষ্য সূত্রে জটিলতর সমন্বয়ে কোন্ সঙ্গীতের সঙ্গতিতে সেগুলিকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাহার কলহাস্য তাহার দেহের শিরায় শিরায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, মুখরিত হইতে লাগিল।

অজয় সেদিন প্রথম ক্লাবে গান গাহিয়াছিল,

"বন্ধু, তোমার হাসির ছোঁয়াচ লাগে মনে,
সকল ব্যথা পাশরণে।"

বিমান শুনিয়া বলিয়াছিল, "এ ত ব্রহ্মসঙ্গীত নয়, বন্ধুটি যদি দেবতা হন ত নিতান্তই নীট্‌শের দেবতা, হাসতে যখন পারেন, নাচতে গাইতেও পারেন মনে হচ্ছে।"

অজয় স্বভাবতঃ লাজুক, কিন্তু একবার কোনওরূপে বাঁধ ভাঙিতে পারিলে তাহার চিত্তবেগ প্লাবনের মত প্রখর গতিতে সমস্ত সঙ্কোচ-কুণ্ঠাকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া বহিয়া চলে। হাসি-পরিহাস, বিশ্রম্ভালাপ, কপট কলহ, মান অভিমানে বীণার সঙ্গে এমন ব্যবহার সেই হইতে সে করিয়া চলিয়াছে যেন আশৈশব তাহাকে সে জানে। লাজুক বলিয়াই ক্লাবের অপর কাহারও সঙ্গে সে মিশে না, কথা বলে না, অথচ মনোযোগ দিয়া

এই একটি মানুষকে সারাক্ষণ ঘিরিয়া রাখা সেইজন্যই তাহার সহজ হয়। যখন বাণার সঙ্গে বলিবার কথা ফুরাইয়া যায় তখন মন্দিরাকে জুটাইয়া আনে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার কথার স্রোত এবং কলহাস্যের বান ডাকিতে থাকে। নিজের উপর আরোপিত মাতৃত্বের এমন-সমস্ত অধিকারকে মন্দিরা অকুণ্ঠিত-চিত্তে সারাক্ষণ প্রচার করে, যাহা অতি বড় লজ্জাহীনেরও কর্ণমূল আতপ্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া নিভৃত সন্ধ্যা ভরিয়া কত সলজ্জ দৃষ্টি-বিনিময়, কত অস্ফুট হাসির আদান-প্রদানের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে।

পথসঙ্গিনী সেই অপরিচিতা, কবরীভার-পীড়িতা গৌরীর মুখখানি অজয় প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। চকিতে কোনও গৃহবাতায়নে অস্পষ্ট একটি মুখের আভাস নূতন করিয়া তাহার বুকের রক্তে দোলা লাগায়। রক্তস্রোতের সেই দ্রুত চাঞ্চল্য বড় বেদনার মত হইয়া তাহার বুকে বাজে বলিয়া স্বেচ্ছায় সেই তরুণীব চিন্তাকে বেশীক্ষণ সে ধরিয়া রাখে না।

কিন্তু নিজেকে লইয়া এই পলাইয়া বেড়ানো বেশীদিন চলিল না।

১০

সেদিন আর কিছু করিবার ছিল না বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তিনি বন্ধুতে বার বার দেখা ছবিগুলিকে আরও একবার দেখিবার সঙ্কল্প লইয়া বিমানদের ইস্কুলের প্রদর্শনীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভদ্রের জন-দুই চেলা জুটিয়া গেল, শ্যামবাজারে তাহারা একটা কুস্তির আখড়া খুলিতে চায়, সুভদ্রকে সে-কাজের গোড়ার দিক্‌কার ভারটা লইতে বলিতেছে। সুভদ্র তাহাদের লইয়া রাস্তার দিক্‌কার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলে ছবির ক্যাটালগ কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া অজয়

দেখিল, হলের মাঝখানে ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত বিমান মহা উৎসাহে শিল্পকলার উপর সমষ্টি-মনের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার ঠিক পশ্চাতেই একটা থামের আড়ালে বসিয়া একটি তরুণী একমনে কতকগুলি উডকাটের প্রিণ্ট উল্টাইতেছিল ; স্পষ্ট বোঝা গেল, বক্তৃতা তাহার শ্রুতিগোচর করাটাই বিমানের আসল উদ্দেশ্য। সযত্নে তাহাকে পরিহার করিয়া অজয় ছবি দেখাতে মন দিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে হলের বহুদূর কোণ হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বিমানের বক্তৃতা থামিয়া গিয়াছে, সুভদ্রকে লইয়া তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী সেই তরুণীর সঙ্গে সে পরিচয় করিয়া দিতেছে। থামের আড়াল হইতে শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্ত মাত্র দেখিয়াছিল, এবার দেখিল, তরুণী তাহার পথপ্রবাস-সঙ্গিনী জ্যোতির্ম্ময়ী সেই গৌরী। তাহার প্রথমেই মনে হইল, নামিয়া বাহির হইয়া যায়, নতুবা বুকের মধ্যে রক্তস্রোতের প্রখর গভীর আলোড়ন এখনই যেন তাহার চেতনাকে বিকল করিয়া দিবে। কিন্তু সুভদ্রের দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন সম্ভব হইবে না, কেন না সুভদ্ররা যেখানে দাঁড়াইয়াছে, তাহার খুব কাছের জায়গা দিয়াই বাহিরে যাইবার পথ। তখন কতকটা নিরুপায় হইয়া এবং কতকটা তাহাকে উহারা কেহ লক্ষ্য করিতেছে না বুঝিতে পারিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত অজয় তাহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া যাহাকে বিশ্বাস করিত, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি অপলক চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য, ঐ মুখখানিকে দেখিলেও দেখা হয় না। মনে হয়, সমস্তটা দেখা হইল না, মুখের মধ্যে সবচেয়ে যে সৌন্দর্য্যটুকু আসল দেখিবার মত, ক্রমাগত সেইটুকু দেখিতে ভুল হইয়া যাইতেছে। কোন্ আনন্দ-বেদনাময় নিবিড় বিস্মৃতির আবরণ অদৃশ্য অশ্রুজলের মত বারম্বার চোখের সম্মুখে নামিয়া আসিয়া সেই অবশেষ সৌন্দর্য্যটুকুকে আর দেখিতে দিতেছে না। পায়ে লাল রঙের পাঞ্জাবী জুতা, তাহার দেহলতা ঘিরিয়া নবকিশলয়ের মত অস্ফুট সবুজ রঙের শাড়ী অস্ফুটতর হইয়া অজয়ের চোখে পড়িল। সুন্দর বাহুটির স্পর্শকুণ্ঠ কোমলতাকে

পীড়িত করিয়া তরুণী একটি বাজু পরিয়াছে. কঙ্কণে হীরা জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার দেহাতিরিক্ত কোন্ জ্যোতিঃ সে-সমস্তকেই আবৃত করিয়া ম্লান করিয়া অজয়ের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিল। ক্রমে সে অনুভব করিল, তাহার শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের তাণ্ডব নর্ত্তন থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বুকের কাছে কি-একটা যেন সূচীবিদ্ধবৎ বিঁধিতেছে। তরুণীকে সে যত দেখিতেছে, তাহার বুক দমিয়া যাইতেছে। কে একটা ভীরু, কে একটা লোভী তাহার মনের মধ্যে লুকাইয়া ক্রমাগত বলিতেছে, তুমি অপূর্ব্ব, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নাই, তুমি কোনওদিন আমার হইবে না, এতবড় ঐশ্বর্য্য বিধাতা আমার জন্য রাখেন নাই।

সহসা সম্বিৎ পাইয়া বুঝিল, সুভদ্ররা তিনজনেই কথা থামাইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। তরুণীর দৃষ্টির বিদ্যুৎ তাহার রক্তস্রোতের মধ্যে কি তীব্র বেদনা জাগাইয়া বহিয়া গেল। চকিতে ফিরিয়া সম্মুখে যে ছবি দেখিল তাহাই লইয়া সে অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল।

বিমান পশ্চাৎ হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল, কহিল, "যাঁর ছবি এত মন দিয়ে দেখছ তিনি নিজে তোমাকে দেখতে চান, চিত্রের চেয়ে চিত্রকারিণীকে দে'খে কিছু কম ভাল লাগবে না তোমার। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

অজয় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আড়াল হইতে সবুজ আলোর ঝলক আসিল। পলাইবার সঙ্কল্প ভাল করিয়া মনে জাগিবার পূর্ব্বেই সুভদ্র আসিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তারপর স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বলিল, "ইনি আমার বন্ধু অজয় রায়।…অজয়, ইনি শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা দেবী, আমাদের বীণা দেবীর বোন। এঁর আঁকা ছবি তুমি অনেক দেখেছ, এখানেও অনেক দেখতে পাবে, কিন্তু নিতে লোভ কর যদি, ভয়ানক জব্দ হবে। পাছে কেউ লভ্য মনে ক'রে দাম হাঁকে, সেই ভয়ে আগে থেকেই সেগুলিকে তিনি বিতরণ ক'রে রেখেছেন।"

অজয় কহিল, "সেই ত ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে। টাকার মূল্য দিয়ে কি ওগুলোর মূল্য হ'ত? সৌন্দর্য্যের মূল্য ঐরকম ক'রেই পেতে হয়।" কিন্তু কথাগুলি যেন অজয় বলিল না, তাহার হইয়া আর-কেহ বলিয়া দিল। ঐন্দ্রিলা বীণার ভগিনী, সেই সূত্রে কোনও একদিন অজয় তাহার কাছাকাছি আসিবে এই ব্যবস্থা স্বতঃই পূর্ব্ব হইতে হইয়া আছে, ইহার মধ্যে বিধাতার কোন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে ভাবিয়া তাহার দেহ কণ্টকিত হইল।

ঐন্দ্রিলার দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারিল না, তাহাকে সে ভয় করিল। একটু পাশ ফিরিয়া পশ্চাতের দেয়ালে বিলম্বিত ছবিগুলির দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার আঁকা প্রায় দশ-বারোটি ছবি। সেগুলি সুন্দর নয়, সেগুলিকে সে ভয় করিল না, সুন্দর নয় বলিয়াই সেগুলিকে সে ভালবাসিল। তাহার মনে হইল, চতুষ্পার্শ্বের প্রতিভার দীপ্তি সমুজ্জ্বল অগণিত মণিরাজির মধ্যে এই ছবিগুলির দীনতাই তাহাদিগকে যেন একটি শুচি-স্নিগ্ধ বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, যেন শাহদারায় মল্লিকা ফুটিয়াছে। বড় করুণ মর্ম্মস্পর্শী মনে হইল।

বিমান কহিল, "ছবিগুলো ত পালিয়ে যাচ্ছে না। সম্প্রতি ও গুলিকে না-হয় না-ই দেখলে?"

সে বলিল, "ভাল লাগছে।"

ঐন্দ্রিলা অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "ওগুলোকে ভাল লাগা ত সহজ নয়?"

অজয়ের গলায় স্বরে কোথা হইতে জোর আসিল, কহিল, "কত বেশী ভাল যে লাগছে সেইটেই বলা সহজ নয়।"

ঐন্দ্রিলা আবার একটু হাসিল। এ-রকম করিয়া কাহারও ছবির প্রশংসা সচরাচর কেহ করে না, বিশেষতঃ ঐন্দ্রিলা তাহার নিজের ছবির মূল্য জানিত। তাহার কর্ণমূল আতপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অজয়ের দিকে চাহিয়া, তাহার গলার স্বর শুনিয়া মনে হইতেছে না ত যে সে শুদ্ধমাত্র ঐন্দ্রিলাকে খুশী করিবার

উদ্দেশ্যে চাটুবাদের আশ্রয় লইতেছে? নিজের পরিচিত পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক যে-কয়টি যুবকের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে সে মিশিতে পাইয়াছিল, তাহাদের একই ধরণের অতিমার্জ্জিত কপট স্তুতিবাদ শুনিয়া শুনিয়া ঐন্দ্রিলার প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এই যুবকটির ব্যবহারে একটি সহজ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুহূর্ত্তে ঐন্দ্রিলার মন তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিল।

তাহারা চারজনে কেহই আসন গ্রহণ করিল না। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন সেই বিশেষ অবস্থানটির মধ্যে তাহারা প্রত্যেকে এমন একটি কৃতার্থতার সন্ধান পাইয়াছে, একটু কোথাও কিছুর ব্যতিক্রম হইলেই যাহা হারাইয়া যাইবে। অজয় চেষ্টা করিয়াও ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, অথচ প্রতিটি মুহূর্ত্ত কি অসীম সম্পদ্ লইয়াই না বহিয়া যাইতেছে! কি যে ইহার পর সে বলিবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিল না; যে-কথাই মনে পড়ে, মনে হয় তাহা তুচ্ছ, তাহা বলিবার মত নয়। সুভদ্রই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে পরিত্রাণ করিল, কহিল, "আচ্ছা বিমান, তোমাদের আধুনিক শিল্পকলার মধ্যে বৌদ্ধযুগ আত্মপ্রকাশ করছে, এটা কোন্ মনোভাব থেকে হয়েছে?"

বিমান কহিল, "শৈবযুগ বল। সব জড়িয়ে শিবের ছবি কতগুলি 'এক্‌জিবিটেড্' হচ্ছে শুনে দেখেছ? ঐন্দ্রিলা দেবী একটিও শিব আঁকেননি, এজন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর এজন্যে তাঁর যদি বিশেষ একটি পার্থিব ফললাভ না-ই হয়, আমি তাতে অন্তত: দুঃখিত হব না। তবু তিনি শিব আঁকলে তার একটা মানে বোঝা যেত, দেশসুদ্ধ আর্টিষ্ট ছেলে হঠাৎ কি কাম্যফল আশা ক'রে যে দল বেঁধে শিব-গড়াতে মন দিল এটা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়। যদি হত, অজয়কে সে-কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত।"

সুভদ্র কহিল, "শিবই হ'ন আর বুদ্ধই হ'ন, আসলে ব্যাপারটা একই। যারা আঁকছে তারা শৈবও নয়, বৌদ্ধও নয়, অথচ তারা শিব আর বুদ্ধ ছাড়া

আর-কিছু আঁকছে না, এই জিনিষটাকে আমি বুঝতে চাচ্ছি। আমার মনে হয়, আমাদের জাতের শারীরিক অস্বাস্থ্য অনেকটাই এই মনোভাবের মূলে। যতখানি উদ্বৃত্ত উদ্যম মানুষের থাকলে তার পক্ষে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়, আমাদের তা নেই। নিতান্ত জীবনধারণের জন্যে যৎটুকু মেহনত দরকার তা ক'রেই আমরা হাঁপিয়ে যাই। সেজন্যে দেখতে পাই বাংলাদেশের ঘরবাড়ী নিতান্তই ঘরবাড়ী, সেগুলি কোনো হিসেবেই 'আর্কিটেকচার' নয়। যারা বাড়ী তৈরী করে, কোনোরকমে চারটে দেয়ালের ওপর একটা ছাত চাপিয়েই তাদের দম ফুরিয়ে যায়। আমাদের নৌকোগুলো কেবলমাত্র নৌকোই, তাতে ক'রে এপার-ওপার করাই চলে, গোরুর গাড়ীগুলো গোরুর গাড়ী, কোনও রসতীর্থের সন্ধানে সেগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় না। বৌদ্ধযুগের যে শিল্পসম্পদকে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পেয়েছি, সম্প্রতি তাই নাড়াচাড়া ক'রেই আমাদের চলছে, কারণ তাতে মেহনত কম, আর চলবেও ততদিন যতদিন আমাদের জাতের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য প্রচুর হয়ে না ফিরে আসছে। রুগ্ন মানুষকে দিয়ে আর্ট হয় না, আর রুগ্ন মানুষের জন্যেও আর্টের চেয়ে কুইনিনের প্রয়োজন বেশী, এ ত আমরা সকলেই ভাল ক'রে জানি।"

অজয় সচরাচর বিমান এবং সুভদ্রের এই-ধরণের তর্কযুদ্ধে যোগ দিত না। কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাহাদের প্রত্যেকটি কথা অবহিত হইয়া শুনিতেছে দেখিয়া আজ চুপ করিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না। কহিল, "বৌদ্ধযুগের শেষে কোনও এক সময় আমাদের দেশের কাল্‌চারের আত্মা রিপ-ভান্‌-উইঙ্ক্‌লের মত ঘুমিয়ে পড়েছিল, দেড়হাজার বৎসরের ঘুম ভেঙে সেইখানেই আবার জেগে উঠছে।— আমি এতে ত দোষের কিছু দেখতে পাই না। বৌদ্ধসংস্কৃতিকে অস্বীকার ক'রে একদিন যে পাপ আমরা করেছিলাম, দেড়হাজার বৎসর পরে এইরকম ক'রে হয়ত তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করছি, মন্দ কি?"

সুভদ্র তর্ক তুলিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি নিজেই তোমার কোনো একটা লেখায়

বলেছ, বৌদ্ধধর্ম্ম অনভিপ্রেতকে অতিক্রম করবার উপায় বলেছে, মানুষকে তার পরম অভিপ্রেত যা তার সন্ধান দিতে পারেনি। রোগমুক্তির ওষুধ দিয়েছে, সুস্থ শরীরের পথ্য-নির্দ্দেশ করতে পারেনি।"

কথার স্রোত ইহার পর প্রখর-ধারায় বহিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত আগে কুণ্ঠিত সঙ্কোচের আতিশয্যে যে পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই অজয় এখন কেবল যে ঐন্দ্রিলাকেই আর লজ্জা করিল না তাহা নহে, তাহার চতুষ্পার্শ্বকেও সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করিল। অন্তরের এমন-সমস্ত গভীর অনুভূতিকে ব্যক্ত করিল যেগুলিকে ইতিপূর্ব্বে নিজেও নিজের কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। এমন-সমস্ত অপূর্ব্ব আশার কথা তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল যাহা তাহার নিজেরই মনের কথা বলিয়া নিজে সে এতদিন জানিত না। এমন উদ্দীপনা প্রকাশ করিল যাহা তাহার স্বভাবে অসম্ভব বলিয়াই নিজে এতকাল সে বিশ্বাস করিত।

অজয়ের সঙ্গে মন্দিরার পিতার চেহারার সাদৃশ্যের কথাটা ঐন্দ্রিলা ইতিমধ্যে কোনও একদিন শুনিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাদৃশ্যটা সত্যই যে কোন্‌খানে তাহা ত জানি না। ও হাসিলে হয়ত কতকটা সেইরকম দেখাইতে পারে, কিন্তু সহজে যে হাসিবে তাহা ত মনে হয় না। এই ত বয়স কিন্তু, বাবা, কি গম্ভীর!

অজয় তখন বলিতে চাহিতেছিল, বুদ্ধদেব এটা বুঝিয়াছিলেন যে সুস্থ শরীরের পথ্য নির্দ্দেশ করিয়া না দিলেও ক্ষতি নাই, সেটা নিজের প্রয়োজনে এবং শক্তিতে নিজেই মানুষ সংগ্রহ করিয়া থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজন একমাত্র অসুস্থের জন্যই। দেশের চিন্তায় কর্ম্মে ব্যবহারে তখনকার দিনে যে অসুস্থতা দেখা দিয়াছিল, নিজের বুদ্ধির দর্পে তিনি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বাহির হইতে ধর্ম্ম দেওয়া যায় না, সেটা প্রতি-মানুষের নিজস্ব জিনিষ। একমাত্র অধর্ম্মকে আঘাত করাই যায়, ধর্ম্ম তারপর নিজেকে নিজে প্রকাশ করে।

ঐন্দ্রিলা ভাবিতেছিল, বাংলাদেশের তরুণরা তরুণীদের শোনাইতে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সত্যই কি কিছু সুখ পায় ? পায় হয়ত, কে জানে ? ক্রমে সে কৌতূহলী হইয়া অজয়ের কথায় মন দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এত উৎসাহ করিয়া বলিতেছে, প্রত্যেকটি কথা অন্তরের সত্যকার উপলব্ধি হইতে বলিতেছে বলিয়াই মনে হয়, না-শোনাটা নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার হইবে।

অজয় এই বলিয়া শেষ করিল, "অসত্যের বন্ধন থেকে দেশের মনকে বুদ্ধদেব আন্তরিকতার যে-ক্ষেত্রে মুক্ত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন তারই উপর ধর্ম্মাশোকের সাম্রাজ্য, তাম্রলিপ্তির বৈভব, অজন্তার শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তারপর দেশের মহাপুরুষেরা তাঁদের বিধি-বিধান নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন সেই মুক্ত আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। শাস্ত্রপঞ্জিকা তৈরী হল, মঠ-মন্দির গড়ল, মানুষের মনের জায়গায় পুরোহিতেরা বসলেন। সেদিন যে আত্মপ্রবঞ্চনায় দেশের মন অভ্যস্ত হল, আজও অবধি তার জের টেনেই আমরা চলেছি। আসল মানুষটাকে কোথায় ফে'লে এসেছি কেউ জানি না, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নকল মানুষটার হারমানার আর শেষ নেই।"

ইহার পর কিছুক্ষণ আর কেহই কোনও কথা কহিল না। সুভদ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা ইতিহাস সম্বন্ধে কখনও গভীর করিয়া কিছু ভাবে নাই, ভাবিবার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। বিমানের বক্তৃতা দিবার প্রয়োজন যাহা ছিল তাহা সে আগেই সমাধা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই জানিত না যে, অজয়ের কথার মধ্যেকার আবেগ অকস্মাৎ একটি নারীচিত্তে গিয়া প্রহত হইয়াছে এবং তাহার অত্যন্ত নিবিড় সজাগ চৈতন্যে যে-দোলা লাগিয়াছে তাহা কিছুতেই আর থামিতে চাহিতেছে না। দেশের বিষয়ে ঐন্দ্রিলা কখনও যে, কিছু চিন্তা করে নাই তাহা নহে। কিন্তু যখনই ভাবিতে বসিয়াছে, দেশের বহুমুখী সমস্যার বিপুল জটিলতায় তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তখন ইহাই মনে করিয়া নিজেকে সে সান্ত্বনা দিয়াছে, যে, ভারতবর্ষে আন্তরিকতা, বুদ্ধি এবং শক্তি সম্পন্ন

মানুষের ত অভাব নাই, তাঁহারা নিশ্চয় এই-সমস্ত সমস্যার কথা ভাবিতেছেন, সমাধান তাঁহাদেরই দ্বারা কোনও-না-কোনও দিন হইবেই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যের সূত্র যে এত দূর-অতীতকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনা মাত্রেই তাহার কল্পনা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অজয়ের দিকে দুই চোখের গভীর দৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল, "আপনি কি তাহলে বলতে চান, বৌদ্ধধর্ম্মকে যে জায়গায় আমরা অস্বীকার করেছিলাম আবার সেইখানেই তাকে স্বীকার ক'রে আমাদের আরম্ভ করতে হবে?"

অজয় কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চুপ করিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার প্রশ্নের উত্তর ভাবিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না, উত্তর তাহার জানাই ছিল। কিন্তু যুক্তিকে কেবল যুক্তির ক্ষেত্রেই একান্ত করিয়া না দেখিয়া, বাস্তব-জীবনে তাহাকে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিবার নারীচিত্তের এই যে প্রয়াস, ইহার অত্যন্ত কঠোর কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী সরলতা তাহার মনকে অভিভূত করিল। এতক্ষণ নির্ব্বিচার আবেগ হইতে কথা বলিতেছিল, এবারে প্রত্যেকটি কথাকে তৌল করিয়া সাবধানে কহিল, "আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই একটা অস্বীকৃতি, তাকে নূতন ক'রে স্বীকার করবার কোনও অর্থ নেই। নিজের ওপর, নিজের কর্ম্মফলের ওপর মানুষের যে চূড়ান্ত নির্ভর তা বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই বিদ্রোহকে আমাদের দেশের মনে আবার জেগে উঠতে দেখলে আমি খুশী হই। সত্যকে অনাবৃত রূপে দেখবার যে ক্ষমতা, সমস্ত বিধি-বিধান নিয়ম-কানুনের ওপর নিজের মনুষ্যত্বকে দর্পের সঙ্গে স্থাপিত করবার যে সাহস তাই আমার কাছে চিরকালের বৌদ্ধধর্ম্ম।"

ঐন্দ্রিলা বিশেষ-কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার গায়ে কাঁটা দিল। সে এইটুকু মাত্র অনুভব করিল যে, দেশের মনে আত্ম-প্রবঞ্চনা সর্ব্বত্র নিবিড় এবং জটিল হইয়া জমিয়া আছে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ ভিন্ন সে জটিলতার সমাপ্তি হইবে না। অজয়ের গলার স্বরে সেই অগ্নিদাহের আঁচ যেন আসিয়া তাহার গায়ে

লাগিল। কোন্ একটা সর্ব্বনাশ-আশঙ্কায় অজয়কেও একমুহূর্ত্তের জন্ম সে ভয় করিল।

অকস্মাৎ বিমান বলিয়া উঠিল, "নাঃ, আসল কথাটার কোনও মীমাংসাই তোমাদের কাউকে দিয়ে হল না। সুভদ্র যদি দেশের লোকের হারানো স্বাস্থ্য তাঁর কোনও টোট্‌কার সাহায্যে তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন তবে তাতে দেশের শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি হোক আর না-ই হোক, সেটা এমনিতেই একটা খুব বড় কাজ হবে। আর অজয় যে দর্পের কথা বলছেন, আজকের এই প্রদর্শনীর কোনও বুদ্ধ বা শিবের মধ্যে তার প্রকাশ নেই। সম্প্রতি আমি অত্যন্ত দর্পের সঙ্গেই বলছি, এক-পেয়ালা চা না হলে আমি আর কিছুতেই পেরে উঠব না।"

সুভদ্র কহিল, "চেঁচাল ত অজয়, গলা শুকিয়ে উঠল কি তোমার?"

বিমান কহিল, "কার্য্য-কারণটাকে উল্টো ক'রে দেখছ। গলা শুকিয়ে আছে ব'লেই চুপ ক'রে আছি, নয়ত অজয়ের সবক'টা কথার জবাব ছিল। এক পেয়ালার ব্যবস্থা ক'রে দাও ত সেটা এখনই প্রমাণ ক'রে দিতে পারি।"

সুভদ্র কহিল, "রক্ষা কর, চা-টা তাহলে থাক। এরপর তোমার বক্তৃতা সুরু হলে আমি একরকম ক'রে টিঁকে যাব কিন্তু এঁর দশা কি হবে?"

পশ্চাৎ হইতে বীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠিল। বীণা কখন অলক্ষ্যে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, ইহারা কেহই তাহা টের পায় নাই, মৃদুহাস্যের মিশাল দিয়া কহিল, "ঐন্দ্রিলাও খুব টিঁকে থাকবে, কিন্তু বিমান-বাবুর যে-রকম অবস্থা দেখছি, চা না পেলে সত্যিই বেশীক্ষণ টিঁকতে না পারেন। একটা উপায় ভাবুন না, সুভদ্রবাবু।"

বিমান কহিল, "আঃ. আপনি এসেছেন, বাঁচলাম। উপায় ভাববার ভার আপনার ওপর। জীবনের মরুভূমিতে তৃষ্ণা জাগাবার ভার আমাদের,

তার ওয়েসিসের সন্ধান একমাত্র আপনাদেরই জানা আছে।” সুভদ্র পাশ হইতে লুকাইয়া তাহাকে বিষম একটা টিপুনি দিল।

বীণা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “আচ্ছা, উপায় আমিই না-হয় ভাবছি। বেশী ভাবতে হবে না, ওয়েসিস নীচেই আছে, হোটেলে, তবে সেটা আমার বা আমার স্বজাতীয়া কারুর সম্পত্তি নয়।”

সেইখানেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল, বলিল, “ইলু বোস্ না”। তাহার দিকে চহিয়া, তাহার কলকণ্ঠের বাধাহীন সুধাস্রোতে দুই কানকে ডুবাইয়া দিয়া সকলে ভাবিতে লাগিল, এই মেয়েটি যেন মূর্ত্তিমতী বাস্তবতা। ইহার চতুর্দ্দিকে কোথাও আত্মপ্রবঞ্চনার কোনও আড়াল নাই। জীবনকে সহজভাবে ধরিবার এবং নিজেকে জীবনের কাছে সহজভাবে ধরা দিবার জন্য এ যেন সারাক্ষণ প্রস্তুত হইয়াই আছে। অতীতকে সে জানে না, জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎ তাহাকে প্রলুব্ধ করে না। অতীতের অস্পষ্টতা এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার হইতে এই কয়টি মানুষের মনকে এক মুহূর্ত্তে ফিরাইয়া লইয়া সে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রবহমান জীবনের জ্যোতির্ম্ময় আবর্ত্তের মধ্যে সবলে নিক্ষেপ করিল। কোন্ অদৃশ্য তরঙ্গাঘাতে সহসা প্রত্যেকটি চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিল।

আবার গল্প জমিয়া উঠিতেছিল, বীণাই বাধা দিয়া কহিল, “চা খেতে কে কে যাবেন শুনি ?”

সকলে উৎসাহ করিয়া প্রস্তুত হইল, কেবল ঐন্দ্রিলা বীণার কানে কানে কহিল, “আমি ভাই যাব না, তোমরা যাও, আমায় এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে।”

বীণা ঐন্দ্রিলার স্বভাব জনিত, তাহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। ডাকিল, “রাহু !”

রাহু অনতিদূরে দাঁড়াইয়া কপট অভিনিবেশ সহকারে মহাপরিনির্ব্বাণ

বিষয়ক একটি ছবি দেখিতেছিল, হোটেলে যাইবার প্রস্তাবটা সম্পূর্ণই তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সোৎসাহে কহিল, "কি ?"

বীণা বলিল, "একটু আয় এদিকে।" রাহু তাড়াতাড়ি কাছ ঘেঁসিয়া আসিলে কহিল, "রাহু-সর্দ্দার, তোমার ইলুদিকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী যাও। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষমানুষ একজন পাহারা থাকা চাই কিনা ?"

রাহু বীণার সঙ্গে মাত্র কয়েকমুহূর্ত্ত আগেই আসিয়াছিল, মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল, "বা-রে, আমি একটাও ছবি দেখলাম না !"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আচ্ছা, এস, এস, তোমাকে আমি ছবি দেখিয়ে আনছি।"

অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া রাহু তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আর-একজন মানুষের মুখে কাতরতা বেশ স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ পাইল, সে অজয়। ঐন্দ্রিলা যে সকলের সঙ্গে মিলিয়া চা খাইতে নীচে আসিল না, এ জিনিষটা তাহার অসহ্য অহঙ্কারের মত হইয়া অজয়ের চোখে লাগিল। তাহার অহঙ্কার দিয়া অজয়ের আত্মাভিমানকে সে যেন আঘাত করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অজয়ের মনে হইতে লাগিল, কোন্ পরাজয়ের অপমান শিরে বহিয়া সে যেন তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফিরিতেছে। দেশের অগ্রসর বা অনগ্রসর কোনও সমাজেরই স্ত্রীজাতি-সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতিতে সে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না, তাই বীণার অন্তকার ব্যবহারের মধ্যে যে একটি দারুণ দুঃসাহসের পরিচয় ছিল তাহা তাহার চোখে পড়িল না। মনে মনে অকারণেই ঐন্দ্রিলাকে সে অপরাধী করিতে লাগিল। এমন কি, কি উপায়ে অন্তকার অপমানের যথাযোগ্য প্রতিশোধ সে লইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা করিতে সে ত্রুটি করিল না।

পেয়ালাতে ধূমায়িত চা ঢালিতে ঢালিতে বীণা কহিল, "কি নিয়ে এত গল্প হচ্ছিল ?"

সুভদ্র কহিল, "বৌদ্ধধর্ম।"

বীণা তাহার টলটলে সুন্দর ঠোঁটটিকে একটু উল্টাইল, তারপর চিনির পাত্র হইতে চিমটায় করিয়া ডেলা চিনি উঠাইতে উঠাইতে কহিল, "অজয়-বাবু আশা করি বুদ্ধদেবের পন্থা অনুসরণ করবেন না?"

বিমান কহিল, "তার আশু সম্ভাবনা ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। বিপরীত লক্ষণগুলোই আজকাল বরং প্রবল।"

অজয় কহিল, "বুদ্ধদেবের পন্থা অনুসরণ করলেই বা ক্ষতি কি?"

বীণা কহিল, "আপনার আছে, বুদ্ধদেবের ছিল না। জীবনের মধ্যে মজা যেটুকু সেটুকুকে উপভোগ ক'রে নিয়ে, তারপর যখন সবদিক্ দিয়ে ঠেলা সামলাবার সময় তখন ছেলেপিলে ঘরসংসার স্ত্রীর কাঁধে ফে'লে দিয়ে পিঠটান দেওয়া, এতে আর মুস্কিলটা কোন্‌খানে? বুদ্ধদেব চালাক লোক ছিলেন তা বলতে হবে।"

১১

সে-রাত্রে অজয় বাড়ী ফিরিয়া বহুক্ষণ ছাতে গিয়া একাকী বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, মর্ম্মান্তিক আনন্দ-বেদনা-ভরা এমন পরিপূর্ণ সন্ধ্যা একটিও আর তাহার জীবনে আসিয়াছে কিনা, স্থির করিল আসে নাই। কিন্তু ক্রমে তাহার চিন্তাতে আনন্দকে ছাপাইয়া বেদনা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ যাহাকে অত্যন্ত অভাবিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাছে পাইয়াছিল, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভরিয়া তাহাকে কাছে না পাইবার বেদনা তাহার মনকে জুড়িয়া রহিল। কাল সকালে ঘুম ভাঙিয়া রাত্রিতে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কি উপায়ে নয়নের জ্যোতিঃ-স্বরূপিণীকে আর-একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য দুনয়ন ভরিয়া দেখিতে পাওয়া

যায়, ইহাই ভাবিয়া তাহাকে অস্থির হইয়া থাকিতে হইবে। অতঃপর, যাহা অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি দিয়া চাহিয়াও সে পাইবে না জানে, তাহা পাওয়ার অধিকার তাহার নাই, তাহাতে লোভ করা তাহার ধৃষ্টতা, নিজেকে এই নিদারুণ আঘাত দিয়া বেদনা পাইয়া অপর বেদনাকে সে ভুলিতে লাগিল। সে যে অযোগ্য, সে যে অকিঞ্চিৎকর, তাহার জীবনে যে ঐশ্বর্য্য সে পাইতে লোভ করে তাহার বিনিময়ে কিছু যে তাহার দেওয়ার সাধ্য নাই, নিজের এই দীনতার অভিমানকে সারাক্ষণ সে মনের সম্মুখে ধরিয়া রহিল।

মনে পড়িল, ঐন্দ্রিলাকে যে-কয়টি মূল্যবান্ মুহূর্ত্ত সে আজ কাছে পাইয়াছিল, একবারও দুই চোখ ভরিয়া তাহাকে সে দেখিয়া লয় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর দুই কানে শুনিয়াছে, অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করে নাই। নিজের বিমুগ্ধ অন্তরের প্রীতি-নিবেদনকে নিজের দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া একবারও তাহার দিকে সে তুলিয়া ধরে নাই। অথচ এই আকস্মিক সাক্ষাতের পূর্ব্বে প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটিকে, কত রঙীন কল্পনার তন্তুজাল বুনিয়া সে রচনা করিয়াছে, চেতনা-নিবিড় কি পরম অনুভূতির মধ্যে এই ক্ষণটিকে বরণ করিয়া লইবে বলিয়া তাহার অন্তঃকরণকে সে প্রস্তুত করিয়াছে।...সে কত গল্প-উপন্যাস পড়িয়াছে, নাটকের অভিনয়, বায়স্কোপের ছবি দেখিয়াছে, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রথম সাক্ষাতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, এরূপ কখনও দেখে নাই। কি অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া সে!

সন্ধ্যায় যে কয়টি কথা আজ সে বলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিকে নিজের মনে সাবধানে বারম্বার সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, প্রতিবারেই প্রায় প্রত্যেকটি কথাকে তাহার বেশী করিয়া অর্থহীন এবং উপহাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রমে সব-কিছু লইয়া সে বেদনা পাইতে লাগিল, নিজের উপর দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাহার দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতে

লাগিল, নিজের অক্ষমতা অযোগ্যতা লইয়া নিজেকে নিদারুণ পরিহাসে সে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল।

নিদ্রাবেশ অতর্কিতে আসিয়া তাহার চিন্তাকাশের স্বচ্ছতাকে বারংবার অভিভূত করিয়া দিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া উত্তেজিত চিন্তার প্রখর গতিচ্ছন্দের মধ্যে বড় বড় ফাঁক। নিজের জৈব-চৈতন্যের এই বিড়ম্বনাও আজ অতি-বড় পরাজয়ের মত হইয়া তাহার মনে বাজিল। খাটের উপর ছোট বিছানাটিতে ততোধিক ছোট নিজের দেহটা লইয়া সে যে ধূলি-মলিন ভূমিতলের কত কাছে তাহা চিন্তা করিয়াও আজ সে পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। যত ভাবে, অলক্ষ্যে তাহার চতুর্দ্দিকে আশার প্রসার, সম্ভাবনার প্রসার সঙ্কীর্ণ হইতেও সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসে। তাহার অন্তরের আশৈশব-লালিত যে উদ্‌গ্রীব দুরাশা অসীমতায় সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লোভ করিত, চারিদিকের সীমাবদ্ধতায় আজ তাহার পাখাসঞ্চালন করিবারও স্থানাভাব ঘটিতে থাকে।

ক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে নিরুপায়তা এমন করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আসিল যে, তাহার চৈতন্য সঙ্কুচিত হইতে হইতে একটি বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিল। এত তুচ্ছ জিনিষকে লইয়া ভাবিতে, দুঃখ করিতে ভাল লাগে না, চিন্তার রাশ আলগা করিয়া দিয়া শেষ-রাত্রির দিকে অলক্ষ্যে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জানে না।

ভোরে উঠিয়া দুতলার পার্টিশান-দেওয়া বারান্দার একধারে ডিস্‌পেন্‌সিং টেবিলে সুভদ্র তাহার নিজের উদ্ভাবিত ফরমুলা অনুযায়ী কি-এক রসায়ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। নন্দ ভোর না-হইতেই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, রোজ যেমন যায়। অছিলা প্রাতর্ভ্রমণ, কিন্তু সবাই জানে চায়ের সময়টা বাড়ীতে উপস্থিত না থাকাটাই তাহার আসল উদ্দেশ্য। তিনি বন্ধুর সংসার-যাত্রার প্রথম হইতেই নিজেকে সে ভারস্বরূপ মনে করিতেছে, প্রত্যহ এক-

পেয়ালা চা এবং দুই টুকরা রুটি বাঁচাইয়া তাহাদের এই ভারকে সে যথাসাধ্য লাঘব করিতে চায়। স্নানের ঘরে বিমান প্রায় আধঘণ্টা হইল কল খুলিয়া বসিয়া আছে, খরস্রোতে জল ঝরিয়া পড়ার শব্দে ছোট বাড়ীটি মুখরিত। হঠাৎ চোখ চাহিয়া অজয় অনুভব করিল, বেদনাতুর যে-মানুষটাকে নিজের মধ্যে লইয়া রাত্রিতে সে ঘুমাইতে গিয়াছিল, ত্রিভুবনে কোথাও যেন সে আর নাই। এমন অনেক দিন হয়, ঘুম ভাঙিয়া পুরানো আমিটাকে সহসা নিজের মধ্যে সে খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু আজ নিজের হইতে বৃহত্তর কোন্ অভিনব চৈতন্যের মধ্যে সে যেন চোখ মেলিল। যেন তাহার অস্তিত্ব তাহার দেহ অতিক্রম করিয়া আজ দূরে দূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। যেন শীতারুণদীপ্ত আকাশ জুড়িয়া তাহারই চৈতন্যের আবেগ আজ কাঁপিতেছে। অকারণেই তাহার বুক আজ ভরিয়া উঠিল। জীবনকে অপরূপ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, অসাধ্য কিছু থাকিবে না, বিধাতার নিজ হাতে আঁকা এই জয়লিপি ললাটে লইয়াই সে যেন পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

পরিপূর্ণ বক্ষে ঐন্দ্রিলার নামটি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বার-বার সে উচ্চারণ করিল। একটা প্রিয় গানের সুর কানের কাছে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল,

"তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।"

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পূবদিকের জানালাটা সে খুলিয়া দিল। যেন তাহারই জন্য কোন্ অভিনন্দন বহন করিয়া একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণিম আলো তাহার পায়ের কাছে আসিয়া লুন্ঠিত হইয়া পড়িল। রাস্তার কৃষ্ণচূড়া গাছটার একটা শাখা ফুলপল্লবের অর্ঘ্য বহিয়া কবে হইতে যে একেবারে তাহার বাতায়নের কোণটিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এতদিন সে তাহা লক্ষ্য করে নাই, এজন্য নিজেকে তাহার অপরাধী মনে হইল।

সুভদ্র কহিল, "পাচন খেয়েছ?"

অজয় কহিল, "আজ থাক।"

সুভদ্রের নিজের তৈয়ারী পাচন। অজয় খাইয়াই তাহাকে অনুগৃহীত করে। সে ইহা লইয়া তাই আর উচ্চবাচ্য করিল না, এক পেয়ালা চা ঢালিয়া নীরবে অজয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

আজিকার প্রভাত অনাদিকালের সমস্ত পথ বহিয়া অজয়ের মনের দ্বারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারই জন্য অসীমতা জুড়িয়া আজ এই মুহূর্তে কত কোটী সূর্য্য জ্বলিয়াছে। পাচন খাইয়া তাহাকে দেহধারণ করিতে হয় এই কথাটাকে সে আজ ভুলিয়া থাকিতে চায়।

বিমান চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া ড্রেসিং গাউনটাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে হঠাৎ কহিল, "তোমার কাছে দশটা টাকা হবে, সুভদ্র?"

সুভদ্র কহিল, "হবে কি না, পুঁজিপাটা খতিয়ে পরে বলছি, কিন্তু এ মাসে তুমি বড্ড বেশী খরচ করেছ, এত টাকা নিয়ে কি কর?"

বিমান কহিল, "সাধে কি এ দেশের লোকের কিছু হয় না? টাকার অভাবে কত-কি করতে পাই না, সে খোঁজটাই না হয় ভুল ক'রে একদিন করতে?"

সুভদ্র কহিল, "হ্যাঁ, অভাব-বোধ ত তোমার কত। কলকাতায় বাড়ীঘর রয়েছে, অবস্থাপন্ন বাপ, মা-ভাই-বোন, কিছুতে তোমার মন ওঠে না। সব ছেড়ে বেদুইনের মত ঘুরে বেড়াবে, বাপের দেওয়া টাকা ছুঁলে তোমার জাত যায়। কবচ্ছর ত আমার সঙ্গে রয়েছ, দেখছি। অভাব অনটন আছেই, ভ্রূক্ষেপও কর না। কেন নিজেকে এ রকম ক'রে কষ্ট দাও? কতদিন ধ'রে বলছি, দেখেশুনে কাজকর্ম্ম একটা জুটিয়ে নাও। কেবল ছবি এঁকে কিছু হয় না, তা ত দেখতেই পাচ্ছ।"

বিমান কহিল, “কি এমন কাজ আছে যে করতে পারি ?”

“না হয় ছাত্রই গোটাদুই জুটিয়ে নাও. এবেলা-ওবেলা ছবি-আঁকা শেখাবে।”

“কত পাব তার থেকে আশা করছ ?”

“কিছু ত পাবে ?”

“হুঁ। গোড়ার দিকে কিছুদিন মাইনেটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।”

“তার অর্থ ?”

“একটা magnifying glass কিনতে সেটা খরচ হয়ে যাবে। উপার্জ্জন-টাকে অতঃপর চোখে দেখতে হবে ত তোমায় ?”

“কিছু তবু ত একটা করতে হবে ? এরকম ক'রে চিরকাল কখনও চলতে পারে না।”

“দু-পয়সা ঘরে এনে সুখেস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারি এমন কোনও পথ এই হতভাগা দেশে আমার জন্যে খোলা নেই।—এক ইনস্যু-রেন্সের দালালীর কাজ ছাড়া।”

“তা সেটা ত কুকাজ কিছু নয় ?”

“তা নয়, তবু সেটা আমি করব না। যে-কারণে পানের দোকান করতে পারি অথচ করব না, সেটাও অপকর্ম্ম কিছু নয়। আমি এটা বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে যে-কাজের থেকে আমি অন্ন আহরণ করব, তাকে মায়ের মত ক'রে আমায় ভালবাসতে হবে। তা যদি না পারি, সে-কাজের প্রতিও অবিচার করব, নিজের প্রতিও সুবিচার করা হবে না। যে-কাজটা কুকাজ নয় তুমি বলছ তাকে মায়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা কোনোদিনই আমি দিতে পারব না।”

“তুমি যাই বল বিমান, এই দরিদ্র দেশে কেবল ছবি এঁকে কোনওদিন পেট ভরবে না, এ আমি তোমায় লিখে দিতে পারি।”

“বেশ ত, তাই যদি হয়, উপবাস ক'রেই দেশের দারিদ্র্যের যে পাপ

তার প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু যে পাপ আমার নয়, তার জন্যে আমাকে দোষারোপ করলে চলবে কেন? বিধাতা যে-কাজের যোগ্যতা দিয়ে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, সে-কাজ একদিনের জন্যেও আমি অবহেলা করিনি, আমার দিক্ থেকে এইটুকু কেবল আমার দেখবার। অবহেলাটা আর-কোথাও আর-কারও দিক্ থেকে হচ্ছে। তারা কে তা জানি না, কিন্তু তারা এই দেশেরই মানুষ। তাদের পাপের ফল ভোগ আমি করছি।"

স্নভদ্র নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া দশ টাকার একটা নোট আনিয়া বিমানের হাতে দিল। অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া টাকাটা লইয়া বিমানও কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, "যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তুমিও দেখতে পাবে, ভুল ক'রে একটা লক্ষ্মীছাড়া দেশে জন্মানো ছাড়া আর-কোনো অপরাধ আমি করিনি। যে-দেশের লোক দারিদ্র্যকে আত্মিকতা ব'লে পূজো দেয় তারপর গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায় অষ্টপ্রহর আত্মা কাকে বলে তা মনে আনবার সময় পায় না। নিজের আর্টিষ্টদের খেতে দিতে পারে না, আবার দেশে আর্ট গ'ড়ে উঠবে এও আশা করে। এদেশের আর্টিষ্ট ছোক্‌রারা কেবল শিব কেন আঁকে কাল জানতে চেয়েছিলে, কারণটা আমার মুখ থেকে আজ শোন। শিব আঁকে এইজন্যে যে সাহেবরাই একমাত্র ছবি কেনে, আর তারা শিবের ছবি চায়। সত্যিকাবের আর্ট তাদের দেশে ঢের আছে, তোমাদের সেজন্যে তারা পয়সা দেবে কেন? তারা grotesque কিছু চায়, দেশে নিয়ে গিয়ে বলতে পারবে, দেখ ছবি, খাঁটি আর্ট নয়, কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। শিব আঁকলে ছবির ভারতীয়ত্বে সন্দেহ করবার কিছু থাকে না, সাহেবরা কেনে, এই হচ্ছে শিব আঁকার ভেতরকার কথা। আর্টিষ্টদের দোষ দেবে কি ব'লে? তাদের কোনো দোষ নেই। শিব-আঁকাটাও ত অপকর্ম কিছু নয়।"

স্নভদ্র বলিল, "তোমার সমস্যা মেটাতে হ'লে যদি দেশের ত্রিশ কোটী

মানুষের অন্ন-সমস্যা আগে মিটিয়ে নিতে হয় ত সে-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।"

বিমান বলিল, "কি আর করব বল, আমার দুর্ভাগ্য। কোনো সমস্যাকে আলাদা ক'রে নিয়ে নিজের সুবিধার জন্যে ছোট ক'রে দেখা আমার স্বভাবে নেই।"

বসিয়া বসিয়া অকস্মাৎ গৃহের মধ্যেকার এই তর্কযুদ্ধকে অজয়ের অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। বিমান বৃহৎ করিয়া দেখিবার কথা বলিতেছে, কিন্তু সে যে-সমস্ত সমস্যার কথা বলিতেছে তাহার একটিও কি বৃহৎ? শিবের ছবি কেহ আঁকিল কিংবা আঁকিল না, এই বিপুল বিশ্ব-ব্যাপারে সত্যই কি তাহাতে এমন-কিছু আসিয়া যায়? কে জানে, হয়ত সমস্ত জিনিষের আসল মূল্য চিরকালের যে হিসাবের খাতায় জমা হইতেছে সেখানে পৃথিবীর মানুষের সমগ্র শিল্পপ্রচেষ্টা অপেক্ষা সকলের দৃষ্টির অগোচরে নিভৃত বিলের জলের বুকে মাছরাঙার চকিত একটি ছায়াও ঢের বেশী মূল্যবান্। ইহারা চতুষ্পার্শ্বের এই অত্যন্ত সচেতন জাগ্রত অসীমতার বিপুল রহস্যে আবৃত হইয়া বসিয়া দুদণ্ডের জন্যও নিজেদের অন্তরের আগ্রহকে কোন্ অর্থহীনতার শূন্য গহ্বরে ঢালিয়া দিতেছে, এই জিনিষটিকে অত্যন্ত অদ্ভুত অমার্জ্জনীয় অপচয় বলিয়া হঠাৎ সে আজ অনুভব করিল।

সে বুঝিতে পারিল, অসীমতার সঙ্গে কোথাও কোনরূপে যাহার যোগ নাই এমন কোনও বস্তুকে সমাদরে তাহার জীবনে সে আহ্বান করিতে পারিবে না। বাহিরের এই আকাশ, এই গ্রহচন্দ্রতারা, এই রৌদ্র বৃষ্টি কুজ্ঝটিকা, যুগে যুগে সার্থকতা হইতে সার্থকতায় বিশ্বসৃষ্টির বিরামহীন এই জয়যাত্রা, এ-সমস্তের সঙ্গে তাহার সুখদুঃখ যতদিন সম্বন্ধ-বিহীন থাকিবে ততদিন কিছু লইয়াই তাহার জীবনের অভাব মিটিবে না।

তাহার মনে হইল, তুচ্ছতা যেন তাহার সমস্ত দেহে গ্লানির মত হইয়া

লিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিতেছে, বাহিরের অজস্র জ্যোতিঃবৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়ে ও সেই গ্লানিকে প্রক্ষালিত করিয়া লয়, তারপর নিজের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ভুলিয়া গিয়া প্রভাতের আকাশে দেবতার মত সদর্পে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

হঠাৎ রাস্তার দরজার কড়াটা রুদ্রতালে নড়িয়া উঠিল। প্রকৃতিস্থ মানুষ এত জোরে কড়া নাড়ে না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তর্ক থামাইয়া সুভদ্র ব্যস্তভাবে বৈকুণ্ঠনাথকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ বাজার হইতে ফিরে নাই, উপরে রান্নাঘরে পাশাপাশি দুটি উনুনে ডাল ও ভাত চাপাইয়া দিয়া ছাতের আলিসায় ভর দিয়া উড়িয়া-ঠাকুর পাশের বাড়ীর আয়ার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নিরত। নন্দ কখন বাড়ী ফিরিয়াছে, তিন বন্ধুর কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। "যাচ্ছি" বলিয়া প্রায় ঝড়ের মত ছুটিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

দরজা খুলিতে যে দুই মিনিট দেরি হইল তাহার মধ্যে আরও পাঁচ সাত বার কড়াটা সজোরে নড়িয়া উঠিল এবং প্রতিবারেই ধ্বনির পরিবর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়া বাহির হইল। একটু পরেই পাড়ার দুই-তিনটি ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি এবং কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করিয়া পুলিশের একজন দারোগা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। নামধাম না জানাইয়া, অনুমতি না লইয়া, তিনজন ভদ্রযুবকের পবিত্র পাঠাগার ও বিশ্রামকক্ষে একদল অপরিচিত মানুষ কি বলিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে, অজয় চমৎকৃত হইয়া তাহাই ভাবিতেছে এমন সময় স্মিতহাস্যে সকলকে শিষ্ট-সম্ভাষণ করিয়া দারোগা তাঁহার আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। জানা গেল, নন্দলাল 'পোলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট,' সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কোন গণ্ডগ্রামে একটা রাজনৈতিক ডাকাতি হইয়া যাওয়াতে সে-সম্পর্কে তাহার খোঁজ পড়িয়াছে। কলেজের কেহ তাহার বাড়ীর ঠিকানা জানে না, গোয়েন্দার সাহায্যে তাহার আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহারা আজ আসিয়াছেন, সঙ্গে অবশ্য খানাতল্লাসীর পরোয়ানা আছে। নন্দলালবাবু তাঁহাদের এত

হায়রাণ করিয়াছেন যে সে-কথা আর বলিবার নহে। কথা শেষ করিয়া নিজে হইতেই একটি চৌকি লইয়া বসিয়া দারোগা এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইলেন।

পুলিশের সঙ্গে অজয়ের জীবনে এই প্রথম পরিচয়। দারোগা অতি মিষ্টভাষী, তাঁহার সঙ্গীদের ব্যবহারও কিছুমাত্র অশিষ্ট নহে; তথাপি নিদারুণ অপমানের উত্তেজনায় অজয়ের কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল। নিজেকে সে বহুপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কাহাকেও সন্দেহ করা মাত্রই তাহাকে অপরাধী করা নহে, কিন্তু তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বুঝিল না। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতে লাগিল, পাঁজরের কাছে কি-রকম একটা ব্যথা, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। সুভদ্র কেবলমাত্র গেঞ্জি গায়ে দিয়া বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার উপর একটা জামা চাপাইয়া ফিরিয়া আসিল। দারোগার হাত হইতে অকম্পিত হস্তে খানাতল্লাসীর পরোয়ানাটি লইয়া আদ্যোপান্ত সেটা সে পড়িয়া দেখিল, তারপর সকলকে প্রথমেই নিজের ঘরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। অজয়ের যেন চলচ্ছক্তি লোপ পাইয়াছিল, অসাড় পা-দুইটাকে কোনও প্রকারে টানিয়া টানিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত সেও সকলের অনুসরণ করিল।

তারপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বাড়ীর সব-কয়টি মানুষের, সব-কয়টি বাক্সপেটরার তালা খোলা হইল। বিমান চাবির গোছাটা কয়েকদিন হইল হারাইয়াছে, তাহার বড় আদরের কুমীরের চামড়ার সুটকেসটার তালা ভাঙা হইল। ছড়ানো জিনিষপত্র সব-কয়টি ঘরের মেজে ভরিয়া স্তূপাকার হইয়া জমিল। এখানকার জিনিস ওখানে গেল, ওখানকার জিনিষ এখানে, এ খামের চিঠি ঐ খামে, ঐ বইয়ের খসা-পাতা এই বইয়ে, সব মিলাইয়া একটা কুৎসিত লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। প্রতিবেশী যাহারা সাক্ষী স্বরূপ আসিয়াছিল তাহারা চাপা হাসির দীপ্তিতে মুখ ভরিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছে। উড়িয়াঠাকুর,—যাহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবে বলিয়া কাল সন্ধ্যায় অজয় শাসাইয়াছে, সেও বাহির হইতে

জানালার ফাঁকে উঁকি মারিয়া মজা দেখিতেছে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বহু কষ্টে অজয় নিজেকে সংবরণ করিয়া রহিল।

অজয় নিজেকে সংবরণ করিতে জানে। দারোগা যখন তাহার ট্রাঙ্কের একেবারে নীচতলা হইতে তাহার বহু সঙ্কোচের কিন্তু বহুযত্নের সঞ্চয় কবিতার খাতাটি টানিয়া বাহির করিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তাহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন সে কিছু বলিল না ত! একটু পরে একটা কবিতার খানিকটা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া দারোগা যখন বলিলেন, "ঠিক এম্‌নিধারা একটা কবিতা ডি এল্ রায় না রবিবাবুর কোন্ একটা বইয়ে পড়েছি না?" তখনও সে চুপ করিয়া রহিল, বিমানের ধরণে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া অল্প একটু হাসিল মাত্র। অকারণে চিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠা যাহার স্বভাব তাহার এ আজ হইল কি?

সন্দেহজনক কিছুই এবারে পাওয়া গেল না। তাছাড়া নন্দলাল বরাবর কলেজে উপস্থিত ছিল বলিয়া তাহার alibi বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সুতরাং এ-যাত্রা এই পর্য্যন্ত। নন্দলালকে আরও বেশী সাবধান হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়া, পুনরায় পারস্পরিক শিষ্ট-সম্ভাষণের পর দারোগা সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

সুভদ্র তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক সুট্‌কেস প্রভৃতি টানিয়া লইয়া ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই বিশৃঙ্খলার উপর আর কাহারও হাত একবার লাগিলে কোনও জন্মে ইহাতে আর শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না। মনের সমস্তটা সঞ্চিত রুদ্ধ জ্বালা নন্দের উপর ঝাড়িবে স্থির করিয়া গিয়া অজয় দেখিল, দুতলার বারান্দার এক কোণে নিজেকে গুঁজিয়া যেখানে সে পড়াশোনা করিত, সেখানে দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সে নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কানের কাছে যে-রক্তস্রোত এতক্ষণ দপ্‌দপ্ করিয়া বহিতেছিল তাহা করুণ সুরে বাজিতেছে। একটু কাশিয়া কহিল, "কিছু ভয় নেই, ওরা কিছু পায়নি, তা-ছাড়া কলেজে তোমার alibi রয়েছে, দারোগা নিজের মুখে ব'লে গেল।"

নন্দ কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন কলেজে বসিয়া, প্রভাতে নিদ্রা-জাগরণের সঙ্গম-সৈকতে কুড়াইয়া পাওয়া অপরূপ জ্যোতিঃসুষমাময় চিন্তার মাণিকটিকে অজয় মনের মধ্যে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও আর তাহার চিহ্নমাত্রেরও দেখা পাইল না।

নন্দ যথারীতি খাইয়া-দাইয়া কলেজে গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী ফিরিতে তাহার সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অজয় বাড়ী নাই, সুভদ্রও বাহির হইয়া গিয়াছে, দুতলার স্নানের ঘরেব দেয়ালে বিলম্বিত একটা প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বিমান অসময়ে বাতির আলোয় দাড়ি কামাইতে ব্যস্ত। বারান্দার অন্ধকারে নন্দকে দেখিতে পাইয়া গলার কাছটায় ক্ষুর ঘসিতে ঘসিতে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া সে কহিল, "এত রাত অবধি বাইরে কি করছিলে?"

নন্দ জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা থাকবার জায়গা ঠিক ক'বে এলাম। গুদাম বাড়ী, একপাশে একটা ঘরে আমায় একটু জায়গা দেবে বলেছে। আমি আজই যাচ্ছি, আমার জিনিষগুলো নিতে এসেছি।"

বিমান কহিল, "উঃ, জিনিষ ত তোমার কত। ক'টা লরী সঙ্গে এনেছ?"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া বেশ স্বাভাবিক সুরেই উত্তর দিল, "আজ্ঞে, বইয়ের বাক্সটা বেজায় ভারি, নিজে পেরে উঠব না, তাই একটা কুলী-ছোকরাকে সঙ্গে এনেছি।"

ঠোঁট চাপিয়া চিবুকের উপর ক্ষুর চলাইতে চালাইতে বিমান আড়চোখে তাহাকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর কহিল, "তা বেশ, কিন্তু সুভদ্র বাড়ী নেই, অজয় নেই, এতদিন তাদের প'ড়ে প'ড়ে খেলে, হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে-ক'য়ে কেটে পড়বে কি রকম?"

নন্দের গলার স্বর এবার কাঁপিয়া গেল, কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া

কহিল, "আমার হয়ে আপনি তাঁদের বলবেন, আমি আর এ-মুখ তাঁদের দেখাতে পারব না।"

বিমান বলিল, "তোমার শ্রীমুখ না দেখতে পেলে তারাও যে দিনকার দিন রোগা হতে থাকবে তা নয়। সে যাক, তুমি চট ক'রে দুটি খেয়ে নাও। মিছিমিছি তোমার খাবারটা কেন ফেলা যাবে?"

নন্দ কিছুতেই শুনিল না। একটা ছেঁড়া মাদুরে জড়ানো বালিশ কাপড়চোপড়, এবং ভাঙা একটা বইয়ের তোরঙ কুলী-ছোকরার মাথায় চাপাইয়া অন্ধকার বারান্দায় বিমানকে আসিয়া সে প্রণাম করিল। বিমান ততক্ষণে কাপড় ছড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করিয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও।" ঘরে গিয়া দরজটাকে ভেজাইয়া দিয়া বাতির আলোয় মনীব্যাগটাকে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দেখিল, সুভদ্রের নিকট হইতে ধার-করা দশ টাকার নোটটা, আনা-চারেক পয়সা, মেয়েলী হস্তাক্ষর সম্বলিত এক টুকরা কাগজ, সুন্দর 'মিনিয়েচার ড্রয়িং'-এর ছোট একটি প্রিণ্ট—এইমাত্র তাহাতে আছে। ভাবিল, 'দুত্তোর, খামোকা এত হাঙ্গাম ক'রে ভর সন্ধ্যেয় দাড়ি কামালাম। যাক্।' আলো নিবাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দশ টাকার নোটখানি নন্দের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "টুইশানীর মাইনে পেতে এখনও ত হপ্তা দুয়েক বাকী, এই টাকা-ক'টা রাখো, বুঝে-শুনে খরচ ক'রো।"

নন্দ জিভ কাটিয়া পিছাইয়া গেল, তারপর হাত-দুটি জোড় করিয়া কহিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, তাহলেই ঢের হবে। অজয়-দাকে, সুভদ্র-দাকে বলবেন আমার ওপর যেন রাগ না করেন। তাঁদের পায়ের ধূলো না নিয়েই পালাতে হচ্ছে, সেই শাস্তিই ত আমার যথেষ্ট।" উদ্যত অশ্রু সংবরণ করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নির্ব্বান্ধব পৃথিবীতে এই তিনটি মানুষকে অত্যন্ত অভাবিত ভাবে তাহার

আত্মীয়রূপে সে কাছে পাইয়াছিল, বিনা-অপরাধেই তাহাদের হারাইতেছে। ইহার পর রোগে-শোকে আপদে-বিপদে মুখের দিকে এতটুকু নির্ভরের আশায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে, এমন কেহ তাহার আর রহিল না।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার চলিয়া যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিমান একটু হাসিয়া ভাঁজ-করা নোটটিকে আবার মনীব্যাগের পকেটে রাখিল, তারপর ছড়ি ঘুরাইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মনে মনে কহিল, 'যাক্, নগদ দশ-' দশটা টাকা লাভ হয়ে গেল। আর একটু হলেই যাচ্ছিল আর কি! কপাল বলি এ'কেই।

১২

বিকালের রোদে তখন সোনালী রঙের ছোপ লাগিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহার কলেজের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ধীরে আসিয়া তেতলায় তাহার পড়িবার ঘরের সমুখকার বারান্দায় রেলিঙের উপর দুইটি শুভ্রনিটোল বাহুর ভর রাখিয়া দাঁড়াইল। আজ সমস্ত দিন তাহার মনটা নিদারুণ তিক্ততায় ভরিয়া রহিয়াছে, কলেজে এক মুহূর্ত্ত বইয়ের পাতায় মন বসে নাই, বাড়ী ফিরিয়াও শান্তি পাইতেছে না। ইচ্ছা করিতেছে, এখনই আবার কোনও একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু যাইবার মত জায়গাও কি ছাই পৃথিবীতে কোথাও একটা আছে?

তাহার অপরাধের মধ্যে কাল সমস্ত রাত নানা দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়া প্রভাতে উঠিয়া মায়ের কাছে পিতার সংবাদ লইতে গিয়াছিল। "তোমার বাবা ভাল আছেন," কোনও প্রকারে এই কথা-কয়টি মাত্র বলিয়া মা এমন মুখ করিয়া রহিলেন, যে আর কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসেই কুলাইল

না। সমস্ত দিন তাঁহার মুখের সেই কি-এক অদ্ভুত-ধরণের কঠোরতার ছাপকে সে নিজের মনে বহিয়া বেড়াইয়াছে। মায়ের ভ্রূকুটিকুটিল কালো চোখের অন্ধকার তাহার চিত্তাকাশ ব্যাপিয়া কোন্ অশুভ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহার আসল রূপটাকে সে জানে না বলিয়াই তাহা আরও বেশী ভয়াবহ। কি হয় যদি সমস্ত নীরবতার আড়াল ভাঙিয়া দিয়া তাহার মা তাহাকে অনাবৃত নির্ম্মম সত্য যাহা তাহার সঙ্গে মুখোমুখি করিতে দেন? পৃথিবীতে এমন কি অকল্যাণ থাকা সম্ভব, এই কয়দিন কল্পনায় বারে বারে সাহসের সঙ্গে যাহার সম্মুখীন তাহাকে না হইতে হইয়াছে? যে-শাস্তি নীরবে দিনের পর দিন তাহাকে বহন করিয়া চলিতে হইতেছে, তাহা হইতে বেশী কঠোর আর কি আঘাত পৃথিবীর মানুষের মুখের দুইটি কথা হইতে সে পাইতে পারে?

পারে না সে পিতার কাছে ছুটিয়া গিয়া এই যন্ত্রণার অবসান করিতে? তিনি কখনও মিথ্যা বলিবেন না, ঐন্দ্রিলার দিন কত দুঃখে কাটিতেছে তাহা জানিতে পারিলে সত্য-গোপন করিতেও চাহিবেন না।··অন্ততঃপক্ষে তাঁহাকে চিঠি ত একটা লেখা চলে? তা-ই সে লিখিবে, এবং পিতারই নিকট হইতে সত্য যাহা তাহা সে জানিয়া লইবে।···কিন্তু দেশ ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া পিতার পলাইয়া বেড়ানো মনে পড়িল। চকিতে দু-একবার তখন তাঁহার ভীত বিষণ্ণ মুখ সে দেখিয়াছে। কে জানে, তাঁহার দুঃখের হয়ত শেষ নাই, ঐন্দ্রিলা না বুঝিয়া অসতর্কে আরও মর্ম্মান্তিক কোনও দুঃখ হয়ত তাঁহাকে দিয়া বসিবে।

যে দেবতাকে শৈশব হইতে পিতার আসনে স্থাপন করিয়া সে পূজা করিতে শিখিয়াছিল, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, আমার এই নিষ্কলুষ জীবনে এত দুঃখ আমার পাওনা হইতে পারে না। আপনার জন পৃথিবীতে আমার ত বেশী নাই, আমার স্নেহময় পিতাকে তুমি আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইও না।

হেমবালা দুতলায় তাঁহার ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। মন্দিরা তাঁহার পাশে বসিয়া পরিত্যক্ত কাপড়ের ছাঁট সংগ্রহ করিয়া সুভদ্রের কাছ হইতে পাওয়া তাহার নূতন পুতুলটিকে নানা বিচিত্র বেশে সাজাইতেছিল। অন্যদিন এমন সময় ঐন্দ্রিলা একবার আসিয়া অন্ততঃ মায়ের খবর লইয়া যায়, আজ সন্ধ্যা অবধি সে আসিল না দেখিয়া তিনি নিজেই ধীরপদে একবার তেতলায় আসিলেন। বলিবার মত কিছু ছিল না, বলিলেন, "বীণাকে একটু না-হয় গিয়ে সাহায্যই কর্ ইলু। বেচারী সারাটা বিকেল ঠাকুরের সঙ্গে আগুনের আঁচে পুড়ছে।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "যাচ্ছি মা," কিন্তু গেল না। ঘরের কাজ যাহা কিছু প্রয়োজন হইলে বীণাই করিত, হেমবালা মন্দিরাকে দেখিতেন, তিনি যখন ছিলেন না আয়া দেখিত, ঐন্দ্রিলা পারতপক্ষে কোনও-কিছুতে হাত দিত না। পারিতও না, তাহার ভালও লাগিত না। বীণা সুবিধা পাইলে তাহাকে কথা শোনাইতে ছাড়িত না বটে, কিন্তু আসলে সেও ঐন্দ্রিলাকে সহজে কিছু করিতে দিত না। এই লইয়া ঐন্দ্রিলার অসাক্ষাতে হেমবালার সঙ্গে সে ঝগড়া করিত। বীণা বলিত, "আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন আমরাই কিছু কি কোনোদিন করেছি? কলেজের পড়া ক'রে আবার নাকি কিছু করা যায়।"

হেমবালা বলিতেন, "তা যদি না যায় বাছা, ত এরপর পড়াশোনা চুকলে, ঘরসংসার হলে তখন নিজের ঘরের কাজ নিজে গুছিয়ে করবে না ত কি পাড়ার লোকে এসে ক'রে দিয়ে যাবে?"

হেমবালা স্বামীর সঙ্গে যথারীতি কলহ করিয়া ঐন্দ্রিলাকে কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, বীণার সে-কথা অজানা ছিল না. একটু বিস্মিত হইয়া বলিত, "এত বড় জমিদারের ঘরের মেয়ে, ওর ভাবনা কি পিসীমা, একটা বড়লোক জামাই ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিও।"

হেমবালা বলিতেন, "তা তোমরা দিতে দেবে কি-না বাছা, আমাদের কথায়

এ কালে আর কিছু হবার জো নেই। কবে কা'র পেছনে ছুট দিয়ে কোন্ খোলার ঘরে গিয়ে উঠবে, আমরা হয়ত টেরও পাব না। তাছাড়া ও যতবড় জমিদারের মেয়েই হোক, ওর বিয়েতে একটি টাকাও আমি খসাব না, তা ঠিকই ক'রে রেখেছি।"

এইখানটায় বীণা হঠাৎ চুপ করিয়া যাইত।

নীচে হইতে বীণার গলা শোনা গেল, "পিসীমা, ইলুকে আসতে বল, খাবার তৈরী হয়েছে।"

হেমবালা বলিলেন, "শুনছিস?"

ঐন্দ্রিলা শুনিল কি-না বোঝা গেল না। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে লাল সুরকির পথটা যেখানে দূরে মাঠের মাঝখানে বড় রাস্তার সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া সে হঠাৎ কোন্ অব্যক্ত আবেগে শিহরিয়া উঠিল। প্রথমে মনে হইল, ভুল দেখিয়াছে, কিন্তু ক্রমে আর সন্দেহ রহিল না। দূরের মানুষটি একটু একটু করিয়া কাছে আসিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা বুঝিল, একাগ্র প্রখর দৃষ্টিতে সে তাহাকেই দেখিতেছে। তাহার সে-দৃষ্টিকে সহ্য করাও যায় না অথচ সে দৃষ্টির দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়াও অসাধ্য। সে কি তাহাদেরই বাড়ীতে আসিতেছে? তাহাকে ত কেহ এ বাড়ীতে আসিতে ডাকে নাই? শুষ্ক চোখমুখ, ধূলিধূসরিত পা, রুক্ষ অসংবৃত চুল, এ তাহার কি মূর্ত্তি? কি সে চায়? কি তাহার এই দৃষ্টির অর্থ? ঐন্দ্রিলার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

হেমবালা আবার ডাকিলেন, "কি হ'ল তোর ইলু?"

"এই যাচ্ছি," বলিয়া একঝটকায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া কম্পিত দ্রুতপদে ঐন্দ্রিলা নীচে নামিয়া গেল। বীণাকে কিছু বলিল না, কিন্তু ইহার পর বহুক্ষণ তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অজয়কে যতদূর হইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা চিনিতে পারিয়াছিল, ঐন্দ্রিলাকে ততদূর হইতে অজয় চিনিতে পারে নাই। তাহার কারণ অজয় চলিতেছিল এবং

চলমান মানুষকে চেনা সহজ। ঐন্দ্রিলা একে ছিল দাঁড়াইয়া, তাহার উপর অজয়ের ধারণা খানিকটা দূর হইতে প্রায় সব বাঙ্গালীর মেয়েরাই দেখিতে একরকম। তাহারা একই রকম করিয়া চুল বাঁধে, একই ধরণে শাড়ী ঘুরাইয়া পরে এবং একই ভঙ্গিতে প্রায় দাঁড়ায়। অজয় জানিত ঐন্দ্রিলারা বালিগঞ্জের এই দিক্‌টাতেই কোথাও থাকে। প্রথমে ভাবিয়াছিল ঐন্দ্রিলা, তারপর ভাবিয়াছিল আর কেহ, শেষে ভাবিয়াছিল বীণা এবং সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহ ভাবে ঐন্দ্রিলাকে চিনিতে পারা মাত্র তাহার আর সম্মুখে চলিতে পা উঠে নাই। আজও প্রায় সমস্ত দিন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টায় পথে পথে সে ঘুরিয়াছে, তাহার উপর এই আকস্মিক ভাবাবেগের আঘাতে তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের মধ্যে দারুণ শুষ্কতা, নাক জ্বলিতেছে, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়িতেছে, এমনই অবস্থায় সে বালিগঞ্জের রেলষ্টেশনে একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। গাড়ীর দেরী ছিল, দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সে তাহার ক্লান্ত দেহমন-ইন্দ্রিয়কে একটুখানি বিশ্রাম দিবার ব্যর্থচেষ্টা করিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলার খাওয়া শেষ হইতেই সুলতা আসিয়া পৌছিলেন। সোজা খাবার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "সব শেষ করেছ, না আছে কিছু ?"

"ওমা, সব শেষ হবে কি ?" বলিয়া বীণা তাড়াতাড়ি এক রেকাবি ভরিয়া খাবার সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল।

সুলতা বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "দেখ বীণি তুই রোজ রোজ আমায় এইরকম ক'রে অপমান করবি ?"

ঐন্দ্রিলা হাসিয়া উঠিল। বীণা বলিল, "সে কি, অপমান আবার কখন্ করলাম ?"

"আমি কি এতগুলো খাই ?"

"বেশী খাওয়াটা বুঝি ভারি অসম্মানের কথা ?"

"তা বই কি, বড়লোকেরা বেশী খায় না," বলিয়া সুলতা প্রায় এক নিঃশ্বাসে

থালাভরা খাবার শেষ করিলেন। বলিলেন, "এ মাল্‌পো বীণার হাতের তৈরি; মুখে দিয়েই তা বুঝতে পেরেছি।"

ঐন্দ্রিলা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুলতা তাহাকে হুকুম করিলেন, "হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছিস্ কি? কারুকে কোনোদিন খেতে দেখিসনি নাকি? দে, চা ঢেলে দে।" চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কহিলেন, "হ্যাঁ রে বীণি, অজয়বাবু কি একলা এসেছিলেন? কতক্ষণ ছিলেন?"

বীণা নিজের উদ্যত পেয়ালা ঠোঁটের কাছ হইতে নামাইয়া বলিল, "কে, অজয়বাবু? কই, তিনি ত আসেন নি?"

সুলতা বলিলেন, "বা রে, আমি পথে আসতে স্পষ্ট দেখলাম, তোদের বাড়ীর দিক্ থেকে এসে বড় রাস্তায় পড়লেন, ভুল হবার ত কথা নয়। রসিকতা করছিস বুঝি?"

বীণা ব্যগ্রতা লুকাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই বলিল, "না, সুলতাদি, না। কখন্ দেখলে?"

"এই ত কয়েক মিনিট আগে।"

বীণা চঞ্চল হইয়া উঠিল, তবু বলিল, "রসিকতাটা তোমার দিক্ থেকে হচ্ছে বুঝি?"

সুলতা বলিলেন, "ভাল জ্বালা, এত লোক থাকতে অজয়বাবুকে নিয়ে হঠাৎ রসিকতা করতে যাব কেন?"

ঐন্দ্রিলা সচরাচর চা খায় না, এক পেয়ালা ঢালিয়া লইয়া বসিল। বীণা বলিল, "ইলু, তুই ত বাইরে ছিলি, জানিস কিছু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অজয়বাবুরই মত একজনকে মনে হল।"

বীণা কহিল, "আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেছিলি?"

"এই দিকেই ত আসছিলেন—"

"আমায় আগে বলিসনি কেন?" বলিয়া বীণা উঠিয়া পড়িয়া ঝি-চাকর

সব-ক'জনকে ডাকিয়া একসঙ্গে জড় করিল। সকলকে বারবার জেরা করা সত্ত্বেও কেহ স্বীকার করিল না, যে আজিকার দিনমানের মধ্যে দিদিমণিদের খোঁজ কেহ আসিয়া করিয়াছে। বীণার তবু দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নীচে দারোয়ান বেহারা কাহারও সাড়া না পাইয়া অজয় ফিরিয়া গিয়াছে। দুঃখে অপমানে তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কি মনে করিয়াছে ভদ্রলোক? সব হইতে তাহার বেশী রাগ হইতে লাগিল ঐন্দ্রিলার উপর! অজয় আসিতেছে দেখিয়া তারপর একবার খোঁজ লইতে হয়, সে ফিরিয়া গেল কি না। সত্যসত্যই সে যখন আসিল না দেখিল, তখনও কি সেকথা একবার মনে হইতে নাই? কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে মুখে সে কিছুই বলিল না। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া কাপড় বদ্‌লাইয়া স্থলতার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলা সেই যে তেতলার বারান্দায় তাহার আগেকার জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, শীঘ্র সেখান হইতে আর যে সে নড়িবে এমন ভরসা রহিল না। অজয় সত্যই ফিরিয়া গিয়াছে। অনাহূত আসিয়াছিল, ঐন্দ্রিলা তাহাকে দেখিয়াও সরিয়া চলিয়া গিয়াছে। চাকরটাকে পাঠাইয়াও তাহাকে ভিতরে আহ্বান করে নাই। তাহার আজন্মের সংস্কার-বহির্ভূত এ কি নিদারুণ অশিষ্টাচার সে আজ করিল? ইহার কি প্রয়োজন ছিল? নিজের ব্যবহার ভাবিয়া নিজেই সে এখন অবাক্ হইয়া গেল। যাহার সঙ্গে একদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কোনও সম্পর্কই তাহার ছিল না, আজ কৃত-অপরাধের অনুশোচনার সঙ্গে অলক্ষ্যে মিলিয়া গিয়া হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত বড় হইয়া সে দেখা দিল। অজয় যে এ-জীবনে তাহার অনিচ্ছিত অপারাধকে কোনওদিন ক্ষমা করিবে না, ইহা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন একরকম করিতে লাগিল। কোনও কিছুতেই খুব বেশী অধীর হওয়া তাহার স্বভাব নহে, অন্ধকারে বাহিরে দূরে মাঠের দিকে নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়া চিত্রার্পিতের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুলতার গাড়ী বীণাদের সদর দরজা পার হইতেই তিনি কহিলেন, "এবারে অজয়বাবুর পেছনে ধাওয়া করতে হবে ত ?"

বীণা কহিল, "লাভ আছে কিছু ? এতক্ষণ কতদূরে গেছেন তার ঠিক কি ?" সুলতা ইহার পর কিছু একটা রসিকতা করিবেন বীণা ইহাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু খুব স্বাভাবিক সুরেই তিনি কহিলেন, "তার চেয়ে ক্লাবেই যাই চল্, সেখানে দেখা হ'য়ে যেতেও পারে। যদিও আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব না ঠিক ক'রেই বেরিয়েছিলাম।"

বীণা কহিল, "এমন কঠিন সঙ্কল্প ক'রে বেরতে ত তোমাকে প্রায় দেখা যায় না, কি হ'ল আজ হঠাৎ ? ক্লাব আর ভাল লাগছে না ?"

ড্রাইভারকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিয়া সুলতা কহিলেন, "তা নয়। ওঁর ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন ধ'রে রোজ সন্ধ্যা না হতেই পালাতে সুরু করেছেন, কি যে ব্রিজ্ খেলার বাতিক। আজ জোর ক'রে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে এসেছি। সবাইকে রিসিভ ক'রে বসাবেন।"

বীণা কহিল, "এতক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছেন নিশ্চয়। তা ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সুভদ্রবাবুর ক্লাবটি যা জমাট আড্ডার জায়গা, খানিকক্ষণ বসলেই মানুষের হাই উঠতে থাকে। সবাই কাঠ হয়ে ব'সে থাকবে, হাসবে না. কথা বলবে না। কি যে হচ্ছে তোমাদের দুর্ভোগ ভুগিয়ে তাও জানি না।"

সুলতা বীণার একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া আস্তে একটু টিপিয়া দিয়া কহিলেন, "একেবারেই যে কিছু হচ্ছে না তা এখন আর বলি কি ক'রে ?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "ভাল জ্বালা যা-হোক, ঐতেই কি মজুরি পোষাবে ?"

সুলতাও হাসিয়াই কহিলেন, "তোর আর আমার ত পোষাবে, তাহ'লেই হল।"

এবারে সুলতার হাতটি টিপিয়া দিয়া বীণা কহিল, "তুমি সত্যি ভারি ভাল, সুলতাদি।"

সুলতা কহিলেন, "অন্যেরা শুনলে ভাল বলবে না যে।"

বীণা কহিল, "তাঁর এত যত্নের ক্লাবটির এমন সুন্দর সদ্গতি হচ্ছে শুনলে সুভদ্রবাবু অন্ততঃ খুশী ত হবেনই না।"

সুলতা কহিলেন, "তা কিন্তু ঠিক বলা যায় না। সুভদ্র কিসে যে খুশী হয়, কিসে হয় না, বোঝা শক্ত। আমি ত অন্ততঃ আজ অবধি বুঝতে পারিনি। একটা কিছু কাজ নিয়ে লেগে প'ড়ে থাকাটাই যেন তার আসল দরকার। কাজগুলোর প্রতি আসলে তার যে কিছু মমতা আছে তার ব্যবহার থেকে তা কিন্তু মোটেই মনে হয় না। একেবারেই মা ফলেষু কদাচন। তা দেশের লোকগুলো ত কুঁড়েমি ক'রেই গেল? নিতান্ত কাজের ঝোঁকেই যদি কেউ কাজ করে সেটাও মন্দ নয়।"

বীণাদের বাড়ী হইতে ক্লাব খুব বেশী দূরে নয়। অল্পক্ষণেই গাড়ী পৌঁছিয়া গেল। গাড়ীবারান্দার ছাত হইতে বীণাকে দেখিতে পাইয়া রমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল, কহিল, "এই যে আপনি এসেছেন। উপরে ওঁরা সব ব'সে আছেন, আপনাদের কথাই সবাই জিজ্ঞেস করছিলেন।"

সুলতা কহিলেন "উনি উপরে নেই?"

রমাপ্রসাদ একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল, "কে, ডাক্তার চাটার্জি? আজ্ঞে না, আমি এসে পৌঁছবার পরেই তিনি চ'লে গেলেন, আমাকেই ব'লে গেলেন সকলকে দে'খে শুনে বসাতে। কোথায় জরুরী খুব কাজ ছিল। কারও কিছু অসুবিধা হয়নি অবিশ্যি।"

"না, না, আপনি রয়েছেন, অসুবিধা কেন হতে যাবে।" বলিয়া সুলতা বীণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গিয়া উঠিলেন।

মেয়েরা বীণার চতুর্দ্দিকে গোল হইয়া ঘিরিয়া আসিলে বীণা বলিল, "নাঃ, এই ক্লাবের চাঁদার টাকাটা এরপর অর্দ্ধেক আমাকে হিসেব ক'রে নিয়ে নিতে হবে। আমাকে নিয়ে ভিড় করবার জন্যেই কি তোরা ক্লাবে আসিস্?"

রমাপ্রসাদ তাহার নিজের ধরণে রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "চাদা যা আদায় হয়, তা শুনলে আপনার আর তাতে ভাগ বসাতে ইচ্ছে করবে না। দেখবেন একবার হিসেবটা ?"

বীণা বলিল, "রক্ষা কর বাবা, বাড়ীতে বাজারের হিসেব রোজ দেখতে হয়, সেই দুঃখ ভুলতে ক্লাবে আসি, এখানেও যদি তাই করতে হয় ত এরপর দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। আপনার ভয় নেই, চাঁদার টাকা পরিমাণে খুব বাড়লেও আমি সত্যিই তাতে ভাগ বসাব না। সুভদ্রবাবু আজ আসেননি বুঝি ?"

বলিতে বলিতেই সুভদ্র আসিয়া পৌছিল। কিন্তু বীণার উৎসুক দৃষ্টি তাহার দিক্ হইতে যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে আজ কোথা হইতে একটি পশ্চিম-দেশীয় সুশ্রী চেহারার মুসলমান বন্ধুকে জুটাইয়া আনিয়াছে, প্রথমেই বীণার সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। বন্ধুটি বেশ সপ্রতিভ, বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টভাব প্রকাশ পাইল না। সকলের সঙ্গে মৌখিক পরিচয় সমাধা হইয়া গেলে সুভদ্রের অনুরোধে তিনি কয়েকটি পারসীক গজল গাহিয়া সকলকে শোনাইলেন। পরিষ্কার সুকণ্ঠ, শ্রুতিমধুর ভাষা, মধুরতর সুর মিলিয়া সহজেই সকলের মনোহরণ করিল। কাহারও সঙ্গে কাহারও কথা বলিবার দায় নাই, শুদ্ধমাত্র এই কারণেই ক্লাব সেদিন জমিল ভাল। গান শেষ হইয়া গেলে তথাকথিত হিন্দু সঙ্গীতের উপর ইস্‌লামীয় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া সুভদ্র সকলকে তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করিল, কিন্তু ছেলেরাও আজ কথার মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনী করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিল, আলোচনা প্রধানতঃ সুভদ্র এবং তাহার মুসলমান বন্ধুটির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনকার মত ক্লাবের কাজ ঐ পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইল। অন্যদিন হইলে এই সময়টাই বীণাকে ঘিরিয়া ছোটখাট আর-একটি ক্লাব জমিয়া উঠিত, এবং সত্যকারের হইয়া জমিত, কিন্তু আজ তাহার মন ভার হইয়া ছিল। সুভদ্রকে

অজয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সে তখন তাহার নবাগত বন্ধুটিকে লইয়া মহাব্যস্ত, তাঁহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। অজয় শেষ পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া স্থলতাও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। বীণাকে নিজেদের গাড়ীতে বাড়ী রওনা করিয়া দিতে নীচে আসিয়া বলিলেন, "ক্লাব আজ মোটেই ভাল লাগল না, না?"

গাড়ী ষ্টার্ট লইয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় হেড লাইটের প্রখর আলোয় দেখা গেল, বড় বড় করিয়া পা ফেলিয়া অজয় আসিতেছে। স্থলতাই প্রথম তাহাকে দেখিতে পাইলেন, চাপা গলায় কেবল কহিলেন, "বীণি, বীণি!"

বীণা ত্রস্তে নামিয়া পড়িল। গাড়ীর মধ্য হইতে অজয়কে সে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু স্থলতা কি বলিতে চাহিতেছেন তাহা তাঁহার গলার স্বরেই অতি অনায়াসে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। অজয়ও ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়ীবারান্দার নীচে অন্ধকারে বীণার কমনীয় চোখ-দুইটি নিজের প্রসন্ন অদৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হেড লাইটের আলোয় অজয়ের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল, একবার বীণাদের দিকে সে চাহিল বটে কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিল বলিয়া মনে হইল না। সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে যাইবে, স্থলতা একটি হাতে আস্তে বীণার বাহু স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এই যে এইখানে।"

অজয় ফিরিল। নত হইয়া দুইজনকে অভিবাদন করিয়া বীণাকে কহিল, "আপনি এই আসছেন বুঝি?"

বীণা কলকণ্ঠে হাসিয়া কহিল, "আপনি যে বিমানবাবুকেও ছাড়িয়ে উঠবার জোগাড় করেছেন! কিন্তু আমিও তাঁর দলের, এ ধারণা আপনার কিসের থেকে হ'ল? রাত ক'টা এখন তার হিসেব আছে?"

অজয় নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

সুলতা কহিলেন, "না না, রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বড় জোর আটটা হবে। ন'টা-সাড়েন'টার আগে কোন্‌দিন তোমাদের ক্লাব ভাঙে শুনি? চলুন অজয়বাবু উপরে, বসবেন। আর সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছে, রমাপ্রসাদ-বাবু আছেন এখনও। আমরা চারজনেই ব'সে আড্ডা দেব।"

অজয় তাড়াতাড়ি কাহল, "আজ থাক, আজ সত্যিই বেশ রাত হয়েছে, তাছাড়া রমাপ্রসাদ-বাবু হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

সুলতা কহিলেন, "তা বেশ ত, তাঁকে না বিরক্ত করতে চান, আমরা তিনজন রয়েছি, আড্ডা দেবার পক্ষে তিনজনই যথেষ্ট।"

বীণা কহিল, "রমাপ্রসাদ-বাবু বেচারা কাজ করবেন, আর আমরা তাঁর পাশে ব'সে গল্প জমাব সেটা কিন্তু জীবে দয়ার পরিচয় হবে না। তার চেয়ে অজয়বাবুকে আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। আজ সন্ধ্যায় উনি যা করেছেন, তার শাস্তি ত ওঁর পাওনাই আছে।"

অজয় সভয়ে কহিল, "কি, কি করেছি আজ সন্ধ্যায়?"

বীণা কহিল, "কথাটা শুনে আপান যে-রকম চমকালেন, তাতে আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যে-ব্যাপারের কথা বলছি তার চেয়ে গুরুতর কিছুই ইতিমধ্যে ক'রে থাকবেন।"

সুলতা কহিলেন, "ওঁর অপরাধ যাই হোক, তার জন্যে শাস্তি-ব্যবস্থা যা হচ্ছে তাতে ওঁকে শোধরাবার বদলে উৎসাহই না বেশী ক'রে দেওয়া হয় তাই ভাবছি।"

অজয় ঘামিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিজের কাছে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, তাহার ভাল লাগিতেছে। সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। শীতের শিহরণ অলক্ষ্যে প্রিয়স্পর্শজনিত শিহরণের বিভ্রান্তি মনে আনিয়া দেয়। দুইটি রূপসী প্রগল্‌ভা নারীর নিভৃত সান্নিধ্য, দু'চারিটা সহজ কথার আদান-প্রদানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন্‌

মাধুর্য্যের ইঙ্গিত। আজ এই রহস্যগভীর রাত্রিতে এই দুইটি মানুষের রসস্নিগ্ধতামণ্ডিত চিত্তের দ্বার অধিকার করিয়া সে রহিয়াছে—সে, অজয়। বহুদূর জগতের অপরিচিত অতিথি, কিন্তু কোন্ মায়ামন্ত্রে ইহাদের মনের নিভৃত মহলে তাহার স্থান হইয়াছে। এই দুইটি মানবীর দৃষ্টিতে নিজের সেই রহস্যরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সে অভিভূত হইল। মনে মনে কথা সাজাইয়া কহিল, "কর্ত্তব্যপরায়ণ বিচারককে শাস্তি দিতে হয়, তার ফলাফল না ভেবে, এই ত নিয়ম।"

বীণা কহিল, "আমি তাহলে স্বীকারই করছি, এতটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আমার নেই। আপনাকে শাস্তি দেব অথচ আপনার ওপর তার ফল কিছুই হবে না, এ আমি সইতে পারব না।"

সুলতা কহিলেন, "শাস্তিটা কতখানি জোরের সঙ্গে দিস্ তার ওপর সেটা নির্ভর করবে। ফল ত হবেই এবং কি ফল যে হবে সেও ত আমি আগে থেকেই ব'লে রেখেছি।"

বীণা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ী আবার অট্টশব্দে ষ্টার্ট্ লইতে আরম্ভ করিতেই সুলতা তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া তাহাকে ফিরাইলেন, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে, মাল্‌পো আর আছে?"

বীণা কহিল, "কেন, তোমার আরও চাই?"

সুলতা কহিলেন, "দেখ্, মার খাবি। সত্যি বলছি, যদি মালপো আর থাকে ত ওকে দিস্, ভালবেসে খাবে।"

বীণা কহিল, "মুখের যা চেহারা দেখছি, নিশ্চয়ই সমস্ত দিন খায়নি। বাজারের তেলেভাজা বাসি কচুরী দিলেও এখন কিছুমাত্র কম ভালবেসে খাবে না।"

সুলতা কহিলেন, "তাই না-হয় দিস্। খাওয়া যেমনই হোক, ভালবাসাটা থাকলেই হ'ল।"

গাড়ীর দম লওয়া হইয়া গেলে শাড়ীর অঞ্চল সম্বরণ করিয়া বীণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, অজয়কে কহিল, "আসুন।"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া গাড়ীর সম্মুখ ঘুরিয়া ড্রাইভারের পাশে বসিতে গেলে বেশ বিরক্ত হইয়াই আবার কহিল, "এ আবার কি করছেন? ভেতরে এসে বসুন।"

সে-আদেশ অমান্য করিবার শক্তি অজয়ের ছিল না। ভিতরে ঢুকিতে গাড়ীর দরজায় তাহার শালের প্রান্ত আটকাইয়া গেল। বীণা হইতে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া একপাশে সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া সে বসিয়া পড়ল। মুক্তিপ্রাপ্ত গ্যাসের দাপটে একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া তারপর পালের নৌকার মত স্থির মন্থর গতিতে সুলতাদের সিত্রোঁআঁ হাজরা বোড দিয়া গড়াইয়া বালিগঞ্জের মাঠে পড়িল।

অন্ধকার পথের পাশে দূরে দূরে স্থাপিত আলোগুলি বারবার বীণার মুখের উপর পড়িতেছিল। কুণ্ঠিতদৃষ্টিতে চাহিয়া অজয় আজও দেখিল, সেই মুখটি কমনীয়, হৃদয়বত্তায় সুকুমার, প্রগল্‌ভতায় দীপ্ত। কিন্তু সে-মুখের সদাউৎসারিত হাসির উৎসমুখ আজ কি সহসা শুকাইয়া গেল? চকিতে চাহিয়া প্রতিবারে যতটুকু দেখিল, সে মুখটিকে অত্যন্ত ক্লান্ত ভারাক্রান্ত মনে হইল। তাহার উদাস-দৃষ্টি কোন্ সুদূরে আজ নিবদ্ধ? অজয় বুঝিল, সেখানে এই মুহূর্ত্তটিতে অজয় আর নাই, চতুষ্পার্শ্বের কেহ কিছু সেখানে নাই। প্রাণপণে নিজেকে যতটা প্রকাশ করে তাহা ছাড়াও বীণার মনের মধ্যে গভীরতার স্থান কি একটা আছে? সেখানে কোন্ রহস্য-নাট্যের অভিনয় আজ চলিতেছে? কাহারা সে-নাটকের পাত্র-পাত্রী? কি সেই নাটকের বিষয়বস্তু?

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পরে অজয়ই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আজ হঠাৎ এমন ক'রে শাস্তি দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেন যে?"

বীণা কহিল, "লোভ আপনাকে দেখানো যাবে না তা আমি এই ক'দিনেই বেশ বুঝতে পেরেছি। জোর ক'রে নিয়ে এলাম কেন যদি জানতে চান ত তার উত্তর এই যে, তা না হ'লে আপনি আসতেন না।"

"কিসে আপনার মনে হ'ল যে আসতাম না ?"

"আজ বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে কি ব'লে ফিরে চ'লে এলেন ?"

"আমি জানতামই না যে সেটা আপনাদের বাড়ী, তাছাড়া আপনাদের বাড়ী যাব ব'লে একেবারেই প্রস্তুতও ছিলাম না। কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন যে আমি গিয়েছিলাম ?"

বীণা একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, "উপরের বারান্দায় ঐন্দ্রিলা ছিল, সে আপনাকে দেখেছে।"

অজয় বলিল, "ও।" তারপর একেবারেই চুপ করিয়া গেল।

বীণা বলিল, "ঐন্দ্রিলাকে আপনিও ত নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন, আপনার বোঝা উচিত ছিল, আমরা আশা করব আপনি আসবেন। কি হয়েছিল বলুন ত ? দারোয়ান বেহারা কারও সাড়া পাননি ?"

অজয় বলিল, "না না, আমি বাড়ীতে মোটে ঢুকিইনি।"

"মাঝপথ থেকেই ফিরে গেছেন ?"

"মাঝপথ থেকেই।"

আধ-অন্ধকারে অজয়কে বীণা সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তারপর আর কোনও কথা হইল না। বীণার মন হইতে এ ধারণা তবু কিছুতেই গেল না যে, অজয় আসিয়াছিল, চাকরবাকরদের কোনও ত্রুটি বশতঃ ফিরিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে না। স্থির করিল, আজিকার অতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি থাকিতে না দিয়া সেই অনিশ্চিত ত্রুটির অপরাধ সে স্খালন করিবে।

বীণাদের বাড়ীর বাগানে গাড়ী প্রবেশ করিল। গিরি-গুল্মে আকীর্ণ একটি সাজানো প্রস্তরস্তূপের পাশ কাটাইয়া মোড় ফিরিবার সময় একটি চকিত মুহূর্ত্তের জন্য অজয় আবার ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে পাইল। এবারেও স্পষ্ট কিছু দেখিল না, কুয়াসাচ্ছন্ন মৃদু জ্যোৎস্নায় চাহিয়া কেবল অনুভব করিল, চতুর্থ প্রহর বেলাতে

ঐন্দ্রিলাকে যে-ভাবে যে-স্থানে যে-বেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিল, রাত্রির প্রথম প্রহরান্তেও সেইখানে সেই বেশে সেইভাবেই সে দাঁড়াইয়া আছে। অজয় বিস্মিত হইল না, আজ অভাবিতের জন্য তাহার কল্পনাপ্রবণ চিত্ত কেমন অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহার মনে হইল, এইরূপই যেন হইবার কথা ছিল।

গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়ি উঠিবার সময় তাহার কেমন অস্পষ্ট করিয়া মনে হইল, সে যেন রূপকথার সেই রাজপুত্র, ঘুমের দেশের রাজকন্যার সন্ধানে আসিয়াছে। ঐন্দ্রিলা সেই রাজকন্যা, সে মৃদু জ্যোৎস্নায় তিনতলার বারান্দার রেলিঙে দুই বাহুকোণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার ঘুম ভাঙে নাই। অজয়ের উপর ভার, ঐন্দ্রিলাকে জাগাইবে। এত বড় বাড়ীটাতে একটি-দুটির বেশী আলো নাই। একতলার প্রায় সমস্তটাই অন্ধকার। বীণার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া একটা বেহারা ছুটিয়া আসিয়া দুই সারি ঘরের মাঝখানের সিঁড়ির পথের আলোটা জ্বালিয়া দিয়াছে। গায়ের কোটটা খুলিতে খুলিতে বীণা কহিল, "বসবার ঘরের চাবি কার কাছে আছে?"

বেহারা চাবি লইয়া আসিলে দরজার তালা খুলিতে খুলিতে কহিল, "এ-বাড়ীতে বড় কেউ ত আসে না, এই ঘরটা বেশীর ভাগ সময় তাই বন্ধই থাকে।" ভিতরের দুইটি আলো জ্বালিয়া দিয়া অজয়কে ডাকিল, "আসুন।" কম্পিত বক্ষে ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্লান্ত-দেহ অজয় আর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়া একটা গদিমোড়া আসনে বসিয়া পড়িল। বেহারাকে জানালাগুলি খুলিয়া দিতে বলিয়া বীণা কহিল, "আপনি একটুখানি বসুন, আমি আসছি।"

ঘরের ভিতরটাতে সত্যই অনেকদিন ঝাঁট পড়ে নাই। দেয়ালের ছবির কাচে, পুঁতির ঝালর দেওয়া হলদে রঙের আলোর শেডে, সাটিনের পর্দার ভাঁজে ভাঁজে বেশ পুরু হইয়া ধূলা জমিয়াছে। সমস্ত বাড়ী নিঝুম। বেহারা বাহিরের দিকের কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছে, বিদ্যুতের আলোর নীচে হইতে খোলা জানালার পথে বাহিরের জ্যোৎস্নাকে কালো মনে হইতেছে।

অজয়ের মনে হইতে ল গিল, এই ঘরের প্রতিটি দেয়াল যেন কোন্ গভীর ঘুমের মায়ায় আস্তৃত। প্রবেশ-পথের উপরে দেয়ালঘড়ির দুলুনিটা দুলিতেছে, ঘুমন্ত মানুষের হৃৎস্পন্দনের মত। .গৃহসজ্জার প্রতিটি উপকরণ, প্রতিটি আস্‌বাব কোন্ স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে জাগিয়া উঠিয়া কি কথা যেন বলিতে চায়, অজয়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অভাবিত এবং অপরিচিত মিলিয়া অজয়ের ক্লান্ত মনের উপর নিদ্রারই মত কোন্ নিবিড় মায়ার যবনিকা বিস্তার করিতে লাগিল।

এই মধুর অপরিচয়। তাহার মগ্ন-চৈতন্য ভরিয়া একটি তন্বী নারী-দেহের গভীরতম রহস্যের আভাস। প্রাত্যহিক নারী-জীবনের কত-শত তুচ্ছ খুঁটিনাটির অপরূপ অপরিচিত সুষমা। বাতাসে কোন্ নাম না-জানা ফুলের মৃদু গন্ধের ইঙ্গিত। হরিদ্রাভ আলোতে কি মায়াঘন করুণ কমনীয় কোমলতা! সবকিছু অবাস্তব, অপার্থিব, কিন্তু দেবমন্দিরের স্তিমিত দীপালোকে অস্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ-করা প্রতিমার সুন্দর মুখের মত মোহময়।

ঐন্দ্রিলা অলক্ষ্যে কখন্ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে অজয় বুঝিতে পারে নাই, তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। ঐন্দ্রিলা বলিল, "দিদি এখনি আসছে।...আপনি আছেন কেমন?"

অজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। ঐন্দ্রিলার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা তাহার মনে হইল না। ঐন্দ্রিলা তাহার খুব কাছেই একটি আসনে আসিয়া বসিলে সেও তাহার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসিয়া পড়িল। কুণ্ঠিত ভাবটা একটু কাটিয়া গেলে ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বেকার কল্পনার ঘোর একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্যকে আবার ঘিরিয়া আসিল। কেমন অস্পষ্ট করিয়া তাহার মনে হইল, এই মেয়েটি সত্যই পুরোপুরি জাগিয়া নাই। স্পর্শমাত্রেই ইহার মনের দ্বার খুলিবে না। আজীবনের সমস্ত তপস্যার শক্তি লইয়া দ্বারে করাঘাত করিতে হইবে।

আজ সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলা তাহাকে প্রায় তাহাদের গৃহদ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছে। অজয়ের সেই অদ্ভুত ব্যবহারের সে কি অর্থ করিয়াছে কে জানে? হয়ত কোনও অর্থ সে করে নাই, অজয়ের চিন্তা এক মুহূর্ত্তের বেশী হয়ত তাহার মনে স্থান পায় নাই। তবু সেই প্রসঙ্গ লইয়াই কথা স্বরু করা উচিত কি-না, অজয় ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়াও নিজের ব্যবহারের বেশ প্রত্যয়যোগ্য এবং বলিবার মত কোনও সদর্থ নিজের মনে মনেও সে যখন করিতে পারিল না তখন বীণা তাহাকে পরিত্রাণ করিল। কলহাসির শব্দে শুদ্ধ পুরীকে সচকিত করিয়া ঐন্দ্রিলার পায়ের কাছে একটি কুশন-ঢাকা মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া সে কহিল, "শুনেছিস্, রাহু-সর্দ্দারের কথা? বলছে, অজয়বাবুকে একলা বসিয়ে চা খেতে দিলে তিনি ভাববেন, এদের বাড়ীতে পুরুষছেলে কেউ নেই, কিম্বা থাকলেও তারা ভদ্রতা জানে না। এই একটু আগে গুছিয়ে রাতের খাওয়া খেয়ে গিয়েছে।"

ঐন্দ্রিলা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। রাহু বীণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়াছিল, তাহার পায়ের প্রতিবাদসূচক আস্ফালন শুনিতে পাওয়া গেল। অজয় কহিল, "আচ্ছা, রাহুবাবুর কাল আমার ওখানে নিমন্ত্রণ রইল, আমি এসে তাঁকে নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। সেদিনও আপনারা তাকে বাদ দিয়ে হোটেলে চা খেয়েছেন। একটা মানুষের ওপর ক্রমাগত অবিচার ঘটতে থাকা ভাল নয়।"

বীণা হাসিতে হাসিতেই কহিল, "পুরুষ জাত এমনি অকৃতজ্ঞই বটে। সমস্ত শহরময় ধাওয়া ক'রে বেড়িয়ে চা খাওয়াতে ধ'রে নিয়ে এলাম আমি, নিমন্ত্রণ জুটল রাহুর। তা কি আর করব। রাহুকেই বলব আমাদের জন্যে কিছু খাবার রুমালে বেঁধে নিয়ে আসতে।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বাড়ী পর্য্যন্ত এসে আর পৌঁছবে না তাহলে।"

দরজার পাশে আবার দুমদুম্ করিয়া শব্দ হইল। বোঝা গেল, রাহুসর্দ্দার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

অকস্মাৎ কোথা হইতে মন্দিরা আসিয়া অজয়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অজয় তাহাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেই সে তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "মাকেও আদর ক'রে দাও!" বীণা তাহাকে প্রায় হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। সিঁড়িতে বলিল, "চল একবার উপরে, তোমার দুষ্টুমি আমি ভাল ক'রে বের করছি।"

ঐন্দ্রিলাকে আবার একাকী পাইয়া অজয়ের মন খুশী হইল। এবারে তাহার নিজের চেতনার উপর হইতে ঘুমের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। স্থির করিল, এবারে আর ভুল করিলে চলিবে না। কোনও কথার সূত্র ধরিয়া এই অপূর্ব্বসুন্দরী, স্বল্পভাষী, দর্পিতা মেয়েটির মনের অন্ততঃ বাহির-অঙ্গনের চৌকাঠ অতিক্রম করিতে হইবে। কে জানে হয়ত এই মুহূর্ত্তটি এমনভাবে কোনওদিন আর আসিবে না।

কিন্তু মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়া যাইতে লাগিল। বীণার কলহাসির ছোঁয়াচ-লাগা অজয়ের সচেতন চিত্ত ঐন্দ্রিলার বসিবার বিশেষ-রকম দর্পিত ভঙ্গীটিতে, দর্পণের মত নির্ম্মল স্বচ্ছ নখররাজির দীপ্তিতে, নিটোল শুভ্র হাত-দুইটির পেলব-মাধুর্য্যে, জরীর কাজ করা ছোট দুইটি লাল মখমলমণ্ডিত পাদুকায়, জরীপাড় লাল শাড়ীটির প্রত্যেক ভাঁজে ভাঁজে বিহ্বল হইয়া ফিরিতে লাগিল, কি কথা বলিয়া আরম্ভ করিবে তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না।

ঐন্দ্রিলাই এবারেও প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আপনি এখন কি লিখছেন?"

অজয় কথাটাকে একেবারেই আমল দিবে না মনে করিয়া কহিল, "লিখবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সেজন্যে বাংলাদেশে কি কারও লেখা আটকায়? রাস্তা থেকে যাদের ড্রয়িংরুমের আলো কেবল দেখেছি, তাদেরও নিয়ে আমরা লিখছি, আবার যারা রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠলে আমাদের হাঁড়ি ফেলতে হয়, তাদেরও প্রতি দরদের বান বইয়ে দিচ্ছি বইয়ের পাতায়! যে-সমস্যা আমাদের নয়, কোনোদিন হবে কি-না তাও কেউ বলতে পারে না, তাই নিয়ে ক্রমাগত নাটক আর

উপন্যাস, উপন্যাস আর নাটক লেখা হয়ে চলেছে! আমাদের জাতের সত্যিই কি কোনও জিনিষ নিয়ে কোনোদিকে সত্যনিষ্ঠার কিছু বালাই নেই?"

অজয়ের এবার মুখ ফুটিল, কহিল, "তা ত নেইই। সেই কথাই ত বিমানদের ইস্কুলে সেদিন আপনার সঙ্গে হচ্ছিল। আসল মানুষটা কোথায় যে তার মুখে সত্যি কথা শুনতে পাবেন? আমাদের সমস্ত রকম বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তাশক্তি চারদিক্কার পাহাড়প্রমাণ কৃত্রিমতায় চাপা প'ড়ে দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। আপনি যে-জিনিষটাকে সত্যনিষ্ঠা বলেছেন, কোনওরকমে সেই জিনিষটার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা না হলে এ ব্যাধি সারবে না। এদেশের মানুষের সত্যিকারের যেটা মন তার চারদিকে কতরকমের আড়াল তা আপনি জানেন না। সেখানকার প্রত্যেকটি দরজা-জানালা বন্ধ। দরজার বাইরে একটুখানি জায়গা যা খোলা আছে সেইখানে ব'সে নিজের সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমাদের কারবার। আমাদের সত্যিকারের সমস্যাগুলি ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ থাকে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না।"

কথাটা বলিতে বলিতে অজয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাহার নিজেরও অন্তঃকরণের এমনই একটা ঘরের সব-কয়টা দরজা-জানালা সে আজ সতর্ক হইয়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছে। সে-ঘর নন্দের। সেখানে সে অত্যন্ত কাতর মুখ কাঁচুমাচু করিয়া থাকে। সেখানে বলা নাই, কওয়া নাই, অকস্মাৎ একদল অপরিচিত লোক হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। তাহাদের কাহারও কাহারও মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি।...বালিগঞ্জ ষ্টেশনে ক্লান্ত দেহ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বসিয়াছিল, একটি হ্যাটবুট সমাবৃত মানুষ তাহার দিকে তির্য্যক্ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল বলিয়া সে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মনে পড়িল! যেন যে-বেঞ্চিটাতে সে বসিয়াছে সেখানে বসিবার সত্যসত্য তাহার কোনও অধিকার নাই। এখনই ঘাড় ধরিয়া তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতে পারে, হয়ত উঠাইয়া দিবে। নিজের সেই কাপুরুষতার লজ্জা ভুলিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ক্লাবের পথ

ধরিয়াছিল। এখনও আবার সেই চিন্তা হইতে মনটাকে সে জোর করিয়া ঐন্দ্রিলার দিকে ফিরাইয়া লইল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কিন্তু শাস্তিভোগও ত আমাদের কম হয়নি, কবে আমাদের চোখ ফুটবে? আরও আঘাত কি এদেশের গায়ে সইবে?"

অজয় এবার সত্য কথাই কহিল, "জানি না, ভাবতে চেষ্টা করিনি কখনও।... আমিও ত এই দেশেরই মানুষ? আমারও বুদ্ধির জড়তা কম নয়।"

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার মূল্যে যাহাকে সে আপনার করিয়া পাইতে লোভ করে, তাহার সম্মুখে বসিয়া নিজের এই নিদারুণ অক্ষমতাকে সে স্বীকার করিতেছে কোন্ লজ্জায়? উচ্ছ্বসিত আবেগে কণ্ঠ ভরিয়া কহিল, "তবে আমার মত ক'রে এই সমস্যাকে আমি ভাবতে চেষ্টা করছি। আমি ব'সে নেই। আমি বুঝতে চেষ্টা করছি, এই-সমস্ত কৃত্রিমতার মূল কোন্‌খানে। দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের মধ্যে কতদিকে কতদূর অবধি আমাদের এই দুর্ভাগ্যের শিকড় চ'লে গিয়েছে, আপ্রাণ চেষ্টায় দিনের পর দিন আমি তার সন্ধান করছি। আমার আশা আছে, এমনি ক'রে অনেক হারানো সূতো আমি খুঁজে পাব। দেশের মনের সবক'টা দরজা একটার পর একটা কেমন ক'রে বন্ধ হয়েছে, কবে বন্ধ হয়েছে, কেন বন্ধ হয়েছে, একদিন তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।... এক-এক সময় মনে হয়, সবক'টা দরজা প্রায় একই সময়ে একই কারণে একসঙ্গেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চকিতের মত সুদূর অতীতের সেই মহাদুর্দ্দৈব আমার মনের ওপর ছায়াপাত ক'রে চ'লে যায়, তাকে ধরতে পারিনে। আমি নিশ্চয় জানি, যদি ক্লান্ত হয়ে না পড়ি, যদি আমার বুদ্ধিবিকৃতি না ঘটে, একদিন তাকে ধরতে পারবই।" বলিতে বলিতে অজয়ের দেহ শিহরিত হইল। এই কথাটাকে এমন করিয়া সে ত আগে কখনও ভাবে নাই, নিজেকে আজ হঠাৎ কাহার যাদুমন্ত্রে সে এমন নিবিড় করিয়া আবিষ্কার করিল? তাহার সম্মুখে এই ত কর্ম্মক্ষেত্র খোলা রহিয়াছে।

নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকে পাইবার পথ। ইহারই সন্ধান কি এতদিন এত ব্যাকুল আগ্রহে সে করিয়াছে ?

শুনিতে শুনিতে সেদিনের মত ঐন্দ্রিলারও গায়ে কাঁটা দিল। সে ভাবিতে লাগিল, ঐ ত ঐটুকু দেহ, গদি-মোড়া চেয়ারটাতে বসিতে গিয়া যেন ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার কণ্ঠস্বরে এত জোর কোথা হইতে আসে কে জানে ?

এমনই করিয়া অনেক কথা বলা হইল, অনেক আবেগ প্রকাশ পাইল, অথচ শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া বহিয়া গেল, অজয় কিছুতেই সহজ চিন্তা, সহজ কথার সূত্র ধরিয়া ঐন্দ্রিলার সঙ্গে সহজ পরিচয়ের যোগ স্থাপন করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা লইয়া অজয়ের আজ কোনও ক্ষোভ নাই। সে আজ এমন কিছু পাইয়াছে যাহার মূল্য আজ এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আর সবকিছু হইতে তাহার কাছে বেশী। ঐন্দ্রিলা হইতেও কি বেশী ? কে সে-কথার উত্তর দিবে ?

বীণা ইহার মধ্যে আর অজয়ের খোঁজ লইবার অবকাশ পায় নাই। অজয়ের জন্য একটি বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া, হেমবালার খাবার উপরে পাঠাইল, হৃষীকেশের খাবার তাঁহার মহলে পৌঁছাইয়া দিল। হাতমুখ ধুইয়া সে ফিটফাট হইয়া আসিল। বলিল, "চলুন।"

সকলে মিলিয়া খাইবার ঘরে গেল। দেখা গেল, চা খাওয়া নয়, পুরাদস্তুর খাওয়ার আয়োজন হইয়াছে। রাহু পূর্ব্ব হইতেই টেবিলের এক দূরপ্রান্তে একটি প্লেট উল্টাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে বীণাদের আর্স্কিন সেডানের অন্ধকারে আলস্যে ও আরামে একাকী দেহ এলাইয়া বসিয়া অজয় ভাবিতেছিল, এই ঐন্দ্রিলা মেয়েটির মনের মধ্যে কি আছে তাহা কোনওদিনই কি সে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে? চকিতে তাহার চোখের মধ্যে কোন্ চিরপরিচয়ের দীপ্তি সে দেখিতে পায়, তাহার বহু জন্মান্তরের বিস্মৃতির পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া সেই আলো তাহার নিভৃততম অস্তিত্বকে সুদ্ধ উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কিন্তু ঐন্দ্রিলার মনের মধ্যে তাহার দৃষ্টির আলোককে সে এতটুকু দূর অবধিও লইয়া যাইতে পারে না।

ঐন্দ্রিলা ছবি আঁকে, কিন্তু সৌন্দর্য্য কখনও কি তাহাকে মুগ্ধ করে, প্রলুব্ধ করে? স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাতে তাহার মন কখনও কি উদাস হইয়া দূরদিগন্তের স্বপ্নলোকে ভাসিয়া বেড়ায়? অকারণের নামহীন বেদনায় মেঘান্ধকার বর্ষার দিনে তাহারও হৃদয় কি থাকিয়া থাকিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে?

তাহার তেজো-দর্পিত মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সে ঐশ্বর্য্যবতী, একথা তাহার দুইটি চোখের দূর–নিহিত দৃষ্টিতে, তাহার চিবুকের গর্ব্বিত দৃঢ় ভঙ্গীতে, তাহার ওষ্ঠাধরের বিশেষ একপ্রকার কুঞ্চনে অতি সহজে ধরা পড়ে। সে শুধু পার্থিব সম্পদ্ নহে, অন্তরের কোন্ গূঢ় ঐশ্বর্য্যে সে চির-ঐশ্বর্য্যবতী। তাহার কোনও অভাব নাই, কোনও বেদনা নাই, পৃথিবীর কাহারও নিকট হইতে তাহার কোনও প্রত্যাশা নাই। সে আপনাতে-আপনি পরিপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

তবু অজয় মনে মনে তাহার আজিকার নানা ব্যবহারের মধ্যে আশান্বিত হৃদয়ে কোথাও এতটুকু একটু ফাঁকের সন্ধান করিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা যে প্রথমে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক-ভাবে অজয়ের সঙ্গে কথা বলিতে পারে নাই,

ইহা কি শুধু অপরিচয়-জনিত কুণ্ঠা, না তাহা-অপেক্ষা বেশী আর-কিছু? তাহার পর যেমন করিয়াই হউক, বাক্যালাপ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু খাইবার টেবিলে বসিয়া অবধি ছোটখাট দুটি-একটির বেশী কথা আর সে বলে নাই। বীণার হাসি-পরিহাস উদ্দাম স্রোতে তাহার নীরবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বহিয়াছে, সে-স্রোত তাহাকেও স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, দুই-একটি তরঙ্গ তাহাকে আঘাতও করিয়া গিয়াছে, তবু সে বিচলিত হয় নাই। অজয় নানা গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া কথা জমাইবার চেষ্টা দুই-একবার করিয়াছিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলার অবিটুট নীরবতা কোনও প্রসঙ্গকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই, কেবল বীণার অহেতুক কলহাস্য বিনা অবলম্বনেও সমান মুখর হইয়া জমিয়াছে।

আহার শেষ করিয়া তাহারা যখন বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, রাত তখন সাড়ে-নয়টার কম হইবে না। ইহার বেশী দেরী করা উচিত নয় মনে করিয়া অজয় বিদায় লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বীণা তাহাকে ছাড়িল না, বলিল, "কি সুন্দর জ্যোৎস্না দেখুন, আকাশটাকে কে যেন দুধ দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। আমার রোজ ইচ্ছে করে, এই সময়টাতে ঐ মাঠের মাঝখান দিয়ে একটানা যতদূর দু-চোখ যায় চ'লে যাই, কিন্তু একলা যেতে ভরসা হয় না। রাহুকে সঙ্গে নেওয়া যায়, কিন্তু সে সঙ্গে থাকা-না-থাকা সমান কথা। আর কেউ আসেও না এ-বাড়ীতে। যদি বেড়াতে নিয়ে যান ত আমরা যাই, কি বলিস্ ইলু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার সব সৃষ্টিছাড়া সখ বাপু।"

বীণা বলিল, "তুমিই ত রোজ বল, আজ হঠাৎ এমন সাধু কেন সাজছ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভদ্রলোককে খাইয়ে-দাইয়ে এই রাত্রে এখন মাঠে মাঠে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে?"

অজয় তাড়াতাড়ি বলিল, "তাতে আমার কিছু কষ্ট হবে না, আপনাদের

যদি না হয়। চলুন না, না-হয় বেশীদূর যাব না। সত্যিই ভারি সুন্দর রাতটি, আপনার ছবি আঁকার ঢের inspiration পেতে পারবেন।"

ঐন্দ্রিলা মনে মনে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু আজই সন্ধ্যায় এই মানুষটির সম্পর্কে একবার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ সে করিয়াছে, এখনই আবার তাহাকে কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার মন চাহিল না। বলিল, "আচ্ছা, চলুন। রাহু-সর্দ্দারকেও সঙ্গে নেওয়া যাক্, নয়ত ও যা ছেলে, ভাববে, আবার আমরা তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো হোটেলে খানা খেতে গিয়েছি।" তাহার এইটুকু সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা অজয়কে আজ খুশীই করিল।

মেয়েরা শাল জড়াইল, রাহু একটা আলষ্টার চাপা দিয়া তাহার বেতের ছড়িটা হাতে করিয়া আসিল। হেমবালা দু-তলার সিঁড়িতে ঐন্দ্রিলার পথরোধ করিলেন, কহিলেন, "এতরাত্রে কোথায় চলেছিস ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বেড়াতে।"

হেমবালা একমুহূর্ত্ত নীবব থাকিয়া কহিলেন, "তোদের কি মাথা খারাপ হয়েছে ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "যদি হয়েও থাকে, শীতের হাওয়ায় বাইরে বেড়ালে উপকারই হবে।"

"যা-খুসি কর্ বাছা" বলিয়া হেমবালা তাড়াতাড়ি তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজার খিল লাগাইয়া দিলেন। মন্দিরা চমকিয়া জাগিয়া "মা" বলিয়া একবার কাঁদিল শোনা গেল।

চারজনে মাঠের পথে বাহির হইল। নগরোপান্তের নির্ধূম নির্ম্মল নৈশ আকাশ প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নাস্রোত বহিতেছে। মাঠের মধ্যেকার বাঁধানো পথ ধূলিহীন, শিশিরসিক্ত। দুই পাশের তরুরাজি সেই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধতায় দূর বসন্তের পুষ্পভারাক্রান্ত ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। প্রথমে সকলে পাশা-

পাশি চলিতেছিল, কিন্তু বীণার সঙ্গে অজয়ের গল্প জমিয়া উঠিবার পর দেখা গেল, ঐন্দ্রিলা ও রাহু বার বার দু-এক পা করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। বীণার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু অজয় মাঝে মাঝে থামিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটাইয়া লইতেছিল।

রাহুর নিতান্তই কথা বলিবার সঙ্গীর অভাব না হয় ঐন্দ্রিলার ইহা দেখা প্রয়োজন, বীণা অজয়কে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িবে না, সুতরাং দলের মধ্যে ইহা সত্ত্বেও অতি সহজেই একটি শ্রেণীবিভাগ হইয়া গেল। ঐন্দ্রিলা সারাক্ষণ প্রায় দূরে দূরেই রহিল, তবু অজয়ের চিত্ত কিছুমাত্র ক্ষোভ মানিল না। এই মায়াভরা অপূর্ব্ব রাত্রিটিকে সে অন্তরের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া অস্তিত্বের মধ্যে লইতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোককে চিরকাল সে বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ এই দুইটি তরুণীর মাধুর্য্যময় তরুণ চিত্তের দোলা লাগিয়া জ্যোৎস্না-স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহির হইতে তীরের বন্ধন অতিক্রম করিয়া অজয়ের অন্তরের মধ্যে প্লাবন বেগে বহিতেছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যলোকে প্রতিদিন যে-উৎসব জমিয়া উঠে, এতকাল বাহিরে দাঁড়াইয়া অজয় তাহার কোলাহল শুনিয়াছে, ভিতর হইতে তাহার আহ্বান আসে নাই। আজ তাহার মনে হইল, সেই উৎসবক্ষেত্রের ভাষাহীন আমন্ত্রণ বহন করিয়া এই দুইটি তরুণী তাহাকে সেখানে লইতে আসিয়াছে। তাহার আজিকার এই অনির্দ্দেশ-যাত্রা সৌন্দর্য্যলোকের একেবারে মর্ম্মস্থলে তীর্থযাত্রা। যাত্রাপথে এত বেশী দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া কি হইবে?

সে সত্যই উত্তেজিত হইয়াছিল। নারীজাতিকে এতকাল খুব বেশী দূর হইতে সে দেখিয়াছে। যতটুকু সম্ভ্রম সত্য সত্য তাহাদের পাওনা, তাহার সহস্রগুণ বেশী তাহাদের সে দিয়াছে। বীণাকেও বহু জনসমাবেশের মধ্যে কাছে পাইয়াছে বলিয়া, মনের এতটা কাছে আর কখনও সে পায় নাই। আজ অকস্মাৎ ইহাদের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়া আত্মীয়তার মাত্রা

রক্ষা করা অনভিজ্ঞতা হেতু তাহার কঠিন হইয়া পড়িল। বীণা যখন তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল তখন ইহা ভাবে নাই যে, অজয় আদৌ রাজি হইবে। অজয় আগ্রহসহকারেই রাজি হইল দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল কম নয়। নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া নিজেই ইহার পর তাহা প্রত্যাহার করিতে তাহার ভাল লাগে নাই।

কিন্তু অজয়ের ব্যবহারে কোথাও কোনও অতিশয়তা প্রকাশ পাইল না। ঐন্দ্রিলা বুঝিতেছিল, এই মানুষটির নিকট হইতে যাহাই পাওয়া যাইবে তাহা তাহার অন্তরের স্বাভাবিক আভিজাত্যের দ্বারা চিহ্নিত হইবে। যদি কোথাও লৌকিক ভব্যতার মাত্রা কিঞ্চিৎ সে অতিক্রম করে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ইহার সত্যনিষ্ঠ তেজোময় স্বভাবে এমন একটি জিনিষের প্রকাশ আছে, যাহা বৈঠকখানার বাতির মত সলিতার নির্দ্দেশে আলো বিকীরণ করে না, যাহা সূর্য্যালোকের মত মুক্ত, স্বভাবের দ্যোতনায় পরিপূর্ণ। হইতে পাবে মাঝে মাঝে মেঘ করিয়া আসে, এই আলোক ব্যাহত হয়। অব্যাহত বাতির আলো অপেক্ষা তবুও ইহা বড় জিনিষ।

চলিতে চলিতে হঠাৎ বীণা করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "গন্ধ পাচ্ছেন ? চাঁপাফুল, চাঁপাফুল !"

সকলে চমকিয়া দাঁড়াইল। সত্যই নৈশ বাতাস কোন্ অজানা সৌরভের গভীর উন্মাদনায় ভাবাতুর হইয়া আছে, জ্যোৎস্না যেন টলিয়া পড়িতেছে। সে গন্ধ শুধু মিষ্ট নয়, তীব্রও। ঈর্ষ্যাভরা, কামনাভরা প্রেমের জ্বালাময় মধুর স্পর্শের মত। "আপনারা এইখানে একটু দাঁড়ান্" বলিয়া অজয় ক্ষিপ্র-গতিতে সেই গন্ধের উৎপত্তিস্থানের সন্ধানে প্রস্থান করিল।

পথের এক পাশে দূরে মাঠের মধ্যে একটুখানি উঁচু জমির উপর কয়েকটি পত্রপল্লবসমাচ্ছন্ন তরুর ঘনসন্নিবেশ। নীচে আলোছায়া-বিচিত্র মসৃণ সবুজ তৃণাস্তরণ, তাহার উপর চাঁদের কণার মত কতকগুলি ফুল ঝরিয়া

পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজের রুমালটি লইয়া সে ঘাসের উপর বিছাইল, তারপর গাছের একটি নীচু শাখাকে আরও নোয়াইয়া সপল্লব ফুলের গুচ্ছ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তাহার উপর রাখিতে লাগিল।

একটু পরে রাহু ছুটিয়া আসিল। ঝরিয়া-পড়া ফুল দু-হাতে কুড়াইয়া জামার পকেট ভর্ত্তি করিতে লাগিল। পথের দিকে চাহিয়া অজয় বুঝিল, বীণাও আসিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে, ঐন্দ্রিলোকে একাকী ফেলিয়া আসিতে হয় বলিয়া আসিতে পারিতেছে না। ঐন্দ্রিলার মনে তখন কি হইতেছিল, কে জানে?

ফিরিয়া গিয়া ফুলের ভাগ প্রথম বীণাকে দিল। বীণা এমন করিয়া ফুলগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকেই প্রথমে না-দেওয়াটা নিষ্ঠুরতা হইত। তারপর একমুহূর্ত্ত দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া অন্তরের নীরব গভীর আরাধনা মিশাইয়া বাকী ফুল ঐন্দ্রিলার হাতে সে তুলিয়া দিল। তাহার একটি হাতে চকিতের মত ঐন্দ্রিলার একটি হাতের এতটুকু স্পর্শ সে লাভ করিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, সুভদ্রের বাড়ীতে তাহার ঘরের এককতার মধ্যে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ হাতটিতে আর কিছু যেন সেদিন তাহাকে স্পর্শ করিতে না হয়।

ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলার নীরবতার বাঁধ অল্প একটু যেন খসিল মনে হইল। অজয় রাহুকে সারাক্ষণ নিজের পাশে ধরিয়া রাখিয়া ঐন্দ্রিলাকে আলাদা করিয়া দল গড়িবার সুযোগ দিল না। সকলে পাশাপাশি চলিল। জোর করিয়াই অজয় এবার প্রথমে কথা বলিল। কহিল, "আপনাকে ক্লাবে কেন দেখতে পাই না?"

ঐন্দ্রিলা এ কথার কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরব রহিল। কত কথাই ত বলা যায়, সবই কিছু আর ইহাকে বলা চলে না। যে কারণগুলি সত্যই বলিবার মত তাহার কোন্‌টা বলিলে এখানকার মত কাজ চলিতে পারে?

বীণা বলিল, "আসল কারণটা আমি বলব ?"

বীণা কি বলিতে কি বলিয়া বিপদ্ বাধাইবে, এই ভয়ে তাহাকে বাধা দিয়া ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমিই না-হয় বলছি। কারণটা আমার কুড়েমি। রোজ কলেজে যেতে হয়, এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ক্লান্তিজনক ব্যাপার।"

অকাজের মাধুর্য্যে অজয়ের মন আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "আমি হলে কলেজে না গিয়ে ক্লাবে যেতাম।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "এবারে আপনি আমাকে সদুপদেশ দিচ্ছেন না।"

অজয় কহিল, "সম্ভবতঃ দিচ্ছি না। কলেজেও যে যেতে পারছেন, এইটেকেই আমাদের এখনকার মত যথেষ্ট মনে করা উচিত। সেখানে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে তা নিয়ে সমালোচনা করবার সময় সত্যিই এখনও আসেনি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সমালোচনা কেন চলতে পারবে না ? খুব চলতে পারে। কলেজ ছেড়ে ক্লাবে যাওয়াটাই ত আর একমাত্র সমালোচনা নয়।"

বীণা কহিল, "আসল কথাটা হচ্ছে, সমালোচনাও চলতে পারে, ক্লাবে যাওয়াও চলতে পারে, কোনো অবস্থাতেই কলেজ ছাড়ার কথাটা অবান্তর।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। অজয় আর অন্ততঃ এই বিষয় লইয়া তর্ক করিবে না স্থির করিয়া কথার স্রোতকে ইহার পর সহজ গতিতে বহিতে দিল।

বীণাদের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়ির কাছে দুই বোনের নিকট নত হইয়া এবং রাহুকে কল্যকার নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন তাহার সমস্ত হৃদয়মন হাসিতে, জ্যোৎস্নায়, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভের তন্ময়তায় বিভোর হইয়া আছে। নন্দের ঘরের দরজাটা মনের মধ্যে বন্ধ হইয়াই রহিল। বাড়ী ফিরিয়া কাহারও খোঁজ সে করিল না, সোজা নিজের ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

দুই দিনের জমানো ঘুম। সমস্ত দিনের উপবাস, পথশ্রম। চতুর্দ্দিক্

হইতে অন্ধকারের নাগপাশ নির্মমভাবে জড়াইয়া আসে, তাহার সঙ্গে ক্লান্তমনে বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তারপর বিদ্যুদুজ্জ্বল একটি অপরূপ সন্ধ্যা। রসনাতৃপ্তিকর অপর্যাপ্ত সুখাদ্য, সুপেয়। কলহাসি-মুখর, কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত, আবেশভঙ্গুর পরিপূর্ণ কয়েকটি মুহূর্ত। জ্যোৎস্নাধৌত আকাশ, রহস্যময় তরুচ্ছায়া, অজানা ফুলের সুগন্ধ। অজয়ের দেহমনে কোথাও আর কিছু আজ ধরিতেছে না। একবার মাত্র গায়ের লেপটিকে আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া দক্ষিণ করতল কপোলের নীচে স্থাপন করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল, তারপর মুহূর্তে নিদ্রার গহনতম তলে তলাইয়া গেল।

অকস্মাৎ এক সময় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথাও খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল কি? কি জানি, সে বলিতে পারে না। সুপ্তিমগ্ন নিস্তব্ধ রাত্রি! পশ্চিম দিক্‌কার বাতায়ন-পথে অস্তোন্মুখ পাণ্ডুর জ্যোৎস্না বিষণ্ণ মুখে উঁকি দিতেছে। বারান্দায় দেয়াল-ঘড়ির একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ।

অজয় অত্যন্ত গভীর করিয়া অনুভব করিল, সে একাকী আছে। হয়ত সমস্ত বাড়ীটাতেই সে আজ একাকী। অকারণেই তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া বন্ধুদের খোঁজ করে নাই, হয়ত কোনও কারণে সকলেই তাহারা আজ বাহিরে রাত কাটাইতেছে। বাহির হইতে নন্দের একটু কাশির শব্দের জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। আশা করিতে লাগিল, নন্দের কাশির শব্দেই তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে।

কেহ একজন কাশিল। নন্দ সচরাচর বারান্দার যেই কোণটিতে ঘুমাইত সেখানে নয়, নীচে বাহিরের দরজার কাছে কিম্বা সিঁড়ির পথে ঠিক বোঝা গেল না। সুভদ্রের গলা শোনা গেল, সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্ শব্দ, চাকররা সদর দরজা খুলিয়া দিতেছে।

উঠিয়া গিয়া পূবদিকের জানালাটা অজয় খুলিয়া দিল। নীচে ঝুঁকিয়া দেখিল, বাহিরের দরজার পথে তিনজন অপরিচিত লোক ধরাধরি করিয়া

বিমানকে ভিতরে আনিতেছে। অজয়ের মেরুদণ্ড বাহিয়া কেমন একটা শৈত্যের শিহরণ ধীরে তাহার মস্তিষ্কের দিকে উঠিতে লাগিল। রাত্রির বাতাস আজ কি অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা, না অজয় ভয় পাইয়াছে ?

হ্যাঁ, অজয় ভয় পাইয়াছে। তাহার দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে।

গলির মুখে বাহিরের দরজার কপাটটা বন্ধ হইল। সুভদ্র বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া উপরে বিমানের ঘরে এক বাল্তি জল দিতে বলিতেছে।···কিছুক্ষণ ধরিয়া জল ঢালা-ঢালির ছপ্‌ছপ্ শব্দ। আরও মিনিট পাঁচসাত কাটিয়া গেলে অজয় পা টিপিয়া বাহির হইয়া বিমানের ঘরে উঁকি দিল। জামাজুতা সুদ্ধ বিমান বিছানায় চিৎপাত হইয়া শুইয়া আছে, তাহার মাথার কাছে একটা ঈজি-চেয়ারে সুভদ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া। দ্বারের কাছ হইতে কুণ্ঠিত স্বরে অজয় কহিল, "কি হয়েছে সুভদ্র ?"

সুভদ্র কহিল, "কি আবার হবে ?"

ঘরের বাতাসে একটা উৎকট গন্ধ। যেন কোথাও ষ্টোভ ধরাইতে গিয়া কেহ মেথিলেটেড স্পিরিটের একটা বোতল উন্টাইয়াছে। অজয় সব বুঝিয়াও যেন কিছুই বুঝিল না। ধীরে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, বেশ কঠিন স্বরেই সুভদ্র কহিল, "তুমি এই শীতের রাতে কি করতে আবার উঠে এসেছ ? যাও শোওগে যাও। যাও বলছি।"

অজয় নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিল। বারান্দাটুকু পার হইতে হইতে শুনিল, বিমান জড়িত স্বরে বলিতেছে, "কেন বাবা তাড়িয়ে দিচ্ছ ? চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে ? ঐ ত তোমাদের জাতের দোষ। মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকো আর রাম-নাম জপ করো, ভূতটাকে চোখ তাকিয়ে দেখলে যে ভূত পালায় সে আর তোমরা কোনো জন্মে শিখবে না।"

সুভদ্র তাহাকে ধমকাইয়া বলিতেছে, "আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের বক্তৃতা হয়েছে, তুমি থামো।"

না, আজিকার এই অভিজ্ঞতা তাহার নহে, দেহে মনে কোথাও তাহাকে ইহা স্পর্শ করে নাই, ইহা স্বপ্ন, অজয় স্বপ্ন দেখিতেছে।···সত্যই হয়ত এই কয়দিন ধরিয়া অজয় স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী কোথাও তাহাকে নিবিড় করিয়া, দৃঢ় করিয়া স্পর্শ করিতেছে না ত! সে কেমন করিয়া জানিবে সে জাগিয়া আছে? বিমান, সুভদ্র, বীণা, ঐন্দ্রিলা, তাহার পরিচিত জগতের কাহারও সঙ্গে, কোনও কিছুর সঙ্গে তাহার অন্তরতম মনের কোনও যোগ নাই। তাহার সত্যকারের সুখদুঃখ দিয়া অপর কাহাকেও সে ছুঁইতেছে না, নিজের মনে অপর কাহারও সত্যকারের সুখদুঃখের ছোঁয়া সে পাইতেছে না। স্বপ্নময় অবাস্তবতায় রঙীন ছায়ার মত সকলে আজ এই মুহূর্তে কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, পলক ফেলিতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, চরমতম বিচ্ছেদেরও কোনও চিহ্ন তখন কোথাও আঁকা পড়িবে না। বিছানায় শুইয়া গভীর নিশ্চিন্ততায় অজয়ের দুই চোখ জুড়িয়া আসিল।

১৫

আর-একটা রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্বদিকের বাতায়ন খোলাই ছিল, বিপরীত দিকের দেয়ালে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। এত অজস্র আলোয় চোখ চাহিয়া জীবনকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ হয় না। কেবল জোর করিয়া বিমানের চিন্তাকে অজয় দূরে সরাইয়া রাখিল। আকাশ জুড়িয়া লক্ষ তরবারির ঝলকিয়া উঠিয়াছে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে যোদ্ধৃ আলোকের এই জয়যাত্রা। ছোট একটা অন্ধকার ঘরে গভীর রাত্রিতে কাহারা জল ঢালাঢালি করিয়াছে, সে স্মৃতি এক ফোঁটা কালির মত আলোকের মহাসমুদ্রে পড়িয়া অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া গেল।

একটা ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। রোজ এই পথ দিয়া এই সময়ে সে

হাঁকিয়া যায়। তাহার চেহারা অজয় কখনও দেখে নাই, দেখিতে তাহার ইচ্ছাও করে নাই। মানুষটাকে বাদ দিয়া তাহার হাঁকটা শুনিতেই তাহার ভাল লাগে।··· পূর্ব্বরাত্রির কথা মনে পড়িল, বীণা-ঐন্দ্রিলা, ঐন্দ্রিলা-বীণা। কিছুক্ষণ পর নিজেরই অজ্ঞাতে মানুষগুলিকে বাদ দিয়া একটা নামহীন মাধুর্য্যের আস্বাদ সমস্ত মন দিয়া সে লইতে লাগিল। মনে পড়িল, কথা বলিতে বলিতে কাল কি গভীর আবেগ তাহার কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেশের দুঃখদুর্গতির মূল সে খুঁজিয়া বাহির করিবে এই তাহার দুঃসাহসিক পণ, দেশের লুপ্ত ইতিহাসের অন্ধকার গুহাপথে কেবলমাত্র অন্তরের অনির্ব্বাণ আগ্রহকে বাতির মত জ্বালিয়া সে অগ্রসর হইয়া যাইবে। আজই সে যাত্রা সুরু করিবে, আজ এই মুহূর্ত্তে। এতকাল সময়ের অপব্যবহার, ক্ষমতার অপচয় করিয়া সে কাটাইয়াছে। কলেজে বৎসরের পর বৎসর সে পুঁথির পর পুঁথি মুখস্থ করিয়াছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে কত শক্তির অভ্যুত্থান তিরোধান, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘর্ষ, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ অরাজকতা, সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনের শেষে পলিপড়া মাটিতে নূতন সভ্যতার অভ্যুদয়, তাহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই তাহার অধিগত হইয়াছে, কিন্তু কলেজের প্রাচীরের বাহিরে যেখানে মানুষের বহুদুঃখদুর্গতি দিয়া গড়া সত্যকারের পৃথিবীর সুরু, সেখানে এই অধীত বিদ্যা তাহার কোন্ কাজে লাগিবে তাহা কেহ তাহাকে আজ অবধি বলিয়া দেয় নাই। ভারতের বহু ইতিহাস সে পড়িয়াছে, বহু গৌরবের অগৌরবেরও ইতিহাস, কিন্তু ভারতের আজিকার অধোগতির সঙ্গে তাহার অতীত ঐতিহ্যের যে কোনও সংস্পর্শ আছে এমন কথার উল্লেখমাত্র কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই।

সুভদ্র আসিয়া অজয়ের দরজায় ঘা দিল, কহিল, "আমায় বিশেষ কাজে এখুনি একটু বাইরে যেতে হচ্ছে, তুমি আজ চা-টা নিজেই ঢেলে খেও, তবে তার আগে পাঁচনটা খেতে ভুলে যেও না। আমার ফিরতে দেরী হতে পারে।"

অজয় কহিল, "চা ঢেলে আমি ঠিক খেতে পারব, কিন্তু তোমার বন্ধুটির ব্যবস্থা কি ক'রে রেখে যাচ্ছ ?"

সুভদ্র কহিল, "ও নিজে যা পারে করবে, ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। একটা কথা তোমাকে বলা উচিত মনে ক'রে বলছি ; ও কালেভদ্রে দু-এক ঢোঁক খায়। কিন্তু এমন বেচাল হতে এর আগে ওকে আর কখনো দেখিনি। কাল কিছু একটা ঘটেছে যা আমরা জানি না।"

ওপাশের ঘর হইতে ভাঙা গলায় বিমান গাহিয়া উঠিল,

"There was a man of Peru, He didn't know what to do···"

ঘুম ভাঙা সত্ত্বেও বিমান বিছানাতেই এতক্ষণ পড়িয়া ছিল। শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিতেই তীব্র রোদের ঝাঁজ তাহার চক্ষে আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ জানালাটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের মনেই সে কহিল, "রোদের ইউনিট্ গুনে কেউ বিল্ করে না কিনা তাই এত তেজ। কি বিটকেল বাবা, চোখদুটো ঝল্‌সে গেছে একেবারে।···and that was the end of the man of Peru"

সুভদ্র ততক্ষণ পথে নামিয়া গিয়াছে। অজয় এক মুহূর্ত দুই চোখ বন্ধ করিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইল। না, সে শুনিতে পায় নাই। আজ তাহার জীবনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত, নূতন যাত্রাপথে অসীমতা-ভরা আলোর আশীর্ব্বাদকে সে পাথেয় করিয়া লইবে। আজ কোনও অন্ধকার না, কদর্য্যতা না, বিমানকে আজ সে ভুলিয়া থাকিবে।

কিন্তু কার সাধ্য যে বিমানকে ভুলিয়া থাকে।

গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিমান গাহিয়া উঠিল,

"There was a man of Madras, He sat upon the grass···"

উৎকট সুর, তদুপযুক্ত বাক্যবিন্যাস। কোনও মাতাল গোরার মুখে শুনিয়া শিখিয়া থাকিবে। কিন্তু বিমানকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না ; সে

বেচারা কেমন করিয়া জানিবে, অজয় কোন্ গভীর বিষয়ের চিন্তায় তখন মগ্ন হইয়া আছে? যদি জানিত, হয়ত সতর্ক হইত।

অজয় শেষ চেষ্টা করিয়া ভাবিতে লাগিল, হয়ত আমার সাধনার পথে শেল্‌ফে সাজানো ঐ বইগুলি কোনও কাজেই আসিবে না। দেশের বিস্মৃত ইতিহাসের যে সূত্রগুলিকে আমি ধরিতে চাই, হয়ত আমার নিভৃততম ধ্যানের মধ্যে অকস্মাৎ সেগুলি ধরা দিবে। ভারতবর্ষের ধূলিতে যুগে যুগে কত মহাপুরুষের পদরজঃ মিশিয়াছে, কত মহাসত্যকে শুদ্ধমাত্র একাগ্র ধ্যানের শক্তিতে তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। এই ভারত-বর্ষের মাটিতে আমার জন্ম, আমিও তেমনই করিয়া সত্যকে লাভ করিব। অজয়ের কতদিন হাসি পাইয়াছে,—যাহার নিজের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের কোনও অর্থ প্রায় নাই, দিনের পর দিন তাহাকে পড়িতে হইতেছে ঐ ইতিহাসের বইগুলি, যাহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রধানতঃ ব্যক্তির কীর্ত্তি এবং অপকীর্ত্তির কাহিনীতে ভারাক্রান্ত! ইহার পর ইচ্ছা করিলেই এগুলিকে সে পোড়াইয়া দিতে পারিবে। তাহার পর তাহার একনিষ্ঠ তপস্যায় অন্ধকারের দ্বার একটু একটু করিয়া যখন খুলিয়া যাইবে, তাহার মধ্যে অনুসন্ধিৎসার অভাব আছে বলিয়া কেহ আর তাহাকে উপহাস করিতে সাহসী হইবে না।

বিমানের গলার প্রাভাতিক জড়তা ততক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে। সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া গাহিল, "There was a man of Kentucky · "

অজয়ের চোখের সম্মুখে সহসা জ্যোতিঃস্নাত প্রভাতের চেহারা কালো হইয়া গেল, দশদিক্ হইতে দশটা বিমান গর্জ্জিয়া গাহিল, "There was a man of Kentucky···" অজয় কি করিতেছে জানিল না, ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া বিমানের রুদ্ধ দরজায় আঘাতের পর আঘাত বৃষ্টি করিয়া সে বলিতে লাগিল, "দরজা খোল, খোল খোল, শীগগির খোল বলছি—"

বিস্ময়ে মুখ ভরিয়া বিমান দ্বার খুলিয়া দিল স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া

বাহির হইতেছিল, ড্রেসিং গাউনটাকে টানিয়া গায়ে জড়াইয়া কহিল, "কি ব্যাপার!"

অজয় বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "ভোরে উঠেই কি ভাঁড়ামো সুরু করেছ?"

একটু হাসিয়া বিমান কহিল, "ভাঁড়ামো আবার কি? ফুর্ত্তি হয়েছে, গান গাইছি।"

অজয় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিল, "ফুর্ত্তি? তুমি বেহায়া তাই··· আশ্চর্য্য, কথাটা তোমার মুখে আটকাল না।"

বিমান ভাল করিয়া হাসিতে পারিতেছে না, কহিল, "দেখ অজয়, বেহায়া আমরা সকলেই। আমাকে আলাদা ক'রে ঐ গালটা দেবার কিছু দরকার আছে?"

"হ্যাঁ আছে, তোমার ভাবি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে তাই আমাদের সুদ্ধ তোমার দলে টানছ!"—অজয়ের বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া, নিজের ধরণে ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া বিমান স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মনে মনে কহিল, 'এরই নাম গেরো। এই কনকনে শীতে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে যে একটু গরম হয়ে নেব তারও জো রইল না।'

নিজের ঘরে ঢুকিয়াই অজয় একেবারে অনুশোচনার গভীর তলায় তলাইয়া গেল।

আঃ, কেন সে কলহ করিতে গেল, কেন করিতে গেল? সে না তপস্বী, তপের সাধনার পথ না তাহার সম্মুখে বিস্তৃত, পদে পদে অপরের পদস্খলনের হিসাব লইয়া নিজের চলাকে ব্যাহত করা কি তাহার সাজে? কাল রাত্রির সেই ব্যাপারের পর হইতে বিমানের প্রতি তিক্ততায় তাহার মনটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঠিক। কিন্তু অধঃপাতে যাইবার অধিকার প্রতি মানুষের আছে, বিমানেরও আছে, অজয় কে যে তাহাকে গায়ে পড়িয়া কথা শোনাইতে গেল?

কিন্তু আধঘণ্টা-টাক পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা হাতে করিয়া বিমান যখন তাহার বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, পেয়ালাটাকে ঠোঁটে ঠেকাইয়া মিষ্টি বেশী হইয়াছে বলিয়া সে সরাইয়া রাখিল। ভাবিয়াছিল, ঐতেই রেহাই পাইবে, কিন্তু বাহির হইয়া গিয়া একটা ট্রেতে করিয়া চা, চিনি, দুধ, এবং পেয়ালা-পিরীচ বহিয়া আনিয়া বিমান কহিল, "ক' চামচ দেব বল।"

এমন যে অজয়, সেও এবারে একটু হাসিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "আমি মিশিয়ে খাচ্ছি, দাও।"

বিমান বলিল, "বসতে পারি ?"

হঠাৎ আবার গম্ভীর মুখ করিয়া অজয় কহিল, "তোমার খুশি।"

একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বিমান বলিল, "আমি মিটিয়ে নিতে চাইছি তা বুঝতেই পারছ, যদি অবশ্য মিটিয়ে নিতে দাও। আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি। কাল রাত্রের ব্যাপারটা ঘটা উচিত ছিল না, কিন্তু ঘটে গেল, কি করব ?"

অজয় একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কি করব মানে ?"

বিমান চুপ করিয়া রহিল। অজয় বলিল, "ও ছাইভস্মগুলো না খেলে চলে না ? কেন খাও ?"

বিমান তবু চুপ করিয়া আছে দেখিয়া অজয় কহিল, "কথাটার যদি উত্তর দেবে না, তবে এত ঘটা ক'রে এসে বসলে কেন এখানে ?"

বিমান একথার পরও আরও কিছুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন তাহার সদাপ্রসন্নতার হালকা মুখোসটা পুরাপুরিই খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। নীচু গলায় বলিল, "কেন খাই জানতে চাইছ। ভাল লাগে ব'লে খাই বললে সাধারণ ভাবে ঠিকই জবাব দেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু সেছাড়া আরও একটা কথা আছে। আর কারুকে বলতাম না, কিন্তু তোমাকে বলছি, কারণ, বুঝতে পারছি জানবার ইচ্ছেটা তোমার আন্তরিক। বুঝতে চেষ্টা করলে

হয়ত তুমি বুঝতে পারবে। ...আমি ভুলে থাকতে চাই, ঠিক যেমন ক'রে তুমি ভুলে থাকো, সুভদ্র ভুলে থাকে। কাল আমার অসহ্য হয়েছিল। আমি দেখলাম, তোমরা কত সহজে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিলে। সে ক্ষমতা ভগবান্ আমাকে দেন নি, আমি কি করব? তুমি কবি-মানুষ, ইচ্ছে করলেই নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারো। সুভদ্র তার হাজারো রকম কাজ নিয়ে মেতে যায়। ও দুটোর একটাও আমি পারি না। আমি যদি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে পারতাম, হয়ত বেঁচে যেতাম, তাও পাবি না ব'লে ভুলে থাকবার অন্য পন্থা খুঁজতে হয়।"

অজয় কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "কিন্তু কি তুমি ভুলে থাকতে চাও, যার কথা কাউকে বলাও চলে না?"

বিমান এবারও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বলব না।"

অজয় কহিল, "কেন?"

উঠিয়া গিয়া খোলা জানালায় বাহিরের দিকে তাকাইয়া বিমান বলিল, "বলা চলে না ব'লে। সবাই সেকথা ভুলে থাকতেই চাই ব'লে।"

সুভদ্র আলিপুরের কোন্ বাগান হইতে একরাশ দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অজয়ের টেবিলের উপর হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "নন্দ নাকি কাল রাত থেকে আসে নি?"

বিমান জানালার নিকট হইতেই বলিল, "সে আর এগুলো হচ্ছে না।" কথাটা বলিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিবার চেষ্টাও একটু করিল কিন্তু একেবারেই হাসির মত সেটা দেখাইল না।

অজয় কহিল, "সে কি, কোথায় গেল?"

বিমান বলিল, "কি জানি কোথায় কাদের একটা গুদাম বাড়ীতে।"

"কি খাবে?"

"ভগবান্ জানেন।"

এবারে অজয়ও একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "সেই ভাল। আমরা জেনেই বা কি করতে পারব ?"

সুভদ্র কাগজের পুঁটলি খুলিয়া গাছ-গাছড়ার নাম লেখা মোড়কগুলিকে মিলাইয়া লইতেছে।

বিমান অকস্মাৎ বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ধার-করা টাকা-দশটা ছিল, দিতে গেলাম, যদি নিত, তোমরা রক্ষা পেয়ে যেতে। কাল রাতের অনাচারটা ঘটতে পেত না। নিলে না, বললে, আশীর্ব্বাদ করবেন, ঢের হবে। যেন এই হতভাগা দেশে কোনো মানুষের আশীর্ব্বাদ কোনো মানুষকে লাগে ! কি আশীর্ব্বাদ করতে পারতাম তাকে ? হঠাৎ কোনো যাদুমন্ত্রে পুলিশের খাতা থেকে তোমার নামটা মুছে যাক ? বলতে পারতাম, যাদের ছেলে পড়িয়ে মাসে দশটা ক'রে টাকা পাও তারা হঠাৎ খুসী হয়ে তোমার মাইনে বাড়িয়ে পঞ্চাশ ক'রে দিক ? বলতাম, এই শীতে তোমার গায়ে দেবার একটা কম্বল নেই, তার হয়েছে কি, এই আমি তোমার মাথায় হাত রেখেছি, তোমার বুকের কাশি সেরে যাক ?"

অজয় দাঁতে দাঁত চাপিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এত অল্পেতে সে মন খারাপ করিবে না ! না, এইসমস্ত তুচ্ছ দুঃখদৈন্যের অনেক উপরে তাহার স্থান। জীবনের মধ্যে মুহূর্ত্তে জীবনাতীতকে আশ্রয় করিয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত সে জানে।

উঠিয়া গিয়া স্নান করিল। বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া অবেলায় ভাত চাহিয়া লইয়া খাইল। ভাত প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু নিজেকে লইয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত জানা থাকিলে শীতের অবেলায় স্নানান্তে ঠাণ্ডা ভাত খাইতেও তেমন-কিছু অসুবিধা বোধ হয় না।

বিকালের দিকে বিমান আবার একবার নন্দের কথা পাড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, সুভদ্র তাহার সেদিনকার কাজের লম্বা একটা ফিরিস্তি দিয়া তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। বিমান বলিল, "ওর খোঁজও কি একবার করবার দরকার নেই ?"

"কখন করব? খোঁজ যাদের জানা আছে তাদের নিয়েই হাঙ্গামার শেষ নেই। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর ভার কি আমাদের ওপর রয়েছে?—তুমি যেতে চাও, যাও না?"

"আমার বয়েই গেছে। অজয় যাচ্ছ?"

"গিয়ে কি করব? তাকে জ্বালাতন করা ছাড়া কিছু লাভ হবে না।"

"তা বেশ," বলিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বিমান বাহির হইয়া গেল।

নীচে বসিবার ঘরে লিখিবার দেরাজে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, সত্যই নন্দের খোঁজ একবার করা তাহাব উচিত ছিল না কি? তাহার পর নিজেই নিজেকে নানা ছলনায় ভুলাইতে লাগিল। যে পলাইয়া গিয়াছে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে তাড়া করিয়া কেন বৃথা বিপন্ন করা? তাহাতে তাহার দুঃখই কেবল হয়ত বাড়ানো হইবে। কিন্তু তাহার অন্তরের একটা অত্যন্ত গভীরতার জায়গায় একটা মানুষ কোনও ছলনাতেই ভুলিল না। সে মানুষটা ক্রমাগত বলিতে লাগিল, নন্দ যে তোমাকে শ্রদ্ধা করিত, দেবতার মত করিয়া পূজা করিত। তাহার মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া তাকাইয়া নিজের মধ্যে যে দেবতাকে তুমি দেখিতে পাইতে, আজ কিসে সেই দেবতাকে আড়াল করিল? সে কি-প্রকারের দেবত্ব, সে কেমন শ্রদ্ধার্হতা, একটি খানাতল্লাসীব পরোয়ানা যাহাকে টলাইয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিল! ভয়ের চেয়ে বড় মানুষের আর পাপ নাই, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া এই কথাটাকে সে বিশ্বাস করিত। সে কি ভয় পাইয়াছে? কি জানি, আজ থাক্, অন্য একদিন ভাবিয়া দেখিবে। আজ নিজেকে কেবল এই কথা বলিয়াই সে শেষ করিল, নন্দকে সে ভালবাসে, হয়ত গভীর করিয়াই ভালবাসে। স্বজনহীন নির্বান্ধব ছেলেটির এতটুকু দুঃখ মোচন করিতে পারিলে সে সুখী হয়। পৃথিবীর কেহ জানিবে না, নন্দ নিজে জানিবে না, কিন্তু হে অন্তর্যামী, তুমি জানো, মনে মনে অজয় নন্দকে প্রতিমুহূর্তে ভাবিতেছে, নন্দকে সে ভোলে নাই।

চা খাইতে বসিয়া স্বভদ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি এত ভাবছ?"

. অজয় বলিল, "এইমাত্র মনে পড়ল, আমাদের বাড়ী আজ একজনের চা খাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

"কার?"

"রাহুর।"

"রাহুর? তা বেশ ত; সে এলে আর-একবার সবাই মিলে চা খাওয়া যাবে।"

"সে এলে ত? তাকে আমারই গিয়ে নিয়ে আসবার কথা ছিল।"

স্বভদ্র আপাদমস্তক তাহাকে একবার দেখিয়া লইল, কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে; যাওনি কেন এতক্ষণ?"

অজয় কহিল, "মাথাটা একটু খারাপই হয়ে থাকবে, এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

স্বভদ্র চায়ের পেয়ালা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ওঠ, এখুনি যাও, কি ভাবছেন ওঁরা বল দেখি।"

অজয় আসন ছাড়িয়া নড়িল না, কহিল, "সেই ভাবনাতেই ত আরও যেতে পারছি না। ছ'টা বাজতে চলেছে, খুব তাড়াতাড়ি গেলেও রাত সাতটার আগে পৌছতে পারব না, মানুষকে চা খেতে ডাকবার উপযুক্ত সময় সেটা নয়। ওঁরা ভাবতে পারেন, চা খাওয়ানোর কথাটা বাজে, একটা ছুতো ক'রে আর-একবার তাঁদের বাড়ী আমি বেড়াতে এসেছি।"

"ত তাঁদের বাড়ী কিছু একটা ছুতো ক'রেই তুমি যদি যাও, সেটা এমন কিছু মহাপাপ হবে না।—দেখ অজয়, জিনিষটা তোমার স্বভাবে নেই, তা আমি জানি। কিন্তু স্বভাবে এমন কত জিনিষ থাকে না, মেয়েদের জন্যে যা একটু-আধটু করতে হয়। সব দেশের লোকেই তা করে। মেয়েদের দশা আমরা যা ক'রে রেখেছি, আমাদের সেটা আরও বেশী ক'রেই করা উচিত।"

"তুমি আছ সারাক্ষণ তোমার সমস্ত খেয়াল নিয়ে। এই ত সবাইকার অবস্থা। মেয়েদের কথা ভাববার এই কি সময়?"

"নিশ্চয় এই সময়। মেয়েদের কথা ভাবব না ত ভাবব কি? ভাববার মত, আশা করবার মত এদেশে আর আছে কি শুনি? সেটা জানি ব'লেই ত আর-সব ফে'লে ক্লাব নিয়ে পড়েছি।"

"ঐতেই কি দেশোদ্ধার হবে?"

"না, কিন্তু কতগুলি মানুষ উদ্ধার হবে ব'লে আশা হচ্ছে।"

"তার মানে?"

"মানে খুব সোজা। স্ত্রীপুরুষকে ঠিক জায়গায় যদি মিলিয়ে দিতে পারি, কতগুলি পুরুষ অন্ততঃ আর-একটু পুরুষের মত হবে। তুমি জানো অজয়, এ দেশের বেশীর ভাগ ছেলেগুলোকে যখন দেখি, কেবল মনে হয়, মেয়েতে পুরুষ সেজে বেড়াচ্ছে। এমন মিষ্টি ক'রে হাসে, এমন নরম ক'রে কথা বলে, পা টিপে টিপে চলে পাছে মাটির গায়ে আঘাত লাগে, এমন নিরীহ করুণ চোখ ক'রে তাকায়! কেন এমন হয় জানো? ওরা যে পুরুষ সেটা মনে পড়িয়ে দিতে মেয়েরা ওদের জগতে বর্ত্তমান নেই। স্ত্রীহীন জগতের শূন্যতা স্বভাবের নিয়মে নিজেরাই ওরা পূর্ণ করছে।"

অজয় হাসিয়া উঠিয়া কহিল; "কি আজে-বাজে বকছ।"

সুভদ্র কহিল, "নাও, ওঠ।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অজয় কহিল, "তুমিও যদি সঙ্গে যাও ত যাই।"

সুভদ্র কহিল, "তাই যাব না-হয়। পথে কালিঘাটে বক্সিংএর আখড়ায় একটু মেরে যাব, পাঁচ-ছ'দিন যাওয়া হয়নি,—আজ যাবই কথা দিয়েছিলাম।"

পথে যাইতে ট্রামে অজয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া সুভদ্র কহিল, "একএকবার ভাবি, অবরোধ-প্রথা আমাদের জাতের হয়ত বা একটা উপকারই করেছে। কৃপণের ধনের মত আমাদের স্ত্রীজাতিকে এতকাল আমরা সঞ্চয়

করেছি। আমাদের এতদিনকার পরাধীনতার পাপ, অধোগতির গ্লানি তাদের তেমন ক'রে স্পর্শ করেনি। এখন যখন পৃথিবীর কারবারে দেউলে হতে আমাদের আর বাকী নেই তখনই এই গুপ্তধনকে বাইরে এনে কাজে লাগাবার সময়।"

একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক যাইতেছেন। ছেলেগুলি খুব সাজিয়াছে, আল্‌ষ্টার, র‍্যাপার, বুটজুতা, রঙীন মোজা। বছর আষ্টেকের একটি ছোট মেয়ে মায়ের কোল ঘেঁসিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, খালি পা, শীতে কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। মা ত মা, তাঁহার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। মা ও মেয়ের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া অজয় কহিল, "কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে পার, কিন্তু বহুপুরুষের জমানো টাকা-কড়ি, আজকালকার বাজারে আর চলে কি না সেটা দেখতে হবে।. একটু ঘসামাজা না করলে চলবে না যে সে ত বোঝাই যাচ্ছে।"

১৬

চারটায় কলেজ হইতে ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, বীণা সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হইয় আছে। বইয়ের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া বীণার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "ভুলেই গিয়েছিলাম আজ অজয়-বাবুর আসবার কথা। তা তুমি অত ক'রে সেজেছ কেন, তুমিও যাচ্ছ নাকি চা খেতে?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "নিয়ে যদি যায় তাহলে কি আর ছেড়ে দি? কিন্তু এদেশের পুরুষ-জাতের যা সাহস সে আর বোলো না। যত বীরত্ব সে কেবল ঐ মাসিক পত্রের পাতায়। চা খেতে ডাকলেই সাহস ক'রে আসে না, তা আবার চা খাওয়াতে নিয়ে যাবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আহা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, যাক না আরও কিছুদিন। কাল ত হাওয়া খেয়ে এলে, এর পর চায়ে প্রোমোশন পেতে কতক্ষণ? আমি

আপাততঃ বাড়ীর চা এক পেয়ালা পেলেই খুসী। তোমার নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছু আছে, না একেবারেই গেছে?"

বীণা কহিল, "না, সে, সমস্তের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। যাই দেখি গে, উনুনে আঁচ দিয়েছে কিনা। তুই ততক্ষণ কাপড় ছেড়ে নে। হঁ্যা, আর দেখ্, একটু পরিপাটি ক'রে সাজিস্। ভদ্রলোক আসছে, একটু সাজগোজ দেখলে খুসি হবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "হঁ্যা, আমার বয়েই গিয়েছে। আমি নীচে নামছিই না মোটে। ভদ্রলোক আসছে রাহুকে নিতে, হঠাৎ দুই বোনে মিলে তার ঘাড়ে প'ড়ে কি হবে?"

বীণা বলিল, "আহা, কি কথার ছিরি। ঘাড়ে পড়া আবার কি? একটা লোক বাড়ীতে আসছে, তার সঙ্গে দেখা করতে হবে না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি বাড়ীর গিন্নি, তুমি দেখা কোরো। আমার ওসব আসেটাসে না তা ত জানোই।"

চা খাওয়া শেষ হইতে হইতে পাঁচটা। বীণা মাছের কচুরি করিয়াছিল, রাহুর অতি প্রিয় খাদ্য, গোটা পাঁচ-ছয় চাহিয়া লইয়া খাইয়াও সে অজয়ের দেরিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক বীণা বারে বারে বাহির হইয়া মাঠের পথটা দেখিয়া আসিতেছে। যা অদ্ভুত মানুষ, বলা ত যায় না, হয়ত কোনও ছুতায় আবার দরজার গোড়া হইতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ছয়টা বাজিতে চলিল, তখনও অজয় আসিল না। রাহুর নাকে কান্না সুরু হইয়া গেল। তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া থামাইয়া, বীণা মুখটিকে কালো করিয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলাকে কহিল, "কি হ'ল বল্ দেখি? আজও কি মাঝপথ থেকে ফিরে গেলেন?"

ঐন্দ্রিলা ঝাঁঝিয়া কহিল, "তা যদি গিয়ে থাকেন ত কি আর করা যাবে বল। সবাই মিলে বাড়ী ছেড়ে তাঁর জন্যে মাঝপথে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, এই কি তিনি আশা করেন?"

বীণা একথার কোনও উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি আবার বারান্দায় ফিরিয়া গেল। পনেরো মিনিট না যাইতেই রাহু এত হুলুস্থূল বাধাইল, যে তাহাকে বাড়ীতে রাখা দায়। তাহার হঠাৎ ধারণা জন্মাইয়াছে, অজয় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে এমন কথা ছিল না। নিমন্ত্রিতকে কে কবে আবার বাড়ী বহিয়া লইতে আসে? বড়দিদির কাছ হইতে ঠিকানা পাইলেই সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারে।

ঐন্দ্রিলা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে সাজসজ্জা সমাধা করিল, তারপর বারান্দায় বাহির হইয়া কহিল, "দিদি, চল তোমাদের সেই হোটেলে, রাহুকে চা খাইয়ে আনা যাক্। নয়ত ওর কাছে নিজেদের মান-সম্মান আর থাকে না।"

বীণা কহিল, "তুই কি ক্ষেপেছিস্ ইলু, ভদ্রলোক এসে কাউকে বাড়ীতে না দেখতে পেলে ভাববে কি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তাহলে তুমি থাকো, রাহুকে নিয়ে আমি চললাম।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি? অজয়বাবু যদি আসেন, রাত আটটায় রাহু তাঁর সঙ্গে চা খেতে যাবে আশা ক'রে নিশ্চয়ই আসবেন না।"

দুতলায় হেমবালা কহিলেন, "আজ আবার কোথায় চলেছিস্?"

"রাহুকে চা খাওয়াতে।"

"চা এইমাত্র সে খেল না?"

"ঘরের চায়ে রাহুবাবুর আর মন উঠছে না।"

"কোথায় গিয়ে চা খেলে মন উঠবে?"

"দেখি কোথায় যাওয়া যায়, হোটেলে যাব ব'লে ত বেরিয়েছি।"

"তার মানে? হোটেলে মেয়েরা আবার যায় নাকি? তোরা দিনদিন সব কি হচ্ছিস্?"

ঐন্দ্রিলা নিঃশব্দে নামিয়া চলিল। হেমবালা দৃঢ়কণ্ঠে ডাকিলেন, "ইলু!" নীচে হইতে কোনও সাড়া আসিল না। ঐন্দ্রিলা জীবনে এই প্রথম মায়ের শাসন অমান্য করিল, কিন্তু তাহার অন্তর্য্যামী জানেন, তাহার মা তাহাকে কম জ্বালান নাই। শোধবোধ স্বরূপ এইটুকু বিদ্রোহের অধিকার এতদিনে তাহার জন্মাইযাছে।

ক্ষেন্তি সেইখানেই মন্দিবাকে আগলাইয়া বসিয়া ছিল, চাপা গলায় কহিল, "বারণ কর রাণী মা, বারণ কর। তোমার চোখের সামনে এমন অনাছিষ্টি সব ঘটতে দিয়ো না। কত ক'রে সবাই তখন বললুম শুনলে না ত, দিলে মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে। এখন বোঝো কেন মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই। মাগো, হোটেল কিনা মুসাফিরখানা, কত জাত-বেজাতের আড্ডা, সেইখেনে দিদিমণি চলেছে চা খেতে!"

হেমবালা বলিলেন, "আঃ, চুপ কর্ তুই।"

কিন্তু ক্ষেন্তি নিজের মনে বকিযাই চলিল।

হেমবালা চিরকাল একটা বিরাট সংসারের কর্ত্রীত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এবাড়ীর গৃহিণী প্রকৃত পক্ষে বীণা। দুতলার একটা ঘরে কোণ-ঠাসা হইয়া থাকা তাঁহার ধাতে সহিতেছে না। ভিতরে ভিতরে কিছুদিন হইতে একটা বিদ্রোহ জাগিতেছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। কেবল ক্ষেন্তি নিজের বিদ্রোহ দিয়া তাঁহার এই বিদ্রোহকে বুঝিতেছে এবং ইহাকে প্রধূমিত করিযা তুলিতেও তাহার চেষ্টাব ত্রুটি নাই। যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না, হেমবালার পায়ের কাছে বসিয়া চাপা গলায় সে দুই সংসারের তুলনা-মূলক সমালোচনা জুড়িয়া দেয়। খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না, গৃহসজ্জা, শিশুদের পরিচর্য্যা, বিধবার সর্ববোচিত আচরণ, কোনও কিছুই বাদ যায় না। হেমবালা সাধারণতঃ তাহার কোনও আলোচনায় যোগ দেন না, কিন্তু তাহাকে বাধাও বড় একটা দেন না। আজও প্রায় ঘণ্টা-খানেক একটানা বকিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "মামাবাবুও যেন কেমনধারা, কারুর ভালমন্দে নেই, একেবারে ভোলা মহেশ্বর।

নিজের মেয়ের ওপর যদি শাসন থাকত তাহলে কি আমাদের দিদিমণিই এমন ক'রে বয়ে যায়? সংসারে থাকতে হলে অত শিব হয়ে থাকলে চলে না মা, অত ভাল আবার ভাল না। হতেন আমাদের কর্ত্তা-মহারাজ—"

হেমবালা তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি যা তা বকছিস? যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা। পালা এখান থেকে হতচ্ছাড়ী।"

রাহুকে চা খাওয়াইয়া, মার্কেট হইতে তাহার জন্য একজোড়া পেন্টিংবুক্ সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, অজয় আসুক, মনে মনে সেও কি আজ ইহাই কামনা করিতেছিল? তাহার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে অজয়ের বিষণ্ণ ছায়ান্ধকার দৃষ্টি পলক ফেলিতে কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহাই দেখিতে পাইবার কৌতূহল কি তাহার মনে ছিল? হ্যাঁ, অজয়ের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, দুই দিনই সে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু সেকথা কাহাকেও বলিবার নয়। কে জানে, তাহার ভুল হইতে পারে। কিন্তু আজ চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া রাহুকে লইয়া সে যে একেবারে হোটেলে আসিয়া হাজির হইল, মনটা খুব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিলে কখনই তাহা পারিত না। হঠাৎ আজ এ তাহার হইল কি?

গাড়ীবারান্দার নীচে হইতেই বীণার কলহাসির শব্দ শুনিতে পাইল। কণ্ঠস্বরে বুঝিল, অজয় এবং সুভদ্র উভয়েই আসিয়াছে। রাহু গাড়ী হইতে নামিয়াই ছুটিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ির গোড়ায় দুই মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া এখন কি কর্ত্তব্য ভাবিতেছে, বীণা বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে বন্দী করিল। কহিল, "পালাতে পাবে না। সুভদ্রবাবুর তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কি দরকাব আছে। ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন।"

অজয় আজ ঐন্দ্রিলার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলই না ত কি করিয়া বোঝা যাইবে তাহার দৃষ্টিতে কোনও জ্যোতিঃসঞ্চার হইল কিনা। রাহুর কাছে বেচারা সত্যই বড় লজ্জিত হইয়াছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিবিড় বাহুবন্ধনে

তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। তদুপরি তাহার জন্য একটা চকোলেটের বাক্স আর মন্দিরার জন্য এক টিন টফি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

বীণা কহিল, "ভাগ্যিস কাজের ভিড়ে অজয়বাবু আজ যথা-সময়ে আসতে পারেননি, তাই চকোলেটগুলো জুটে গেল। আমরা দুবোনে মিলেই ওটা শেষ করব, কি বলিস ইলু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "রাহু-সর্দ্দার কি বলেন?"

বীণা বলিল, "রাহু আবার কি বলবে, তার চা খাবার কথা ছিল, চা সে ত দুদুবার খেয়েছে।"

বাহিরের দুইটি অভ্যাগত মানুষের সম্মুখে রাহু মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিল না, চকোলেটের বাক্সটাকে আরও একটু দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল মাত্র।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবুর হঠাৎ আজ কি এত কাজ পড়ল? হর্ষচরিতের সমালোচনা শেষ হয়নি এখনো?" সমালোচনার খানিকটা ক্লাবে একদিন অজয় সকলকে পড়িয়া শোনাইয়াছিল।

অজয় এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার চোখের দৃষ্টির কোনও ভাবান্তর আজ বিশেষ বোঝা গেল না। কহিল, "সেটা আর শেষ করব না ঠিক করেছি। কি হবে শুধু শুধু কতগুলি data জুটিয়ে, যার থেকে সত্যিকারের কাজে লাগে এমন কিছু গড়তে পারব না?"

সুভদ্র বলিল, "কোন্ জিনিষটা কাজে লাগবে আর কোন্‌টা লাগবে না, সে বিচার গোড়া থেকে এত বেশী না করাই ভাল।"

অজয় কহিল, "তোমার মত সব মানুষের কাজের শক্তি ত অফুরন্ত নয়, আমাদের অল্পই সাধ্য, যথাশক্তি ফলাফল বিচার ক'রেই তাকে কাজে নিয়োগ করতে হয়।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আজ কি কাজ করছিলেন?"

সুভদ্র বলিল, "কাজ ত কত।"

অজয় বলিল, "সত্যই কিছু করিনি। অসময়ে আপনাদের বাড়ী আসা উচিত কিনা তাই নিয়ে স্বভদ্রের সঙ্গে খানিক তর্ক করেছিলাম। সেটাকে যদি কাজ বলেন।"

দুই বোনে নীরবে একটুখানি দৃষ্টি-বিনিময়, তারপর বীণা কহিল, "তর্কে স্বভদ্রবাবুর জিত হয়েছে জেনে একটা দিন আমি অন্ততঃ খুসী হয়েছি। স্বভদ্র-বাবুই তাহলে এঁকে ধ'রে এনেছেন?"

স্বভদ্র কহিল, "এবিষয়ে অজয়ের বক্তব্যটাই শোনা যাক।"

অজয় কহিল, "না, এতটা প্রশংসা সত্যিই স্বভদ্রের পাওনা নয়। তর্ক করেছিলাম ঠিক, কিন্তু তর্কে হেরে যাবার ইচ্ছাটা গোড়াগুড়িই আমার মনে ছিল।"

নিতান্ত অকারণেই ঐন্দ্রিলার কানের কাছটা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। বীণা কহিল, "তাই যদি ছিল ত মোটেই তর্ক না ক'রে একেবারে সোজা যদি এইদিকে চ'লে আসতেন তাহলে এই হার-মানার অগৌরব আর স্বীকার করতে হত না এবং আর একটু আগে আসা হত।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ঐন্দ্রিলার আর-একটু কাছে নিজের আসনটিকে টানিয়া লইয়া স্বভদ্র কহিল, "আমার আজ আসবার কোনও কথা ছিল না, কেবল আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব ব'লে এসেছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবুকে হার মানিয়ে আজ আপনার সাহস বেড়ে গিয়েছে।"

স্বভদ্র কহিল, "না, সাহসের আমার কোনো সময়েই কমতি নেই। আমি জানতে এসেছি, আমাদের ক্লাবে কেন আপনি যান না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কথাটার জবাব কাল অজয়বাবুকে একবার দিয়েছি। আমার ভয়ানক কুঁড়েমি করতে ভাল লাগে, বাড়ীতে সেকাজ যত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় আর কোথাও তেমন হয় না।"

সুভদ্র কহিল, "এই কুঁড়েমি কাটাতে হবে।"

ঐন্দ্রিলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যিই কি এই ক্লাব থেকে কোনো কাজ হবে?"

বীণা কহিল, "এইরে! কুঁড়েমি না ছাই। গোড়া থেকেই কাজের হিসেব। তোমরা সবাই বড় বেশী কাজের লোক হয়েছ। ক্লাব ত ক্লাব, সেখানে কাজ আবার কি হবে শুনি? মানুষের একসঙ্গে গোল হয়ে ব'সে গল্প করবার একটা জায়গা থাকবে না?"

সুভদ্র, অজয়, ঐন্দ্রিলা, কথাটা তিনজনের কাহারও মনঃপূত হইল বলিয়া মনে হইল না। ইহার পর কে কি বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় উপরেব সিঁড়ির পথ হইতে হেমবালাব গলা শোনা গেল, "ইলু।"

বীণা তাডাতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আমিই যাচ্ছি, ইলু তুই বোস্। বাবার সঙ্গে অজয়বাবুদের পবিচয় ক'রে দিয়েছি। পিসীমার কথাটা মনে ছিল না। তাঁর খোঁজ একবার নিয়ে দেখছি।"

একটু পরে নীচে নামিযা কহিল, "ইলু, তুই একবার ওপর থেকে হয়ে আয়।"

ঐন্দ্রিলা উঠিতেই অজয় এবং সুভদ্রও উঠিয়া পড়িল। সুভদ্র কহিল, "মন্দিরাকে আজ ত দেখতে পেলাম না?"

বীণা কহিল, "ওর শরীরটা ক'দিন ধ'রে ভাল যাচ্ছে না।"

অজয কহিল, "সুভদ্র ত ছোট ছেলেদের অসুখের মস্ত স্পেশালিষ্ট।"

সুভদ্র কহিল, "স্পেশালিষ্ট ত কত। তবে একদিন এসে দে'খে যাব, যদি অনুমতি দেন।"

বীণা কহিল, "সত্যি আসবেন? বড খুসী হব তাহলে।"

রাত্রিতে আহারাদির পর দুই বোনের অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। বীণা বলিল, "অজয়কে সত্যিই আমার খুব ভাল লাগে, তোর ভাল লাগে না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বেশ sincere ধরণ-ধারণ। কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি, আমার ভাল লাগাটা ঠিক তোমার ভাল লাগার মত নয়।"

বীণা বলিল, "অর্থাৎ তুই তাকে ভালবাসিস্ না, এই ত?

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অর্থাৎ তুমি তাকে ভালবাস, এই ত? মাগো মা, এরই মধ্যে ভাল পর্য্যন্ত বেসে ফেলেছ? তুমি সব পারো বাছা।"

বীণা বলিল, "পারি ব'লে কি বেসেছি? না বেসে পারিনি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কাউকে ভাল না বেসে বেশীদিন থাকতে পারা তোমার স্বভাবে নেই, তা জানি। ওর তরফ থেকেও সাড়াশব্দ পেলে নাকি কিছু?"

"পাইনি, কিন্তু আশা হচ্ছে যেন পাব।"

"শেষকালে ফাঁকিতে প'ড়ো না কিন্তু।"

"যদি পড়ি, কি আর করতে পারি বল? সে সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে ত কেউ আর ভালোবাসতে পারে না।"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল, "তা তোমাকে বেশীদিন সন্দেহ নিয়ে কাটাতে হবে না। ওর যখন সময় হবে, ও সোজাসুজি তোমাকে এসে বলবে।"

বীণা কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কিসে তোর তা মনে হ'ল?"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, অম্‌নি। ওর সঙ্গে দুদিন কথা ব'লেই মনে হ'ল, ওর মনে যা আসে মুখে তাই বলে। তোমাকে ভুল করতে ও দেবে না।"

বীণা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। জীবনে আরও একবার সে ভুল করিয়াছিল। দুইদিনের পরিচয়ে এমনই করিয়া আরও একজনকে সে ভালবাসিয়াছিল। আত্মীয়-বন্ধু কাহারও কথায় সেদিন কর্ণপাত করে নাই। জোর করিয়া নিজের অতি অন্তরঙ্গ জীবনকে প্রায় অপরিচিত আর-একটি জীবনের সঙ্গে নিবিড়তম গ্রন্থিতে সে গ্রথিত করিয়াছিল। মৃত্যু সে বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে ব্যর্থতার বিষে, তাহার প্রেমের যে নিদারুণ অপমানের জ্বালায়

তাহার জীবনের সেই দিনগুলি বেদনাতুর হইয়া আছে, দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতের মত তাহাকে আমরণ স্মৃতিতে বহন করিয়া বীণাকে বাঁচিতে হইবে। কিন্তু কেন বিধাতা তাহাকে এমন করিয়া গড়িয়াছিলেন তাহা সে জানে না। তাহার পরিচিতের সংখ্যা কলিকাতায় সামান্য নয়। কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতেই তাহার চতুষ্পার্শ্বের জগতের সমস্ত তরুণদের মনে সে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে। কতজন তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তাহার মনে ধরে নাই। সে চিরকাল অপরিচিতকে, অভিনবকে, দুর্লভকে, দুরধিগম্যকেই কামনা করিযাছে এবং দুঃখ পাইয়াছে। অজয়ের দিক্ হইতে সাড়া পাইবে আশা করিতেছে, একটু আগে ঐন্দ্রিলাকে সে বলিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা বলিয়াছে। তাহার অন্তরতম মনে সে জানে, চিরকাল তাহাকে আজিকাব এই ভালবাসা লইয়া দুঃখ পাইতে হইবে। তবু পশ্চাৎ ফিরিবার সাধ্য তাহাব নাই।

ঐন্দ্রিলাও ইহার পর স্তব্ধ হইয়া গেল। যখন নূতন করিয়া কোনও কথা উঠিযা পড়িবার সম্ভাবনা আর দেখা গেল না, বীণা উঠিযা শুইতে গেল। ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া গেল, কিন্তু সে গেল না।

১৭

ভ্রাতাব পাযের কাছে একটানা ঘণ্টা-দুই বসিযা থাকিয়াও হেমবালা সেদিন শান্তি পাইলেন না। ঐন্দ্রিলা ফিরিল কি-না খোঁজ লইতে তেতলায় আসিযা দেখিলেন, কলেজের কাপড় না-ছাড়িয়াই সে ছবি লইযা বসিয়াছে। কহিলেন, "কি আঁকছিস্?"

ছবি হইতে চোখ না তুলিয়াই ঐন্দ্রিলা কহিল, "বাহু সর্দ্দার একটা হাতী ফর্‌মাইস্ করেছিলেন, আঁকা শেষ ক'রে এখন দেখছি এর পায়ে একটা সরু শিকল পরিয়ে দিলে জিনিষটা বেশ ভাল ছবি হয়ে উৎরয়, তাই দিচ্ছি।"

তাহার পাশেই বসিয়া-পড়িয়া হেমবালা কহিলেন, "তা দিস্ এখন, শিকলটা একটু দেরিতে পরালেও রাহুসর্দ্দারের হাতী পালিয়ে যাবে না। আয় দুটো কথা বলি। কথা বলতে যে কোনোকালে শিখেছিলাম তাও প্রায় ভুলে যাবার জোগাড়।"

ঐন্দ্রিলা ছবির উপর আরও একটু ঝুঁকিয়া কহিল, "বোসো।" আলো কমিয়া আসিতেছে, ছবি ইহার পর এমনিতেই তুলিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু হেমবালার সঙ্গে কি বলিয়া কথা সুরু করিবে সে ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে হেমবালা আহত হইয়া কহিলেন, "তোর এখন কথা বলতে ভাল লাগছে না?"

ঐন্দ্রিলা অনুতপ্ত হইয়া রং-তুলি সরাইয়া রাখিল। মায়ের এককতার বেদনা তাহারও অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। কহিল, "ভাল লাগছে বই কি, বোসো তুমি।" তারপব মায়ের আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া যথাসাধ্য প্রসন্নতার হাসি মুখে আনিয়া বলিল, "কিন্তু কথা বলতে ভুলে যাচ্ছ বলছিলে কেন বল ত? বেশ ত দু-তিন ঘণ্টা ক'রে রোজ মামাবাবুব কাছে কাটিয়ে এস। কথা আবার কত বলতে হয়।"

"হ্যাঁ, দাদার সঙ্গে ত কত কথাই আমাব হয়। কি এমন কথা আছে যা তাঁকে বলতে পারি?"

"কি তাহলে সেখানে কর সারাক্ষণ?"

"কিছু না, যতক্ষণ ব'সে থাকতে পাই বসি, তারপর উঠে চ'লে আসি।"

"ব্যস? মামাবাবুও একটা কথা বলেন না?"

"তা নেই বা বললেন? তাঁর কথা শুনতে ত যাই না, তাঁকে দেখতেই যাই, সে তিনি জানেন। কিন্তু সেকথা যাক্। বীণি কোথায় গিয়েছে বলতে পারিস্?"

একটু থামিযা ঐন্দ্রিলা কহিল, "না, বাড়ী এসে তাকে দেখতে পাইনি।"

গলার স্বর একটু নামাইয়া হেমবালা কহিলেন, "বীণাকে আমি ত আর কিছু বলতে পারি না, আর আমি বললেই বা সে শুনবে কেন, এ-বাড়ীতে সে-ই হ'ল সর্ব্বেসর্ব্বা। তোকেই বলছি। এ কিন্তু বাপু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটা দিনও কি ফাঁক যেতে নেই? এই ক'দিন ত বাড়ীতেই সভা বসত। কি, না মেয়ের চিকিৎসা হচ্ছে। তা মেয়েটা ভাল ক'রে সেরে ওঠা পর্য্যন্ত যদি সবুর সইত ত বুঝতাম, না-হয় বাড়ীতেই আরো দুদিন সভা বসত। তা না, রুগ্ন মেয়েটাকে একটা আযার কাঁধে ফেলে দিয়ে সেই দুপুর না পেরতেই সফর করতে বেরিয়েছে। এখন রাত দুপুরের আগে বাড়ী ফেরে ত বাঁচি।"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া কহিল, "দিদির কাজগুলো ভাল হচ্ছে তা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু তুমি এই নিয়ে মাঝ থেকে কেন মিছিমিছি ভেবে মরছ? তোমার ত ভাববার কথা নয়?"

হেমবালা কহিলেন, "ভাবি কি আর সাধে? তোরই জন্যেই ভাবি। কলেজেই না-হয় পড়ছিস, তোর বয়েসটা কি শুনি? চোখের ওপর দুবেলা যেমন দেখবি, তেমনিই ত শিখবি। তোকে নিয়ে যে আমার কি বিপদ্ হয়েছে, আমি ছাড়া সে আর কেউ জানে না।" তারপর প্রায় অর্ধঘণ্টা ধরিয়া নানা রকম করিয়া বীণারই প্রসঙ্গের আলোচনা। গত কয়েক দিনই এইরূপ হইতেছে। বেচারি দিদি! একমাত্র হাসির আয়ুধ লইয়া অকরুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ। তাহারও সম্বন্ধে কোনও মানুষের মনে ভিতরে ভিতরে যে এতখানি বিরূপতা সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা মনে করিয়াই ঐন্দ্রিলা চমৎকৃত হইল।

ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কহিল, "দিদির সংসারযাত্রা তোমার ভাল লাগছে না বুঝতে পারছি। এ নিয়ে দিদিকে খোলাখুলি যে তুমি কিছু বলবে, তারও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সবদিক্ ভেবে দেখলে, আমার মনে হয় তোমার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

হেমবালা রুক্ষস্বরে করিলেন, "তাহলে নিজের খুসিমত তুইও খুব ধিঙ্গিপনা ক'রে বেড়াতে পারিস্, এই ত ?"

ঐন্দ্রিলাও হঠাৎ কঠোর স্বরেই জবাব দিল, "সে তুমি থাকলেও পারব, তুমি দে'খে নিও।"

বিস্ময়ের আতিশয্যে হেমবালার মুখে কিছুক্ষণ কথা সরিল না। একটু সরিয়া বসিয়া কন্যাকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া ধীরে কহিলেন, "তোর কি হয়েছে বলতে পারিস ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমার আবার কি হতে যাবে ? যেমনকার তেমনিই আছি।"

কথার স্বর আরও নামাইয়া হেমবালা কহিলেন, "আমার কথার এমন অবাধ্য ত তুই কোনোদিন ছিলি না, মুখে মুখে কথা কোনোদিন তোকে বলতে শুনিনি। লেখাপড়া শিখে এ কি সহবৎ তোর হচ্ছে ?"

ঐন্দ্রিলা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল, তাহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে।

"ইলু !"

এবার ঐন্দ্রিলার অশ্রু আর বাবণ মানিল না।

তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হেমবালা কহিলেন, "লক্ষীটি, তুই চুপ কর্। এমনিতেই আমার সুখের শেষ নেই, তার ওপর তোর চোখের জল আর দেখতে পারি নে। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন কিছু বলব না তোকে।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঐন্দ্রিলা বলিল, "মা গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি দেশে ফিরে যাও। সেখানে তুমি রাজরাণী, এখানে ভায়ের সংসারে তুমি কেউ নও।··· এ বাড়ীর চাকর-বাকরগুলোর কাছে সুদ্ধ আমি ছোট হয়ে আছি তোমার জন্যে। তুমি জানো না, বেশী কাছে এসেই দিন দিন কিরকম তুমি আমার পর হয়ে যাচ্ছ।"

অঞ্চলে চোখের প্রান্ত হইতে এক ফোঁটা উদ্যত অশ্রু মুছিয়া লইয়া হেমবালাও গাঢ়স্বরেই কহিলেন, "তা কি আর আমি বুঝি না ভেবেছিস্? তোর ব্যবহারে কতদিন যে আমার বুক ফেটে গেছে, তবু আমি কিছু বলিনি।...আজ কথাটা তুইই তুললি—"

ইহার পর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। চোখমুখ মুছিয়া একটু স্থির হইয়া লইয়া মায়ের একটি হাতের উপর নিজের হাতটিকে রাখিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "এরকম ক'রে আর একটা দিনও আমাদের চলা উচিত নয় মা। পরস্পরকে এরকম ক'রে আমরা হারাতে পাবব না। আমাদের দুজনেরই ভালমন্দ আমার চেয়ে তুমি ঢেব বেশী বোঝ, তুমিই উপায় ভেবে ঠিক কর। ভাববার ভার তোমারই ওপর আমি দিচ্ছি।"

একথার উত্তরে হেমবালা কেবল কহিলেন, "সে আমার ভাবাই আছে। তুই একটু বুঝে চললেই উপায় হয়।"

ঐন্দ্রিলা বড় আশা করিয়াছিল, আজ অশ্রুর প্লাবনে মায়ের চিত্তেব আড়াল ভাঙিয়া পড়িবে। তাহা পড়িল না। যতখানি আনুকূল্য লইয়া আজ সহসা মায়ের কাছে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, ততখানিই প্রতিকূলতা লইয়া উঠিয়া গিয়া মুখহাত ধুইল। তারপর তাড়াতাড়ি কাপড় বদ্‌লাইয়া বাড়ীর গাড়ীব অভাবে একটা ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া সেই প্রথম সুভদ্রদের ক্লাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা কবিতে বাহির হইল। হেমবালা আজ আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা কবিতে ভরসা পাইলেন না।

সুলতাদের বাড়ীর নীচে গাড়ীবারান্দায় সুভদ্র তাহার অভ্যর্থনা করিল। বীণা উপরে সুলতার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত ছিল, ঐন্দ্রিলাকে দেখিবা মাত্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সুভদ্রবাবুর যেমন কপাল, এমন দিনে ক্লাবে লোক নেই!"

রমাপ্রসাদ কাছেই ছিল, কহিল, "আগে যাও বা দুচারজন আসত, চাঁদার তাগাদার ভয়ে তারাও এখন আর আসে না।"

বীণা কহিল, "শুনছেন সুভদ্রবাবু? ক্লাব জমাবার কিছুমাত্র আশা যদি মনে থাকে, আপনার এই সহকারীটিকে একটু সংযত করতে হবে। এমনিতেই ত আপনাদের জাতের ভয়ের শেষ নেই, তার ওপর উনি সুদ্ধ যদি ভয়াবহ হয়ে ওঠেন—"

রমাপ্রসাদ অভিযোগের সুরে কহিল, "আমার আর দোষ কি বলুন, আমার কর্ত্তব্য আমি করি।"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বীণা কহিল, "ভুল করেন। অনেকের অনেক কর্ত্তব্য ভুলে ক্লাবে এসে বসতে হয়, আপনি একলা কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ হলে চলবে কেন?"

সুভদ্র কহিল, "আমি বলি, কিছুদিন চাঁদার পাটটা উঠিয়ে দিয়েই দেখা যাক না?"

বীণা কহিল, "সে অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি defaulterদের দলে নেই, তাই স্বচ্ছন্দ চিত্তে একথা বলতে পারছি। মেম্বারদের চাঁদা দেওয়ার তৎপরতা-বিষয়ে রমাপ্রসাদবাবুর যা অভিমত, তাতে ও জিনিষটাকে বাদ দিযে রাখলে তিনি নিজে এবং মেম্বাররা একসঙ্গেই ভারমুক্ত হয়ে বাঁচবেন।"

সুভদ্র আজ একটু চঞ্চল হইয়াছে। পারিলে বাহির হইয়া পথের লোক ডাকিয়া আনে। বন্ধুবান্ধব যাহাদের টেলিফোন আছে তাহাদের টেলিফোন করিয়া আসিতে ডাকিতেছে। বিমানদের ইস্কুলে খবর লইয়া জানিল, এইমাত্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া সে সিনেমা দেখিতে গিয়াছে। প্রিয়গোপালের উপর সুলতার শাসন আজকাল অত্যন্ত কড়া। তেতলার বারান্দায় একটি সিগার মুখে করিয়া বসিয়া ভদ্রলোক পেশেন্স খেলিতেছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া ঐন্দ্রিলাদের মাঝখানে বসাইয়া দিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সুভদ্রবাবু নিজে এসে এখানে বসলেই ত আমরা আর-একটা মানুষকে দলে পাই, এই সহজ কথাটা ওঁর মাথায় কেন আসছে না?"

স্থলতা কহিলেন, "সুভদ্রের ত সবই অমনিধারা। নিজকে বাদ দিয়ে রেখেই ওর সমস্ত-কিছুর হিসেব। এঁকে ধ'রে আনতে পেরেছে, এইটুকু এর মধ্যে যা ভাল।"

মেয়ে দুচারজন যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা স্থলতাদের প্রতিবেশী। খোঁজ লইয়া জানা গেল, গান কেহ গাহিতে জানে না। কি অবলম্বন করিয়া যে আজ ক্লাব জমিবে সুভদ্র ভাবিয়া পাইল না। প্রিয়গোপাল তাঁহার স্বাভাবিক ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, "সেই যে আপনার বন্ধুটি, কি তাঁর নাম, তিনি আজ আসেননি বুঝি? তিনি ত বেশ গাইতে পারেন।"

বীণা নীরবে একবার স্থলতার মুখের দিকে চাহিল। স্থলতা বলিলেন, "অজয়বাবুর আবার কি হয়েছে? তাঁকে ত অনেকদিন ক্লাবে দেখিনি?"

সুভদ্র হাসিয়া কহিল, "defaulterদের দলে সেও নেই, এইটুকুই মাত্র আমি জানি। হয়ত খানিক পরে এসেও পড়তে পারে।"

ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, অজয়কে দেখিতে পাইবার কিছুমাত্র আগ্রহ তাহার মনে নাই বটে, কিন্তু সে আসিয়া পড়িলে হয়ত বা তাহার ভালই লাগে। মায়ের সঙ্গে কলহ করিয়া মনটা এত ভার হইয়া আছে, অজয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া হয়ত সে একটু হাল্‌কা বোধ করিতে পারে। কলহ সে ত মায়ের সঙ্গে করে নাই, তাহার কলহ সত্য-গোপনের সঙ্গে, মিথ্যাচারের সঙ্গে, আত্মপ্রবঞ্চনার সঙ্গে। অজয়ের সঙ্গে ঐ একটা জায়গায় তাহার আশ্চর্য্য রকম মেলে। অজয়ের সত্যকারের জীবনের চেহারাটা কি তাহা সে জানে না, জানিতে চাহেও না, কিন্তু যে-মিথ্যাকে নিজের জীবনে ঐন্দ্রিলা সহিতে পারিতেছে না, বাহিরে স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে অজয়। অজয়ের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা তাই ঐন্দ্রিলার মনকে একটি বিশেষ অন্তরতম স্থানে স্পর্শ করে।

কিন্তু অজয়ের রক্তের মধ্যে ভারতবর্ষের নির্লিপ্ততার সাধনা। ক্লাবে যাইবে কিম্বা যাইবে না, এই চিন্তা লইয়া তাহার সমস্ত বিকাল-বেলাটা কাটিয়াছে, সন্ধ্যাও

কাটিতেছে।...এই নির্লিপ্ততার কারণও এবারে একটু ছিল। নন্দকে আজও পর্য্যন্ত সময় করিয়া সে দেখিতে যাইতে পারে নাই, কিন্তু বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা লইয়া অজয়ের মনে কোনও গ্লানি নাই। এই ক'দিন একবারও কোনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে বালিগঞ্জে গিয়াছে, নিজের মনে তাহা সে স্বীকার করে না, করিলে নন্দের কাছে অপরাধী হইতে হয়!

বিমান মুখ টিপিয়া হাসে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না কেন? অজয় তাহা হইলে বেশ দুকথা তাহাকে শোনাইতে পারে। সুভদ্র মন্দিরার চিকিৎসার ভার হাতে লইয়াছিল, অজয়কে জোর করিয়া রোজ সঙ্গে লইয়া যাইত। কোনও দিন গল্প জমিত, কোনও দিন বা ওষুধ-পত্র বুঝাইয়া দিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইত, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই অজয়ের মনে মোহের ছোঁয়াচ লাগিতে পায় নাই, অন্ততঃ অজয় তাহাই জানে। সে নির্লোভ, তাহার ভালবাসাকে ঘিরিয়া তাহার তপস্যার দুর্ভেদ্য আবরণ।

কেবল চতুর্দ্দিক্কার নিঃস্বতা, হীনতা, মিথ্যাচার এবং ব্যাধিজীর্ণতা দেখিয়া দেখিয়া মনের পারা যখন শূন্যের ঘর ছাড়াইয়াও নীচে নামিতে থাকে, তখন প্রাণপণে নিজেকে ডাকিয়া বলিতে হয়, এই হতভাগ্য দেশ আর ঐ অনাবিষ্কৃত ঐন্দ্রিলা! ঐন্দ্রিলা আছে, এই দেশের মাটিতে গড়া জীবন্ত দেবীপ্রতিমা, এই দেশেরই বহুযুগের পাপক্লিষ্ট বাতাসে আর-সকলের সঙ্গে সেও নিঃশ্বাস লইতেছে, অথচ হতভাগ্যরা সে-সংবাদ জানে না, জানিয়া উৎসব করে না।

উৎসবের প্রয়োজন অজয়েরও জীবনে একটু হয়ত ছিল, কিন্তু নিজের কাছেও সে-কথাটা শেষ পর্য্যন্ত সে চাপিয়া গেল। বিমানের ঠোঁট-চাপা হাসিকে তাহার ভারি ভয়!

মন্দিরা সুস্থ হইয়া উঠিল, ভালই হইল। সুভদ্র খুব খুসী। বলিল, "দেখলে, দিশি গাছ-গাছড়ার গুণ? আমাদের দেশের ওষুধগুলি আমাদের দেশের অন্তরের

জিনিষ। একই মাটিতে আমাদের জন্ম, একই মাটি এবং জলবায়ু থেকে আমরা প্রাণ আহরণ করি। বিলিতি লেবেল-মারা ওষুদের ভাষা আমাদের দেহের অণুপরমাণু বোঝে না। এদেশের চিকিৎসকদের গবেষণা-বৃত্তিও এই কারণেই স্ফূর্তি পায় না, বিলিতি মার্কা ওষুদেব ভাষা তাদের সাধ্য কি যে ভাল ক'রে বুঝবে ?…"

অজয় তর্ক করে না, সে ভাবে, মন্দিরার শিয়রের কাছে বসিয়া এই ক'দিন যখনই সুযোগ পাইয়াছে নিমীলিত নেত্রে তাহার আরোগ্য-কামনা করিয়াছে। সুভদ্রের টোট্‌কা-গুলিই কি সব ? একটি তপোনিষ্ঠ মানবাত্মার একাগ্র নীরব শুভকামনা মন্দিরাকে কোনওরূপে কি কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই ?

ইহার পর কয়েকটা দিন আবার নিজেকে লইয়া কাটিতেছে। মনের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার রচনা করিয়া ততোধিক অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতীতের ধ্যান করে। দুরন্ত প্রখর কল্পনাকে অধীত ইতিহাসের পল্‌কা সূতায় বাঁধিয়া দেয়, সেই রশ্মির শাসন অলক্ষ্যে কখন্ ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়ে, কল্পনা উধাও হইয়া মায়া-মরীচিকা-ভরা অনির্দ্দেশ্যতার জগতে আনাগোনা করে, সত্যকারের পথ অনধ্যুষিত পড়িয়া থাকে।

এই অন্ধকারের ধ্যান লইয়া আরও কিছুদিন তাহার চলিতে পারিত, বিমান হঠাৎ একদিন সব ঘোলাইয়া দিল। কহিল, "কিছু মনে ক'রো না অজয়, আজকাল কি খুব কবিতা লিখছ ?"

অজয় কহিল, "মোটেই লিখছি না, হঠাৎ ওকথা কেন ?"

বিমান কহিল, "এই, কিছুদিন থেকে ভাবের হাওয়া একটু জোর বইছে যেন। কলেজে যাবার নাম কর না, উস্ক-খুস্ক চুল, চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। এত সাধের জীবন তোমার, শেষটা কবিতা লিখে না শেষ করতে হয়, বন্ধু-মানুষ, আগে থেকেই তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

অজয় কহিল, "তা কবিতা জিনিষটা এমনই কি আর খারাপ ? তুমিও ত ছবি আঁকো, তুমি আর কোন্ মুখে অন্যদের সাবধান্ করতে এস ?"

বিমান কহিল, "ভুক্তভোগী ব'লেই সাবধান করতে পারি, তা না হলেই কাজটা অনধিকারচর্চ্চা হ'ত। দেখছ ত আমার গতিক।...তা ছবি আঁকা ত ভাল, ছবির ভাষা সব দেশের মানুষেই বোঝে, কিন্তু বাঙালী জাত কবিতা লেখেই কেবল, পড়ে না, আর বিদেশীরা তোমাদের ভাষা বোঝে না, সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হও, কলেজে গতিবিধি সুরু কর, ভাল ক'রে পাশ ক'রে বেরুতে পারলে আর-না-হোক ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারীও কোথাও একটা জুটে যাবে।"

অজয় কহিল, "চিরটা কাল কি টাকার মূল্যেই সব-কিছুর বিচার করবে ?"

বিমান কহিল, "মিথ্যে আমার ওপর রাগ করছ, টাকার মূল্য কোনো জিনিষের জন্যে না দিতে হলে আমিই সবচেয়ে বেশী বেঁচে যাই। এই দেখ না, একটা ছবিও যে এবার শেষ পর্য্যন্ত বিক্রি হবে তার সম্ভাবনা আর দেখা যাচ্ছে না।...কিন্তু তুমিই এমন একটা জিনিষের নাম কর, টাকার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে না দিয়ে এই হতভাগা দেশে যা পাওয়া যায়।...তুমি কি বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু সময় থাকতে তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, সে-গুড়ে বালি। যে তল্লাটে যাওয়া-আসা করছ, গাড়ীর তেলের খরচ জুগিয়ে উঠতে পারবে না। ভাবছ, দুচারটে লাগসই রকম কবিতা লিখে লুকিয়ে শ্রীহস্তে গুঁজে দিলেই কাজ উদ্ধার হবে, মোটেই তা হবে না। সে-সব romantic soulদের যুগ আমরা পার হয়ে এসেছি, অন্ততঃ এযুগের রোমান্স মোটরকারেই জমে ভাল।...কথায় কথায় মনে প'ড়ে গেল, তোমার কাছে পাঁচটা টাকা হবে অজয়? আসছে মাসে দিয়ে দেব।"

ইদানীং মনে মনে অজয় গান্ধী এবং টলষ্টয়ের শিষ্য হইতেছিল। ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, অভাব-বোধটাই সত্যকারের দারিদ্র্য; সম্পদ্ আছে কি নাই, থাকিলে কতটুকু আছে, তাহা দিয়া দারিদ্র্যের বিচার হয় না। কিন্তু হায় রে, নিজেকে লইয়া সে যাহা-খুসি করিতে পারে, করিবার অধিকার তাহার আছে, কিন্তু অপরকে সে বঞ্চিত করিতে চাহে কোন্ অধিকারে? না, তাহার অন্ধকারের

ধ্যান তাহার থাকুক, সে-তপস্যা তাহার একলার। কিন্তু তাহার যে-জীবনে সে ঐন্দ্রিলাকে চায় সেখানে কোনও একদিক্‌কার চরিতার্থতা লইয়া অজয় খুসী হইবে না, সেখানে অসীম তাহার তৃষ্ণা। সেখানে দেহে সে চায় অপরিমিত স্বাস্থ্য, চায় সবল মাংসপেশী, মনে চায় অপরাজেয় পৌরুষ। বুদ্ধির দর্পে জীবনের জটিলতম সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া সে জয়ী হইতে চায়। সেখানে জীবনযাত্রায় সে চায় প্রচুর অর্থ, চায় প্রতিষ্ঠা। সে-যাত্রার অবসানে সে চায় বহুযুগব্যাপী কীর্ত্তির অমরতা। জীবন ভরিয়া সে জীবনাতীতকে চায়, চায় অমৃতের আস্বাদ, অসীমতার স্পর্শ।

অতৃপ্তি আবার বিশ্বজোড়া হইয়া উঠে, ধ্যান-ধারণা পড়িয়া থাকে, আয়োজন-মাত্রকেই মনে হয় পণ্ডশ্রম। নিজের নিঃস্বতা লইয়া ঐন্দ্রিলার মুখ মনে করিতেও সে লজ্জা পায়।

এমনই সময় বীণার একটুকরা চিঠি পাইল। সে লিখিয়াছে, 'আপনাকে এই ক'দিন একবারও দেখতে পাইনি কেন? ক্লাবেও ত আর আসেন না। আজ সন্ধ্যার পর ক্লাবে একবারটি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। দেরি হলে এসে-যাবে না, আমি অপেক্ষা করব।'

চিঠিটিকে বাক্সে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অজয় স্থির করিল, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। কিন্তু ইহার পর যেখানেই গেল, যাহাই করিল, তাহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্য তালাবদ্ধ বাক্সের মধ্যে সেই ছোট নীল কাগজের টুক্‌রাটিকে ভুলিতে পারিল না। নিজের অজ্ঞাতে তাহার মনের মধ্যে বীণার চিঠিটির প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি কথা, তাহার নারীহস্তের প্রত্যেকটি ছাঁদ একটি অপরূপ সঙ্গীতের সুরে বাজিতে লাগিল। চিঠিটি তালাবদ্ধ রহিল বটে, কিন্তু মনে মনে চিঠির কথাগুলিকে কতবার সে যে আবৃত্তি করিল তাহার ঠিক নাই। যে-কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অন্তরালে আরও কত কথা যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নানাভাবে বহুবার সে করিল। কিন্তু একবারও ভুলিতে পারিল

না, চিঠির কথাগুলিতে লুকানো অর্থ কিছু থাকুক-আর-নাই-থাকুক, চিঠিটিতে একটি সুন্দরী তরুণীর চম্পকাঙ্গুলির স্পর্শ লাগিয়াছে, কাগজের টুরাটিকে নখে ভাঁজ করিয়া সে ছিঁড়িয়াছে, হয়ত চিঠির কাগজের প্যাড কাপড়ের দেরাজে তোলা থাকে, বন্ধ কাপড়ের দেরাজের বহুদিন সঞ্চিত অস্ফুট সৌরভ চিঠিটির সারা দেহ আচ্ছন্ন করিয়া রহিযাছে।

চিঠিটি ঘেরিয়া যে মোহ তাহা সম্পূর্ণই বীণার রচনা, কিন্তু অজয় চিনিয়াও প্রথমটা চিনিতে পারে না। কয়দিন ধরিয়াই এইরূপ হইতেছে। হাসিতে, সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, সঙ্গীতে, দেহমনের অকুতোভয় প্রগল্‌ভতায় বিচিত্র রসলোকের সৃষ্টি করিতেছে বীণা, তাহার মধ্যে বারম্বার অজয় অলক্ষ্যে ঐন্দ্রিলাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। লুব্ধচিত্তে চিঠিকে বাহির করিয়া তাহার সৌরভে বুক ভরিযা নিঃশ্বাস লইতে গিযা কখন সেটাতে নিজেরই অজ্ঞাতে সে অতি মৃদু অধরস্পর্শ করিযাছিল, করিয়াই ভয়ে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। এ কি করিতেছে সে? বীণা ঐন্দ্রিলার আত্মীয়া, শুধু এই কারণেই কি তাহার মনে আজ বীণা সম্বন্ধে এই মুগ্ধতা জাগিতেছে? তাহার চিত্তবৃত্তিতে এ কোন্ দুর্ব্বোধ্য অব্যবস্থিততা দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন? এই বহুধা-খণ্ডিত, দুর্ব্বল মন লইযা পৃথিবীতে সে কি করিবে, নিজের বা অপরের কোন্ কাজে সে লাগিবে? নিজেকে অত্যন্ত মমতাহীন তিরস্কারে সে জর্জ্জরিত করিল। তাহার উন্মুখ-কল্পনায় যে-একটি অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যলোক একটুক্‌রা নীল কাগজের তুচ্ছ কয়েকটি ছত্রকে আশ্রয করিয়া এতক্ষণ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছিল, তাহার দ্বার হইতে মুগ্ধমনকে কঠোর কশাঘাতে সে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু তৎপরিপর্ত্তে নিজেকে আর-কিছু সে দিতে পারিল না। দেখিল, পূজার বেদী অশ্রু-ধৌত হইয়া আছে, মণিরত্নে জল্‌জল্ করিতেছে, কিন্তু মনকে একবার কঠোর করিয়া তুলিয়া ঐন্দ্রিলাকেও সেখানে আজ আর সে বসাইতে পারিল না। যে-মন দিয়া ঐন্দ্রিলাকে সে ভালবাসে, যেন সেই মন দিয়াই বীণাকেও অত্যন্ত

গভীর করিয়া তাহার ভাল লাগে। এই দুটি মনোভাব যেন একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ, একটিকে ভাঙিয়া ফেলিয়া আর একটিকে অটুট রাখিবার উপায় নাই। তখন নিরুপায়তার দুঃখে দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া সেই শূন্য বেদীরই উপর তাহার মস্তক বারম্বার সে লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

কিন্তু সন্ধ্যা যত নিকটতর হইতে লাগিল, বেদনার বোঝা, জীবনব্যাপী শূন্যতার ভার ক্রমে তাহার দুর্বহ বোধ হইতে লাগিল। সুভদ্র যখন ডাকিয়া গেল, সে তাহার সঙ্গে গেল না। কিন্তু সন্ধ্যার পর একাকী অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকা অসাধ্য হইল, তখন আলো নিবাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

মনের গায়ে বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ। নিজেকে থাকিয়া থাকিয়া সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ফেলিত, পুনরায় আকুলি-বিকুলি করিয়া ফিরিয়া পাইত। কিছুদিন বৈরাগ্য অভ্যাস চলিতেছে, ফলে নিজেকে একটু একটু করিয়া হারাইয়া এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইবার প্রয়োজনও সে আর অনুভব করে না, যখন সব-কিছুই তাহার মধ্যে থাকিয়া অন্য কেহ তাহাকে দিয়া করাইয়া লয়। আজও অজয়ের হইয়া যেন আর কেহ তাহাকে ভবানীপুরের পথ ধরাইয়া দিল।

সমস্ত পথ হাঁটিয়া চলিল। পাথেয়ের অভাব সত্যই সেদিন তাহার ছিল, তাহা ছাড়া চিন্তাকুল মন লইয়া সর্ব্বদাই সে হাঁটিতে ভালবাসিত, একাগ্র-মনে চিন্তা করিবার তাহাতে সুবিধা হইত। পথ চলিতে অজয়ের হইয়া আর একজন কেহ ভাবিল, ভাবিয়া স্থির করিল, বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে অসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিয়া, চিরদিনের মত জীবনের এই গভীর অনন্দবেদনাময় অপরূপ অধ্যায়টিকে শেষ করিয়া দিবে। বীণাকে সে ভালবাসে না, তবু তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ঐন্দ্রিলার সমীপবর্ত্তী হইবার নিষ্ঠুর সুযোগ সে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সময় থাকিতে সে করিবে। বীণার নিকট হইতে

বিদায় লওয়ার অর্থ সে জানে, চিরকালেরই মত ঐন্দ্রিলাকেও তাহা হইলে সে হারাইবে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু সে ভয় করিবে না।

কি ইহার পর অবশিষ্ট থাকিবে? কিছু না। তা নাই থাকুক। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের যুবকের সত্যই প্রেম করিবার অধিকার নাই, ত্যাগী হইয়া অনন্যমনা হইয়া শুধু কর্ম্মের অধিকার তাহার আছে। কিন্তু কর্ম্মের অধিকারই কি তাহার আছে? কি তাহার কাজ, কোথায় কোন্ শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে ইচ্ছ থাকিলেই সে প্রবেশ করিতে পারে? শুধু চিন্তা, শুধু দুর্ভাবনা, শুধু ব্যর্থতার লজ্জা, শুধু নৈরাশ্যের গ্লানি? হয়ত তাই, অন্ততঃ আলো কোনওদিন যদি জাগে, এই অন্ধকারের বুকের মধ্যেকার সুপ্ত বহ্নি হইতেই জাগিবে, এই ব্যর্থতার অরণ্যের বুকের মধ্যে দিয়াই চরিতার্থতার পথ কাটা হইবে। বাধা যাহা আছে তাহা পর্ব্বত-প্রমাণ হইতে পারে, অন্ধকার দুর্ভেদ্য, পথ সংশয়-সমাকুল হইতে পারে, দেবতার অভিপ্রায় জীবনে কোথাও না প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অবকাশহীন দুঃখের রাত্রিতে তাঁহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে, তবু হাল ছাড়িলে চলিবে না, তবু পথ চলিতে হইবে। পথের পাশে শুইয়া, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলে, অথবা কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিলে সময় কাটিবে, পথ একটুও কাটিবে না। অপ্রতিহত গতিতে পথ চলিয়া পথকে অতিক্রম করিতে হইবে। এপথের সাথী কেহ নাই, নাই-বা রহিল কেহ সাথী। একটি মানুষের একাগ্র তপস্যার শক্তিতে বিশ্বদেবতার আসন টলিয়া উঠিতে পারে বলিয়া যে-দেশের মানুষ বিশ্বাস করিত, আজ সে-দেশের কোটী কোটী নিরন্ন, বস্ত্রহীন, রোগশোক-জীর্ণ, অত্যাচার-প্রপীড়িত মানুষেরও মনে এ কি নিদারুণ নৈরাশ্য, এ কি নিশ্চেষ্টতা তাহাদের জীবনে? এই দেশব্যাপী, বহুযুগব্যাপী তমঃ, ইহাকে বিদূরিত করিবার কোনও উপায় তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। কল্পনা করিতে পারে না, দেশের ঐশ্বর্য্যশালীতার দিনে, গতিশীলতার দিনে যে-তপস্যা গিরি-অরণ্য-লোকালয় ব্যাপৃত করিয়া জাগিয়া থাকিত, আজ এই দুঃখের দিনে, মুমূর্ষুতার দিনে একান্তে

একটি মানুষের নিভৃত জীবনে তাহা জাগিতেছে। সেই একটি মানুষের একাগ্র উগ্র তপশ্চর্য্যায় দেবতার আসন টলিতেছে, অঘটন-ঘটনা সম্ভব হইতেছে।

স্থির করিল, মমতাহীন ত্যাগের দ্বারা নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে জ্বালাইয়া সে এই তপস্যার বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিবে। সুখ তাহার জন্য নহে, প্রেম তাহার জন্য নহে। সে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে-ভারতবর্ষের কোটী কোটী নরনারী অহোরাত্র মৃত্যুকে জীবনধারণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে। সে সর্ব্বত্যাগী, সে তপস্বী। ভাবিল না, কোন্ পন্থা ধরিয়া তাহার তপস্যা অগ্রসর হইবে, সেই তপস্যার বহ্নিতে কোন্ দেবতার উদ্দেশে সে হবিঃ প্রদান করিবে, কোন্ মন্ত্রবলে সেই অ-দৃষ্ট দেবতাতে সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। কেবল অনুভব করিল, সুদুস্তর কৃচ্ছ্রসাধনেব প্রয়োজন আছে, এবং ভাবাবেগে তাহার দুই-চক্ষু বারম্বার অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল।

ত্যাগমন্ত্রের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে যখন স্বলতাদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বুকের মধ্যে হৃদয়ের অস্তিত্বকে সে আর অনুভব করিতেছে না। সে নিষ্কাম, সে নির্লোভ, নিবাত দীপশিখার মত উর্দ্ধরতিতে সে অটল, কোনও নারীর সান্নিধ্য তাহাকে বিচলিত করে না, তাহার অন্তরের দীপ্তিকে মেঘজালে আবৃত করিতে পারে না, নিজের কাছে ইহাই সে আজ প্রমাণ করিবে। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া দৃঢ়পদে সে উপরে গিয়া উঠিল।

কিন্তু বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, ঐন্দ্রিলাকে হঠাৎ আজ ক্লাবে দেখিতে পাইবে ইহা ছিল তাহার কল্পনারও অগোচর। মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তা কণা কণা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল, যেন ঐন্দ্রিলাকে হারাইতে হারাইতে ফিরিয়া পাইয়াছে এমনই ভাবে সমস্ত মন হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল, না গো না, আমি মিথ্যা বলিয়াছি, নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলাইয়াছি, তোমাকে নহিলে আমার চলিবে না। তপস্যা করিয়া, সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়া আমার নিরর্থক, যদি পুরোভাগে জয়লক্ষ্মীরূপে তুমি না নির্ম্মাল্য

হস্তে অপেক্ষা করিয়া থাকো। দুঃখের সাধনা ত আমার আছেই, হয়ত বহুযুগ ধরিয়া থাকিবে, বারে বারে এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রাণপাত করিয়া সে-সাধনা সমাপ্ত করিব। কিন্তু নিরবধি-কাল ব্যাপিয়া আর কোথাও আর কখনও ঠিক এই মূর্ত্তিতে তোমাকে ত আর আমি পাইব না। অসীমতাতে তুমি যে পরিপূর্ণরূপেই সীমাবদ্ধ, তুমি যে সুসীম, সেই ত তোমার সুষমা, তোমার মায়া। তুমি যে একান্তভাবেই তুমি, আমার চিরকালের জীবনে তোমার স্থান আর-কিছু দিয়া পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

বীণা আজ ইচ্ছা করিয়াই অনেকক্ষণ অজয়কে লক্ষ্য করিল না। সে আহ্বান করা মাত্র অজয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এই আনন্দকে সে কি অজয়ের নিকট হইতে লুকাইতে চায়, না চিঠিতে গোপন অন্তরের ব্যাকুলতা অসতর্কে প্রকাশ করিযা ফেলিয়া সে লজ্জিত হইয়াছে? সুলতা যথারীতি অজয়ের অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহারই সঙ্গে গল্প জমিয়া উঠিল। সুভদ্রের অদৃষ্ট সত্যই খুব খারাপ নয, সন্ধ্যার পর হইতেই একটি-দুইটি করিয়া অনেকগুলি মানুষের সমাগম হইয়াছে। চিরাচরিত প্রথামতে অভ্যাগতরা যদিও স্ত্রী ও পুরুষ দুইদলে বিভক্ত হইয়া বসিয়াছে, তথাপি গল্পগুজবে, গীতবাদ্যে, হাসি-পরিহাসে সমষ্টি-চৈতন্যের উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতেছে।

এক সুভদ্র বারেবারেই অন্তরালে পড়িয়া যায়। সমস্ত ব্যবস্থা করে সে, সকলের দিকে দৃষ্টি রাখে সে, নিজে সে কাহারও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না। একমাত্র ঐন্দ্রিলা ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হয়। সমস্ত আয়োজন করে সুভদ্র, অর্থব্যয় করে সে, সুবিধা লয় অন্যেরা এবং তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া ভুলিয়া যায়। ঐন্দ্রিলাব ন্যায়নিষ্ঠায ইহা বাধে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে সে সুভদ্রের কাছে ঘেঁসিয়া যায়। অজয় ইহা লক্ষ্য করে মাত্রই, সুভদ্র তাহার বন্ধু, সুভদ্রকে তাহার স্বাভাবিক মনে সে ভালবাসে, নির্লিপ্ত মনে সে অবজ্ঞা করে, কোনও অবস্থাতেই তাহাকে সে ভয় করে না।

কিন্তু আরও একটি কে যুবক, সুভদ্র তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহাকে লইয়া ঐন্দ্রিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেছে। দুজনে গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। ছেলেটি সুপুরুষ, বাঙালীর পক্ষে আশ্চর্য্য ফরসা, ইউরোপীয় পোষাকে তাহাকে এমন চমৎকার মানাইয়াছে। কথার মাঝে মাঝে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া নত হইয়া হাসিয়া সে কথা বলিতেছে। ঐন্দ্রিলাও খুব হাসিতেছে। ঐন্দ্রিলা হাসিতেছে, তাহার সেই হাসি অকারণেই অজয়কে কেন জানি বিদ্রূপের কশাঘাত করিল। পাশ হইতে রমাপ্রসাদ বলিল, "নির্ম্মল সান্ন্যাল, এফ আর সি এস, ডাক্তার। তিন বছর ফিরেছে, এরই মধ্যে টাকার কুমীর।" মনে মনে তাহার সঙ্গে অজয় নিজের তুলনা করিয়া বেদনা পাইতে লাগিল

সচকিত হইয়া নিলিপ্তভাবে গেরুয়া পরিচ্ছদটাকে মনের চতুর্দ্দিকে টানিয়া টানিযা দিতেছে এমন সময় বীণা উঠিযা তাহাবই পাশ দিযা গাডী-বারান্দার ছাতে চলিয়া গেল। সেখানে তাহার অস্থির পাদচাবণা অজয লক্ষ্য করিল না, স্নলতা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "আমি এবার উঠি। বীণা আছে ঐখানে, গাডী-বারান্দার ছাতে। যান না, একটু গল্প ক'বে আসুন। Substitute দিয়ে যাচ্ছি, অপরাধ না নিতে পাবেন সেইজন্যে।"

ছাতে বীণা কহিল, "যাক্, আপনার ক্রমে উন্নতি হচ্ছে দে'খে আশান্বিত হচ্ছি।"

অজয় কহিল, "উন্নতি কিসে দেখলেন?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "চেঁচিয়ে না ডাকা সত্ত্বেও বুঝতে পেরে নিজে থেকেই উঠে এসেছেন।"

অজয় সে হাসিতে যোগ দিল না, তপস্বীর উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিল। বলিল, "বিকেলেই আপনার চিঠি পেলাম, কেন ডেকেছেন?"

বীণা হাসিয়াই বলিল, "অমনি।"

অজয় একটু কাষ্ঠহাসির অভিনয় করিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে-একটি

অব্যক্ত আনন্দের কম্পন মর্ম্মর শব্দে বাজিয়া উঠিল, বহু চেষ্টাতেও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। আরও একটু সতর্ক হইয়া কহিল, "আমি ভাবলাম, খুব বড়-রকম কিছু কাজ হবে।"

বীণা বলিল, "হঠাৎ খুব ত কাজের লোক হয়েছেন আপনি? বিনা কাজে মানুষের সঙ্গে দেখা করা যায় না, না? কি হয়েছে আপনার, আসেননি কেন এতদিন?"

অজয় বলিল, "ব্যস্ত ছিলাম একটু।"

বীণা বলিল, "কলেজেও ত আর যান না শুনলাম।"

অজয় বলিল, "হ্যাঁ, ব্যস্ততাটা বেশীর ভাগ সেই সম্পর্কেই।"

বীণা বলিল, "বিকেলেও কি আপনার কাজ থাকে? এত কাজ কিন্তু কারুরই থাকা উচিত নয়। আসল কথা আমাদের বাড়ী অনাহূত যেতে আপনার বাধে। তা ক্লাবে ত আসতে পারেন?"

বীণাদের বাড়ী যে আর-কোনও বাড়ী হইতে অজয়ের মনের দৃষ্টিতে আলাদা, অজয় আজ ইহা স্বীকার করিবে না। কহিল, "আপনাদের বাড়ী অনাহূত যেতে আমাব বাধে, কেন আপনার তা মনে হ'ল; আপনারা না-ডাকা সত্ত্বেও ত কতবার গিয়েছি।"

বীণা বলিল, "আপনি বলতে চান, আপনার বাধে না?"

অজয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না।"

বীণা তাড়াতাড়ি কহিল, "ব্যস্, চলুন তাহ'লে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

অজয় গম্ভীর মুখেই কহিল, "সে কি! যা-কিছু অবাধে করতে পারি তার সমস্তই এই মুহূর্ত্তে ক'রে ফেলতে হবে?"

বীণা বুঝিতে পারিল, অজয় যে-কারণেই হউক আজ কঠিন হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু তাহার এত আগ্রহভরা নিমন্ত্রণকে অজয় যে এত তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিবে, ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বেদনায় তাহার সুন্দর হাস্যদীপ্ত

মুখখানি কালো হইয়া গেল। মেয়েটিকে ফেলিয়া আসিয়াছে, একবার ভাবিল, নমস্কার করিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু শেষ অবধি হৃদয় তাহাতে সম্মত হইল না। আজ কতদিন পরে দেখা হইয়াছে, আরও কতদিন হয়ত দেখা হইবে না, এই উপবাসী চিত্ত লইয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে? আধ অন্ধকারে ছলছল চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কই, একটুও মনে হইল না ত যে সে-মুখে হৃদয়হীনতার কোনও চিহ্ন আছে। ভাবিল, হয়ত অজয়ের জীবনে এমন কোনও বেদনা আছে সে যাহার আভাস মাত্র এতদিন পায় নাই। অজয়ের এই বেদনা কোথায়, তাহাকে তাহা জানিতে হইবে, প্রীতির প্রলেপে সেই ক্ষতকে নিরাময় করিতে হইবে। অভিমান করিয়া বেদনা দিবার এবং বেদনা পাইবার সময় এ ত নয়।

অজয়ের উদাস দৃষ্টির আরও নীচে ঘেঁসিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কেন যেতে চাচ্ছেন না?"

নিষ্ঠুরতা অজয়ের স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহার মন ভিজিয়া আসিতেছিল, কহিল, "আজ থাক্, আর-একদিন যাব।"

"কবে যাবেন?"

"হাতের কাজগুলো চুকে যাক, দু-তিন দিন পরেই গিয়ে হাজির হব।"

বীণার মনে হইল, কতকাল যেন তাহাকে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। একটুও সান্ত্বনা বোধ করিল না। অগত্যা কহিল, "আচ্ছা চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। বাড়ীই ত যাবেন এখন?"

অজয়ের তখনই বাড়ী ফিরিবার কোনও তাড়া ছিল না, কিন্তু বীণাকে বারম্বার দুঃখ দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। বলিল, "আপনার অসুবিধা হবে না ত?"

দরজার কাছে ঐন্দ্রিলাকে অজয় শুষ্ক একটি নমস্কার করিল। ঐন্দ্রিলাও নীরবেই প্রতিনমস্কার করিল। বীণা কহিল, "ইলু, তুই বোস, আমি বাড়ী গিয়েই গাড়ী

পাঠিয়ে দেব, যখন খুসি তারপর যাস্। মেয়েটা এতক্ষণ কি করছে কে জানে, আমাকে একটু তাড়াতাড়িই পালাতে হচ্ছে।"

ঐন্দ্রিলার চোখের গভীর দৃষ্টি অজয়কে কি কথা বলিতে চাহিল কে জানে? অজয় আজ তাহা জানিবার চেষ্টা মাত্র করিল না। নিজের মধ্যে এত জোরও তাহার লুকানো ছিল দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল।

গাড়ী হাজরা রোড অতিক্রম করিতেই বীণা কহিল, "রাত ত কিছুই হয়নি, একটু নদীর ধার দিয়ে ঘুরে যাবেন? মেয়েটার অসুখ হয়ে অবধি দিনরাত ঘরে বন্ধ হয়ে থেকে থেকে হাঁপ ধ'রে গেছে।"

অজয় কি যে বলিল, বোঝা গেল না। ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরাইতে হুকুম দিয়া বীণা কোলের উপরকার কোট্‌টি খুলিয়া লইয়া গায়ে জড়াইল।

নদীর ধার হইয়া আউট্‌রাম ঘাটের কাছাকাছি গাড়ী পৌছিলে বীণা কহিল, "ড্রাইভারকে এখানে একটু থামতে বলুন না?" গাড়ী থামিলে বিনা-বাক্যব্যয়ে সে পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল। কহিল, "শীতে হাত-পা জ'মে যাবার জোগাড়। চলুন, মাঠটুকু হেঁটে পার হয়ে যাই, আড়ষ্ট ভাবটা একটু কাটুক। ভাল লাগবে না আপনার হাঁটতে?"

অজয় কহিল, "তা বেশ ত, হেঁটেই চলুন।"

নিজের গাড়ীতে করিয়া যে পৌছিয়া দিতে আসিয়াছে, সে-ই যদি খানিকটা পথ হাঁটাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করে, তাহাকে মুখ ফুটিয়া 'না' বলা অজয়ের পক্ষেও সহজ হয় না।

ড্রাইভারকে বলা হইল, সে গাড়ী লইয়া মাঠের ওপারে চৌরঙ্গীর কোণে অপেক্ষা করিবে। সেই অবধি হাঁটিয়া গিয়া তাহারা গাড়ী ধরিবে।

মাঠের পথ প্রায় অন্ধকার। সারি সারি আলোর মালা সেই অন্ধকারের চারিপাশ ঘিরিয়া প্রহরায় দাঁড়াইয়াছে, যেন সতর্ক হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছে, বিলুপ্ত করিতেছে না। চতুষ্পার্শ্বের দূরাগত-কোলাহলগুঞ্জনের মাঝখানে স্তব্ধতার

হ্রদ নিস্তরঙ্গ, চারিদিকে বাধা পাইয়া এই স্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধিয়াছে, স্রোতের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বহিতেছে না। মাঝে মাঝে দুই-চারিটি পথিকের আনাগোনা, মোটরের আলোর ছুটাছুটি, বিচিত্র ছন্দের হর্ণের শব্দ মধুর বিক্ষিপ্ততা আনিয়া দিতেছে।

অজয় এবং বীণা নিঃশব্দে চলিয়াছে। অজয়ের মধ্যে অজয় আজ কোথায় যে সে কথা বলিবে? যে-গেরুয়া পরিহিত মানুষটা আজ বীণার সঙ্গে পথ অতিবাহিত করিতেছে অজয় তাহার পরিচয় ভাল করিয়া এখনও পায় নাই, নিজের মনের লুকানো সমস্ত কথা তাহাকে সেইজন্যই সে এখনও বলে নাই। বীণা ভাবিতেছে, কথা দিয়াই কি সব কথা বলা যায়? আর যত প্রকার করিয়া বলা চলে সব ত প্রায় নিঃশেষ করিলাম। এই মানুষটির আশা কি অপরিসীম, না ইহার বুদ্ধিসুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই?

বীণা যতদূর জানে এটা লীপ-ইয়ারও নয়, তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে মনে করিয়া বলিল, "সত্যি যদি এমন হয়, এই পথটুকু আর না ফুরোয়?"

অজয় কহিল, "বাড়ীতে মন্দিরার পক্ষে সেটা অবিশ্যি একটা দুর্ঘটনা হবে।"

বীণা তবু আশা ছাড়িল না, কহিল, "সবদিক্ দিয়েই কি দুর্ঘটনা? সব জিনিষেরই ত ভালমন্দ দুটো দিক্ থাকে।"

অজয় কহিল, "তা থাকে বটে, আচ্ছা, দাঁড়ান ভেবে দেখছি।"

বীণা কহিল, "থাক, এতটা কষ্ট আর আপনাকে করতে হবে না। পথটা শেষ হবে এবং একটু পরেই শেষ হবে, আপনার ভয় নেই। সম্প্রতি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, জবাব দেবেন?"

অজয় কহিল, "কি কথা?"

বীণার কোটের আস্তিন অজয়ের শালের প্রান্ত ছুঁইয়া গেল, কহিল, "নিজেকে নিয়ে আপনার খুব একলা থাকতে ভাল লাগে, না?"

অজয় কহিল, "চিরকাল একলা থাকাটাই অভ্যাস করেছি।"

বীণা কহিল, "তাতে ত আসে যায় না কিচ্ছু, চিরকালের সমস্ত অভ্যাসই মানুষ কোনও-না-কোনওদিন বদলায়।"

অজয় কহিল, "আশা করা যাক্, সময় যখন হবে, আমিও বদলাব।"

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বীণা কহিল, "কিন্তু সময়টা কখন হবে? সেই কথাটাই ত জানতে চাচ্ছি।"

অজয় এ কথার কোনও জবাব দিল না।

বীণা সহসা কহিল, "সত্যি, আপনারা এ যুগের ছেলেরা যে কি হয়ে যাচ্ছেন, নিজেরাই তা ভেবে দেখছেন না। পৃথিবীতে কোনও-কিছুর সঙ্গে কি আপনাদের কোনও সম্পর্ক থাকতে নেই? বাড়ীঘরের সংস্পর্শ এড়িয়ে বেড়ায় ব'লে বিমান-বাবুকে সকলে দোষ দেয়, কিন্তু ভাব দে'খে ত মনে হয় না, বাড়ীঘর বলতে আপনাদের কারও কিছু আছে। আপনার ত বাড়ী একটা আছে শুনেছি, কে আছেন সেখানে?"

"আমার বাবা আছেন।"

"তাঁর কথা ভাবেন একবারও?"

অজয় এবারেও জবাব দিল না।

"পৃথিবীর কোনও মানুষের কথাই কি ভাবেন একবারও?...সুভদ্রবাবু, বিমান-বাবু ত আপনার বন্ধু, কি অর্থে তাঁরা আপনার বন্ধু? কেউ কারুর ভালমন্দেও নেই আপনারা।"

এ কথার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে অজয় কহিল, "কিন্তু এসব কথা আপনি ভাবলেনই বা কখন, আর আজ এ সময়ে হঠাৎ আমাকেই বা কেন বলছেন?"

বীণা কহিল, "বলছি প্রাণের দায়ে। তবে কোনও আশা মনে নিয়ে বলছি না। মানুষকে মানুষ ব'লে কোনও মূল্য যে দিতে শেখেনি তার মনের কষ্টিপাথরে আমার আর কি দাম উঠবে? আমি নিতান্তই রক্তমাংসের মানুষ।"

গেরুয়া পরিচ্ছদটা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, অজয় আবারও সেটাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইল। বীণা কহিল, "আর বেড়াতে ভাল লাগছে না, চলুন বাকী রাস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হয়ে যাই।" বীণা যে এত দ্রুত হাঁটিতে পারে অজয় জানিত না, তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে গিয়া নিজে সে হাঁপাইয়া গেল।

মাঠের মাঝখানে দীপালোকিত একটা পথ পার হইয়া গভীর পয়ঃপ্রণালী। এ সময়ে জল থাকিবার কথা নয়, দুদিক্ হইতে মেঠো-পথ ঢালু হইয়া নামিয়াছে, মাঝখানটা অন্ধকার। একেবারে নীচের মাটি আর্দ্র হইলেও হইতে পারে। বীণা দুমনা হইয়া অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল, পশ্চাৎ হইতে অজয় আসিয়া জুটিতেই ছোট একটি লাফ দিয়া সেই জায়গাটুকু পার হইতে গেল। তারপর ঠিক যে কি ঘটিল বোঝা গেল না। হয় শাড়ীর আবেষ্টনে দুই পা যথেষ্ট অবকাশ পাইল না, অথবা ওপারের অসমান মাটিতে পা হড়কাইল, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে একটি পা চাপিয়া ধরিয়া বীণা বসিয়া পড়িল। অজয় পাশ হইতে ঝুঁকিয়া কহিল, "কি হ'ল আপনার? লাগল কি?"

বীণা একথার উত্তরে আরও একবার অর্দ্ধস্ফুট একটু কাতরোক্তি করিল মাত্র।

অজয় কহিল, "খুব বেশী লেগে গেছে বুঝি?"

বীণা হাঁটুতে ভর দিয়া কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "না, তেমন কিছু লাগেনি।"

"এখুনি কি চলতে পারবেন? একটু না-হয় ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিন্।"

"না, থাক; বাড়ীতে মেয়েটাকে ফে'লে এসেছি, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ইলু বেচারিও অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে গাড়ীর জন্যে। মাঠে বেড়াবার কল্পনাটা মাথায় না এলেই ভাল ছিল দেখছি।"

ঢালু জায়গাটুকু বাহিয়া ওপারের মাঠে উঠিতে সে কি ক্লেশ! যে পা-টা মচকাইয়াছে তাহার উপর বীণার তন্বুলতার ভার সয় না, মনে হয় ভাঙিয়া পড়ে বুঝি। অজয়ের বুকের মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু পাশাপাশি

পথ-চলা ছাড়া সে আর কি করিতে পারে? যদি বাংলা দেশ না হইত, বীণাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া সে বাকী পথটুকু পার হইয়া যাইত, কিন্তু এত জোরই বা তাহার গায়ে কোথায়? সতর্ক হইয়া থামিয়া থামিয়া পথ চলিতে চলিতে ঘন নিঃশ্বাসের কাতরতায় বীণা তখন কি বলিতে চাহিতেছিল? বলিতে চাহিতেছিল, বন্ধু, তোমার কাঁধে আমার ডান-হাতখানি একটু রাখিতে দাও, তাহাতে আকাশটা হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িবে না, আমার খোঁড়া ডান পা-টা একটু বিশ্রাম পাইয়া বাঁচুক? কি জানি, অন্ততঃ অজয় সে ভাষা বুঝিতে পারে না।

কিন্তু ক্লান্ত বীণাকে চৌরঙ্গীর মোড়ে গাড়া ধরাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া অজয়েরও হঠাৎ কি হইল, গভীর বেদনায় সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। আজ সে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহার নিকট তাহার জীবনের চরিতার্থতার প্রতিরূপ, তাহাকে অন্তরের সিংহাসন হইতে সে আজ বাহিরের ধূলিকর্দ্দমে টানিয়া নামায় নাই। বীণা তাহার নিকট জীবনের উৎসব-সমারোহের প্রতিরূপ, সে উৎসবের আহ্বানকে সে আজ অবলীলায় অগ্রাহ্য করিয়া ফিরিয়াছে। কত মহা-মুহূর্ত্ত, কত গভীর ইঙ্গিত, কত সুবর্ণসুযোগ বৃথা বহিয়া গিয়াছে, সে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে নাই। নিজের মধ্যে নিজের দুর্দ্দম শক্তিমত্তার রূপ সে আজ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ফিরিয়াছে। তবু অশ্রুর স্রোত এমন করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠে কেন?

১৮

পরদিন ভোরে উঠিয়াই অজয় বীণাদের বাড়ী হাজির হইল। অনাহূত আসিল এবং অসময়ে আসিতেছে এই সংশয়কে মনে স্থান দিল না। আসিবার সময় বিমান তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া বুরুশ দিয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া দিয়াছিল, পথে আসিতে হাওয়ায় উড়িয়া, ঘনঘন অঙ্গুলিচালনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া

সেগুলি আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়াই তাহার সেই স্রস্ত চিন্তাকুল অনিদ্রাক্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "কি ব্যাপার ?"

অজয় আজ বীণাকেই দেখিতে আসিয়াছে। সমস্তরাত বীণার আহত পায়ের বেদনা তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে। বীণার পাশে থাকিয়াও কাল যে সে তাহার কোন কাজে লাগে নাই, আজ যতটা সম্ভব সেই অক্ষমতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে। কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ভরিয়া কহিল, "কেমন আছেন আপনি ?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "ভালই ত আছি মনে হচ্ছে। খারাপ থাকতে কি কখনো আমাকে দেখেছেন ?"

অজয় কহিল, "পা-টা সেরেছে ?"

বীণা ঝুঁকিয়া বসিয়া তাহার বাসন্তী রঙের পরিধেয় প্রান্ত ঈষৎ একটু তুলিয়া ধরিল। লাল মখমলের চটির আবরণ মোচন করিয়া একটি স্নিগ্ধকান্তি সুকোমল পদ-পল্লব কার্পেটের ফুলপল্লবের উপর স্থাপন করিয়া কহিল, "সেরেই ত গিয়েছে মনে হচ্ছে।"

এত সুন্দর যে কাহারও পা হইতে পারে অজয় তাহা জানিত না। অকারণ মাধুর্য্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিয়াই ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে এতদূরে বালিগঞ্জে ছুটিয়া আসা সার্থক হইয়াছে।

পা-টিকে সম্মুখের দিকে অল্প একটু প্রসারিত করিয়া বার-কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বীণা আবার কহিল, "এইদিক্‌টায় একটু এখনও খচ খচ করে লাগছে, তা ওটুকু খানিক পরেই সেরে যাবে। আপনার সব খবর বলুন।"

অজয়ের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরিল না। অমন সুন্দর পা-টিতে এখনও কোথাও ব্যথা বাজিতেছে এই চিন্তা তাহার বুকের মধ্যে রক্তস্রোতকে সহসা কেন এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল কে জানে ? কাল সমস্তরাত যে-বেদনা গুমটের মত মনে চাপ বাঁধিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া অদৃশ্য অশ্রুজলে তাহা অজস্র হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই অদৃশ্য ধারা-বর্ষণে ধোয়াইয়া বীণার আর্ত্ত

পা-টিকে সে মুহূর্ত্তে নিরাময় করিয়া দিতে চায়। তাহা ছাড়া আর কিছু ত তাহার করিবার সাধ্য নাই। ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "আমার আর নূতন কি খবর থাকবে?...কাল রাতটা মোটেই ভাল কাটল না।"

বীণা উৎকর্ণ হইয়া কহিল "কেন, আপনার কি হ'ল আবার?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অজয় কহিল, "হয়নি বিশেষ কিছুই। শরীরটা কিছুদিন থেকে কেমন ভাল থাকছে না।"

বীণা নিরাশ হইল বটে কিন্তু ধরা দিল না, কহিল, "বাড়ীতে অমন একজন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি থাকতে আপনার আবার শরীরের জন্যে ভাবনা।"

অজয় কহিল, "শরীরটাকে নিয়ে ধন্বন্তরি তাঁর যথা-কর্ত্তব্য করছেন, কিন্তু সব রোগ কি আর ওষুধে সারে? সে যাক্, এখন মন্দিরা কেমন আছে বলুন।"

বীণা কহিল, "অনেকটাই ভাল। আপনি এসেছেন খবর পেয়েই ছুটে আসছিল, আয়া তাকে দুধ খাওয়াতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। এখনি এসে পড়বে, ভাবনা নেই। বসুন আপনি।"

ক্রমে মন্দিরাকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্রম্ভালাপ জমিয়া উঠিল। নিত্যকার মতই বীণার কলহাসির বান ডাকিতে লাগিল। যেন কাল সন্ধ্যায় ডান পায়ে সামান্য একটু আঘাত লাগা ভিন্ন কোথাও আর কিছু ঘটে নাই। বীণার অকুণ্ঠিত ব্যবহারে অজয়েরও ব্যবহার সহজ হইয়া গেল, তাহার মনে ইহা লইয়া যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। বিমানের গল্প, সুভদ্রের গল্প, সুলতা, প্রিয়গোপাল, রমাপ্রসাদের গল্প, ক্লাবের এমন আরও অনেক মানুষের গল্প যাহাদের নামও অজয় মনে রাখে নাই। অজয় দেখিল, তাহাদের সকলেরই সম্বন্ধে বীণার কৌতূহল সমান সজাগ সচেতন। গভীর আন্তরিকতার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষকে সে দেখিয়াছে, পরমাত্মীয়ের মত তাহাদের প্রত্যেকের কথা সে ভাবিয়াছে, প্রত্যেকটি মানুষের তুচ্ছতম সুখদুঃখের সংবাদ সাবহিত হইয়া সে রাখিয়াছে। মনে মনে কখন ঐন্দ্রিলার দূর-নিহিত রহস্য-গভীর দৃষ্টি, দেবতার

মত দর্পিত দৃঢ় মুখশ্রীর সঙ্গে বীণার এই সদাহাস্যময় স্নিগ্ধ সহৃদয়তার সে তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সতর্ক হইয়া চিন্তার রাশ টানিয়া ধরিল। আজ চিন্তা নয়, আজ কোনও সংশয় নয়, দ্বন্দ্ব নয়, আজ সে কার্পণ্য করিবে না, আজিকার এই মুহূর্ত্ত-কয়টিকে পরিপূর্ণ করিয়াই বীণাকে সে নিবেদন করিয়া দিবে। বীণাকে তাহার ভাল লাগে, তাহার কাছে বসিতে, তাহার চোখে চোখে চাহিতে, তাহার কলকণ্ঠের বাধাহীন সুধাস্রোতে ক্লান্ত চেতনাকে অবগাহন করিতে দিতে তাহাব ভাল লাগে, নিজের কাছে পরিপূর্ণ করিয়া একথা স্বীকার করিতে সে আজ লজ্জা বোধ করিবে না।

ইচ্ছা করিয়াই একথা সে ভুলিল না, যে এই বাড়ীরই কোনও একটি কক্ষে, অনতিদূরে ঐন্দ্রিলা রহিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া অজয়ের ধ্যান-কল্পনার ইন্দ্রলোক। এই ত ভাল হইয়াছে, সংশয়ের আবর্ত্তের একেবারে কেন্দ্রস্থানটিতে পঁহুছিয়া সংশয়কে সে অতিক্রম করিতেছে। বীণা যেমন করিয়া গৃহভিত্তিতে নিজের পদপল্লব স্থাপন করিয়াছিল, এই ত তাহার অন্তরের পূজাবেদীতে ঐন্দ্রিলারও চরণস্পর্শ তেমনই করিয়া সে লাভ করিতেছে। তবু বীণাকে তাহার ভাল লাগে না এই মিথ্যা কেমন করিয়া নিজেকে বলিবে। জীবনে শ্রেয় যাহা, প্রেয় যাহা, তাহার পায়ে চিরকাল অকুণ্ঠিতচিত্তে অন্তরের শ্রদ্ধা সে সমর্পণ করে, অকল্যাণকে অসুন্দরকে ক্ষমা করে না, ইহাই ত তাহার স্বভাবের সত্যনিষ্ঠা। নিজেকে এবং অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে সে জানে না, ইহাই কি অবশেষে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? বীণা-ঐন্দ্রিলার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেলে তাহার মনের উপর হইতে কতবড় একটা বোঝা নামিয়া যায়!

পুঁটি এবং ভবতোষ নামের একজোড়া মানুষের গল্প হইতেছিল। ক্লাবে যতক্ষণ থাকে, দুজনেরই ভিজে-বেরালের মূর্ত্তি, তাহাদের একসঙ্গে করিতে সুভদ্র বেচারা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গেল। এদিকে গোপনে গোপনে দুজনেরই কাছে দুজনের চিঠি স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটিদের হষ্টেলের আশেপাশে সন্ধ্যার

অন্ধকারে ভবতোষ গা-ঢাকা দিয়া ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায়। বীণা বলিতেছিল, এদেশের মানুষের এমনই অদ্ভুত মনোবৃত্তি, লুকাইয়া অন্ধকারে হাত না বাড়াইলে পাইয়াও পাওয়া হয় না। ইহাদের লইয়া ক্লাব করিবার চেষ্টা যে কত বড় পণ্ডশ্রম, সুভদ্রবাবু কোনওদিনই কি তাহা বুঝিবেন না? অজয় কিছুই শুনিল না। সে তখন ভাবিতেছিল, মানুষকে মানুষ বলিয়া কোনওদিন আমি মনের কাছে ডাকিয়া লই নাই, তুমি আমাকে কাছে ডাকিয়াছ, কেমন করিয়া কাছে ডাকিতে হয় তোমার কাছে সেই শিক্ষা আমার পাওয়া। আমাকে মানুষ বলিয়াই তোমার ভাল লাগে, তোমার কাছে এই আমার ঋণ, এ ঋণ শোধ না করিতে পারি যদি, আমার মানুষ নামে কলঙ্ক থাকিবে।

সময় কোন্‌দিক্‌ দিয়া বহিয়া যাইতেছে, দুজনের কেহ তাহা বুঝিতেছে না, এমন সময় দুতলার সিঁড়িতে ঐন্দ্রিলার চটির শব্দ শোনা গেল। এক মুহূর্ত্ত উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া অজয় দ্বিগুণতর অভিনিবেশ লইয়া বীণার কথা শুনিতে এবং তাহার প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিতে বসিল।

দুইসার ঘরের মধ্যেকার পথ দ্রুত অতিক্রম করিয়া ঐন্দ্রিলা তাহার মামার মহলের দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহার পরিধেয় লাল শাড়ীতে একটুকরা রোদ পড়িয়া ঘরের মধ্যেটাকে একমুহূর্ত্ত লোহিতাভ করিয়া তুলিল। সেই আলো অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অজয়েরও মনের সমস্ত উৎসাহ যেন দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল।

এত কাছের পথ দিয়া ঐন্দ্রিলা চলিয়া গেল, অথচ একবার ঘরের মধ্যে তাকাইয়া তাহার উপস্থিতিকে স্বীকার করিল না, এই চিন্তা অজয়ের মন হইতে আজিকার বিশ্রম্ভালাপের সমস্ত সুখ অপহরণ করিযা লইল। মন্দিরা আসিয়াছিল, তাহাকে একটু আদর করিয়া ক্ষুব্ধ বীণার নিকট বিদায় লইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু অত্যন্ত অভাবিত ভাবে বাগানের পথে নতমুখী ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তাহার আবার দেখা হইয়া গেল। হৃষীকেশের মহল হইতে সে ফিরিতেছে। মর্ম্মরের

জীবন্ত দেবীপ্রতিমা। কম্পিতবক্ষে নমস্কার করিয়া অজয় কহিল, "ভাল আছেন?" ঐন্দ্রিলা চোখ তুলিল না, চিন্তাকুল মুখে একটু হাসি আনিয়া হাতদুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, কহিল, "আপনি ভাল আছেন?" কথাটুকু শেষ হইতে না-হইতে অজয় তাহার পিছনে পড়িয়া গেল।

ট্রামের পথ ধরিয়া বিহ্বলের মত ছুটিতে ছুটিতে অজয় কেবলই ভাবিতে লাগিল, ঐন্দ্রিলা তাহার চোখে চোখে চাহে নাই, চোখে চোখে চাহে নাই। যদি চাহিতই, কি দেখিতে পাইত? দেখিত, অজয়ের দৃষ্টি অর্থহীন, উদাস। কিন্তু তাহা যে সে দেখিল না সেই বেদনায় অজয়ের সমস্ত ঔদাসিন্য অশ্রু হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

অনুভব করিল, ঐন্দ্রিলার পাশে বীণাকে চাহিয়া না দেখা তাহার কত সহজ! বীণার কলহাসির মোহ-মদিরতা যেন পৃথিবীর ধূলিমাটি হইতে সবুজ তৃণপুঞ্জের মত পল্লবিত হইয়া উঠে, দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে, চিত্তকে বিশ্রাম দেয়। তাহার দিকে চাহিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া চলে, এমন কি তাহাকেও বিশেষ করিয়া মনে না রাখিলে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সান্নিধ্য যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের মত দিক্‌দিগন্তকে আবৃত করিয়া আসে, জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার দিকে চাহিয়া অন্তর বিশ্রাম পায় না, কিন্তু ইহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া থাকিয়াও শান্তি নাই। এক হয় দূরে পলাইতে হয়, নতুবা সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া ইহার সঙ্গে ব্যবহার করা চলে, এবং দুইয়ের কোনওটিই সহজসাধ্য নয়।

মনে পড়িল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে যতবার তাহার দেখা হইয়াছে, বেদনার গুরুভার বহিয়া সে ফিরিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহাকে আনন্দ দেয় নাই, কিন্তু আনন্দ না দিয়াই অজয়ের অন্তরের মধ্যে এক সুপ্ত জয়লিপ্সু পুরুষকে সে জাগ্রত করিয়াছে। আজও তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ভরিয়া এই মন্ত্রই গুঞ্জিত হইতে লাগিল, আমি জয়ী হইব, জয়ী হইব, বৈরাগ্যের অহঙ্কার আমার মিথ্যা অহঙ্কার, আমি আর নিশ্চেষ্ট

হইয়া থাকিব না। ইহাকে হার মানাইয়া, ইহার অটুট দৃপ্ততাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া ইহাকে আমি লাভ করিব, সেজন্য প্রাণপাত করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। আমার জীবনে অন্য সংগ্রাম যাহা আছে তাহাকে এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমি টানিয়া আনিব, এবং একই পরাজয় দ্বারা পরাজিত করিব। আমার মধ্যে দেবতার অন্য উদ্দেশ্য যাহা আছে, তাহাকেও এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরিয়া আমি চরিতার্থতা দান করিব।

যাহাকে লইয়া এই ঘোর সমারোহের যুদ্ধের আয়োজন, সে তখন পিতার কাছ হইতে পাওয়া সেদিনকার ডাকের একটি চিঠি হাতের মুঠায় করিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। তাহার দেহমনে যুদ্ধসজ্জার মত কিছু কোথাও চোখে পড়িতেছে না। নরেন্দ্রনারায়ণ এই প্রথম এবারে তাহাকে চিঠি লিখিয়াছেন:

'মা, তোমার কোনও খবর পাই না। কেমন আছ? পড়াশুনা কেমন করিতেছ? হয়ত শীঘ্রই একবার তোমাকে দেখিতে যাইব, কবে যাইতে পারিব তাহা নিশ্চয় করিয়া এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তোমাকে দেখিতে মন ব্যাকুল হইয়াছে।'

উৎসাহিত হইয়া হৃষীকেশকে খবরটা দিতে গিয়াছিল, তিনি কর্ত্তব্য-বোধে একটুখানি হাসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। হেমবালার দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে খবর লইয়া অধীর আনন্দে আজ তাহার সমস্ত বাড়ী কোলাহলে মুখর করিয়া তুলিবার কথা ছিল, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও তাহা বলিবারও অধিকার তাহার নাই।

বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরের দরজা অবধি গিয়ে কিছু না ব'লেই চ'লে এলি যে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অম্‌নি।"

মন্দিরা সোহাগ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া জোরে

জোরে পা ফেলিয়া হেমবালা ছাতে চলিয়া গেলেন, মন্দিরা কাঁদিল। যে-ঐন্দ্রিলাকে কোনও দুঃখ টলাইতে পারিত না, পিতার মুখ মনে করিয়া সেও আজ কাঁদিতেছে।

মন্দিরার খোঁজে আসিয়া বীণা বলিল, "এ কি কাণ্ড!"

তাড়াতাড়ি পিতার চিঠিটিকে লুকাইয়া আঁচলে মুখ মুছিয়া ঐন্দ্রিলা উঠিয়া বসিল। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বীণা কহিল, "অজয়বাবু আজ একলা এসেছিলেন, তাই ?"

ঐন্দ্রিলা মুখটাকে একঝটকায় সরাইয়া লইয়া কহিল, "কি যে মাথামুণ্ডু বল তার ঠিক নেই।"

বীণা কহিল, "মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝতে পারলে কি করব? তোর বয়সের মেয়েরা ত আর পেন্সিল হারিয়ে গেছে ব'লে কাঁদতে বসে না। আজ নিশ্চয় ক্লাবে আসিস্. সুভদ্রবাবু বার-বার ব'লে দিয়েছেন, তোকে নিয়ে যেতে। এখন ওঠ্, কলেজে যাবার সময় হয়েছে সে খোঁজ রাখিস্ ?"

ঐন্দ্রিলা তাহার চোখে চোখে চাহে নাই, চোখে চোখে চাহে নাই, সেই দুঃখে অজয় তাহার পিতাকে চিঠি লিখিতেছে। লিখিল, 'এবার আপনার সঙ্গে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমাকে বৎসরের পর বৎসর কলিকাতায় রাখিয়া, বহুক্লেশে আমার পড়া-খরচ জোগাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি ফললাভের আশা করিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছিলেন, আমি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইব, ইহাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বাংলা দেশের অন্য অনেক পিতার মত আপনারও মনে ধারণা ছিল, যে, লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ হওয়া যায়। আমার অতিবড় দুর্ভাগ্য, আজ আপনার সমস্ত স্বার্থত্যাগের মূল্যগ্রহণ যখন আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখনই আপনাকে আমার জানাইতে হইতেছে যে আমি মানুষ হই নাই। অন্ততঃ এমন-কিছু হই নাই যাহার জন্য এত বৎসর ধরিয়া আপনার এত

দুঃখভোগ এবং স্বজন-পরিত্যক্ত অবস্থায় দূর-বিদেশে আমার দীর্ঘদিনের এত প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।'

যদি সার্থক হইত, ঐন্দ্রিলা আজ তাহার চোখে চোখে চাহিত। কিন্তু পিতাকে সেকথা ত সে আর লিখিতে পারে না। তাই দীর্ঘ ছয়পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া, তাহার জীবনে মানুষের মত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার যতপ্রকার সমস্যা তাহার প্রত্যেকটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়-লব্ধ শিক্ষাকে যাচাই করিয়া সে তাঁহাকে জানাইল, তাহার জীবনের সর্ব্বৈব বিফলতার জন্য পিতাকে সে একটুও দায়ী করিতে চায় না, সে কেবল বলিতে চায়, আগামী আষাঢ়ে তাহার বয়স পঁচিশ পূর্ণ হইবে, এটা মাঘ। বাজে খরচ বলিয়া চব্বিশ বৎসর সাত মাসই হিসাবে তোলা থাকুক, বাকী পাঁচটা মাসকে সে কাজে লাগাইবে। সে তাই স্থির করিয়াছে, এম-এ পরীক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইবে না। পিতা এই মনে করিয়া দুঃখ পাইবেন, এই দেড় বৎসর সে পড়া-খরচ বলিয়া যাহা লইয়াছে, অন্নের জন্য তাহার সবটাই নষ্ট হইল। তাহার জীবনের চব্বিশটা বৎসরই নষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া দয়াপরবশ হইয়া তিনি যেন তাহাকে ক্ষমা করেন।

চিঠিটি সুভদ্র এবং বিমানকে পড়িয়া শোনাইল। অন্য সময় শোনাইত না, কিন্তু, মানুষকে মানুষ বলিয়া মান্য করে না, বীণার এই তিরস্কার সম্প্রতি তাহার মনে লাগিয়াছে। সুভদ্রকে বলিল "কি বল, কিছু অন্যায় লিখেছি ?"

সুভদ্র একমুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে চাই না, বলা উচিতও নয়। আমার ধারণা, তুমি নিজে জেনে বুঝে যেভাবে জীবনকে গড়তে চাচ্ছ, প্রত্যেক মানুষকেই কোন-না-কোনদিন তাই করতে হয়। পিতা বা শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কতকটা হয়ত তাকে করতে পারে, কিন্তু তার হয়ে তার পথনির্দ্দেশ করতে পারে না। ভালমন্দ বুঝবার তোমার বয়স হয়েছে, তুমি যদি সত্যই অনুভব কর, তোমার সমস্ত জীবন ধ'রে এতদিন কেবল পণ্ডশ্রম তুমি ক'রে এসেছ, তোমার দিক্ থেকে সেকথা ভাববার এবং বলবার তোমার ষোল আনা

অধিকার আছে। যখন একমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করবার তোমার সময় এসেছে মনে করছ এবং সেজন্যে প্রস্তুতও হয়েছ, তখন অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে তোমাকে আমি বলব না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "কিছু বলবে না সেই কথাটাই পাঁচ মিনিট ধ'রে এত দীর্ঘ ক'রে অজয়কে না শোনালেও কোন ক্ষতি ছিল না। অবিশ্যি চব্বিশ বৎসর সাত মাসই যার বাজে খরচ হয়ে কেটেছে, এই পাঁচ মিনিটের ক্ষতিতে তার কিছু এসে যাবে না।"

সুভদ্রের সাধারণতঃ দুইপ্রকার রোগী জুটিত। এক যাহাদের এমন-কিছু হয় নাই যেজন্য সত্যসত্যই ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন, আর যাহাদের এমন-কিছু হইযাছে ডাক্তার ডাকিয়াও যাহার কোনও প্রতিকার হওয়ার আশা নাই। তাহাদের পুরানো চাকরটা অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, সম্প্রতি সে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসাতে সুভদ্রের একজন সত্যকারের রোগী জুটিয়াছে। কাজ করিবার মত অবস্থায় সে ব্যক্তি আর নাই, সহজেই তাহাকে হাঁকাইয়া দেওযা যাইত, কিন্তু সুভদ্র তাহাকে ছাড়ে নাই। একটি বন্ধু-ডাক্তারের কাছে আজ তাহাকে এক্স-রে পরীক্ষার জন্য লইযা যাওযার কথা ছিল, কথার মাঝখানে উঠিযা পড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবার আগে অজয়ের ঘরে আসিয়া বসিয়া বিমান কহিল, "এরপর কি করবে ভেবেছ ?"

অজয় কহিল, "জানি না। সেইটে ভেবে ঠিক করাই এখন আমার সব-চেযে বড় কাজ, তাই করব ব'লেই আর সব দিক্ থেকে ছুটি ক'রে নিচ্ছি।"

বিমান কহিল, "এমনই কি ভাবনা যে দিনে তিনঘণ্টা কলেজ ক'রে সেটা ভাবা চলত না ?"

অজয় কহিল, "হয়ত চলত, কিন্তু চলা উচিত হত না। শ্রদ্ধা ক'রে যে-কাজ করা যায় না তা কাকরই করা উচিত নয়, একথা ত তুমিই উঠতে বসতে বল।"

বিমান কহিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার আর আমার অবস্থাটা এক নয়। আমার কাজ বা অকাজ নিয়ে আমি পৃথিবীতে একেবারেই একলা পথের পথিক। তুমিও যে আর কারুর জন্যে কিছুমাত্র ভাবো তা নয়, কিন্তু তুমি আশা কর তারা তোমার জন্যে ভাবুক, অন্ততঃ সেইজন্যেই কেবলমাত্র নিজের দিক্ ভেবে কোনও কিছুর বিচার করা তোমার উচিত হবে না। কি এরপর করতে পারো না পারো সে-সম্বন্ধে বীণা-ঐন্দ্রিলাদের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?"

অজয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "না, এ-সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে হঠাৎ কেন আমি কথা বলতে যাব?"

বিমান বলিল, "প্রয়োজন বোধ না করলে কেন বলতে যাবে? কিন্তু বীণা-দেবী সম্বন্ধে এইটুকু তোমাকে আমি বলতে পারি, যে, তুমি তাঁকে যতটা জানো, তাব চেয়ে ঢের বেশী তিনি প্রাক্‌টিক্যাল। কথা যদি বলতেই, তাতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হত না। তাছাড়া তোমার জীবনে এমন সময় হয়ত এসেছে, যখন সবদিক্ ভেবে তাঁকে সব কথা বলাই তোমার উচিত হত।"

অজযের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন-একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখানুভূতি। একটি রূপসী তরুণীর জীবনেব সঙ্গে বিমান তাহার অন্তরতম জীবনকে জড়াইয়া কথা বলিতেছে, সেইসূত্রে তাহার বুকে যেন কাহার সুখস্পর্শ। বাহিরে সে যথোপযুক্ত তীব্রভাবে বিমানের কথার প্রতিবাদ করিল, কহিল, সে সময় তাহার জীবনে আদৌ এখনও আসে নাই, শীঘ্র আসিবার কোনও সম্ভাবনাও সে দেখিতে পাইতেছে না। বাঙালী মনোবৃত্তির এইদিক্‌টাকে কোনও দিনই সে বুঝিতে পাবে না। দুইটি নিঃসম্পর্কিত তরুণ-তরুণীকে একসঙ্গে দেখিলেই কেন তাহারা মনে করে যে তাহাই লইয়া প্রণয় এবং পরিণয়ের দেবতাদের চোখে ঘুম নাই? মানুষ কি মানুষের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সহজ বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, সহৃদয়তার ক্ষেত্রে মিলিতে পারে না? ইত্যাদি।

বিমান একথায় মুখ টিপিয়া একটু কেবল হাসিল।

পাঁচদিন পরে অজয়ের চিঠির জবাব আসিল। তাহার পিতা লিখিয়াছেন :—'পুত্রকে ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সাহায্য করা ছাড়া কোনও পিতার আর যে কিছু করিবার সাধ্য নাই কেবল তাহাই নহে, আর কিছু করা হয়ত কর্ত্তব্যও নহে। তোমার বিচারবুদ্ধির উন্মেষ আরও কিছুদিন আগে হইলে আমি অবশ্যই সুখী হইতাম, কিন্তু সেকথা ভাবিয়া এখন দুঃখ পাওয়া নিরর্থক। নিজে ভালরূপ চিন্তা করিযা যাহা শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই করিও, আমি কোনও জায়গায় বাধা হইব না। কিন্তু তোমার দিকে তোমাকে যেমন কর্ত্তব্য বিচার করিবার, স্থির করিবার স্বাধীনতা আমি দিতেছি, আমার নিজের দিক্ হইতেও আমার কর্ত্তব্য আমাকে করিতে হইবে। তোমার চিঠিটি পাইয়া অবধি আমি অনেক ভাবিয়াছি। বুঝিতেছি, তোমার জীবনের এই সঙ্কট সময়ে তোমার মনুষ্যত্ববিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ তোমাকে আমার দেওয়া উচিত। সেজন্য, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে নহে, অন্য সমস্ত দিকেও তোমার আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। আমি তাই স্থির করিতেছি, তোমাকে কোনও বাবদে এখান হইতে কোনও খরচের টাকা আমি আর পাঠাইব না। ফেব্রুয়ারী মাসের খরচের টাকা আজও পর্য্যন্ত জোগাড় হয় নাই বলিয়া পাঠাই নাই, তাহাও আর পাঠাইব না। তোমার পড়া-খরচের জন্য এ-পর্য্যন্ত যে-ঋণ আমাকে করিতে হইয়াছে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া চেষ্টা করিলে বাকী জীবনে হয়ত তাহা পরিশোধ করিয়া যাইতে পারিব। অকারণে আমার এই ভার আরও বাড়াইতে তুমি নিশ্চয় আমাকে পরামর্শ দিবে না।'

অজয় শৈশবে মাতৃহীন। প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়া তাহার পিতার এই একটি মাত্র সন্তান লাভ ঘটিয়াছিল। শিশুপুত্রকে লইয়া বহুদিন একাধারে তাহার পিতা এবং মাতার স্থান পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। দেশে পূর্ব্বপুরুষদের অমিতব্যয়িতার উদ্বৃত্ত জমিজমার সামান্য যাহা আয় ছিল, তাহা দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু পুত্রকে কোনওদিন কোনও ক্লেশ

তিনি অনুভব করিতে দেন নাই। নিজে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, বড় প্রয়োজনের ছাতাটিকে নিজ হাতে তালির পর তালি দিয়া ঢাকিয়াছেন, তবু পুত্রকে ভাল পরিচ্ছদ, ভাল আহার্য্য, ভাল বইয়ের অভাব কোনওদিন বুঝিতে দেন নাই। অজয়ের মনে পড়িল, সে যতবার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছে তাহার পিতা তাহার পরিত্যক্ত দুচারিটি কাপড়-জামা নিজের জন্য রাখিতে পাইয়া, পূজার দিনে নূতন পরিধেয় পাইলে শিশুরা যেমন খুশী হয়, তেমনই খুসির হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিয়াছেন। মনে পড়িল, এই সেদিনও বাড়ীর চাকরের অসুখ করিলে অজয়কে কোনও কাজে হাত দিতে না দিয়া, নিজে মশলা বাটিয়া, জল তুলিয়া, রান্না করিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইয়াছেন। অজয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পাইলে আনন্দে তাঁহার চোখে অবিরল অশ্রু ঝরিয়াছিল। জলপানি অতঃপর সে আর পায় নাই, এই কয়বৎসর প্রায় অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ধার করিয়া, কখনও বা জমিজমা বিক্রয় করিয়া পিতাকে তাহার কলেজের খরচ জোগাইতে হইয়াছে, কিছুতেই তিনি কাতরতা অনুভব করেন নাই। বলেন নাই, আমি কখন আছি কখন নাই তাহার ত কিছু ঠিক নাই, ঢের ত তোমার জন্য করিলাম, এবার তুমি আমার জন্য কিছু কর, মরিবার পূর্ব্বে দুদিনও তোমার উপার্জ্জিত অন্ন আহার করিয়া যাই।

সেই পিতা আজ তাহাকে এই চিঠি লিখিয়াছেন। কত বড় আশায় নিরাশ হইয়া, কি গভীর বেদনা পাইয়া এই চিঠি তিনি তাহাকে লিখিতে পারিয়াছেন। অজয় আর বেশী ভাবিতে পারিল না, টেবিলে মাথা গুঁজিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

১৯

তারপর অপরিচিত অন্ধকার দুর্ভাগ্যের জগতে অজয়ের অপরিসীম মুক্তি। কোনওদিকে সম্প্রতি কিছু যে তাহার করিবার নাই, এই অভিনব উপলব্ধির মধ্যে

কয়েকদিন সে বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইল। চিরকাল ছোটবড় সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র হইতে সে পলায়ন করিত; আজও বুঝিল না, পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এই চিন্তাও তাহার একটা পলায়ন। পিতার সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব হইতে নিজেকে অতি সহজে সে নিষ্কৃতি দিল। কিন্তু ভাগ্য তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না।

দুইদিন না যাইতেই অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া আসিল। চিরকাল বাংলা উপন্যাসের নায়কদের মত নিশ্চিন্তমনে তর্ক করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, নানা মনোলোভন মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াই তাহার দিন কাটিয়া যাইবে, ইহাই হয়ত তাহার মনে ছিল। আজ জীবনের নগ্নতার রূপ, বিরূপতার রূপ, সহসা তাহার সেই নিশ্চিন্ততার একেবারে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন্‌দিক্ দিয়া কি হইবে কিছুই সে বুঝিতেছিল না, অথচ হাতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই; সুভদ্রের কাছে বাসা-খরচের ধার জমিতেছে এবং যেহেতু সুভদ্রের ধার দিবার ক্ষমতাও অফুরন্ত নয়, সেই ধার অন্যত্র সুভদ্রের হইয়া জমিতেছে।

বাংলাদেশের পনেরো আনা শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী যুবক যাহা করে, সেও অতঃপর তাহাই করিতে লাগিল। প্রথমতঃ নিজের যোগ্যতা-সম্বন্ধে নিজের আবাল্য-পোষিত অত্যুচ্চ ধারণা হইতে করিবার মত কোনও কাজ সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পর এমন-সমস্ত স্থানে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল যেখানে টেবিলের ধূলা ঝাড়িবার জন্যও তাহার প্রবেশাধিকার নাই। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় কিছুদিনের মধ্যেই কল্পনার আকাশকুসুম রচনা ছাড়িয়া দিয়া বাস্তবতার ধূলিমাটির জগতে নামিয়া আসিতে সে বাধ্য হইল, কিন্তু সেখানেও মানুষের ভিড়ে কেহ তাহার দিকে তাকাইল না। একমাস না কাটিতেই সে বুঝিতে পারিল, বিধাতার হাতের যেমন জয়টীকা ললাটে লইয়াই সে পৃথিবীতে আসিয়া থাকুক, আপাততঃ ত্রিশটাকা মাহিনার কেরানীর কাজ পাওয়াও তাহার পক্ষে দুরূহ।

এমন অবস্থায় আর যাই করা চলুক, প্রেম করা চলে না। তাহার দর্পী মন নিজের এই পরাজয়-লাঞ্ছিত ধূলিধূসরিত মূর্ত্তিটাকে কিছুতেই ঐন্দ্রিলার চোখের সম্মুখে লইয়া গিয়া ধরিতে রাজি হইল না। নিজেকে বুঝাইল, যোগ্য হইয়া, মানুষের মত হইয়া প্রিয়ার সঙ্গে মিলিতে চাই বলিয়াই ত বিরহযাপনের এই তপস্যা আমার জীবনে, আমি ইহাতে কাতর হইব না। তাহার সম্বন্ধে ছোট ছোট লোভগুলিকে জয় করিয়া জীবনের সর্ব্বত্র বড় করিয়া তাহাকে লাভ করিব।

বীণার সম্বন্ধে মনকে এত সতর্ক হইয়া চারিদিক্ দিয়া বাঁধিতে হইত না। কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় রহিয়া রহিয়া একটি দীপালোকিত কলহাস্যমুখর বিশ্রম্ভালাপের সভা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে হূ হূ করিতে থাকিত। ইতিমধ্যে বীণার নিকট হইতে একটি চিঠি পাইল। রাহু একজন বেহারা সঙ্গে লইয়া চিঠিটি হাতে করিয়া আসিয়াছিল, বলিল, "বড়দি বলেছে, আপনাকে কক্‌খনো আমি নিয়ে যেতে পারব না, যদি পারি আমাকে ফির্‌পোতে খাওয়াবে।"

অজয় বলিল, "আমাদের বৈকুণ্ঠ ডিম-রুটি দিয়ে এমন খাসা বম্বে টোষ্ট তৈরী করে, ফির্‌পোর কোনো বাবুর্চ্চি তার কাছাকাছিও কিছু করতে পারে না। তুমি বোসো, বড়দির সঙ্গে বাজিতে হেরে গিযেছ ব'লে একটুও তোমাকে দুঃখ করতে হবে না দেখো।"

বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া চায়ের জোগাড় করিতে বলিয়া বীণার সুন্দর হস্তাক্ষর সম্বলিত নীলরঙের খামটি সে খুলিয়া ফেলিল। চিঠির কাগজের পরিচিত অস্ফুট সৌরভ; বীণা লিখিয়াছে, 'ইলু হঠাৎ ক্লাব নিয়ে খুব মেতেছে। সুভদ্রবাবুকে বুঝিয়েছে, ছেলেমেয়েদের জোর ক'রে মেলাতে গেলে তারা কোনজন্মেও মিলবে না, মানুষের ধাতেই সেটা নেই। তাদের একসঙ্গে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিলে কাজের চাপে চট্‌পট্ সব জোড় বেধে যাবে। আমি শুনে যথারীতি খুব হেসেছিলাম, বলেছিলাম, চাপ দিলে জিনিষ যে কেবল জোড় লাগে তা নয়, ভাঙেও। এই ধরুন না, ক্লাবটা কর্ম্মক্ষেত্র হয়ে

উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমারই মন প্রায় ভাঙবার জোগাড় হয়েছে। সুভদ্রবাবুর অবিশ্যি তাতে আসে যায় না কিছু। তাঁর এখনকার ভাবটা এই, ঐন্দ্রিলা যা বলে তা ঠিক না হয়ে যায় না। বেচারা সুভদ্রবাবু! ওঁরও অদৃষ্টে এই ছিল তা কে জানত? সে যাক্, শেষ অবধি আমার সঙ্গে এই রফা হয়েছে, খুব মারাত্মক কোনো কাজে এখনই হাত দেওয়া হবে না। সম্প্রতি একটা অভিনয় ক'রে ক্লাবের জন্যে কিছু টাকা তুলবার ব্যবস্থা করা হবে। পুকুর কাটতে যেতে হবে না জেনেই আমি খুব খুসী হয়েছি, এবং গানের দিক্‌টার ভার নিয়েছি। আপনি কি আমার এই বিপৎকালে আমায় একটু সাহায্য করবেন না? আপনি না এলে একলা আমি কিছুই ক'রে উঠতে পারব না। আজ বিকেলেই যদি আসেন, দুজনে একসঙ্গে ব'সে গোড়ার দিক্‌কার কাজের একটা খস্‌ড়া তৈরি ক'রে ফেলি। উৎপাত সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সবটা আমার সৃষ্টি নয় তা বলেইছি।'

যে নিদারুণ অন্ধকার লইয়া অজয়ের এই কয়টা দিন কাটিয়াছে, তাহার মধ্যে বীণার এই সহৃদয়তা ভরা ছোট সুন্দর চিঠিটি যে কতখানি আলো, কত বড় প্রলোভন বহিয়া লইয়া আসিল তাহা অজয় ছাড়া আর কেহ বুঝিল না। কিন্তু নিজের প্রতি নির্মম হইয়া এই প্রলোভনকে সে জয় করিল। বীণার কথা ভাবিল না, ঐন্দ্রিলাকে ভাবিল। বীণার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া যদি ঐন্দ্রিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, সে জানে কি গভীর মর্ম্মপীড়া লইয়া তাহাকে ফিরিতে হইবে। এখনকার মনের অবস্থায় ততখানি বেদনা সহিবার ক্ষমতা একেবারেই যে তাহার নাই।

কিন্তু মন আজ এতটুকু মাধুর্য্যের স্পর্শের জন্য এমন উন্মুখ যে, রাহুকেও তাহার ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া সিনেমায় গেল। বেহারাটাকে আগেই বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সিনেমা যখন শেষ হইল রাত তখন প্রায় নয়টা। রাহু বিপদ্ বাধাইয়া বলিল, "এত রাত্রে আমি একলা যেতে

পারব না, আপনিও চলুন।" অগত্যা অজয়কে রাজি হইতে হইল। স্থির করিল, রাহুকে তাহাদের বাড়ীর বাগানের ফটক ধরাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে।

পথে আসিতে মনের গায়ের অনেকগুলি আঁটাআঁটির বাঁধন আলগা হইয়া খসিয়া পড়িল। দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, জানি না কোন্ কাম্যফলের সন্ধানে অন্ধকারের মহাসমুদ্রে এবার আমার ডুব দিবার পালা, অনেক দিন ত দেখা হইবে না, দেখিতে চাহিব না, আজ শেষ একবার তোমার আলোর আশীর্ব্বাদ দুই চোখ ভরিয়া আমায় বহিয়া লইয়া যাইতে দাও। এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, একবার তাহাকে দেখিয়া যাই। দুর্দ্দমনীয় লোভ গলার কাছে অস্থির রক্তগতির সঙ্গে দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল। ভাবিতে লাগিল. হয়ত বীণার সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রিলাও আজ তাহার পথ চাহিয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাহুর ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। হয়ত আর একটু পরেই দেখিতে পাইবে, নিত্যকার মত তেতলার বারান্দায় রেলিঙে দুই বাহুর ভর রাখিয়া চিত্রার্পিতের মত সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু মাঠের ওপারে আবছায়া অন্ধকারে শুভ্র বাড়ীটি স্বপ্নপুরীর মত জাগিয়া উঠিল, তিনতলার বারান্দায় স্বপ্নরূপিণী মানসী-প্রতিমার দেখা মিলিল না। রাহুকে গাড়ীবারান্দার নীচে অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া সে বিদায় লইল। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিল, হয়ত রাহুর কাছে খবর পাইয়া বীণা এখনই ছুটিয়া আসিবে, তারপর ঐন্দ্রিলাও আসিবে। কিন্তু উপরের সিঁড়িতে রাহুর জুতার শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল, হেমবালার গলা শোনা গেল, একটা দরজা খুলিল, বন্ধ হইল, তারপর সব নিস্তব্ধ। প্রলোভনেও ভুলিল, লোভও মিটিল না, এই তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে।

ভারাক্রান্ত মনে মাঠের পথটুকু পার হইয়া অন্ধকারে বড় রাস্তার মোড় ফিরিতেছে এমন সময় নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একটি মোটর তাহার প্রায় গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। চমকিয়া ফিরিয়া যাহাকে দেখিতে পাইল, সে ঐন্দ্রিলা।

তাহার মুখ ভাল করিয়া চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার রূপজ্যোতিঃর চকিত শিখাখানি সেই একটি মুহূর্ত্তেই অজয়ের দুইচোখে যেন জালা ধরাইয়া দিয়া গেল। ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত এমন মনোহরণ রূপে ঐন্দ্রিলাকেও ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও দেখে নাই। আজ অজয় তাহাদের বাড়ী আসিবে কথা ছিল বলিয়াই কি বাড়ীর বাহিরে ঐন্দ্রিলার এই সমারোহের অভিযান? মনে পড়িল, বীণা লিখিয়াছে, ঐন্দ্রিলা ক্লাব লইয়া হঠাৎ খুব মাতিয়াছে। যতদিন ক্লাবে যাওয়া অজয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল, ঐন্দ্রিলা ভুলেও সেদিক্ একবার মাড়ায় নাই। যেন ঐন্দ্রিলাকে লইয়া বেদনা পাওয়াটাই তাহার আসল প্রয়োজন এমনইভাবে নিজেকে নানা ছলনায় সে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। বহু রাত অবধি বাড়ী ফিরিয়া গেল না, ময়দানের নির্জ্জন এককোণে দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ একবার ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া দেবতাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি অমন করিয়া বারবার বঞ্চিত করিয়া আঘাত করিয়া কি আমাকে বলিতে চাও তাহা আমি জানি, আলো আমার জন্য নহে, সুখ আমার জন্য নহে, প্রেম আমার জন্য নহে। স্নেহপ্রীতিহীন নিরানন্দ কোন্ অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে লইতে চাও? আমি হার মানিব না, ভয় করিব না, আমি প্রস্তুত।

বাড়ী ফিরিয়া রাহুর মুখে অজয়ের খবর শুনিয়া বীণা একপাশে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। আজ কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, রাহুর জন্ত আটটা অবধি অপেক্ষা করার পরও সে যখন ফিরিল না, বীণা নিজেই নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইয়াছিল, অজয় তাহাকে লইয়া ক্লাবে গিয়াছে। ঐন্দ্রিলাকেও তাড়া দিয়া সে-ই আজ ক্লাবে লইয়া গিয়াছিল। এখন বারবার মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে সে ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতাই বা কিসের? অজয়ের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং অজয়ের বিধাতাও বোধহয় কিছু বলিতে পারেন না, বীণা ত কোন্ ছার। তাহার পাশে বসিয়া তাহার একটি হাতকে নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া ঐন্দ্রিলা ডাকিল, "দিদি!"

"কি ?"

"কি এত ভাবছ ?"

"তুই যা বলেছিলি ও মোটেই সেরকম নয় !"

"কি-রকম নয় ?"

"ও মনে যা অনুভব করে, ব্যবহারে তা প্রকাশ করে না।"

"কিসে বুঝলে ?"

"ওর আজকের এই ব্যবহারে তাই মনে হচ্ছে। কি একটা কথাকে ও মনে চাপা দিয়ে রেখেছে, নিজে ব্যথা পাচ্ছে, অন্যদেরও ব্যথা দিচ্ছে, একটাও ঠিক ইচ্ছে ক'রে করছে না। এত ক'রে আসতে লিখলাম, রাত নটায় রাহুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল ?"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া বলিল, "মানুষের জীবনে কত সময় কত রকমের ঝড়-ঝাপ্‌টা আসে, ইচ্ছে থাকলেও সমান ব্যবহার সব-সময় সে করতে পারে কি ?"

বীণা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এমন যদি হয়, যে, ও আর কাউকে ভালবাসে ?"

যে-হাতটিতে বীণার হাতটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ঐন্দ্রিলার সেই হাতটি অল্প একটু কাঁপিয়া গেল মাত্র। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

অজয়কে এই ক'দিনেই তাহারও যে একটু ভাল লাগিয়াছে ঐন্দ্রিলা এখন নিজের কাছে তাহা আর অস্বীকার করে না। আজ অজয়ের সঙ্গে দেখা হইবে মনে করিয়া সে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া সাজিয়াছিল। সাজগোজ দেখিলে বেচারা সত্যই যদি একটু খুসী হয় ত হোক না। ওকে দেখিলে সত্যই মনে হয়, অনেকখানি খুসী হইবার প্রয়োজন তাহার জীবনে আছে। তারপর ক্লাব হইতে ফিরিবার সময় অকারণেই আজ তাহার মনে হইতেছিল, আসর যেন ভাল করিয়া জমিল না, কোথায় যেন কি অভাব রহিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতেই এত যত্নে সে যে

সাজিল, চিরাভ্যস্ত আলস্য কাটাইয়া বাড়ীর বাহির হইল, এ-সমস্তকেই পণ্ডশ্রম বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে সে যে কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়াছে, মনেমনে একবারও সেকথা মানিতে চাহিল না।

রাত্রির আহারাদির পর বীণা শুইতে গেলে তেতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, তাহার স্বভাবে কোনও মানুষকে ভালবাসা কোনও দিনই কি সম্ভব হইবে? সে বুঝিতেই পারে না, একজন মানুষের এমন অবস্থা কিরূপে হওয়া সম্ভব যখন আর-একজন বিশেষ মানুষকে না হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকার কোনও অর্থ থাকে না। নিজের কাজকর্ম্ম পড়িয়া থাকিবে, চোখে ঘুম থাকিবে না, আহারে রুচি চলিয়া যাইবে, দুদিন আগে পরিচয় ছিল না এমন একজন মানুষের জন্য ক্রমাগত হা-হুতাশ চলিতে থাকিবে, ভাবিতেই তাহার হাসি পায়। ভাল লাগার কথা আলাদা। পৃথিবীতে আরও কয়েকজন মানুষকে তাহার ভাল লাগে, অজয়কেও লাগে। কিন্তু বীণা তাহাকে লইয়া এমন সুরু করিয়াছে যেন অজয়ের মত মানুষ পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে আর জন্মায় নাই। এই জিনিষটিকে সে বুঝিতে পারে না। যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্, অজয় ত অত্যন্তই সাধারণ মানুষ। বীণার জন্য ঐন্দ্রিলাকে কাল যদি কেহ একটি স্বয়ম্বর সভা ডাকিতে বলে, অজয়কে ডাকিবার কথা তাহার মনেই হইবে না। ঐ ত চেহারা, তাছাড়া এখনও কলেজের পড়াও তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইলেই যে কি করিয়া তাহার দিন চলিবে তাহার ঠিক নাই। বীণা উহার মধ্যে কি দেখিল? কিন্তু সেই সঙ্গে ঐন্দ্রিলা ইহাও ভুলিতে পারিতেছিল না, যে, একমাত্র এই মানুষটিই অত্যন্ত দূরের জায়গা হইতে দুইদিনের পরিচয়েই অলক্ষিতে তাহারও মনের অত্যন্ত কাছে আজ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথায় প্রথমদিন হইতে যে-সুর বাজিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন ঐন্দ্রিলারই অন্তরের কোন্ অন্তরতম অনুভূতির স্পন্দন লইয়া বাজিতেছে। উহার কণ্ঠের আবেগ কেন মনকে এমন করিয়া স্পর্শ করে কে জানে। কে জানে অজয়ের কণ্ঠস্বরে থাকিয়া থাকিয়া এমন

চিরপরিচয়ের ছোঁওয়া কোথা হইতে আসিয়া লাগে। আর তাহার ক্ষুধিত অগ্নিগর্ভ দুইটি চোখ! মনে হয় সে-দৃষ্টি মানুষের অন্তরের অন্তস্তল অবধি ভেদ করিতে পারে। কোনও আবরণ টানিয়া নিজেকে সে-দৃষ্টি হইতে আড়াল করা যায় না। সে-দৃষ্টিকেই বা ঐন্দ্রিলা কেন এত ভয় করে কে জানে? সব জড়াইয়া জীবনের বিশেষ কোন্ একটা রূপ, একটি কোন্ বিশেষ জীবন্ততা এই মানুষটির মধ্যে যেন প্রতিফলিত হইতেছে, কোথাও-না-কোথাও কোনও-না-কোনওরূপে সে বর্ত্তমান না থাকিলে জীবনের কোন্ একটা দিক্ একেবারেই যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

নীচে বসিবার ঘরের ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইল। সাড়ে এগারো হইতে পারে কিংবা সাড়ে বারো, একটা হওয়াও বিচিত্র নয়। ভাবিল, এবারে গিয়া শুইবে, যদিও ঘুম আসিবে কিনা তাহার ঠিক নাই। হঠাৎ মনে হইল, জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। যেন এত রাত্রিতে জনশূন্য স্তব্ধ মাঠ পার হইয়া অজয় আসিতেছে। দূরে দেবদারু গাছগুলির ছায়া যেখানে নিবিড় হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানে সে যেন হঠাৎ নিজেকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে পাইয়াই সে লুকাইল। ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিয়া বাজিতে লাগিল। আরও একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল, সেদিনেরই মত আজও ভয়ের উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু আজ সে পলাইল না, দূরে তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

কতক্ষণ এভাবে কাটিল জানে না, মনে হইল বহুক্ষণ। তারপর সহসা আবার ছায়ান্ধকার নড়িয়া উঠিল। যে লুকাইয়াছিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ফিরিয়া চলিয়াছে। এবারে ঐন্দ্রিলার মনে কোনও সন্দেহই আর রহিল না, যে, সে অজয়। ক্রমে মৃদু জ্যোৎস্নার ধূসরতায় প্রেতমূর্ত্তির মত সে মিলাইয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা এত ভয় কেন পাইল বুঝিল না, কিন্তু দ্রুতপদে ঘরে গিয়া ঘুমন্ত বীণাকে দুইহাতে জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল। সে রাত্রিতে

তাহার চোখে আর ঘুম আসিল না। পৃথিবীটাকে সে যেমন ভাবিয়াছিল, মোটেই যেন সেটা তেমন নয়। সবকিছু কেমন ব্যাধিগ্রস্ত, অস্বাভাবিক। প্রেতলোকেরই মত ভয়াবহ। ঐন্দ্রিলা ছুটিয়া পলাইতে চায়, পারে না। অজয়ের চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি তাহার দিগন্ত জুড়িয়া জাগিয়া থাকে।

এদিকে ভোরে যথারীতি সুভদ্রের সর্ব্বসিদ্ধি রসায়ন। বাড়ীর সব-কয়টি মানুষকে ঘুম হইতে জাগাইয়া প্রথমেই এই তিক্ত পাঁচন পান না করাইযা সে অন্য কাজে হাত দিত না। একমাত্র নন্দ যে-ক'টা দিন এবাড়ীতে ছিল, অত্যন্ত প্রসন্ন স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া এই পাঁচন গিলিয়াছে। অজয় খায় নিজের অস্বাস্থ্যের প্রতিকার কামনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধার মনোভাব লইয়া। বিমান রোজই এই সূত্রে একবার করিয়া সুভদ্রের সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম করে এবং শেষ পর্য্যন্ত যেন নিতান্ত জোরে হারিয়া গিয়াই এক নিঃশ্বাসে সবটুকু তিক্ততা গলাধঃ করিয়া তিক্ততর ভাষায় সুভদ্রকে গালাগালি করিতে থাকে।

কিন্তু সুভদ্র রসায়ন প্রস্তুত করিতে যেমন সিদ্ধহস্ত ছিল, চা তৈয়ারীতেও তাহার হাত ছিল কম নয়। তাহার হাতে পরিবেষণ করা সুরভি চায়ের পেয়ালাগুলি সম্মুখে করিয়া বসিযা জীবনের ছোটখাট তিক্ততার আস্বাদ ভুলিয়া যাইতে কাহারও বেশী সময় লাগিত না। কিন্তু এইখানটাতেই প্রায়শঃ বাধা ঘটিয়া যাইত। ভোর না হইতেই সমস্ত সহরের ছেলেরা সুভদ্রের সন্ধানে আসিয়া নীচের ঘরে ভিড় করিত, নিকটতর পল্লীরও কেহ কেহ আসিত। আজ রসায়ন প্রস্তুত করা অবধিও ত্বর সহিল না, বৈকুণ্ঠ খবর দিল, নীচে জন-দুইতিন রোগীর শুভাগমন হইয়াছে। ব্যায়ামের আখড়া, দাতব্য-চিকিৎসালয়, খেলার ক্লাব, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাহারা আসিত, তাহাদের বসাইয়া রাখা চলিত। চিকিৎসার্থী হইয়া কেহ আসিয়াছে জানিলে সুভদ্রকে আর ধরিয়া রাখা যাইত না।

সে নীচে চলিয়া গেলে বিমান কহিল, "সুভদ্রের অভিনয়ে তুমি নামছ ?"

অজয় কহিল, "না। তুমি?"

বিমান কহিল, "আমাকে কেউ ডাকেওনি, তাছাড়া নামতে আমি চাইও না। নিজের পৌরুষ সম্বন্ধে এমনিতেই আমি যথেষ্ট সচেতন, সেজন্যে সুভদ্রের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন যেদিন হবে, সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব। তোমার অবস্থা কি প্রকার?"

অজয় কহিল, "বিশেষ ভাল কিছু নয়। বাবা জানিয়েছেন, টাকাকড়ি আর পাঠাবেন না। সংসার খুঁজে ত্রিশ টাকার একটা কাজ পাইনি। নিজের পৌরুষ নিয়ে গর্ব্বিত হবার কিম্বা অভিনয়ে নামবার সময় এটা নয়।"

বিমান কহিল, "ত্রিশটাকার কাজেরই যদি দরকার ছিল ত আর ক'টা মাস কলেজে গেলেই হত?"

অজয় কহিল, "না বিমান না, ত্রিশটা টাকার যে দরকার সেটা সাময়িক, তার জন্যে মিথ্যার সঙ্গে রফা ক'রে আমার চিরকালের ভবিষ্যৎকে আমায় নষ্ট করতে ব'লো না। নাহয় অনাহারেই থাকব, কিম্বা ভিক্ষা করব, কিন্তু তুমি জানো না আর সব ভুলে গিয়ে নিজেকে নিয়ে কতবেশী এখন আমার থাকা দরকার। মানুষ হতে হলে একেবারে ভিত থেকে নিজেকে আবার আমায় নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে, বাজে কাজে মনটাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিলে এখন আমার চলবে না। এমন কি, দেশের যে ইতিহাসকে বাইরের জিনিষ ব'লে এতদিন মনে করেছি, বাইরে থেকে যার চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করেছি, পারিনি, এখন মনে হচ্ছে, আমার মধ্যে, দেশের প্রতি মানুষের মধ্যে তার একটা পরিপূর্ণ প্রকাশ যেন আছে। নিজেকে ভাল ক'রে জানতে পারলে সেই ইতিহাসের গোড়ার কথাটাও আমার জানা হবে। আমার মধ্যে আমার মনুষ্যত্বের যেগুলি অসম্পূর্ণতা, হয়ত তারই সমস্যা আমার দেশের সমস্যা। সেগুলিকে জেনে প্রতিকারের ব্যবস্থা যেদিন করতে পারব, দেশের বহুযুগব্যাপী দুর্ভাগ্যের অনেক রহস্য সেদিন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

বিমান কহিল, "আপাততঃ তোমার সমস্যাগুলি মিটলেই আমি খুসী হই। কিন্তু নিজেকে আলাদা ক'রে নিয়ে এ সমস্যা তুমি মেটাতে পারবে না, কেননা সমস্যাগুলি একলা তোমার মোটে নয়ই। সেইটে বুঝতে পারছ না ব'লেই গোলে পড়েছ।"

"সমস্যাটা তাহলে কি, তোমার মুখ থেকেই শুনি।"

"যা এক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই সমস্যা। যে কাজের যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, সবদিক্ বজায় রেখে তা করতে পারছ না। এদেশে যাদের পুলিশ হওয়া উচিত তারা হয় ইস্কুল-মাষ্টার, যাদের দাদনের ব্যবসা করা উচিত তারা করে পুরুতগিরি, যাদের হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত তারা হয় কবিতা লেখে নয় ছবি আঁকে। সম্ভবতঃ মনুর সময় থেকে এইরকম চ'লে আসছে, চট্ ক'রে অন্যরকম কিছু যে হবে তা ত মনে হয় না।"

"আমি যে কি কাজের যোগ্যতা নিয়ে এসেছি তা জানব কি ক'রে?"

"হয়ত কোনো কাজের যোগ্যতা নিয়েই আসনি, কিন্তু যেহেতু এটা বিধাতার পৃথিবী, দুই পায়ের উপর ভর রেখে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা তোমার জন্যেও কোথাও এখানে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই। হিমালয়ে গিয়ে বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করলেও এ দেশের মাটিতে সেইটুকু জায়গা তুমি নিজের জন্যে ক'রে নিতে পারবে না। এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেখানে অনধিকারীর ভিড়, তোমার দুস্তর তপস্যালব্ধ অত্যন্ত সত্য অধিকারকেও কেউ এখানে মান্য করবে না। নিজেকে নিয়ে তুমি করবে কি, সে-চেষ্টা তোমার আগে কেউ আর এদেশে করেনি ভেবেছ? তার চেয়ে কোথাও কোনো আপিসের বড়বাবুর সুনজরে পড়তে পারো কি-না চেষ্টা ক'রে দেখ, তাতে সবদিক্ গিয়েও জীবনের একটা খুব মোটা দিক্ বজায় থাকবার সুবিধা হবে। হৃষীকেশবাবুর ত শুনেছি পাটের ব্যবসায়ের সূত্রে অনেক বড় বড় সাহেব-সুবোর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, একবার সেদিক্ দিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ না?"

অজয়ের সমস্ত শরীর দারুণ ঘৃণায় রি রি করিয়া উঠিল, কহিল, "থাক্ বিমান, আমার ভাবনা তোমাকে আর ভাবতে হবে না, চুপ কর তুমি।"

ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া শূন্য চায়ের পেয়ালাটা ঠেলিয়া টেবিলের মাঝখানে সরাইয়া দিয়া বিমান উঠিয়া পড়িল। কহিল, "সেই ভাল, যে সমস্যাটা মিটবে না তাকে ভুলে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে আর যাই হোক, মনটা অন্ততঃ সুস্থ থাকে। তুমি ত ইতিহাস পড়েছ, আমাদের জাতের মত এমন আর একটা জাত কোথাও দেখেছ? আমরা যে কেবল অধঃপতিত পদানত দাসজাতি তা নয়, তদুপরি আমরা আবার বুদ্ধিমান্। নিজেদের এমন গুছিয়ে ফাঁকি দিতে পারি যে নিজেদের নিরুপায় দাসত্বের চেহারাটা সুদ্ধ আমাদের চোখে পড়ে না। সওদাগরী আপিসের বড়বাবু দেখেছ? পদসেবা ক'রে বাইরে বেরিয়ে এসে বড় সাহেবের মত গলা ক'রে কথা কয়। তার বড়বাবুত্ব ঘোচাতে পারে এ-দেশের তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে সে-সাধ্য কারুর নেই। মেজাজটাকে খানিকক্ষণের মত একটু সাহেবী ধরণের ক'রে নেবার জন্যে আমি মদ খাই, আমাকে গাল দাও কেন?"

অজয় কোনও কথা কহিল না। খোলা জানালায় জ্যোতিঃপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, সীমাহীন সৃষ্টি ভরিয়া অফুরন্ত তোমার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, তার কিছু দ্বার খোলা হইয়াছে, কত দ্বারই খোলা হয় নাই। অথচ সামান্য একটু অন্নের অংশ লইয়া, মাটির অধিকারের অংশ লইয়া মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি হানাহানি। এই ক্ষুদ্রতার ঘৃণিত আবেষ্টন হইতে তুমি আমাকে তুলিয়া ধর প্রভু!

সুভদ্রের রোগী দেখা শেষ হইয়াছে। পাড়ার যে দরজীর কাছে অজয় কিছুদিন আগে জামা করাইয়াছিল, তাহার পাওনা টাকা-দশটা নিজের নিঃশেষিত-প্রায় পুঁজি হইতে লুকাইয়া সে শোধ করিয়া দিতেছে।

২০

অভাবগুলিও অজয়ের মনের কাছে ক্রমে আবছায়া হইয়া আসে। অভাবও আছে, অভাবের বেদনাও আছে, কিন্তু সে-বেদনা যেন তাহার নয়। যেন আর কাহারও।

গা-সহা হইবার আগেই কোনও কিছু আর তাহার গায়ে লাগে না। দূর ভবিষ্য তাহার জন্য কোন্ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য বহন করিতেছে, সেইখানে তাহার দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, বর্ত্তমানের রিক্ত নিরাভরণ মূর্ত্তি চোখ চাহিযাও আর দেখিতে পায় না। সুভদ্রের আশ্রয়ে দুইবেলা দুইটি খাইতে পায়, সমস্ত দিনরাত চারিটি দেওয়ালের আওতায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। পারতপক্ষে বাহির সে বড় একটা হয় না। আগে লুকাইয়া চাকুরির চেষ্টা যাও বা একটু আধটু করিত, পণ্ডশ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাও এখন ছাড়িয়া দিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, চাকুরির সময় এ নয়। দিন ত কাটিয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া কাটিতেছে ঐন্দ্রিলা তাহা জানিতে পারিতেছে না, আসলে ইহাই তাহার অতিবড় সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা পাইতেছে না সুভদ্র। সর্ব্বত্র ধার জমিতেছে। কেমন করিয়া সেই ধার শোধ হইবে সে ভাবিয়া পাইতেছে না। নিজের অভাব অসুবিধা লইয়া কাহারও কাছে অভিযোগ জানানো তাহার স্বভাব নহে। অজয়কে কিছুই সে বলে নাই। অভাব যখন ছিল না, বিমানকে মাঝে মাঝে তাড়া দিয়া খরচপত্র বিষয়ে সাবধান হইতে বলিত। পাছে এখনকার অবস্থায় সেই জিনিষটিকেই সুভদ্রের স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত মনে করিয়া বিমান ক্ষুব্ধ হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু আর সে বলিতে পাইতেছে না। সুভদ্রের দেশ হইতে যাহা আসে তাহা কেবল দুটি মানুষেরই পক্ষে পর্য্যাপ্ত, তৃতীয় ব্যক্তিটির কথা ছাড়িয়া দিলেও সুভদ্রের সখের ভিষক্‌বৃত্তির খরচও বড় কম নয়। অথচ তিন বন্ধুর সংসার-যাত্রার সমস্ত ভাবনা একলা সুভদ্রই ভাবিবে এমনই একটা নিয়ম নিজে হইতেই কি কারণে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং সে-নিয়মটাকে আর-সকলের অপেক্ষা সুভদ্রই মান্য করিয়া চলে বেশী।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসার-যাত্রার বিপদ্ এইখানে যে প্রাণপাত করিয়া কৃচ্ছ্রতা করিলেও ব্যয়সঙ্কোচ যাহা হয় সেটা চট্ করিয়া চোখে পড়ে না। কিছুদিন হইতে খুবই কষাকষি করিয়া চলিতেছে, কিন্তু কোনওদিক্ দিয়াই নিরুপায় অবস্থাটার কিছু সমাধান তাহাতে হইতেছে না। সম্প্রতি তিনমাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়াতে বাড়ীওয়ালার দারোয়ান আসিয়া শাসাইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে ভাড়ার টাকা জোগাড় না হইলে হয়ত অপমানের আর শেষ থাকিবে না। কথাটা অজয় এবং বিমান ত্নজনেরই নিকট হইতে সে লুকাইয়াছিল, কিন্তু বিমানের সঙ্গে পারিবার জো নাই। হঠাৎ সেইদিনই বৈকালিক সাজসজ্জা সমাধা করিয়া রোল্ড গোল্ড বাঁধানো ছড়িটি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "তোমার কাছে পাঁচটা টাকা নিশ্চয়ই হবে না সুভদ্র ?"

একটু ম্লান হাসিয়া সুভদ্র কহিল, "না।"

বিমান কহিল, "কথাটা স্বীকার করতে এত লজ্জিত হবার কিছু কারণ দেখতে পাই না। বাপের দেওয়া টাকা, থাকলেই সেটা এমন আর কি গৌরবের বিষয় হত ?"

সুভদ্র কহিল, "ব্যাপারটা নিয়ে academic আলোচনার উৎসাহ তোমার যখন রয়েছে, তখন টাকার দরকারটা এমন কিছু মারাত্মক নয় তোমার।"

বিমান লাঠির হাতলটাকে নিজের গলায় বাধাইয়া টানিতে টানিতে কহিল, "তা ত নয়, কিন্তু তোমার অবস্থা ভেবে দুঃখ হচ্ছে। পাঁচটা মোটে টাকা, তোমার প্রাণের বন্ধু আমি, চাইতে এলাম দিতে পারলে না। এরপর তোমার গতি কি হবে ?"

সুভদ্র আবারও একটু ম্লান হাসি মুখে আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "চিরকালই কি আর এই রকম ক'রে কাটবে ? গতি কিছু একটা হবেই।"

বিমান কহিল, "ছাই হবে। এদেশে গতিমাত্রই ত অধোগতি। হয় ভিক্ষাবৃত্তি, নয় উঞ্ছবৃত্তি। কি করবে ঠিক করেছ ? বাপের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখবে, না গাঁটকাটার দলে ভিড়বে ?"

সুভদ্র কহিল, "মাঝামাঝি পথ কিছু নেই নাকি ?"

বিমান কহিল, "দেখ খুঁজে, আমি সম্প্রতি নিজের পথ দেখছি।"

ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তর্‌ তর্‌ করিয়া সিঁড়ি নামিয়া পথে বাহির হইয়া আসিল। এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে কহিল, 'না, এই লক্ষীছাড়া দেশে সাধ্য কি যে চরিত্র ঠিক রেখে পথ চলব ? বাড়ীসুদ্ধ মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, ঠায় দাঁড়িয়ে তা ত আর দেখা যায় না ? পকেটে দুটো টাকা যদি থাকত, কোথাও একপাত্র খেয়ে নিয়ে অন্ততঃ আজকের মত ভুলে থাকতে পারতাম। তারও যে জো নেই ছাই। কি করব ? শিবের ছবি আঁকব একটা ?'

কিন্তু সুভদ্রের বিপদ্‌ জমা হইয়া ছিল।

পরদিন স্নান সারিয়া বাহির হইতে গিয়া সুভদ্র দেখিল, অজয় প্রায় দরজা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, "কি খবর অজয় ? স্নান করবে ?"

অজয় কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার হয়ে দরজীকে টাকা দিয়েছ ?"

সুভদ্র কহিল, "কে বললে ?"

অজয় গলার স্বর আরও একটু চড়াইয়া বলিল, "কে আবার বলবে ? দরজী নিজে। আমি এই তার কাছ থেকে আসছি।"

সুভদ্র বলিল, "আচ্ছা, দরজাটা ছাড়, আমার ঘরে এস, বলছি।"

অজয় বলিল, "না, এইখানেই এখখুনি আমি আমার প্রশ্নের জবাব চাই। টাকা দিয়েছ ? কেন দিলে ?"

সুভদ্র নিতান্ত অপরাধীর মত বলিল, "হ্যাঁ, দিয়েছি, বড্ড উত্যক্ত করছিল।"

অজয় প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল, "টাকা পেত সে আমার কাছে, তোমায় উত্যক্ত করছিল মানে ?"

সুভদ্র এবার একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, "মানেটা তোমার বুঝতে পারা উচিত। এপাড়ায়, এ বাড়ীতে আমি সাত বছর আছি, সকলে আমাকেই চেনে, তোমাকে কেউ চেনে না।"

কথাটার মধ্যে অসম্মানসূচক কিছুই ছিল না, কিন্তু অজয় অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এ পাড়ায়, এবাড়ীতে থাকতে আসা আমার অন্যায় হয়েছিল, এতটা রূঢ় ভাবে সেটা আমায় না জানিয়ে দিলেও হ'ত।"

সুভদ্র জিভ কাটিয়া কহিল, "রূঢ় শোনাবে যদি বুঝতে পারতাম, কথাটা এরকম ক'রে আমি বলতাম না। তুমি আমাকে ভুল বুঝছ অজয়।"

"এতদিন ভুল বুঝেছিলাম," বলিয়া চটি ফটফট করিতে করিতে অজয় নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সুভদ্র সঙ্গে গেল, কাতর কণ্ঠে কহিল, "অজয়, তুমি অকারণ চটছ, তোমাকে আঘাত করতে আমি একেবারে চাইনি।"

অজয় একথার কোনও উত্তর দিল না। আলনা হইতে নিজের কাপড় চোপড় ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া বিছানার উপর ফেলিতে লাগিল। বিমান আসিয়া একবার দরজায় উঁকি দিল, সুভদ্র চোখের ইসারায় তাহাকে বিদায় করিল। অজয় ততক্ষণ তাহার বই-খাতাপত্র একটা লোহার ট্রাঙ্কে ঠাসিয়া ভরিতেছে।

সুভদ্র একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, "অজয়, শান্ত হও। আমি অপরাধই যদি ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা কর।"

কিন্তু অজয় তবুও নিরুত্তর। কাপড়-জামাগুলিকে যেমন তেমন করিয়া পাট করিয়া সুটকেসে ভরিয়াছে, এবার বিছানাটাকে লইয়া পড়িয়াছে। চোখে সে কিছু ভাল দেখিতে পাইতেছে না; এখনই, এই মুহূর্ত্তে এবাড়ী তাহার ছাড়িয়া যাওয়া চাই, সে কথাটা তাহার আচরণে সুভদ্রকে সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

সুভদ্র কহিল, "তুমি আমার বন্ধু, বন্ধুর হয়ে তার কয়েকটা টাকা দেনা শোধ করেছি, সেটা এমনই কি অপরাধ হয়েছে?"

রাস্তার দিককার জানালায় মুখ বাড়াইয়া অজয় ডাকিল, "কুলী, কুলী, এই কুলী!"

সুভদ্র এবার দস্তরমত ভয় পাইয়াছে, কহিল, "অজয়, অজয়, এরকম পাগলামি করে না, একটুখানি স্থির হও। একটু ভেবে দেখ, এমনই কি ভীষণ অপরাধ আমি করেছি? আমাদের তিন বন্ধুর কারও অবস্থাই ত সচ্ছল নয়? সেদিন আমার হাতে টাকা ছিল আমি দিয়েছি; যখন আমার থাকবে না, তোমার পালা আসবে, তুমি করবে, এটা আমি আশাই করব। এ না হলে একসঙ্গে থাকবার, পরস্পরকে বন্ধু ব'লে পরিচয় দেবার মানেই হয় না কিছু। তোমার দেনাটাকে আমার নিজের দেনা, আমাদের তিনজনেরই দেনা মনে ক'রে আমি টাকা দিয়েছি।"

অজয় এবারে জামাজুতা পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, বলিল, "সেইজন্যেই লুকিয়ে দিয়েছিলে! নিজের দেনা মানুষে লুকিয়ে দেয়! আমাকে ছেলেমানুষ বোঝাচ্ছ তুমি।"

সুভদ্র বলিল, "তুমি যা পাগল, হয়ত অকারণে হাঙ্গামা করবে, যেমন এখন করছ, ভেবেই ত লুকিয়েছিলাম।"

অজয় ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল, বলিল, "অকারণেই বটে! যে নিজের বাপের টাকাও ছোঁবে না ঠিক করেছে, সে তোমার লুকিয়ে দেওয়া টাকাটা নিয়ে চুপ ক'রে থাকবে তুমি ভেবেছিলে!"

সুভদ্র বলিল, "ভুল করেছিলাম। আবারও বলছি, অপরাধ যদি হয়ে থাকে ত ক্ষমা কর। আর এরকম ভুল করব না, কথা দিচ্ছি।"

অজয়ের রাগটা পড়িয়া আসিতেছে, কিন্তু ততক্ষণে কুলী আসিয়া গিয়াছে। তাহার মাথায় মোট চাপাইয়া বাহির হওয়া পড়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুভদ্র একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "যদি তোমার অপমানই হয়ে থাকে, বন্ধুত্ব জিনিষটা তার চেয়েও যে বড় একথাটা ভুলে যেও না। এতদিন ধ'রে এমন কিছু কি তোমার জন্যে করিনি যার কথা মনে ক'রে এ অপমান ভুলে যাওয়া যায়?"

এবারে জবাব দেওয়ার মত কোনও কথা অজয় সত্যই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কুলীর মাথায় মোট চাপানো হইয়া গিয়াছে, এখন কি বলিয়া আর সে

ফিরিতে পারে? বিমান এই লইয়া তাহাকে এরপর যদি কখনো উপহাস করে, সুভদ্র যদি মনেমনেও হাসে? তাছাড়া কুলীটাই বা কি মনে করিবে? অজয় যেন কতকটা নিরুপায় হইয়াই বাহির হইয়া গেল। সুভদ্র অতশত বুঝিল না, তাহারও ততক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, কেবল বলিল, "বেশ, যাও।"

অজয় চলিয়া গেলে বিমান ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এ কি কাণ্ড!"

সুভদ্র একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "কাণ্ড না কাণ্ড, শুনলে ত সবই?"

বিমান বলিল, "তা শুনলাম বই কি? এখন কি করবে ভেবেছ?"

সুভদ্র বলিল, "কি আবার করব?"

বিমান বলিল, "ছোঁড়া যায় কোথায়, সেটা অন্ততঃ দে'খে আসা যাক।"

সুভদ্র কহিল, "উঁহু, আমি যাব না। সাধ্য যখন নেই, সাধ ক'রে আর ভার বাড়াব না। তুমি যেতে চাও ত যাও।"

বিমান কহিল, "ভার বইবার ক্ষমতটা তোমার চেয়ে আমার ত বেশী নয়, তবু একবার দেখলে হত। ধর, কৌতূহল ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে?"

সুভদ্র কহিল, "আছে, তবে এক্ষেত্রে অন্ততঃ সেটাকে চেপে যাওয়া ভাল মনে করি। ওকে যতটা জানি, তাতে ওকে এখন আর ঘাঁটালে ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে মিটমাট হবার সম্ভাবনাটা কমবে বই বাড়বে না।"

সুতরাং বিমানের যাওয়া হইল না।

সেদিন দুপুরে খাওয়াটা দুই বন্ধুর কাহারও মুখে রুচিল না। কত বড় ব্যাপার কি অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিযা গেল! অজয় রাগের মাথায় বাহির হইয়া গেল, দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়াই তাহাকে ধরিয়া রাখা উচিত ছিল কি? কোথায় সে গেল? নিঃসম্বল প্রবাসী ছাত্র, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? যদি বা কোথাও মাথা গুঁজিবার স্থান হয়, কেমন করিয়া তাহার আহার জুটিবে? আজ দুপুরে অন্ততঃ নিশ্চয়ই তাহার খাওয়া হইবে না, তাহার ভাতটা এখানে পড়িয়া

রহিল। কিন্তু সুভদ্র জোর করিয়া যথারীতি আহার করিল, এবং বিমান কিছুই খাইতেছে না দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিল না।

এর ঠিক তিনদিন পরেকার ঘটনা। এই তিনদিন বিমান লুকাইয়া অজয়ের খোঁজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষিয়া ফেলিয়াছে। অজয় একেবারেই নিরুদ্দেশ। সুভদ্র ইতিমধ্যে কোথায় একটি মুমূর্ষু রোগীর সন্ধান পাইয়াছে, সকাল সকাল বৈকালিক জলযোগ সারিয়া বাহির হইয়া যায়, বেশ রাত করিয়া ফেরে। বিমান একবার চাঁছা দাড়ি দ্বিতীয়বার ফেনলিপ্ত করিতেছে এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, কে একজন ভদ্রলোক অজয়বাবু সম্বন্ধে কি যেন বলিতে চাহিতেছেন। বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রয়েছেন তিনি?"

চাকর বলিল, "রাস্তার ধারে রকের ওপর ব'সে আছেন।"

বিমান তোয়ালে ঘসিয়া মুখের সাবান মুছিতে মুছিতে বলিল, "ওপরে নিয়ে এলি না কেন হতভাগা?"

চাকর বলিল, "আমি ত বলেছিলাম, তিনি ওপরে আসতে না চাইলে কি করব?"

বিমান ছুটিতে ছুটিতে নীচে আসিয়া দেখিল, পুরনো একটা বেতের বাক্স, সতরঞ্চি মোড়া ছোট্ট একটা বিছানা এবং গোটা দুই পোঁটলা পাশে লইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ম্লানমুখে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। বিমানের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ইনি অজয়ের খবর লইতে আসিয়াছেন, দিতে আসেন নাই। অত্যন্ত আশা করিয়া আসিয়াছিল, মনটা বড়ই দমিয়া গেল।

বিমান নমস্কার করিলে ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার নাম শ্রীবিজয় রায়, আমি অজয়ের বাবা হই।" বিমান নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গেলে তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া তাহাকে বাধা দিলেন, কিন্তু যে-দুই-হাতে বাধা দিয়াছিলেন তাহাতেই জড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। বিমান লক্ষ্য করিল, তাঁহার জুতা দুটির প্রায় সমস্তটা জুড়িয়াই তালির উপর তালি।

বিজয় কহিলেন, "অজয় বাড়ী নেই বুঝি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমান বলিল, "আজ্ঞে না, তা আপনি এখানে কেন ব'সে আছেন ? ওপরে চলুন। ওরে বৈকুণ্ঠ, ও বৈকুণ্ঠ, এদিকে আয়, বাক্স-বিছানা ওপরে নিয়ে চল্।"

উপরে অজয়েরই পরিত্যক্ত খাটের উপর বৃদ্ধের বিছানা-বাক্স রাখিয়া বিমান একখানি চেয়ার টানিয়া তাঁহাকে বসিতে দিল, তারপর ভাবিতে লাগিল, তাঁহাকে ভালমন্দ আর কিছু না বলিয়া হঠাৎ যেদিকে হোক ছুটিয়া পলাইয়া গেলে কেমন হয়। কিন্তু অতটা সংসাহস শুধু এক পেয়ালা চা পেটে হওয়া সম্ভব নয়, অতএব খাটের একপাশে বসিয়া বলিল, "আপনাদের দেশ থেকে কলকাতা ত অনেক দূরের পথ, দুপুরে নিশ্চয় আপনার ভাল ক'রে খাওয়া হয়নি। কিছু খাবার আনিয়ে দিই ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না, তার কিছু দরকার নেই। ভাজা চিঁড়ে আর বাতাসা সঙ্গে এনেছিলাম, দুপুরে তার বেশ অনেকখানি খেয়েছি ; এখনও অনেক আছে, পোঁটলা খুলে বের ক'রে নিলেই হ'ল। তাই নিচ্ছি।" বলিয়া চিঁড়ের পোঁটলাটা খুলিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, "আজকেই খেয়ে না শেষ করলে একদম মিইয়ে যাবে, খুব মুড়মুড়ে এখনই আর নেই।"

নিজের মনীব্যাগটার অন্তরপ্রদেশ মনশ্চক্ষে একবার দেখিয়া লইয়া বিমান নিবৃত্ত হইল, কহিল, "একটু চা করে আনুক অন্ততঃ ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "চা, চিনি, টিনের দুধ, সবই আমার সঙ্গে আছে,—একটু গরম জল হলেই চলবে। আমার শিশিতে স্পিরিট আর নেই, নয়ত তোমাদের বিরক্ত না ক'রে স্পিরিট ষ্টোভটাকেই কাজে লাগাতে পারতাম।"

উঠিয়া গিয়া বিমান বৈকুণ্ঠকে গরমজল করিয়া আনিতে বলিয়া দিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "অজয়ের কি বাড়ী ফিরতে রাত হবার সম্ভাবনা ? তাহলে বরং আমি চাটা খেয়ে একটু ঘুরে আসি। শ্যামবাজারে তার দূর সম্পর্কের এক পিসি থাকেন, বহুবৎসর তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই……"

কোনও প্রকারেই আত্মরক্ষা করা যখন সম্ভব নয়, তখন দু-একবার ঢোঁক গিলিয়া কথাটা বিমান বলিয়াই ফেলিল, "অজয় আজ তিনদিন হ'ল এবাড়ী ছেড়ে গিয়েছে, কোথায় যাচ্ছে কাউকে ব'লে পর্যন্ত যায়নি।"

চিঁড়ের পোঁটলাটার মধ্যে বৃদ্ধ বাতাসার সন্ধান করিতেছিলেন, পোঁটলাটাকে আবার বাঁধিয়া ফেলিলেন। চোখদুটি এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু যেন বিস্ফারিত হইল, একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কোথায় যাওয়া সম্ভব? কেন গেল?"

বিমান সত্যমিথ্যা মিলাইয়া কহিল, "এখানে তেমন স্থবিধা হচ্ছিল না। কোথায় গেল কি জানি, যত জায়গায় তার যাবার সম্ভাবনা ছিল সব জায়গাতেই তার খোঁজ আমরা করেছি। আছে হয়ত খুব কাছাকাছিই কোথাও, যে-কোনো সময় দেখা হয়ে যেতে পারে।"

করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গরমজল আসিলে বলিলেন, "চা এখন থাক। আমাকে ঠাণ্ডা জল এক গেলাস দিতে ব'লে দাও।··· গোয়ালন্দের দিক্‌কার ফিরতি ট্রেনটার ত আর বেশী দেরি নেই, সেইটে আমার ধরা চাই।"

বিমান এবার বেশ জোর গলাতেই প্রতিবাদ করিল, বলিল, "তাও কি কখনো হয়? আজকে আপনার যাওয়া হতেই পারে না। কাল সকালেই হয়ত অজয় এসে হাজির হবে,—যা খামখেয়ালী মানুষ, তখন তাকে আমরা কি বলব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ব'লো, তোমার বাবা এসেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা নয় তোমার সঙ্গে এখন তাঁর দেখা হয়। আর, আমার ছেলেকে ত আমি চিনি; কাউকে যে কিছু ব'লে যায়নি তার মানেই হচ্ছে, নিজে থেকে তোমাদের কাছে সে আর আসবে না।"

বৈকুণ্ঠ কুলী ডাকিতে গেল। বিমানের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল দেখিয়া বিজয় আবার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "তুমি দুঃখ ক'রো না

বাবা। ও নিজের পায়ে দাঁড়াবে ঠিক করেছে, যদি পারে ত তার চেয়ে বড় শিক্ষা পুরুষ মানুষের আর কিছু হতে পারে না। আমার নিজের জীবনে এই আনন্দই আমার সবচেয়ে বড় যে, রান্নাবান্না থেকে সুরু ক'রে, কাপড় কাচা, জুতো সেলাই, এমন কি আমার ছোটখাট রোগের চিকিৎসার জন্যেও পরের মুখ তাকিয়ে আমায় থাকতে হয় না। শিশু বয়সেই ওর মাকে ও হারিয়েছে, তখন থেকে স্নেহদুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে তার এইদিক্‌কার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে আমি কেবল বাধাই হয়েছি, ভুল করেছি। এবারেও যে থাকতে পারিনি, ছুটে এসেছিলাম, ভুল করেছিলাম। দুঃখ পেয়েই ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা পেতে কুণ্ঠিত হলে চলবে কেন?"

নীচে সিঁড়ির পথে শোনা গেল, বেহারী কুলী অতি অপরূপ বাংলায় বৈকুণ্ঠের সঙ্গেই দর-দস্তুরের পালাটা চুকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং বৈকুণ্ঠ অতি অপরূপ হিন্দীতে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে সে-বিষয়টার মীমাংসা তাহার দ্বারা হওয়া অসম্ভব। বিজয় কহিলেন, "হ্যাঁ, আর একটা কথা।—" বেতের বাক্সের তালা খুলিয়া পেট মোটা একটা লেফাফা বাহির করিলেন, বলিলেন, "তিনশোটা টাকা আছে এর ভেতর। তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে যেমন ক'রেই হোক তোমার দেখা হয়েই যাবে। টাকাটা তুমিই রাখবে, যদি নিতান্ত দরকার হয়, ধর,—শক্ত অসুখবিসুখ কিছু করে, কেউ দেখবার না থাকে, ত তোমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত খরচ ক'রো।"

বিমান টাকাটা হাতে লইয়া কহিল, "আমাদের বন্ধু সুভদ্র, আমার চেয়েও অজয়ের সে-ই বেশী বন্ধু আসলে, তার হাতে টাকাটা দিলে হ'ত। আর, সুভদ্রের সঙ্গে আপনার দেখা হ'ল না, আপনি এসে ফিরে গিয়েছেন শুনে বড় দুঃখ পাবে বেচারা।"

বিজয় কহিলেন, "এর পরে যদি কখনো আসা হয়, ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিছু মনে ক'রো না তোমরা। দেশেও কাজকর্ম্ম প'ড়ে আছে কিছু কিছু,

অকারণ দেরি করতে চাই না। ওর খবর পাওয়া গেলে একটা পোষ্টকার্ড লিখে আমায় জানিও। এই হ'ল আমার ঠিকানা।"

বিমান শিয়ালদহ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। টিকিট করিতে গিয়া সগু পাটভাঙ্গা মুগার পাঞ্জাবীটা একেবারেই ধামসাইয়া গেল। একটা থার্ডক্লাস গাড়ীর ভদ্র আরোহীদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া বৃদ্ধের জন্য একটু বসিবার জায়গাও সে-ই করিয়া দিল।

গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বৃদ্ধ কহিলেন, "অসুখের কথাটা আমি একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে ব'লেছি। আরো ত কত রকম বিপদ্ আপদ্ আছে মানুষের? তুমি যখনই দরকার মনে করবে, যেভাবে ভাল মনে করবে, টাকাটা খরচ ক'রো। আমি দিয়েছি বলা চলবে না, তুমি দিচ্ছ বললেও হয়ত নেবে না, কিন্তু তুমি বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলে, সে আমি তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা ব'লেই বুঝতে পেরেছি। তুমি একটা রাস্তা বের করতে পারবেই।"

চড়া সুদে ধার-করা এতগুলা টাকা, কাহার হাতে দিয়া যাইতেছেন সে চিন্তা একবারও যে মনে ছায়াপাত করিল না তাহা নহে, কিন্তু অমন ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান্, সুদর্শন ছেলেটি, বিদায় লইবার সময় আবার তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, উহাকে সন্দেহ করাও পাপ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ ময়লা কাপড়ের কোঁচার খুঁটে নিজের চোখের প্রান্ত মুছিয়া ফেলিলেন।

টাকাটা সঙ্গেই ছিল, গাঁটকাটার ভয়ে পকেটে হাত ঢুকাইয়া সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া পথ চলিতে চলিতে বিমান গাহিতে লাগিল:

"Honey! I'll take care of you and your money!"

তারপর গান থামাইয়া মনে মনে কহিল, 'নাঃ, বৃদ্ধ নিজের ছেলেকেই কেবল চেনেন, পরের ছেলেদের একটুও না। তা না হলে পৃথিবীতে এত লোক থাকতে করকরে এতগুলো টাকা আমার হাতে তুলে দিতেন না।···দূর ছাই, বৈকুণ্ঠও যে আমার চেয়ে লোক ভাল এদিক্ দিয়ে। কি বিপদেই যে পড়া গেল।'

২১

ক্লাব হইতে "বিসর্জ্জন" অভিনয় হইবে স্থির হইয়াছে।

সুভদ্রের মনটা যে কিছুদিন হইতে ভাল নাই, অর্থাভাব তাহার একমাত্র কারণ নয়। অনেক আশা করিয়া ক্লাব করিয়াছিল, কিন্তু শেষ অবধি ইহা হইতে কিছু যে একটা গড়িয়া তুলিতে পারিবে সে-সম্ভাবনা দিনকার দিনই কমিয়া আসিতেছে। ভাবিয়াছিল, কাজের মধ্যে দিয়া সমষ্টি-চৈতন্য সংহতির পথে উত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু অভিনয়ের আয়োজন হইয়া অবধি বিরোধ এবং অশান্তির শেষ নাই। প্রথমতঃ বিরোধ নেতৃত্ব লইয়া। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যে-কেহ "বিসর্জ্জন" বইখানা সুর করিয়া পড়িতে পারে, তাহারই ধারণা, অভিনয়ে নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতায় তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। সেকার্য্যের যোগ্যতা আসলে সুভদ্রেরই একটু যা আছে। নিজে সে ভাবাবেগ-বর্জ্জিত বলিয়া অভিনয়ে যথা-পরিমিত ভাবের প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা তাহারই সকলের অপেক্ষা বেশী। অল্পেতে সে বিচলিত হয় না, অত্যন্ত বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িলেও বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সে কাজ করিতে পারে। তদুপরি শুদ্ধমাত্র নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাতেও সে সকলের অগ্রণী, সে-অভিজ্ঞতাও ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তাহারই একমাত্র আছে। অভিনয় প্রচুর-ব্যয়-সাপেক্ষ, এবং সেদিক্‌কার দায়িত্ব কেহ ঘাড় পাতিয়া লইতে চাহিল না বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত সুভদ্রেরই নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটা আসলে অনেকেরই যে মনঃপূত হয় নাই, উঠিতে বসিতে এই কয়দিন সুভদ্র তাহার প্রমাণ পাইতেছে। অতঃপর বিরোধ অভিনেতা-নির্ব্বাচন লইয়া। রঘুপতির অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হইল না বলিয়া রমাপ্রসাদের একটি বন্ধু রাগ করিয়া ক্লাবের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। জয়সিংহ এবং গোবিন্দ-মাণিক্যের অংশ অদল-বদল করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উভয় অভিনেতাই বাঁকিয়া বসিয়াছে। রিহার্স্যালের সময় কাহারও অভিনয়ে কোথাও

খুঁৎ ধরিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়, ক্লাবটা যে আসলে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর বৈঠকখানা সে কথাও সকলে সব সময় মনে রাখে না। মেয়েদের লইয়া কোনও গোল নাই, কারণ তাহাদিগকে কোনও কারণে কিছু বলিতে সুভদ্রের মত নির্ভীক মানুষেরও বাধে। কেবল জয়সিংহ-অপর্ণা এবং গোবিন্দ-গুণবতীর অভিনয়ের রিহার্সাল একসঙ্গে হইবার জো নাই, মেয়েদের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি।

সুতরাং রিহার্সাল যাহা হইতেছে তাহার কথা না বলিলেও চলে। একমাত্র সুভদ্র কিছুতেই দমিবার পাত্র নয় বলিয়া রোজই কিছুক্ষণ ধরিয়া হৈ চৈ চলে। বীণা পিয়ানোয় তাল দিয়া অপর্ণাকে গান শেখায়, সেদিক্‌টাই যা-একটুখানি জমে। পূজারীদের কোরাস্ একবার সুরু হইলে সেদিনকার মত আসল কাজ যাহা তাহা একেবারেই চুকিয়া যায়। মাদল বাজাইয়া, নাচিয়া, লাফাইয়া, তেতলায় সুলতার কচি ছেলেটার ঘুম ভাঙাইয়া ক্লাবের কাজ শেষ হয়। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া সকলে মনে করে, কাজের মত কাজ বেশ খানিকটা করা হইল।

আজও সন্ধ্যা হইতেই ক্লাবের কাজ সুরু হইয়াছে। ক’দিন সুভদ্র আসে নাই বলিয়া নাট্যাংশের অভিনয় হয় নাই। লিখিবার টেবিলের একপাশে একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া বীণা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে “বিসর্জ্জন” বইখানা আগাগোড়া আবার পড়িয়া ফেলিতে ব্যস্ত। অপর্ণার গানের রিহার্সাল দেওয়াইতে সে আজ উৎসাহ বোধ করে নাই, প্রথম হইতেই কোরাসের রিহার্সাল চলিতেছে।

হল্ হইতে সুলতা ডাকিলেন, “ঢের হয়েছে বীণা, এইবার ওঠ্। দেখছিস্ একটা সুরও কেউ ঠিক ক’রে গাইতে পারছে না, আর ক’টা দিনই বা বাকী আছে, শেষটা কি লোক হাসাবি ?”

ঐন্দ্রিলা কহিল, “দিদি যেন কি। আমাকে এত ক’রে টেনে নিয়ে এসে এখন দিব্যি এক কোণে ব’সে বই পড়া হচ্ছে।”

রমাপ্রসাদ কহিল, "রিহার্সালে সবটাত এমনিতেই শুনতে পাবেন, বই পড়ার চেয়ে সে বরং আরো ভালই লাগবে।"

সুলতা কহিলেন, "বইটা ত পালিয়ে যাচ্ছে না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বই না পালাক্, দিদি এই রকম করতে থাকলে আমরা এরপর পালাব।"

সুলতা কহিলেন, "অন্ততঃ অভিনয়ের দিনে শুনতে যারা আসবে তারা যে পালাবে, তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

বইয়ের পাতা হইতে চোখ না তুলিয়াই বীণা কহিল, "মন্তব্য শেষ হ'ল তোমাদের? এইবার থামো। আমি ত বলেইছি, আমার আজ ভাল লাগছে না কিছু করতে।"

সুলতা কহিলেন, "বেসুরো গানগুলো শুনতে আমাদের যে আরও ভাল লাগছে না বীণা!"

বীণা কহিল, "কোরাসের গানগুলো বেসুরো হলেই realistic হবে বেশী। গোড়া থেকে তোমাদের বলছি, একজন কেউ গাইয়ে ছেলে lead করতে সঙ্গে না থাকলে এই সব আনাড়িদের দিয়ে কোনোকালে কিছু হবে না, তা তোমরা কেউ কানেই নিলে না, এখন আমাকে দোষ দিলে কি হবে শুনি?"

সুলতা একটি গালে রসনা-সন্নিবেশ করিয়া একটুখানি অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। বীণা আঁচল ঘুরাইয়া উঠিয়া পড়িল, কহিল, "আহা, আবার হাসি হচ্ছে। তা বেশ, যত পারো হাসো, আমি চললাম। ইলু যাচ্ছিস্?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন মিছে? ধ'রে নিয়ে এলে তুমিই, আবার তুমি যেতে বললেই যাব।"

সুলতা এবারে একটু ক্ষুন্ন হইয়াই মৃদুস্বরে কহিলেন, "না-হয় নিজের ইচ্ছেতেই একদিন এলি ইলু। এটাত ক্লাবই কেবল নয়, আমার বাড়ীও ত বটে।"

নিতান্ত কথাটাকে চাপা দিবার জন্যই ঐন্দ্রিলা কহিল, “আসতে ইচ্ছে আমার করে সুলতাদি, কদিনই ত এসেছি। আজকে শরীরটা ভাল ছিল না, আজকের কথাই বলছিলাম।”

সিঁড়ি নামিতে নামিতে অনুভব করিল, সুলতাকে ফাঁকি সে দিতে পারে নাই। পাছে এ-বিষয়ে আর-কিছু বলিতে গেলে ঐন্দ্রিলা আরও বেশী করিয়া ধরা পড়ে, এই ভয়ে স্বভাব সুলভ সৌজন্য বশতঃই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ী ফিবিবার পথে ইহাই সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, যে, আসল ফাঁকি তাহার কোন্‌টা এবং সেই ফাঁকি কাহাকে সে দিতে চেষ্টা করিতেছে। সত্যই কি কেবল বীণারই ইচ্ছাতে সে আজ ক্লাবে আসিয়াছিল? অজয়কে হয়ত দেখিতে পাইবে সে সম্ভাবনা মনে পডিয়া একবারও কি তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপে নাই? সে দুরু দুরু ভয়ের, তাহা সে জানে। অজয়কে সে ভয় করে, ভয় করে। অত্যন্ত গভীর করিয়া ভয় করে। সে এমন ভয় যাহার কথা কাহাকেও বলিতে গেলে নিজেরই কর্ণমূল আতপ্ত হইযা উঠে। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অজয়কে তাহার ভালও লাগিত, কিন্তু আজ তাহার জন্য ভয় ছাড়া কিছু আর মনের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। তবু এই ভয়াবহতারই এ কি নিদারুণ প্রলোভন? একদণ্ড কেন তাহাকে সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না? গভীর রাত্রিতে প্রেতের মত যাহাকে দূর হইতে সে দেখিয়াছিল, চকিতে তাহার চোখে যে-দৃষ্টি সে কল্পনা করিয়াছিল, আবছায়া স্মৃতির পটে অঙ্কিত সে-মূর্ত্তি সে-দৃষ্টিকে আসল মানুষটার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবার একি প্রচণ্ড কৌতূহল তাহার মনে! যে মানুষটা সসম্ভ্রমে কাছে আসিয়া বসে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে, ভাল করিয়া চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া কথা বলে না, তাহার সঙ্গে এই নিশাচর বুভুক্ষ গোপনচারী মানুষ-টার সত্যই কোথাও মিল আছে কিনা জানিতে পাইলে সে কি খুসী হয়? হয়ত খুসী হয় না, কিন্তু জানিতে তাহার আগ্রহেরও শেষ নাই।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিবার পর ঐন্দ্রিলার প্রথম মনে পড়িল সারা পথ

বীণার সঙ্গে একটিও সে কথা বলে নাই, বীণাও নিঃশব্দে এতটা পথ অতিবাহিত করিয়াছে। এমন প্রায় কোনওদিনই হয় না, সে না বলিলেও বীণাই তাহাকে দিয়া কথা বলায়। বীণার নীরবতা তাহার মনকে স্পর্শ করিল, গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে কহিল, "এসো, এসো, এইটুকুতেই এত ভাবলে নাকি চলে। সবে ত সুরু!"

বীণা কেমন একরকম করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "হ্যাঁ, তুই ত সবই জানিস্। আচ্ছা তুই যা, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এত রাত্রে কোথায় আবার ঘুরতে যাবে তুমি?"

বীণা বলিল, "হারিয়ে যাব না, ভয় নেই। দে'খে আসি সুভদ্রবাবুদের কি হয়েছে। হঠাৎ এবারে যা গরম পড়েছে, বাড়ীসুদ্ধ অসুখবিসুখ ক'রে প'ড়ে আছেন হয়ত।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তুমি ত আর ইচ্ছে থাকলেই তাঁদের নার্স করতে লেগে যেতে পারবে না? খবরটা আনতে ড্রাইভারকে পাঠালেই যথেষ্ট হত না কি?"

বীণা কহিল, "না-হয় নিজেই যাচ্ছি। ওতে আমার কিছু এসে যাবে না।"

চলমান্ মোটরটির দিকে চাহিয়া ঐন্দ্রিলা কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সে বেশ জানিত, বীণা তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেও সে প্রাণান্তে যাইত না। ছেলেদের মেস-বাড়ীতে হট করিতে মেয়েরা গিয়া হাজির হয় না। তাহা বীণাও জানে বলিয়াই তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গেল। তবু অকারণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন বীণা পথের মাঝখানে জোর করিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। মনের কোণে বীণার সম্বন্ধে একটু তিক্ততা জাগিয়া রহিল। বীণা যেন তাহার অস্তিত্বকে তাচ্ছিল্যভরে অস্বীকার করিতেছে। নিজে হইতেই যেখানে সে দূরে রহিয়াছে সেখান হইতেও জোর করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিতেছে।

উপরে আসিয়া কিছুক্ষণ বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা যে কত বেশী রাত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে তাহাই বুঝাইবার জন্য হেমবালা আজ

সাতটা না বাজিতে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, সিঁড়ি উঠিতে ঐন্দ্রিলা তাহা লক্ষ্য করে নাই। অজয়দের মেসে বীণার নৈশ অভিযানের পালাটিকে নানা বিচিত্রভাবে সে কল্পনা করিতে লাগিল। কল্পনা ক্রমে উদ্দাম হইয়া সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যের সীমারেখা ছাড়াইয়া বহিয়া চলিতে লাগিল। তখন প্রায় উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়া উঠিল, 'দূর ছাই আর ভাবব না।' তারপর ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাবার স্পর্শ না করিয়াই শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়াও যখন কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না তখন স্থির করিল, আলো জ্বলিতেছে বলিয়া ঘুম আসিতেছে না। উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে চিন্তারাশি রামধনুবর্ণে জ্বলিতে লাগিল।

চৌকা চেয়ারগুলির একটিতে বসিয়া-পড়িয়া বীণা কহিল, "মানুষটা থাকল কি মরল সে খোঁজ করাও একবার আপনারা দরকার মনে করেন নি? সত্যি, আপনারা যেন কি! যেমন অজয়-বাবু তেমনি আপনারা দুজন।"

সুভদ্র অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না। অজয়ের খোঁজে বিমান যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষিয়া বেড়াইয়াছে, এখনো বেড়াইতেছে, সে কথাটা কাহাকেও, বিশেষ করিয়া সুভদ্রকে সে জানিতে দিতে চায় না। অকারণেই অনেকখানি তিরস্কার নীরবে পরিপাক করিতে হইবে জানিয়া মনটাকে সে প্রস্তুত করিয়া লইল। লিখিবার ডেস্কটার উপর আধখানা শরীরের ভার রাখিয়া কাৎ হইয়া বসিল, হাসিয়া কহিল, "আসল কথা আমরা ভয় পাইনি মোটে। মনের সবচেয়ে বড জায়গায় ওর এখন বন্ধন, যেখানেই যাক্ দুদিন পরে ঠিক ফিরে আসবে। আব সে-কথা আপনিই সব-চেয়ে ভাল বোঝেন।"

বীণা কহিল, "আপনাদের চেয়ে খানিকটা ভাল যে বুঝি তা ঠিক। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি, ব্যাপারটাকে যত সহজ ভাবছেন তত সহজ সত্যিই সেটা নয়। ফিরতে উনি নাও পারেন, ওঁর অসাধ্য কাজ নেই।"

বিমান কহিল, "কার সাধ্য বেশী এবারে তারই পরীক্ষা চলছে।"

বীণা কহিল, "পরীক্ষাটা আপনাদের কাছে আমি অন্ততঃ দেব না। আপনারা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে আর ব'লে কাজ নেই।"

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল। সুভদ্র ব্যথিত হইয়া কহিল, "আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন, করুন। কিন্তু যে, মানুষ যাবে ব'লে পণ করেছে তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে কিছু কি লাভ হ'ত? কোনো জোরের সম্পর্কই বেশীদিন টেঁকে না।"

বীণা কহিল, "টেঁকে কিনা তা কোনদিন পরখ্ ক'রে দেখেছেন? আমি ত দেখেছি, একমাত্র জোরের সম্পর্কটাই টেঁকে। আসল কথা মনের মধ্যে কোন বন্ধনকে শেষ অবধি স্বীকার করতে আপনাদের ভাল লাগে না। জোরের সম্পর্ক ব'লে নয়, মানুষের আসল সম্পর্কটা যে কোন্‌খানে সে শিক্ষাই আপনাদের কারও হয়নি। কল্‌কাতার মেস্‌গুলিকে একদিনে সব কেউ ভেঙে দেয় তাহলে বেশ হয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে বীণা কহিল, "কোথায় কোথায় ওঁর যাবার সম্ভাবনা তা জানেন কেউ?"

সুভদ্র এবং বিমান নীরবে একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। বীণা অস্থির হইয়া কহিল, "জানেন না, এই ত? কলেজে যাওয়া উনি ত ছেড়েই দিয়েছেন, সেদিক্ থেকে কোন খবর পাবার আশা নেই। নন্দ বলে আপনাদের বাড়ীতে যে-ছেলেটি থাকত, অজয়বাবু তার কথা প্রায়ই বলতেন, সে কোথায় আছে এখন?"

সুভদ্র মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে জানাইল, তাহাও জানে না।

বীণা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, কহিল, "তাও জানেন না। তা বেশ। সে ছেলেটি ত কলেজে পড়ে, সেখানে খোঁজ করা চলে?"

সুভদ্র একটু ভাবিয়া কহিল, "ওর টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, কলেজ ত সম্প্রতি নেই।"

নিরুপায়তার দুঃখে বীণা সুভদ্রদের এবারে তিরস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বদ্ধদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ

মৃদুস্বরে কহিল, "জিজ্ঞেস করতেও ভয় করছে, ওঁর দেশের ঠিকানা আপনারা জানেন ?"

বিমান চুপ করিয়া রহিল।

সুভদ্র কহিল, "চেষ্টা করলে দেশের ঠিকানা পাওয়া শক্ত হবে না। কলেজে তার সহপাঠীদের কেউ-না-কেউ নিশ্চয় জানে।"

বীণা কহিল, "জানে না, জানে না, কক্‌খনো জানে না, আমি আপনাদের ব'লে দিচ্ছি। মিছিমিছি কেন কষ্ট করবেন, খোঁজ ক'রে দরকার নেই।" বাহির হইয়া যাইতে যাইতে দরজার কপাট ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "সত্যি আপনাদের কথা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। কি আপনারা হয়েছেন সব। কারও কোন দায় নেই, কারও ওপরে আপনাদের কোন দাবী নেই। আত্মীয় বন্ধু, থেকেও কেউ নেই আপনাদের। যার যখন যা খুসি করছেন, ঠিক করছেন, কি ভুল করছেন তা দেখবার মানুষ নেই। আগাগোড়া জীবনটাই আপনাদের ছেলেমানুষি বেহিসাব। কাজ অকাজ, সবই আপনাদের খামখেয়ালিতে চলছে। কলেজে পড়ছেন, ছবি আঁকছেন, সে-সবও আপনাদের খামখেয়ালি। এরকম ক'রে মানুষের বেঁচে থাকার মানে হয় কিছু ? শক্ত হাতে কেউ আপনাদের ভার নিতে পারে তাহলে হয়, যেমন ক'রে ছোট ছেলের ভার মানুষে নেয়। কিন্তু পৃথিবীতে আপনাদের ভাবনা কেউ ভাবে না, যদিও সেইটেই সব-চেয়ে বেশী দর্‌কার।"

তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিয়া দুই বন্ধুতে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল। বৈকুণ্ঠ খাইতে ডাকিয়া গেল, উঠিল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে সুভদ্র কহিল, "সত্যই কারও সঙ্গে আমাদের যে বিশেষ কিছু সম্পর্ক আছে তা নয়। আমার ত অন্ততঃ নেই। আমাদের দেশাত্মবোধ বলতে কিছু নেই, জাত আমরা মানিনে, পরিবারকে আশ্রয় ক'রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মনুষ্যত্ব বিকাশ পেত, আমাদের কালে তারও ভিত এলিয়ে গিয়েছে। পারি না, মনটা

কেমন বসতে চায় না। চোদ্দপুরুষে জমিজমা ক'রে চলেছে, আরামেই চলেছে, আমারও চলত না এমন নয়। যদি সব-ছেড়ে বাড়ী গিয়ে বসতে পারতাম, প্রভাটার একটা গতি হ'ত কিন্তু নিজের দিক্ থেকে যেটা করা উচিত মনে করি, সেটা করতে কেমন ভাল লাগে না। বীণাদেবীকে সে কথা ত আর বোঝান যাবে না, তাই চুপ ক'রে রইলাম···

হঠাৎ বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। চকিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঐন্দ্রিলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গাড়ীবারান্দার নীচে আর্ম্কিন হাঁপাইতেছে, দরজা খুলিয়া বীণা পাদানে পা বাড়াইল। নিজের অসতর্কতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নগরোপান্তের নিস্তব্ধ রাত্রি, মোটরের দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শোনা গেল, সুরকি-ফেলা পথের উপর মোটরের চাকার মর্ম্মরধ্বনি। দুতলার সিঁড়িতে বীণার পায়ের শব্দ স্ফুটতর হইতে লাগিল, হেমবালা নিজেকে জানান দিবার উদ্দেশ্যে একবার কাশিলেন, কিন্তু ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যে রক্তস্রোতের শব্দকে ইহারা ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

আলো জ্বালিয়া ঐন্দ্রিলাকে আস্তে ঠেলা দিয়া বীণা ডাকিল "ইলু!"

ঐন্দ্রিলা সাড়া দিল না।

বীণা আবার ডাকিল, "ইলু ঘুমুচ্ছিস?"

বেশ বোঝা গেল, বীণার গলার স্বর স্বভাবিক অবস্থায় নাই। এবারে ঐন্দ্রিলা ভয় পাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "কে, দিদি? কি হয়েছে?"

বীণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল।

ঐন্দ্রিলা ঢোঁক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি কারও?"

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তবে?"

"সুভদ্রবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় চ'লে গিয়েছেন, কোনো খোঁজই নেই।"

"অজয়বাবু? সে কি, কবে?"

"তা বেশ, পাঁচ ছ'দিন হ'ল।"

"তুমি সুভদ্র বাবুর কাছে শুনলে?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে ঐন্দ্রিলা কহিল, "পুরুষ-মানুষ ত? ভয় পাবার আছে কি?"

বীণা কহিল, "হ্যাঁ, পৌরুষ ত কত। একটা প্রকৃতিস্থ মানুষ, তুচ্ছ কথা নিয়ে রাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, লজ্জা করে না, এমন কখনো শুনেছিস?"

ঐন্দ্রিলাকে স্বীকার করিতে হইল, সে শোনে নাই। কিন্তু তাহার মনের কোন্ একটা গভীর তল হইতে এই কথাটাই সমস্ত দুর্বোধ্যতাকে ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, যে যাহা কখনও শোনে নাই, এই মানুষটির নিকট হইতে তাহাও তাহাদের শুনিতে হইবে, যাহা কখনও দেখে নাই তাহা দেখিতে হইবে, এইজন্যই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদের জীবনে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মানুষটি সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিবে। ইহাকে ভয় করা যায়, কিন্তু ইহার জন্য ভয় পাইবার কিছু নাই। তাহার মনের উপর যে অন্ধকার ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, ধীরে তাহা মিলাইয়া গেল। খোঁপা ঠিক করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, "বেচারা সুভদ্রবাবু!"

বীণা ঝাঁঝিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তুমি ত সুভদ্রবাবুর কথাটাই কেবল ভাববে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "না গো, না, আমি কারও কথাই ভাবছি না। ঢের রাত হয়েছে, এবার খাবে এসো।"

বীণার সঙ্গে সঙ্গে সেও খাবারের ঢাকা খুলিয়া খাইতে বসিল।

প্রভাতে ঐন্দ্রিলার ঘুম না ভাঙিতেই বীণা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

দুতলায় হেমবালা তখনও দ্বার খোলেন নাই, রুদ্ধদ্বারের বাহিরে স্তিমিত আলোকে দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া ক্ষ্যান্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছে। বাড়ীর অন্য ঝি-চাকরদের সঙ্গে শেষ অবধি কিছুতেই আর তাহার বনিবনাও হইয়া উঠিল না, প্রায় সমস্ত জীবন একটা বৃহৎ পরিবারে যে মর্য্যাদা পাইয়া সে অভ্যস্ত, এখানে কেহ তাহাকে তাহা দিবে না, সুতরাং পারতপক্ষে নীচেকার মহলে সে বড় একটা যায় না, সুযোগ পাইলেই হেমবালাকে আসিয়া আশ্রয় করে।

বীণা বলিল, "চুপ ক'রে ব'সে কেন আছ, পিসীমাকে দরকার?"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "না দিদিমণি, দরকার আর কি? ঘুম ভাঙতেই ত ডাক পড়বে, আগে থেকে তৈরী হয়ে ব'সে আছি। আমরা রাজবাড়ীর ঝি-চাকর, কাজ পালিয়ে বেড়ানো, সাতডাকে সাড়া না দেওয়া, ও-সব ত আর আমাদের ধাতে নেই।"

বীণা বলিল, "তা কাজ করতে চাও, নীচে ত ঢের কাজ রয়েছে, স্বচ্ছন্দে করতে পার।"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "কোথা আর পারি দিদিমণি, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমাদের কাজ কি আর তোমাদের মনে ধরবে? কিছুতে হাত লাগাতে গেলে বাড়ীসুদ্ধ একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে আসে, আবার ব'সে খাই ব'লে খোঁটাও শুনতে হয়।"

বীণা বলিল, "খোঁটা আবার তোমাকে কে দেয়?"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "কে আবার দেবে, দেয় আমার কপাল।"

বীণা বলিল, "খোঁটা যারা দেয় তাদের ত তুমি খাচ্ছ না, তাহলেই হ'ল।"

হৃষীকেশের মহলে পৌঁছিয়া বীণা দেখিল, তিনি স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছেন বেহারাকে ডাকিয়া তাঁহার ঘর ঝাড়িতে বলিয়া বাগান হইতে কয়েকগুচ্ছ ফুল তুলিয়া আনিয়া একটি রেকাবীতে কতকগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া দিল। স্নানান্তে একসঙ্গে কন্যাকে পাইয়া হৃষীকেশের চিন্তাভারাচ্ছন্ন মুখ প্রসন্নতার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "আজ খুব ভোরে উঠেছ মা?"

বীণা বলিল, "রোজই খুব যে দেরি ক'রে উঠি তা নয়, কিন্তু রাহু-মন্দিরার পাল্লায় কোনোরকমে একবার পড়লে ছাড়া পেয়ে বেরুতে সেদিন নটা বেজে যায়। ততক্ষণ চাকরবাকরগুলো তোমার কি হাল ক'রে রাখে জানতেও পাই না।"

রাহু-মন্দিরার নাম হইতেই চকিতের মত হৃষীকেশের মুখে আবার একটু স্নেহপ্রসন্নতার হাসি খেলিয়া গেল। কহিলেন, "আমার অসুবিধা কিছু হয় না। তাছাড়া হেমও ভোরেই রোজ আসে। অপর্ণা কেমন আছেন এখন?"

বীণা কহিল, "ভাল।"

পিতাপুত্রীতে ইহার পর অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। হৃষীকেশ চশমা বাহির করিয়া বই লইয়া বসিলেন। হৃষীকেশের মুখে কোনও হাসি মুহূর্ত্তেকের বেশী স্থান পায় না, তবু তাঁহার স্তব্ধ বিষণ্ণতারও কেমন একটি শ্রী আছে, তাঁহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া কঠিন হয়। বীণা বসিয়া বসিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। বেহারা নিঃশব্দে ঘরদোর গুছাইয়া চলিয়া গেলে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার ত্রুটিগুলি সারিয়া লইল, তারপর পিতার খুব কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া কহিল, "তোমাকে আজ একটু বিরক্ত করব, কিছু মনে করবে না ত বাবা?"

হৃষীকেশ চশমা খুলিয়া রাখিয়া কন্যার দিকে ঘুরিয়া বসিলেন, কহিলেন, "বল, কি বলবে?"

বীণা বলিল, "আচ্ছা বাবা, দেশের জমিজমা থেকে আয় ত দিন দিন ক'মে

যাচ্ছে, এখানেও তোমার কাজকর্ম্মের অবস্থা কিছু ভাল নয়, নিজে কিছুই আর তুমি দেখতে শুনতে পার না। রাহুসর্দ্দার মানুষ হয়ে উঠতেও ঢের দেরি। তুমি নিজে কতদিন বলেছ, যদি ভাল লোক পাও নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে রাজি আছ।······অজয়বাবুর মতো বিশ্বস্ত লোক খুব ত বেশী পাওয়া যাবে না, ওঁকে একটা chance দিয়ে দেখবে ?"

হৃষীকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "Chance অন্যকে যতটা দেব তার চেয়ে ঢের বেশী নিজেকেই দেওয়া হবে, কাজের কথা নিয়ে আমাকে কিছু বলতে তুমি সঙ্কোচ ক'রো না মা। কিন্তু অজয়বাবুকে আমি ত তেমন জানি না, যে ধরণের কাজের কথা তোমাদের আমি বলেছি সে কি ওঁর ভাল লাগবে ?"

বীণা বলিল, "ভাল লাগাটা বড় কথা নয়, অন্ততঃ সব অবস্থায় নয়,—মানুষকে খেতে-পরতে হবে ত আগে ?"

হৃষীকেশ কহিলেন, "সে ত খুব ঠিক কথা। কাজটা অসাধু না হয় এইটুকু দেখাই দেশের এখনকার অবস্থায় যথেষ্ট। তা বেশ, তুমি ব'লে দেখতে পার।" বলিয়া আবার চশমাটা কানে বাধাইয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া বসিলেন।

পিতার মহল হইতে ত্রস্তপদে বাহির হইয়াই বীণা গাড়ী তলব করিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে ভবানীপুরে সুলতাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। সুলতা নীচে চায়ের তদারক করিতেছেন, প্রিয়গোপাল তখনও নামেন নাই, কহিলেন, "কি রে বীণি, তুই এমন সময়ে অকস্মাৎ ?"

বীণা কহিল, "তোমার কর্ত্তা কোথায় ?"

সুলতা কহিলেন, "আমার কর্ত্তা আছেন যেথানে খুসি, সে-খবরে তোর কাজ কি ?"

"ঠাট্টা নয় সুলতাদি—"

"আমিই কি বলছি ঠাট্টা? ভারি একটা খোস-খবর এনেছিস মনে হচ্ছে, আমরাও না-হয় তার ভাগ পেলাম।"

"ভাগ তোমাকে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি ওপরে চাটুয্যে মশাইকে আগে খবর পাঠিয়ে দাও।"

"খবর আর পাঠাতে হবে না, নিজে থেকেই মাথার টনক নড়েছে, ঐ আসছেন বীরপুরুষ।"

"তা বীর আর কম কি, তোমাকে সামলে ঘর করছেন ত?"

"হ্যাঁ, ঘর ত কতই করছেন, দিনের বেলায় হাইকোর্ট আর সারা রাত ব্রিজের আড্ডা।"

বীণা কহিল, "ব্রিজের আড্ডা এখনো চলছে? নাঃ, তুমি কিছু কাজের নও সুলতাদি। তোমার হয়ে আমাকেই দেখছি সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

"তা বেশ ত, তুইই দে-না সব ব্যবস্থা ক'রে। সেজন্যে তোর হাতে কিছু-দিনের মত সমর্পণ ক'রে দিতে হয় যদি, খুসী হয়ে দেব।"

"থাক্, এতটা খুসী তোমাকে আমি আর করব না, ব্যবস্থা এমনিতেই হবে।—"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রিয়গোপাল আসিয়া পড়িলেন, বীণাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশে একটা চৌকি লইয়া বসিয়া কহিলেন, "আজ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আপনি খুব ভাল চা করতে পারেন, সে-পরিচয় বহুবার পেয়েছি। আসুন, পেয়ালাগুলো ভর্ত্তি করুন আগে, তারপর সব খবর শোনা যাবে।"

"তোমার লোভকে এত বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হবে না," বলিয়া সুলতাই চা ঢালিয়া দিলেন। একটু মুখ-বিকৃতি-সহকারে এক চুমুক খাইয়া প্রিয়গোপাল বলিলেন, "তা হোক, আপনি কাছে থাকলেই ঢের হবে। এবারে কি খবর বলুন।"

অজয়ের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত যতটা জানিত বীণা সমস্তই বিবৃত করিল।

স্থলতা কহিলেন, "ও হরি, এইজন্যে তোকে আজ এত খুসী দেখাচ্ছিল? তুই ত আচ্ছা মেয়ে।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "খুসী কেন দেখাবে না? বাঙালীর ছেলে, ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে যে বেরিয়েছে সেইটেই ত আশার কথা।"

বীণা কহিল, "আশার কথা হ'ত, পথে বেরনটা একাধিক অর্থে যদি সত্যি না হ'ত। বাপের ওপর রাগ ক'রে খরচ নেওয়া বন্ধ করেছেন, এদিকে পকেটে একবেলা খাবার মত পয়সা আছে কিনা সন্দেহ! আমার ত মনে হয়, বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবার আসল কারণটা স্থভদ্রবাবু যা ভেবেছেন তা মোটে নয়ই। কলহটা উপলক্ষ্য, স্থভদ্রবাবুর ওপর ভার হয়ে থাকতে চাননি, সেইটেই আসল কথা। ওঁর স্বভাব জানতে আমার ত বাকী নেই?"

স্থলতা কহিলেন, "কিন্তু স্বভাব জেনেই বা তুই এখন করবি কি?"

বীণা কহিল, "সেইজন্যেই ত এসেছি তোমাদের কাছে। কাজের চেষ্টা করছিলেন, অবিশ্যি স্থবিধে কিছু হয়নি। সেদিক্‌কার সমস্যাটা মিটলে এসব পাগলামি নিশ্চয় কতকটা সেরে যায়। বাবা অনেক দিন থেকে তাঁর কাজকর্ম্ম বুঝে নেবার জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। আমি এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসছি, অজয়বাবুকে নিতে তিনি রাজি হয়েছেন।"

স্থলতার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "যাক, এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "খুব ভাল সম্বাদ। আপনার বাবার কাজকর্ম্ম বলতে নিতান্ত চারটিখানি বোঝায় না ত, অজয়বাবুর জোর কপাল :বলতে হবে। শুনে খুসী হওয়া গেল।"

বীণা কহিল, "আপনি খুসী হয়ে ত আমার সব হবে। খুসী যার হওয়া দরকার তার কাছে খবরটা পাঠাই কেমন ক'রে বলুন ত?"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "কিছু ভাবতে হবে না, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এমন

জায়গাই নয় যে বেশীদিন অজ্ঞাতবাস চলবে। তার ওপর আবার যে পৃথিবীতে আপনি রয়েছেন। ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন কিছুদিন, নিজে থেকেই খোঁজ পেয়ে যাবেন।"

সুলতা কহিলেন, "বীণা ধৈর্য্য ধ'রে থাকবেন, তাহলেই হয়েছে আর কি।"

বীণা কহিল, "তোমরা ওকে কেউ জানো না সুলতাদি, তাই ওরকম বলছ। আমি সত্যিই একদিনও দেরি করতে চাই না। ডাক্তার চ্যাটাৰ্জ্জী একটু কষ্ট করলে হয়ত উপায় হয়।"

প্রিয়গোপাল বলিলেন, "কি করতে হবে বলুন, খুব খুসী হয়েই করব।"

বীণা বলিল, "পুলিশের সঙ্গে আপনাদের ত নিত্য কারবার। তারাই একমাত্র ওর খোঁজ নিয়ে দিতে পারে। তাদের ব'লে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন?"

প্রিয়গোপাল স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ না কিছু একটা বলো।"

প্রিয়গোপাল আরও একটু ভাবিয়া কহিলেন, "পুলিশ চেষ্টা করলে ওর খোঁজ পায় তা ঠিক, চটপট খোঁজ পাবার উপায়ও ঐ একটাই কেবল আছে। কিন্তু ঐকাজটি আপনাকে আমি করতে দেব না। পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না কিছুতেই।—অকারণে ছেলেটাকে সন্দেহের তলায় ফেলে ওর সমস্ত জীবনটাকেই হয়ত মাটি করা হবে। বাংলাদেশের উঠতি বয়সের ছেলে, পুলিশের সংস্পর্শে যত কম আসে ততই ভাল।"

কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লালবাজার হাজতের দরজায় দাঁড়াইয়া পুলিশের একজন দারোগা ডাকিতেছে, "অজয়কুমার রায়।...অজয়কুমার রায় কার নাম?"

কম্বলের বিছানা ছাড়িয়া অজয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল, কহিল, "আমার নাম।"

দারোগা কহিল, "আসুন আমার সঙ্গে।"

অজয় মন্ত্রচালিতের মত তাহার অনুসরণ করিল।

সুভদ্রের বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবার পর হইতে সুরু করিয়া ষোলো-সতেরো ঘণ্টায় যে-অধ্যায়ের শেষ, বিকালেই তাহার অনেক কথা অজয়ের স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ কোন কথাকেই মনে রাখিবার মত করিয়া সে মনে রাখে নাই। যেন আর কাহারও জীবনের ঘটনা, তাহাকে জোর করিয়া শোনাইয়া গিয়াছে। শুনিতে সে চাহে নাই।

ট্রাঙ্ক আর সুটকেস বৌবাজারের মেসের ম্যানেজারের জিম্মায় রাখিয়া সে কেবল বিছানাটি লইয়া হাওড়ায় রাত্রিবাস করিতে গিয়াছিল, এটা বেশ পরিষ্কার মনে আছে। অন্যত্র স্থানাভাব ঘটিলে ষ্টেশনে কিছুকালের মত আশ্রয় পাওয়া সম্ভব, এ শিক্ষা তাহার নন্দের নিকট হইতে পাওয়া। প্রথমে শিয়ালদহের কথাই মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সেদিকে সে গেল না। সম্ভবতঃ শিয়ালদহের সঙ্গে নন্দের নির্য্যাতনের স্মৃতি একসঙ্গে হইয়া জড়াইয়া গিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশনের জনাকীর্ণ ধূলিময় এককোণে বিছানা নামাইয়া সে কুলি বিদায় করিল। কিন্তু কে কি মনে করিবে ভাবিয়া বিছানাটাকে ভাল করিয়া পাতিয়া গুছাইয়া বসিতে তাহার ভয় করিতেছে।

হয়ত কেহ জানিতে চাহিবে, মশাই কদ্দূর যাবেন? তখন সে কি উত্তর দিবে? যদি বলে আগ্রা, কি দিল্লী, কি এলাহাবাদ, হয়ত প্রশ্ন হইবে, সেখানে কি করা হয়? যদি বলে, এমনি যাচ্ছি বেড়াতে, হয়ত শুনিতে হইবে, ভালই হল আপনাকে সঙ্গে পাওয়া গেল, বেশ যাওয়া যাবে গল্প করতে করতে। কিম্বা, আগ্রার ট্রেনের ত আর দেরি নেই মশায়, টিকিট করা হয়েছে আপনার? অবস্থাটা কল্পনা করিয়াই অজয় ঘামিয়া উঠিল। বিছানাটা যেন তাহার নয় এমনই ভাবে দূরে দূরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ এক সময় কোথা দিয়া যে কি ঘটিল, সত্যই তাহার ভাল করিয়া মনে নাই। অন্যদের সঙ্গে সেও পলাইতে পারিত, কিন্তু জীবনে সেই

প্রথম কি এক গভীর উন্মাদনা তাহাকে পাইয়া বসিল, সে পলাইল না। ঠায় দাঁড়াইয়া মার খাইল এবং আরও কয়েকটি যুবকের সঙ্গে ধরা পড়িল।

অতঃপর বহুলোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া পথ। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। দুপাশের বাড়ীর বারান্দার চিকের আড়াল হইতে মাড়োয়ারী সুন্দরীদের কঙ্কন-সমাবৃত হস্তের লাজবৃষ্টি।··অজয় মাথা নত করিয়া চলিয়াছে। গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছে না ত!

জোড়াসাঁকোর থানা। সেইখানে প্রথমে সে নন্দকে দেখিল। নন্দও হাওড়ায় গিয়াছিল, অন্যদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। পলাইতে চেষ্টা সে করিয়াছিল, অসুস্থ শরীরে ছুটিতে পারে নাই। অজয়ের পায়ের ধূলা লইয়া নন্দ প্রণাম করিল।··· ধীরে অজয়ের আত্মস্থতা ফিরিয়া আসিতেছে।···কিন্তু কি একটা তুচ্ছ কারণে পুলিশের একজন লোক অজয়কে কঠোর কটূক্তি করিয়া উঠিল, চকিতে অজয় নন্দের মুখের দিকে একবার তাকাইল,—না, তাহার পর জোড়াসাঁকোর কথা সত্যই অজয়ের মনে নাই।

তারপর রাত নটা সাড়ে-নটায় লালবাজার। এবারে কালো কয়েদী গাড়ীতে চড়িয়া তাহাদের যাত্রা। লালবাজার হাজতে গভীর রাত্রিতে মুড়ি খাইয়াছিল মনে আছে। হাজতে সেদিন বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী যুবকের ভিড়, তাহাদের প্রায় সকলেরই মাথায় গান্ধীটুপি। চীৎকার করিয়া তাহারা ঘর ফাটাইতেছে। যথারীতি সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া একপালা কংগ্রেসের বৈঠক হইল। দরজার তারের জালে মুড়ি গুঁজিয়া গুঁজিয়া কে একজন নাগরী হরপে গান্ধীকি জয় লিখিয়া দিল। অতঃপর বহুকণ্ঠের মিলিত জয়ধ্বনি, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়, মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" অজয় এই জয়ধ্বনির সঙ্গে প্রাণপণে নিজের মনের কণ্ঠ মিলাইতেছে, কিন্তু মুখ খুলিতে তাহার ভারি লজ্জা। দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া স্তব্ধ নিঃস্পন্দ হইয়া সে বসিয়াছে। তাহাকে লইয়া ক্রমে আশেপাশে

নানাপ্রকার মন্তব্যের গুঞ্জন। কে একজন তাহার সঙ্গীকে বুঝাইতেছে, লোকটা বাঙালী, গান্ধীর নাম মুখে আনিবে না, দেশবন্ধুর জয় বলিলে এখনই গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিবে।

দুতলার হাজতঘর হইতে নামিয়া দারোগার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অজয় একতলার একটা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ছোট একটি টেবিল সম্মুখে করিয়া বসিয়া বিশালকায় একজন সাহেব কর্ম্মচারী। দুইজন সার্জ্জেণ্ট ত্রস্তপদে এধার-ওধার টহলাইয়া বেড়াইতেছে। দৈত্যপুরীতে প্রহ্লাদের মত, সঙ্গের বাঙালী দারোগাটিকে অজয়ের মনে হইল যেন তাহার কতকালের বন্ধু, পরমাত্মীয়। লোকটিকে সহসা সে ভালবাসিল। অজয়কে যেমনভাবে যাহা সে করিতে বলিল; পরম নির্ভরের সঙ্গে নির্ব্বিচারে সে তাহা করিয়া গেল। কি একটা কাগজে সহি দিল, এইটুকু তাহার মনে আছে। তারপর মুক্তি!

দারোগার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ইহার পর কি তাহার করা কর্ত্তব্য ভাবিতেছে, অকস্মাৎ পাশ হইতে কে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "অজয়দা—।" দেখিল, নন্দও আসিয়া জুটিয়াছে।

নন্দ কহিল, "কোথায় যাবেন এখন, বাড়ী?"

অজয় কহিল, "না, সে-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

নন্দ কহিল, "সে কি, কেন?"

অজয় সত্য বলিতেছে মনে করিয়াই বলিল, "সেখানে খরচ বড্ড বেশী।"

অত্যন্ত অবাক্ হইয়া নন্দ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজয়কে তাহার অন্তরের যে স্বর্গলোকে সে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোনও পার্থিবতার কিছুমাত্র সংস্পর্শ ছিল না। অজয়কেও যে টাকাকড়ির ভাবনা ভাবিতে হয় এই আকস্মিক উদ্ভাবনা তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার বিষাদ-করুণ চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেননি?"

অজয় বলিল, "বিছানাটা হাওড়া ষ্টেশনে প'ড়ে আছে। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস বৌবাজারের মেসে। সম্প্রতি সেগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভব কিনা দেখতে যাব। ফিরে এসে বাড়ীর খোঁজ করব।"

নন্দ কহিল, "বিছানাটা কি আর আছে এতদিন? চলুন তবুও একবার দেখা যাক।"

দেখা গেল, বিছানা অজয় যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল সেখানে নাই বটে, কিন্তু বহুদূরে একটা কোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। টানাটানি করিয়া বিছানাটাকে নন্দ কাঁধে তুলিয়া লইল, অজয় মুটে ডাকিতে চাহিল, কিছুতেই শুনিল না। দুইজনে বাহির হইয়া আসিয়া একটা বাসে উঠিল। অজয় কহিল, "কোথায় যাচ্ছি ঠিক না ক'রে আগে-ভাগেই ত বাসে চ'ড়ে বসা গেল।"

নন্দ বলিল, "আপনার যদি কিছু আপত্তি না থাকে, আগে আমার ওখানে চলুন। শেয়ালদার খুব কাছেই একটা গলিতে আমি থাকি। পরে বৌবাজারে ট্রাঙ্ক স্যুটকেস আনতে যাওয়া যাবে।"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে অজয় অত্যন্ত আরাম অনুভব করিল। এতক্ষণ মন্ত্রচালিতের মত চলিতেছিল, সে চলা এখনই অন্ততঃ ব্যাহত হইবে না। তাহার হইয়া সমস্ত ভাবনা আর-কেহ ভাবিয়া দিতেছে এই অবস্থাটাই আসলে তাহার ভাল লাগে। বলিল, "তাই চল যাচ্ছি। বিছানার মোট কাঁধে ক'রে আর কাহাঁতক ঘুরে বেড়াবে?"

অত্যন্ত অপরিসর একটা গলি, বৌবাজার হইতে বাহির হইয়া এধার ওধার শীর্ণতর দুই একটা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু-পুরাতন ও জীর্ণ একটা বড় বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া শেষ হইয়াছে। দেখিলে হঠাৎ মনে হয় না যে সেখানে মানুষ বাস করে। আশেপাশের সমস্ত বাড়ীগুলি যেন বিরাগবশতঃই ইহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেয়ালে বহু বৎসর আগে সখ করিয়া কেহ লাল রঙ ধরাইয়াছিল, এখন সে রঙ প্রায় মিশিদেওয়া দাঁতের

মত কালো হইয়া আসিয়াছে। দুতলা বাড়ী, লোহার গরাদে দেওয়া খিলান করা সরু সরু দরজা জানালা। চার কোণে চারিটি ছোট গম্বুজ, সব-ক'টাকেই আগাছার ঝাড় বেড়িয়া ধরিয়াছে। সম্মুখের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেয়াল দিয়া ঘেরা, সেখানেও মনের আনন্দে আগাছা জন্মাইয়াছে। আগাছার বন অতিক্রম করিয়াই একতলার লম্বা সরু বারান্দা। সারি সারি সব-ক'টা দরজাতেই তালা দেওয়া, সব চেয়ে ছোট দরজাটার তালা খুলিয়া "আসুন" বলিয়া নন্দ ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট ঘরটির সেই একটি দরজা ছাড়া আর সব-ক'টা দরজা জানালাই মোটা লোহার গরাদে দিয়া বন্ধ করা, হঠাৎ ঢুকিয়াই মনে হয় কয়েদখানায় ঢুকিলাম। একপাশে ছোট একটি তক্তপোষের উপর ময়লা একটা বিছানা পাতা, শিয়রের দিকে একটা মস্ত কেরাসিন কাঠের বাক্সকে কাৎ করিয়া ফেলিয়া নন্দ টেবিল তৈয়ারী করিয়াছে। টেবিলের একপাশে মাটির সরায় মাটির পিলসুজে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। আর-একপাশে খান-পাঁচ-সাত কলেজপাঠ্য কেতাব। বিছানার উল্টা দিকে চুণ-বালির ছোপ লাগানো একটি ছোট চৌকির উপর জলের কুঁজা, একটা উপুড়-করা কাঁসার গেলাসে তাহার মুখ ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

অজয়ের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া নন্দ স্মিতমুখে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "স্নান ক'রে বেরুবেন?"

অজয় কহিল, "হ্যাঁ, স্নান সেরেও বেরুতে পারি।" লালবাজারে এই ক'দিনে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এখন ভাবিতে লাগিল, সেইখানে থাকিয়া যাইতে পারিলেই ভাল ছিল, কোনও গোল থাকিত না। ইহার পর কি সে করিবে, কোথায় যাইবে, নিঃসম্বল মানুষকে কে কোথায় আশ্রয় দিবে? ভাবিতেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইতেছে।

নন্দ তাহার স্নানের জোগাড়ে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই তাহাকে থামাইয়া

দিয়া কহিল, "সেজন্যে এত ব্যস্ত হবার এখনই কিছু দরকার নেই, ঢের সময় আছে। বোসো, তোমার সব খবর আগে শুনি।"

ঘরে বসিবার আসবাব কিছু ছিল না, অজয় বিছানায় বসিয়াছিল, নন্দ তাহার পাশে বসিতে অত্যন্ত ইতস্তত: করিতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে বিছানায় বসাইয়া অজয় কেরাসিন কাঠের বাক্সটার উপর চড়িয়া বসিল। কহিল, "কেমন আছে?"

"মন্দ আর কি?"

"কাশিটা আর হয় না ত?"

"বিশেষ না।"

অজয় সত্যই খুসী হইল, কহিল, "খুব ভাল খবর। আমি কতদিন তোমার কথা ভেবেছি, কিন্তু তোমার ঠিকানা চেষ্টা করলেও যে জানতে পারা যেত না।"

"এক জায়গায় খোঁজ করলে খুব সহজে জানতে পারতেন।"

"কোথায়?"

"পুলিশে।"

"তারা এখনো তোমায় জ্বালায়?"

"জ্বালোনো আর কি? খোঁজ খবর করে।"

"সে যাক—এখনো পড়ছ?"

"আর চোদ্দদিন পর পরীক্ষা।"

"পড়াশোনা কেমন করেছ?"

"ভালই মোটের ওপর। অসুখের ভয়ে বেশী মেহনৎ করতে ভয় করে, নয়ত আর একটু ভাল হ'ত।"

"চলছে কি ক'রে?"

"টুইশানিটা ত আছে।"

"তাইতেই চলে? দশটা ত মোটে টাকা।"

"বাড়ীভাড়া লাগে না, কলেজের মাইনে দিতে হয় না, খাওয়া-দাওয়া করতে যা লাগে আর বই খাতা পেন্সিলের খরচ।"

"তোমার ঐ শরীরে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া হওয়া দরকার।"

নন্দ মৃদু হাসিল। পেট ভরিয়া আহার করিতে পারিবার উপর কাহারও যে কোন দাবী থাকিতে পারে ইহা যেন নিতান্তই অবান্তর প্রসঙ্গ।

অজয় বলিল, "বাড়ীভাড়া লাগে না বলছ, সে কিরকম ক'রে হয়?"

নন্দ বলিল, "বাড়ীটা প'ড়েই ছিল, পুরনো ব'লেও বটে আর ভূতের বাড়ী ব'লেও বটে, কেউ এটা ভাড়া নিতে চায় না। বাড়ীওয়ালারা মস্ত লোক, পরোয়া করে না, এটাকে তাদের গুদাম ক'রে রেখে দিয়েছে। আমি ব'লে কয়ে এই ঘরটা নিয়েছি। তারাও বিনি-পয়সায় একজন চৌকিদার পেয়ে খুসীই হয়েছে মনে হয়।"

স্নান সমাধা হইতেই নন্দ বলিয়া বসিল, "খেতে যাবেন চলুন।" অজয়কে হঠাৎ এই অবস্থায় এতটা কাছে পাইয়া ক্রমে তাহার সাহস বাড়িতেছিল। অন্য সময় এই কথাটুকু বলিতে অনেক কাঁচুমাচু করিত।

অজয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া নন্দের সাহস একেবারেই উবিয়া গেল। বলিল, "আপনার ভাল না লাগে ত দরকার নেই… আমি পাশেই একটা হোটেলে খাই। ভালই হোটেল, তাই ভেবেছিলাম হয়ত আপনার অসুবিধা নাও হতে পারে।"

অজয় বলিল, "নন্দ, কাছে এসো।…হোটেলে কত ক'রে দিতে হয়?"

নন্দ বলিল, "তিনরকম আছে, দু আনা, তিন আনা আর পাঁচ আনা।"

"দু আনাতে কি-কি দেয়?"

"ভাত, ডাল আর মাছের কাঁটার চচ্চড়ি। ভাত-ডাল খুব অনেকখানি ক'রে দেয়।"

তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া অজয় বলিল, "তুমি দু আনাতেই খাও?"

"হ্যাঁ।"

"দুবেলা খাও ?"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া রহিল।

অজয় আবারও কহিল, "একবেলাও রোজ খেতে পাও না। বালিগঞ্জে ছেলে পড়াতে যেতে হয়, এতটা পথ অসুস্থ শরীরে রোজ হাঁটা সম্ভব হয় না, খাবারের পয়সা বাস ভাড়া দিতে খরচ হয়ে যায়, এই ত ?"

নন্দের হঠাৎ আজ কি হইল, মাথাটাকে আরও নীচু করিতে করিতে কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিল।

অজয় বলিল, "না নন্দ, ওইটি চলবে না। কাঁদতে সুরু কর যদি তাহলে এখনই আবার মুটে ডেকে বিছানাপত্র নিয়ে চ'লে যাব।"

যেমন অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমনই অকস্মাৎ নন্দ চুপ করিয়া গেল। চোখ মুছিয়া যখন তাকাইল, অজয় দেখিল, তাহার মুখের স্বাভাবিক বিষণ্ণতারও অনেকখানিকে সেইসঙ্গে সে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

তাহাকে জোর করিয়া পাশে বসাইয়া অজয় বলিল, "শোনো নন্দ। আমার অবস্থাটা তোমার চেয়ে কিছু বিশেষ ভাল নয়, অন্ততঃ এমন নয় যে আমার দ্বারা তোমার কোনও সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তোমার একটি সাহায্য আমি নেব। আমি তোমার সঙ্গে এইখানেই থাকব যদি তাতে তোমার কিছু আপত্তি না থাকে।"

নন্দ প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার আপত্তি থাকবে ? কি বলছেন আপনি, বা রে !"

অজয় বলিল, "কিন্তু তার আগে আমাদের দুইজনকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নিজে থেকে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবার কোনও চেষ্টাই কখনো করব না। চেষ্টা করলেও পারব না, সেটাও একটা কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ সেটা নয়। তুমি একবেলা খাচ্ছ কি দুবেলা খাচ্ছ কিম্বা একেবারেই খাচ্ছ না, আমি আর তা জানতে চাইব না। তুমিও চাইবে না।"

নন্দ কতকটা বুঝিতে পারিল, কতকটা পারিল না, কহিল, "যদি একজন কারও অসুখবিসুখ করে?"

অজয় কহিল, "তাহলে তাকে দেখা না দেখা সম্পূর্ণ অপরের ইচ্ছাসাপেক্ষ। কারও ওপর কোনো দায় থাকবে না। রাজি?"

নন্দ মাথা নাড়িয়া জানাইল, রাজি। কিন্তু তাহার মুখটি আবার অন্ধকারে ছাইয়া গেল।

অজয় বলিল, "আর আমি যে এখানে রয়েছি সে খবর কাউকে তুমি দেবে না, তার আভাস মাত্র বাইরে কোথাও তোমার কোনো কথায় প্রকাশ পাবে না।"

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, তিনটাকা এগারো আনা রহিয়াছে। কহিল, "তুমি খেতে যাও, আমি সুবিধা মত পরে যাব।"

২৩

বিকালে কলেজের কাপড় না ছাড়িয়াই ঐন্দ্রিলা বীণাকে আসিয়া বলিল, "দিদি, চল একবার সুলতাদির কাছ থেকে হয়ে আসি। নিজের ইচ্ছেয় একদিনও যাই না ব'লে উঠতে বসতে তিনি আমায় কথা শোনান্, আজ তোমাকেই আমি ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।"

বীণা কহিল, "মোটে ত পাঁচটা, এত আগে গিয়ে কি করব? সাতটার আগে কেউ আসবে না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কারুর আসা ত চাই না, সুলতাদি থাকলেই হ'ল।"

সমস্তটা দিন কেন তাহার এত ছটফট করিয়া কাটিয়াছে সে জানে না। কোনও উপায়ে মনের এই অস্থিরতা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়। কি জানি কেন তাহার মনে হইতেছে, সুলতার কাছে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিতে পারিলে

অনেকখানি শান্তি ফিরিয়া পাইবে। কলজে বসিয়া বারবার স্থলতাকে সে আজ ভাবিয়াছে।

সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ছয়টা বাজিয়া গেল। কিন্তু স্থলতাদের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, তখন অবধি ক্লাবের মেম্বাররা কেহ আসে নাই। স্থলতা হলের এককোণে একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছেন, পাখাটার কিছু-একটা দোষ হইয়াছে, একটা টিপয়ের উপর সাবধানে নিজের ভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া রমাপ্রসাদ সেটা সারাইবার চেষ্টা করিতেছে। বীণাদের আসিতে দেখিয়াই স্থলতা সেলাই তুলিয়া রাখিয়া আসিলেন। রমাপ্রসাদ উচ্চাসন ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। কহিল, "বীণা দেবী এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে।—আমাদের বইটা শেষ অবধি বোধহয় বদলাতেই হবে, সব পার্টের জন্যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অপর্ণা যিনি করছিলেন, আজ স্থলতা দেবীকে চিঠি লিখেছেন, তাঁর বাড়ীর লোকদের ভয়ানক আপত্তি, তিনি আর আসতে পারবেন না।"

বীণা কহিল, "একেবারেই কোনো লোকের দরকার হয় না এমন একখানা বই এবারে আপনি লিখে ফেলুন, ষ্টেজ ক'রে দেবার সব ভার আমি নেব। নেপথ্য থেকে সব দেবতারা দৈববাণী করছেন, এই ধরণের একটা কিছু।"

বীণা ও স্থলতার সেদিন পরস্পরকে অনেক কথা বলিবার এবং পরস্পরের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিবার আছে। নিভৃতে ছাড়া তাহা হইবার নহে। রমাপ্রসাদকে ডাকিয়া স্থলতা কহিলেন, "বইয়ের ব্যবস্থা ঠিক হবে, আপনি ভাববেন না, সম্প্রতি পাখাটার একটা গতি করুন। আগে যাও বা খট্‌খট্‌ ক'রে ঘুরছিল, আপনি হাত লাগানোতে তাও ত আর ঘুরছে না। একটা মিস্ত্রি কোথাও থেকে ধ'রে আনুন।"

অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া রমাপ্রসাদ চলিয়া গেলে স্থলতা হাসিয়া উঠিলেন, বীণা-ঐন্দ্রিলা সেই হাসিতে যোগ দিল। স্থলতা কহিলেন, "সত্যি বলছি ভাই, চল্‌ শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা ক্লাব করা যাক। আর ভাল লাগে না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "চ্যাটার্জ্জি-সাহেবের ওপর শোধ তোলবার জন্যে বুঝি ?"

সুলতা কহিলেন, "তা বেশ ত, শোধ কেন নেব না ?"

বীণা কহিল, "কোথায় গেলেন তোমার বীরপুরুষ ?"

সুলতা কহিলেন, "কোথায় আবার, ব্রিজের আড্ডায়।"

বীণা কহিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে, তোমার হয়ে এবিষয়ে সব ব্যবস্থা ত আমার ক'রে দেবার কথা। রাজি আছ আমার পরামর্শ মতো চলতে ?"

সুলতা কহিলেন, "তোকে বাপু কথা দিতে ভয় করে। কি করতে হবে শুনি ? রমাপ্রসাদের সঙ্গে প্রেম ক'রে jealous ক'রে তুলতে হবে ?"

বীণা কহিল, "পাগল, ওধরণের কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না, তা আমি জানি।"

ঐন্দ্রিলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা আবার রমাপ্রসাদ। বেচারা !"

বীণা কহিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলছি। ভদ্রলোক ভয়ানক ব্রিজ ভালবাসেন ?"

"সেইরকমই ত মনে হয়।"

"তা এর খুব সহজ উপায় রয়েছে। তোমাকে অনেকদিনই বলব ভাবছি। নিজে খেলাটা শিখে নাও। তারপর তোমাদের দুজনেরই ভাল লাগে এমনতর বন্ধুবান্ধব দুএকজনকে ডেকো। কর্ত্তাও বাড়ী থাকবেন, তোমারও সময় কাটবে ভাল।"

সুলতা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কথাটা ভাল বলেছিস্। তুই জানিস খেলতে ? দিবি শিখিয়ে ?"

বীণা কহিল, "দেব না শুধু, ভদ্রলোক পাকাপাকি রকম ঘরমুখো না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে রোজ এসে খেলব।"

ইহার পর সুলতা অজয়ের প্রসঙ্গ তুলিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মিস্ত্রি লইয়া রমাপ্রসাদ ফিরিয়া আসিল, তাহাদের পিছনে মস্ত একটা মই কাঁধে করিয়া কুলি আসিল। সেদিনকার মত গল্প জমিবার কোনও সম্ভাবনা আর রহিল না।

সাড়ে-সাতটায় সুভদ্র আসিল। বিমানও সঙ্গে আসিয়াছে। দূর হইতেই বীণাকে দেখিয়াই সুভদ্র বুঝিতে পারিল, তাহার কমনীয় মনটির উপর দিয়া কি নিদারুণ ঝড় বহিয়া যাইতেছে, ভয়ে অগ্রসর হইয়া গিয়া অন্যদিনের মত কুশল জিজ্ঞাসাও করিল না। কয়েকটি নূতন মেম্বার জুটাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের লইয়াই ব্যস্ত রহিল। অভিনয়ের অক্ষম আয়োজন চলিতে লাগিল, এক রমাপ্রসাদ ভিন্ন অপর কাহারও কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ পাইল না।

কিছুক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া বীণা উঠিয়া পড়িল। সুভদ্রের পাশ ঘেঁসিয়া গাড়ীবারান্দার ছাতে যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে বলিয়া গেল, "একটু শুনুন।"

সুভদ্র বাহির হইয়া আসিলে কহিল, "কিছু খবর পেলেন?"

"না।"

"খবর পাবার আর আশা আছে কিছু?"

"যথাসাধ্য ত চেষ্টা ক'রে দেখেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ!"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে বীণার সান্ত্বনার্থ কিছু একটা বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় রমাপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া সুভদ্রকে সংবাদ দিল, "বিমানবাবু কি চমৎকার রাজার পার্ট করছেন দেখবেন আসুন। উনি এত ভাল করতে পারেন, আমরা কেউ জানতাম না ত!"

বীণা দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "আমি বাড়ী যাচ্ছি, ঐন্দ্রিলাকে দয়া ক'রে ব'লে দেবেন।"

তাহাকে বাধা দেয়, বহু চেষ্টাতেও এতটা কঠিন সুভদ্র নিজেকে করিতে পারিল না। বীণা যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল, তাহা কেহই প্রায় লক্ষ্য করিল না, যাহারা করিল তাহারাও বুঝিতে পারিল না যে সে চলিয়া যাইতেছে।

সেদিনকার মত রিহার্সাল চালাইয়া দিবার জন্য বিমান রাজার পার্টে

নামিয়াছিল, কিন্তু তাহার অভিনয়ে সকলে বিস্মিত, মুগ্ধ। সমস্বরে দাবী করিতে লাগিল, "আপনাকে আমরা চাইই, 'না' বললে কিছুতেই শুনব না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "নামুন না, বিমানবাবু। সকলে এত ক'রে বলছে। সত্যিই ত আপনি বেশ ভাল অভিনয় করেন।"

সুলতা কহিলেন, "রাণীর পার্ট নিয়ে তুই নামবি?"

সকলে আবার সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তাহলে ত বেশ হয়, খুব ভাল হয়।"

বীণার কাহাকেও কিছু না বলিয়া-কহিয়া হঠাৎ বাড়ী চলিয়া যাওয়া ঐন্দ্রিলা লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া আছে। এই-সব প্রেমে-পড়া-পড়ি ব্যাপারগুলি এমনিতেই সে সহিতে পারে না, তাহার উপর সেগুলি কি হাটের মধ্যে ঢাক পিটাইয়া লোক-জানাজানি করিয়া না করিলেই নয়? তাহা ছাড়া অন্যদের কথাও ত একটু ভাবিতে হয়? সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতেছে, উহার মধ্যে নিজের দুঃখটাকেই বড় করিয়া এমন সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবহার করাটা নিছক স্বার্থপরতা।

রমাপ্রসাদ কহিল, "কি বলেন, রাজি?"

মুহূর্ত্তে মনকে প্রস্তুত করিয়া সে কহিল, "দেখতে পারি চেষ্টা ক'রে।"

রিহার্সাল সত্যই ইহার পর সেদিন জমিল ভাল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলের অজস্র প্রশংসা কুড়াইয়া ঐন্দ্রিলা যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য বাহিরে আসিল, তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল। মনের অস্থিরতাটা সত্যই আজ অপ্রত্যাশিত উপায়ে কাটিয়া গিয়াছে। সুভদ্র সুখী হইয়াছে, তাহার বক্তৃতা আজ থামিতে চাহিতেছে না। সকলের উৎসাহগুঞ্জনের মধ্যে দাঁড়াইয়া অজয়ের আজিকার অনুপস্থিতিকেও ঐন্দ্রিলা অতিবড় স্বার্থপরতার রূপে দেখিল। ভাবিল, অজয় সেই ধরণের মানুষ যাহারা অপরকে আনন্দ করিতে দেখিলে কাতর হয়, পাছে সেই আনন্দের ভাণ্ডারে নিজেকেও কিছু দান করিয়া ফেলিতে হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া দূরে

থাকে। এমন মানুষকেও ভাল লাগিয়াছিল ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বাহিরে মেঘ করিয়া আসিতেছে, আসন্ন দুর্য্যোগের রাত্রি। সকলের সঙ্গে স্থলতাও নীচে আসিয়াছিলেন, ঐন্দ্রিলাকে বলিলেন, "তোর সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি। বীণাটা হঠাৎ মাঝখানে উঠে চ'লে গেল, কিছু ব'লে সুদ্ধ গেল না। একটু খবর নেওয়া উচিত।"

বালিগঞ্জের মাঠের পথ ধরিতে-না-ধরিতে মহা আড়ম্বরে বৃষ্টি। দম্‌কা হাওয়ার দাপটে পাশের দেবদারু গাছের সারি অস্থির বিপর্য্যস্ত। আর্স্কিন সেডান্‌কে যেন সাবধানে পা টিপিয়া পথ চলিতে হইতেছে। পথের মোড় ফিরিয়া যেখান হইতে তাহাদের বাড়ী প্রথম চোখে পড়ে, সেইখানে আসিয়া নিজের অজ্ঞাতেই ঐন্দ্রিলা দূরে মাঠের মাঝখানে, যেখানে ঘনতরুসন্নিবেশের নীচে আজও হয়ত রাশি রাশি চাঁপাফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। চোখ ফিরাইতেই চকিত বিদ্যুতের আলোয় মনে হইল, অজয়। যেন পলকের মত পথপার্শ্বের একটা দেবদারু গাছের আড়ালে তাহাকে দেখিল, সিক্ত পরিচ্ছদ শীর্ণ দেহে লিপ্ত হইয়া আছে, চুলগুলি জলধারার সঙ্গে মুখচোখের উপর গড়াইতেছে। ভয়-বেদনাতুর মুখ, আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টি, কিছুই তাহার চোখ এড়াইল না। গাড়ী পলক ফেলিতে সরিয়া আসিল, ঐন্দ্রিলা পশ্চাতের কাচের জানালায় একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আজ ভয় হইল না, আজ তাহার দয়া হইল। দুর্য্যোগ-ঘনরাত্রি, জনহীন পথ, পথচারী নিরাশ্রয় হতভাগ্যের জন্য তাহার নারীহৃদয় গভীর বেদনায় মোচড দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিল, গাড়ী থামাইতে বলে, নামিয়া গিয়া খোঁজ লয়, কিন্তু পাশে স্থলতা রহিয়াছেন, কোথা হইতে দুস্তর লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। এ লজ্জা নিজের জন্য তত নহে, অন্য মানুষটির জন্য যত। যে নিজেকে এত করিয়া লুকাইতেছে, তাহাকে প্রাণ ধরিয়া সে সকলের কাছে ধরাইয়া দিতে পারিল না।

স্থলতা কহিলেন "কি রে, ইলু?"

উত্তর দিল, "কিছু না।"

বাড়ীর দরজায় গাড়ী পৌছিলে স্থলতাকে রান্নাঘরে বীণার কাছে পৌছাইয়া তিনতলার বারান্দার এককোণে প্রস্তরমূর্ত্তির মত অনিমেষ দৃষ্টিতে সুদূরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির ছাঁটে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপ-মাত্র করিল না। যাহার সন্ধান এত করিয়া কেহ পাইতেছে না, সে হয়ত এখনও ঐ তরুবীথির নীচেকার পথ ছাড়াইয়া যায় নাই। এখনও হয়ত প্রাণপণ জোরে চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে শুনিতে পায়, তবু সে কত দূরে! শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া বহিয়া গিয়াছে, কতকালে ফিরিবে কে জানে? কখনও ফিরিবে কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? ও যা মানুষ, হয়ত চিরকালের মত শেষ দেখা দিয়া এবং শেষ দেখা দেখিয়া গেল, দৃপ্ত-ঐন্দ্রিলার, অকুতোভয় ঐন্দ্রিলার মনে এই চিন্তাও আজ জাগিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা!' ···বাহিরের এবং ভিতরের সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া এ কি ক্রন্দনের সুর!···প্রাসাদের মত এই বাড়ীতে কত ঘরের দরজা বৎসরে একবার খোলা হয় না, আর একটা মানুষ ঝড়ের মুখে জীর্ণপত্রের মত হয়ত আজ পথে পথে ছিট্‌কাইয়া ফিরিতেছে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।··· নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর পৃথিবী।

২৪

অজয়কে বিমান বার বার বলিয়াছে, সমস্যাটা তোমার একলার নয়; মানুষের জীবনের, বিশেষ করিয়া এযুগের সভ্য মানুষের জীবনের অধিকাংশ সমস্যাই কোনও না-কোনও রূপে সমষ্টিগত সমস্যা। কিন্তু বিমানের কথা অজয় শুনিত মাত্রই, শ্রদ্ধা করিয়া শুনিত না। তদুপরি নিজের পুরুষকারে তাহার অপরিসীম

নির্ভর। নিজের বাহিরে আর যাহা-কিছু, তাহারই ত অপর নাম দৈব। সমষ্টিগত কর্ম্মফলকেও সে দৈবেরই নামান্তর বলিয়া জানে। সুতরাং একলার মনে করিয়াই তাহার জীবনের সমস্ত সংশয় সমস্যার সঙ্গে সে সংগ্রাম করিতে নামিয়াছে।

প্রথমেই তাহার দৈহিক অসম্পূর্ণতা। এই ক'দিনেই শরীর যেন আরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শ্রম না করিয়াই শ্রান্তি, আহার নাই অপরিপাক আছে। নন্দ তাহার পরিচিত এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, অজয় ডাক্তারের কাছে যাইতে অপমান বোধ করে। তাহার অস্বাস্থ্য তাহার লজ্জা, ইহাকে প্রচার করিয়া বেড়াইতে তাহার আপত্তি। সুভদ্র বন্ধু মানুষ, নিজে হইতে অজয়ের চিকিৎসার ভার হাতে লইয়াছিল, তাহার পাঁচনে তিক্ততা ছিল, অগৌরব ছিল না! নন্দকে এত কথা সে বলে নাই, বলিয়াছে সমস্ত অস্বাস্থ্যের প্রতিকার অনায়াসে এবং বিনা চিকিৎসাতে করিতে পারে, প্রতি মানুষই সেই গভীর শক্তিতে শক্তিমান্, নিজের মধ্যে সেই শক্তির উৎসমূল আমি খুঁজিয়া বাহির করিব, ইহাই আমার সাধনা। নতুবা মনুষ্যত্বের দুরূহতর পরীক্ষাগুলিতে আমি উত্তীর্ণ হইব কেমন করিয়া ?

বিমান কাছে থাকিলে বলিত, 'তুমি ভারতবর্ষের মানুষ, তোমার এধরণের সব spiritualityর মূলে আছে তোমার মজ্জাগত আলস্য। সবকিছুকে তুমি সহজ করতে চাও।' বিমানের কথা এখন না ভাবিলেও চলে। অজয়ের জগতে এখন একমাত্র মানুষ নন্দ, তাহাকে লইয়া কোনও গোল নাই। অহেতুক শ্রদ্ধা জিনিষটা নন্দ তাহার পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। অজয় শ্রদ্ধেয়, অজয় প্রণম্য, ইহা স্থির করিয়াই সে সুরু করিয়াছিল, সুতরাং অতঃপর তাহার মধ্যে যাহা-কিছু অপরিস্ফুট, যাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য দেখিত, তাহাকেই অনন্যসাধারণ জ্ঞান করিয়া ভক্তিতে আনন্দে অপ্লুত হইয়া যাইত।

অজয়ের সঙ্গে কোনদিন কোন কিছু লইয়া সে তর্ক করিত না, তর্কটা অজয়ের হইয়া মনে মনে নিজের সঙ্গে করিত।

স্বভাবের ভয়-প্রবণতা লইয়াও অজয়ের লজ্জার অবধি ছিল না, নন্দের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়াও কতকটা সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের অঙ্গ। যখন নন্দের খোঁজ করা তাহারই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল তখন বিপদের ভয়ে সে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে, আজ যাচিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া সেই অপরাধ সে ক্ষালন করিতে চায়।

দেশের অতীত ঐতিহ্যের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে কল্পনার দীপবর্ত্তিকা হাতে করিয়া মাঝে মাঝে অভিযান করে। নানা রকম করিয়া দেশের বহুমুখী সমস্যাকে ভাবে, মনে মনে তাহাদের নানা ঐতিহাসিক সমাধান স্থির করে কিন্তু তাহার মন খুশী হয় না। সমস্ত সমস্যার একটি যে সমাধানকে গহনতম অন্ধকারের অতল তলা হইতে অন্তরের আলোয় প্রদীপ্ত করিয়া সে বাহিরে আনিতে চায়, তাহার পথ কোথায়, কতদূরে ?

অন্ধকারের পথে, সংগ্রামের পথে বেশীদূর অগ্রসর হইবার মত জোর অজয় কিছুতেই মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেমন দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কিছুতেই সাড়া জাগে না। যুগাবতার গান্ধী। ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী সমাহিত তপস্যা তাঁহার দৃষ্টিতে নূতন যুগের আলোয় চোখ মেলিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর ভাষায় যুগযুগান্তের ভারতবর্ষের বাণী তাঁহার উদারকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-অজ্ঞান, সমর্থ-অসমর্থ, সকলকে তাঁহার আহ্বান, এ আহ্বান অজয়ের জন্যই কেবল ন'হ। অজয় কি করিবে, কি সে করিতে পারে ? সত্য এবং অসত্য ব্যবহার, এই উভয়েরই সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক অসহযোগ, সে কর্ম্মহীন অসামাজিক মানুষ। নন্দ বাহির হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া মাঝে মাঝে দু-একটা পুরান খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া আনে, পড়িয়া অজয়ের দুর্ব্বল দেহ গভীর

আবেগে কণ্টকিত হয়। দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে ছাতের উপর দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্‌কার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

দেশের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন, নিজেকে দিয়া অজয় বুঝিতেছে। এ দেশে কতিপয়ের স্বার্থত্যাগ, কতিপয়ের প্রাণদান চিরকালই ব্যর্থ হইবে। এদেশের মানুষ দেখে, শোনে, আলোচনা করে, টেবিল চাপড়ায়, তারপর সব ভুলিয়া যায়। চোখের সম্মুখে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেলেও পাশ কাটাইয়া ইহারা বাড়ী আসে এবং বৈঠকখানার বাতাসকে কণ্ঠস্বরের উদ্দীপনায় ভরিয়া তুলিতে পারিলেই খুসী হয়।

নন্দের পরীক্ষার আর তিন দিন মাত্র বাকী। সমস্ত দিনরাতই প্রায় সে পড়িতেছে। সকালে ভাল করিয়া অন্ধকার না কাটিতেই বালিসটাকে কোলে করিয়া সে উঠিয়া বসে। স্নানের সময় না-হওয়া পর্য্যন্ত নড়ে না। স্নানের পর ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হয়, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিলে তাহার ক্লান্ত শুষ্ক মুখ দেখিয়া অজয় বুঝিতে পারে, বাহির হওয়াটা বেশীর ভাগই অজয়কে ভুলাইবার জন্য। রাত্রিতে সম্ভবতঃ কোনওদিন দুপয়সার ছোলাভাজা, কোনদিন বা একমুঠা যবের ছাতু আহার করিয়া সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। গলির ধারের একটা গ্যাসের আলোর খানিকটা একতলার বারান্দার এককোণে আসিয়া পড়ে, সেইখানে একটা খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া নন্দ পড়া করে, ঝড়বৃষ্টি না হইলে রেড়ীর তেল পোড়ায় না। প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়াই সে পড়ে, অজয় বারণ করিলেও শোনে না, অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলে, “এই ক’টা ত দিন, স্কলারশিপ না পেলে আর যে আমার পড়া হবে না!”

অজয়ের বলিতে ইচ্ছা করে, নিজের প্রাণের মূল্যের বিনিময়ে এমন করিয়া যে-অভীষ্ট তুমি লাভ করিতে চাহিতেছ, তোমার ঐহিক বা পারত্রিক কোন্

কাজে তাহা লাগিবে কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? কিন্তু তরুণ-হৃদয়ের এই সাগ্রহ স্বপ্ন-সাধনাকে নির্ম্মম হইয়া ভাঙিতে পারে না। বলিতে চায়, প্রাণেই যদি না বাঁচিয়া থাকো, স্কলারশিপটা শেষ অবধি ভোগ করিবে কে ? উহার ক্ষুৎপীড়িত আশাহীন রোগবিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সেকথাটাও বলিতে তাহার আট্‌কায়।

দিনের পর দিন এই প্রাণান্তকর সাধনা চোখে দেখিয়া অজয়েরও মনে নিজেরই অজ্ঞাতে কাজের উৎসাহ জাগিয়া উঠিতেছিল। বহুদিন হইতে একটি ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল, সম্প্রতি একদিন রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া স্বল্পাবশিষ্ট অর্থ হইতে কিছু কাগজ, দোয়াত, কলম, প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিস সে কিনিয়া আনিয়াছে। অনেক কাটাকুটি করিয়া দুই অঙ্ক অবধি লেখা হইয়াছে, আরও দিন দশবারো খাটিতে পারিলে হয়ত বইটা শেষ হয়, কিন্তু সেই অবধি কেমন করিয়া তাহার চলিবে তাহা সে জানে না। তিনটাকা এগারো আনা লইয়া সুরু করিয়াছিল, যাহা বাকী আছে তাহাতে দুইদিন, কি বড় জোর আর তিনদিন অর্দ্ধাশনে তাহার চলিতে পারে। তাহার পর কি উপায় হইবে ? তখনকার অবস্থাটাকে কিছুতেই সে কল্পনা করিতে পারিল না। ভাবিল, অদৃষ্ট এত নির্ম্মম হইতে পারে না। আমি কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইব না তাহা নিশ্চয় কিন্তু অনাহারেও শুকাইয়া মরিব না। কোনও অলক্ষ্য উপায়ে আমার সম্মুখের এই অন্ধকার পাষাণ প্রাচীর সরিয়া গিয়া আমার পথ খুলিয়া যাইবে। পৃথিবীর আলোয় যেদিন চোখ মেলিয়াছিলাম, জানি না কোথা হইতে এই আশ্বাস আমার মনে জাগিয়াছিল, আমি জয়লাভ করিব। তারপর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সেই আশ্বাস আমার কানে বাজিয়াছে, সমস্ত বাধাবিপত্তি কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশে বারম্বার আমার পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাম্যবস্তু আমার পথে ভিড় করিয়া আসিয়াছে, আমি তাচ্ছিল্যভরে তাহার অধিকাংশকে হাত বাড়াইয়া

লই নাই। আমার সেই-সমস্ত ত্যাগ-করা সম্পদ্ নিশ্চয় কোথাও কোনও হিসাবের খাতায় জমা করা আছে। আজ নিঃস্বতার দিনে, রিক্ততার দিনে আমি বঞ্চিত হইব না।

দুপুরে নন্দকে লজিক্ পড়াইতে বসিয়া বারবার সেদিন সে ভুল করিতে লাগিল। কিছুতেই বইয়ের পাতায় তাহার মন বসিল না। নন্দ হঠাৎ পড়ার মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, কহিল, "আজ আর থাক্, একটা দিন একটু বিশ্রাম করব।"

তাহার অমনোযোগ বশতঃই যে নন্দ উঠিয়া-পড়িল তাহা বুঝিতে পারিয়া অজয় জোর করিয়াই তাহাকে আবার পড়িতে বসাইল। নিজের মনকে ইহার পর একবারও আর সে হাত-ছাড়া করিল না। ভারি ত ব্যাপার, দুমুঠা খাইতে পাইবে কিম্বা পাইবে না, তাহাই লইয়া আবার এত ভাবনা। কিন্তু এবার নন্দের দিক্ হইতে মনঃসংযোগের অভাব ঘটিতে লাগিল। সে কিছুই শুনিতেছে না, অজয়ের প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর দিতেছে। অগত্যা বই বন্ধ করিয়া অজয় কহিল, "কি হয়েছে আজ তোমার? এমন অমনোযোগ ত আগে আর কখনো দেখিনি।"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল মাত্র।

ইহার পর সমস্তটা দিন অজয় তাহার নাটক লইয়া ব্যস্ত রহিল। এই নাটকে আলমগীর চরিত্রকে সে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে। বাদশাহ শাহজহান জরাভারগ্রস্ত স্থবির, শিশুর মত কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, তাঁহাকে লইয়া রাজপরিবার অতিষ্ঠ। এদিকে সাম্রাজ্যের চতুঃসীমান্তে বহিঃশত্রু প্রবল। পূর্ব্বসীমান্তে দুর্দ্দান্ত মগ, পশ্চিমে পারস্য, সমুদ্র-উপকূল জুড়িয়া পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ ফরাসী, ওলন্দাজ। বৃদ্ধ বাদশাহের বুদ্ধিভ্রংশজনিত নানাপ্রকার অকর্ম্মের ফলে রাজশক্তির অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয়তর হইতেছে অথচ রাজমন্ত্রীদের মধ্যে, শাহজাদাদের মধ্যে, রাজার আত্মীয় অনাত্মীয় পার্শ্বদবর্গের মধ্যে এমন কেহ নাই

যে সাহস করিয়া তাঁহার কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারে।" হিন্দুস্থান চিরকাল বস্তু অপেক্ষা বস্তুর প্রতীকের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্। ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধি ছিল বলিয়াই আউরংজীব সাম্রাজ্যের সঙ্কট সময়ে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পিতৃসিংহাসন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সে-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিকৃতবুদ্ধি অক্ষম বৃদ্ধের নিরুপায় বিদ্রোহ তাঁহাকে ব্যথিত করিল, কিন্তু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। হিন্দুস্থানকে রাষ্ট্রীয় সংহতি দান করিয়া অমিতশক্তিশালী করিয়া তুলিবার স্বপ্ন আশৈশব তাঁহার চক্ষে; অজয় বলিতে চাহে, বাদ্‌শাহ আলমগীর রূপে ভারতকে একটিমাত্র ভেদবুদ্ধিহীন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার দুশ্চেষ্টার মূলে তাঁহার আশৈশবের সেই স্বপ্ন। তৃতীয় অঙ্কে এই অবধি গল্পকে টানিয়া আনিয়া সে যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আভায় কলিকাতার ধূমাচ্ছন্ন আকাশও শ্যামলী নববধূর মত সাজিয়াছে।

নন্দ শুইয়া ছিল, তাহাকে নাড়া দিয়া কহিল, "এসময়টা শুয়ে প'ড়ে না থেকে ঘুরে এসো না একটু ?"

নন্দ বলিল, 'আজ শরীরটা কেমন ভাল লাগছে না।"

অজয় সে-রাতে খাইতে গেল না। বাকী পয়সা-ক'টাকে যথাসাধ্য সে বাঁচাইয়া চলিতে চায়। তিনদিন উপবাস করিয়া একবেলা খাইলে আরও তিনদিন উপবাস করিবার শক্তি সে লাভ করিবে, হয়ত ছয়দিনের দিন তাহার কিছু একটা উপায় হইবে। আকণ্ঠ কলের জল পান করিয়া আসিয়া সে আবার নাটক লইয়া বসিল। নন্দ সচরাচর যেসময় খাইতে যায় সেই সময়ে একবার বাহিরে বারান্দায় নিঃশ্বাস লইতে আসিয়া দেখিল এককোণে অন্ধকারে গোঁজ হইয়া সে বসিয়া আছে। ডাকিল, "নন্দ।" নন্দ সাড়া দিল না। কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া অজয় তাহাকে টানিয়া তুলিল, কহিল, "এখানে ব'সে কি করছ ?"

নন্দ কহিল, "কিছু না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে কি ছিল, "ঘরে এসো," বলিয়া অজয় তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া আসিল। বাতির আলোয় তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "সেদিন তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে, যে, এ-সমস্ত চলবে না, তুমি এ রকম করলে আমি চ'লে যাব ?"

ভয়ে নন্দের শুষ্ক মুখ আরও শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। জড়িত কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "কথা দিচ্ছি, আর কখনও করব না।"

অজয় বলিল, "পুরুষ মানুষকে দুঃখভোগ করতে হয়, দুঃখভোগ করতে দিতে হয়। বিশেষতঃ এই দুর্ভাগা দেশে দুঃখের তপস্যাই ত আমাদের একমাত্র তপস্যা, আর কি আমাদের করবার আছে ?"

নন্দ নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল। অজয় বলিল, "শোনো নন্দ। দুঃখ তুমি আমার থেকে কম করছ না, আমি তা সারাক্ষণই দেখছি, যতটা চোখে দেখা যায়। তার বেশী যেটা সেটারও অনেকখানিকে অনুভব করছি। এক একবার মনে হয় নিজের জন্যে না হোক, তোমারই মুখ চেয়ে আমার ব্রতভঙ্গ করি। যেমন ক'রে হোক, যে-কোন কাজ নিয়ে হোক, দুজনে দুবেলা পেট ভ'রে খাবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু বিমান কি বলত তোমার মনে আছে ত ? যে কাজ আমার নয় তা যদি আমি করতে যাই, ত সে কাজ সত্যিই যার এমন একজন মানুষকে আমি বঞ্চিত করব। দেশের অন্নসমস্যা আজ এমনি।— যে-কাজের শক্তি এবং যোগ্যতা পৃথিবীতে আমারই একমাত্র আছে, তা যে কি তা আমি আজও জানি না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্ত্তব্য ছিল অন্ততঃ সেইটে আমাকে জানিয়ে দেওয়া, তা সে দেয়নি। নিজের চেষ্টায় তা আমাকে এখন জানতে হবে। যদি তা করতে গিয়ে আমাকে অনাহারে মরতে হয়, তবু জানব মরা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। দেশের লোক জানবে, আমার সমস্ত নিয়ে নিজের প্রতি আমি খাঁটি ছিলাম, সেই অপরাধে আমার জন্যে

তারা মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেছে। অবস্থাটাকে তারা অন্ততঃ উপলব্ধি করবে। ক্রমাগত নিজেদের ফাঁকি দিতে গিয়ে আমরা সকলে মিলে দেশ-বিধাতাকে ফাঁকি দিচ্ছি। সত্যকে আড়াল ক'রেই প্রতিকারের সম্ভাবনাকে বেশী ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। আমরা মরেও যদি সত্যকে সকলের চোখে ধরিয়ে দিয়ে যেতে পারি ত সেই মৃত্যুই কি আমাদের জীবনধারণকে সার্থক করবে না?"

অজয়ের মুখে মৃত্যুর কথা এরূপ ভাবে নন্দ পূর্ব্বে আর কখনও শোনে নাই। ভয়ের উত্তেজনায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বেচারার অবস্থা দেখিয়া অজয় সত্যই অনুতপ্ত হইল। মৃত্যুকে একেবারে সম্মুখে করিয়াই ত বেচারা বসিয়া আছে, অনাহার ও অস্বাস্থ্য মিলিয়া তাহার জীবনের সব কয়টি শিকড়কেই শিথিল করিয়া দিয়াছে, পৃথিবীতে এমন আপনার জন তাহার কেহ নাই যে একমাত্র হৃদয়ের আবেগ দিয়া, স্নেহের আবেষ্টন দিয়া মৃত্যুর সেই করাল রূপকে তাহার ভয়াকুল দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।—ইহাকে মৃত্যুমন্ত্র শোনাইয়া আর কি হইবে? তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য নিজের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "খেতে যাওনি এখনো?"

নন্দ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

অজয় বলিল, "আজকের মতো আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকুক। আর তিনদিন প'রে তোমার পরীক্ষা, এখন উপোস দিলে চলে?"

নন্দ এই প্রথম অজয়ের কথার অবাধ্যতা করিয়া বলিল, "আজ আমি কিছুতেই খেতে যেতে পারব না।"

অজয় পকেট হাত্ড়াইয়া তিনআনার পয়সা বাহির করিল, বলিল, "আজ প্রতিজ্ঞা যখন ভেঙেছি, ভাল ক'রেই ভাঙব। পয়সা ক'টা নাও। ইচ্ছে না করলেও দুটিখানি মুখে দিয়ে এসো। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, তারপর যতখুসি উপোস কোরো।"

নন্দ বলিল, "পয়সা ত আমার কাছেই আছে।"

অজয় বলিল, "ঠিক বলছ ?"

নন্দ বলিল, "আপনি ত জানেন, আমি মিথ্যে কখনো বলি না।"

অজয় বলিল, "তা জানি। তবে খেতে যাওনি কেন ? যাও, খেয়ে এসো।"

নন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অজয়ের মনে হইল, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতেছে। হঠাৎ অজয়ের পায়ের কাছে মাটিতে সে বসিয়া পড়িল, অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, "আপনিও ত আজ তিন দিন রাত্রে খেতে যাননি—" বাকী যাহা বলিবার ছিল তাহার গলায় বাধিয়া গেল, অজয়ের পাশে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অজয় বাধা দিতে চেষ্টা করিল না, বাধা দিবার শক্তি আজ নিজের ক্লান্ত দেহমনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে বর্ষা নামিয়াছে। নীরবে নন্দের পাশে মাটিতে নামিয়া বসিয়া তাহার মাথাটিকে সে কোলে টানিয়া লইল, তারপর নীরবেই তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিল। রাত্রি বহিয়া চলিল। ধূলি-সমাচ্ছন্ন আর্দ্র ভূমিতল ছাড়িয়া উঠিবার কথা দুজনের কাহারও মনে হইল না।

সকালে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া অত্যন্ত নিদ্রাতুর চোখে নন্দকে একবার উঠিতে বলিয়া নিজে কখন্ বিছানায় গিয়া শুইয়াছিল মনে নাই। ভোরবেলা ধীরে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "নন্দ!" হঠাৎ গরম জলের কাৎলিতে হাত ঠেকিলে যেমন হয় তেমনই ভাবে চমকিয়া সে হাত সরাইয়া লইল, আবার সন্তর্পণে কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, জ্বরে নন্দের গা পুড়িয়া যাইতেছে। সভয়ে তাহাকে ঠেলা দিতে দিতে ডাকিল. "নন্দ, নন্দ, নন্দ!"

ঘুম এবং জ্বরের মোহ একসঙ্গে কাটাইবার চেষ্টা করিতে করিতে নন্দ বলিল, "কি ?"

"বিছানায় উঠে শোও। শীগ্‌গির ওঠ। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে একেবারে!"

নন্দ বিছানার প্রান্তে উঠিয়া বসিল। তারপর কিছুক্ষণ বাম হস্তে দক্ষিণ হস্তের কব্জির কাছে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া ঘুম-জড়ান চোখ ভাল করিয়া না

মেলিয়াই একটু মৃদু হাসিল মাত্র। যেন ঠিক এইরূপ হওয়ারই কথা ছিল। আরও আগেই হয় নাই যে, সে কেবল অদৃষ্ট-দেবতাকে সে এতদিন গুছাইয়া ফাঁকি দিতে পারিয়াছে বলিয়া।

অজয় বলিল, "আমারই জন্যে এই বিপদ্ ঘটল। আমার উচিত ছিল তোমাকে বিছানায় তুলে শোয়ানো।"

অজয় বলিল, "আপনার কি দোষ, বা রে! বিছানায় শুয়ে কি আর মানুষের জ্বর আসে না? অসুখটা ত আমার আছেই, যখন হয় এম্‌নি হঠাৎই হয়।"

অজয় বলিল, "ক'দিন থাকে?"

নন্দ বলিল, "তার ঠিক নেই কিছু, একদিনেও সেরে যায় আবার একুশ দিনও থাকতে পারে।" এমন ভাবে বলিল, যেন এক্ষেত্রে একে আর একুশে তফাৎ কিছু নাই। বাস্তবিক ছিলও না। পীড়িত, দুর্ব্বল, অনাহারক্লিষ্ট দেহে যে সুখের জীবন তাহাকে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হইতেছে, তাহার উপর সামান্য একটু জ্বরতপ্ততাকে এমন কিছু অসাধারণ বিপৎপাত বলিয়া তাহার মনে হইবার কথা নয়। আরও ছেলেবেলায় জ্বর আসিলে এইজন্য সেটাকে তাহার দুর্ভাগ্য মনে হইত, যে, যতদিন জ্বর থাকিবে, পেট ভরিয়া সে খাইতে পাইবে না। এখন ত এমনিতেই অধিকাংশ দিন খাইতে পায় না, সুতরাং জ্বর একটু আছে বা নাই তাহাতে আর এমন আসিয়া যাইবে কি?

বলিল, "পরীক্ষার জন্য ভাববেন না, পরীক্ষা আমি ঠিক দেব।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, সে হবে এখন। সম্প্রতি তুমি শুয়ে পড় দেখি। দাঁড়াও, বালিশটা ঠিক ক'রে দিচ্ছি।···এই দুটো চাদর এক সঙ্গে ক'রে দিচ্ছি, গায়ে দাও।···মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, টিপে দেব?"

নন্দ ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না, না, মাথায় তেমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না।"

অজয় বলিল, "মাথা টিপে দিতে আমার বেশ লাগে, দাওনা টিপে দিচ্ছি।"

নন্দ কিছুতেই রাজি হইল না, কিন্তু ক্রমাগত বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "কাল রাত্রে খাওনি, নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে তোমার। দুপয়সার বার্লি এনে জ্বাল দিয়ে দিই, কি বল?"

নন্দ বলিল, "জ্বরের প্রথম দিনটা লঙ্ঘন দেওয়াই ত ভাল। আজকে থাক্।"

"কিন্তু মুখটা শুকিয়ে উঠেছে যে।"

"আচ্ছা, একটু জল দিন্।"

পিপাসায় তাহার তালু, গলা এবং বুক তখন শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

অজয় বলিল, "দাঁড়াও, কাগজ জ্বেলে জলটা একটু গরম ক'রে দিচ্ছি; ওতে পিপাসাও সহজে মিটবে, ঘাম হ'লে ভালও লাগবে একটু।"

উঠিয়া পুরান খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া আগুন ধরাইল, তারপর একটা এলুমিনিয়মের গেলাসে জল লইয়া আগুনের আঁচে ধরিতে যাইবে এমন সময় দরজার কড়াটা সজোরে নড়িয়া উঠিল।

অজয় উঠিয়া-পড়িয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীতে visitor, এমন সময়ে? কি ব্যাপার?"

কাহারও অসুখ দেখিলে অজয় যত ভড়কাইত এত আর কিছুতে নহে। বিশেষতঃ নন্দকে লইয়া সে এখন একেবারে একাকী। মাথা টিপিয়া দিতে চাহিয়াছিল, বাস্তবিক ঐটুকু অবধিই সে পারিত, তাহার বেশী আরও কিছু তাহাকে করিতে হইবে বলিলে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একাকী এক রোগীর পরিচর্য্যা, মরণপথের যাত্রীর সঙ্গে মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তে গুরুভার দুর্ভাবনা বহিয়া চলা, তদুপরি নন্দের রোগটা যে বাস্তবিক কি তাহাও সে জানে না, টি-বি হইতে পারে, টাইফয়েড, কিম্বা বসন্ত··· চেষ্টা করিয়াও কণ্ঠস্বরে আনন্দের উদ্দীপনা অজয় লুকাইতে পারিল না। হয়ত তাহার অজ্ঞাতবাসের পালা ফুরাইয়াছে। সে ইচ্ছা করে না সুভদ্র আসুক, কিন্তু

হয়ত খবর পাইয়া সুভদ্রই তাহাকে ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নন্দের সমস্ত ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

নন্দ দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া অজয় দ্বার খুলিয়া দিল। টুপী হাতে করিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি অজয়ের পূর্ব্বপরিচিত সেই বাঙালী দারোগা, লালবাজার হাজতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অজয় যাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। আজও মানুষটিকে দেখিয়া সে খুসীই হইল। এতটা খুসী না হইলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে-অবস্থায় সে পড়িয়াছে, একটা মানুষের মুখ দেখিতে পাওয়াই কতকটা সান্ত্বনা, তারপর এই মানুষটিকে কি কারণে জানে না, প্রথম দিন দেখিয়াই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। স্মিতহাস্যে আগন্তুককে সে অভিবাদন করিল। দারোগা প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনিও এখানেই রয়েছেন বুঝি? বেশ, বেশ, কেমন আছেন?"

অজয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সঙ্গের পুলিশ দুইজন ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারপ্রান্তেই রহিয়া গেল। অজয় তাহাদের দেখিতে পাইয়াছে মনে হইল না। দারোগা বলিলেন, "কি নন্দবাবু, চিনতে পারেন?"

নন্দ মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "চিনতে কেন পারব না? কেমন আছেন? বসুন।"

নন্দের বিছানার এক পাশে চাদরটাকে একটু টানিয়া বসিয়া দারোগা বলিলেন, "শরীর ভাল নেই বুঝি, কি হয়েছে?" নন্দের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি তাহার কপালে হাত রাখিয়া জ্বর পরীক্ষা করিলেন, নাড়ী দেখিলেন। এলুমিনিয়মের গেলাসটা হাতে করিয়া আসিয়া অজয় বলিল, "নন্দ, জলটুকু খেয়ে নাও।"

কনুয়ে ভর দিয়া উঁচু হইয়া নন্দ জলপান করিল। দারোগা বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করবার আছে।

অজয় নিজের বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া কহিল, "বলুন, কি বিষয়ের পরামর্শ।"

দারোগা কহিলেন, "আপনাদের যা অবস্থা দেখছি, তাতে আমি এসে প'ড়ে ভালই হয়েছে। এঁর সব ভার আপাততঃ আমি নিতে পারব। অবশ্যি আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি তা বলাই বাহুল্য।"

অজয় কহিল, "ঘরে থার্মোমিটার নেই কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওর জ্বর একশো তিনের কম হবে না। পরশু রাত থেকে কিছু না খেয়ে আছে, আজ এইমাত্র একটু জল পেটে পড়ল। এ অবস্থায় ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

দারোগা কহিলেন, "হাস্‌পাতালে যাচ্ছেন মনে করুন না, ব্যাপারটা আসলে ত তা-ই। এই ত আধ-ক্রোশ রাস্তা, মোড় থেকে ট্রামে চ'লে যাব। আমার পরামর্শ যদি শোনেন, ত, এঁকে এখুনি এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা না করলেই ওঁর মারা যাবার সম্ভাবনা বেশী। আপনাদের অবস্থা জানতে ত আমার বাকী নেই?"

অজয় তবু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "ও যেতে পারবে না।

দারোগা কহিলেন, "ইচ্ছে থাকলেই যে ফে'লে রেখে যেতে পারব সে সাধ্যি কি আর আছে? জানেনই ত, আমরা হুকুমের চাকর।···তা বেশ, নন্দবাবুর উপরেই ভার দেওয়া যাক। কি করা উচিত তিনিই বলুন।"

নন্দ উঠিয়া বসিয়াছিল, লাল ক্যানভাসের জুতাজোড়াটাতে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিল, "আমি যাচ্ছি, চলুন।"

অত্যন্ত কাতর মিনতির স্বরে অজয় কেবল কহিল, "নন্দ··"

নন্দ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, কহিল, "অজয়দা, অনুমতি করুন ঘুরে আসি। এ-সব আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, জানেনই ত। কিছু কষ্ট হবে না। তাছাড়া হয়ত বেশীক্ষণ রাখবেই না, এমনি কতকগুলি প্রশ্ন করবে, জবাব দিয়ে চ'লে আসব।"

অজয় তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

দারোগা অজয়ের অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, "অজয়বাবু মনটাকে একটু ঠিক করুন। আমরা মানুষ ত? নাহয় পুলিশে কাজ করি, আমাদেরও ভাইবোন আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ওঁর কিছু কষ্ট হবে না। আপনি একজন ছিলেন, আমরা সবাই মিলে ওঁকে দেখব। সরকারের যত দোষই দিন, অসুখে বিসুখে সি-ক্লাশ প্রিজনাররাও যা ট্রিট্‌মেণ্ট পায় তা আমার আপনার সাধ্যের বাইরে। এমন হতে পারে যে এখান থেকে চ'লে যাবার ফলেই উনি বেঁচে যাবেন।"

অজয় কিছু না বলিয়া বিমানের ধরণে একটু হাসিল মাত্র। তাহার দিকে চাহিয়া নন্দের দুইচোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও নিজের মুখ হইতে একটুখানি হাসিকে কিছুতেই মিলাইয়া যাইতে দিল না।

নন্দকে লইয়া দারোগা চলিয়া গেলে সেইখানেই দুইহাতে মাটিতে ভর দিয়া অজয় বসিয়া পড়িল। মুখের হাসি ক্রমে বেদনায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। দুই হাত কানের উপর চাপিয়া সে রক্তস্রোতের শব্দ বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু শব্দ দ্বিগুণতর হইতেছে। অনাহারে শরীর দুর্ব্বল ছিল, মনে হইল, হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া পড়িয়াছে, এখনই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মাটিতেই সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর কাল রাত্রিতে নন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে যেখানে লুটাইয়া পড়িয়াছিল সেখান অবধি গড়াইয়া গিয়া নিজেকে ধূলিধূসরিত করিতে করিতে নির্ম্মম হাতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া রহিল। সহসা সমস্ত অস্তিত্ব-ভরা হিংস্র কঠোরতা লইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি চাই না, এই ক্লিষ্ট, ধূলিমলিন, অবমানিত জীবনকে আমি চাই না। এই নিরুপায়, নিরানন্দ, আশাহীন, উদ্দীপনাহীন জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নাই। হে দেবতা, তুমি ইহাকে ফিরাইয়া লইতে পার, এই মুহূর্ত্তে ফিরাইয়া লইতে পার। তুমি বাছিয়া বাছিয়া আর দেশ পাও নাই, আমাকে

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছিলে। তুমি বাছিয়া বাছিয়া আর কোনও মানুষ করিতে পার নাই, আমাকে আমি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলে! জীবনে বহুবার তোমার বহু অনুগ্রহের দানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তুমি জানো। আজ তোমার দেওয়া সর্ব্বোত্তম দান এই জীবনকেই আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি, ইহাকে ফিরাইয়া লও, ফিরাইয়া লও।"

দেবতা সে-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু অজয়ের চোখের সম্মুখে দিনের আলো রক্তবর্ণ হইয়া ক্রমে কালো হইয়া আসিল। এই পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, তাহাদের সমস্ত স্মৃতি, নিজের জীবনের সহস্র সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার সঞ্চয় সেই অন্ধকার মহাসমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল। কলিকাতার পথের সদা-প্রবহমান্ কোলাহলের স্রোত, সমস্ত হাসি কান্না সঙ্গীত হাহাকারের প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন মহা স্তব্ধতার মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া গেল। কানের কাছে রক্তস্রোত উদ্দাম নৃত্যে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল, সে নৃত্য থামিল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মৃদুতর হইতে হইতে ক্রমে আর শোনা গেল না। বহুক্ষণ ধরিয়া সে অনুভব করিল, যেন সেই স্তব্ধ অন্ধকারের একেবারে মর্ম্মস্থানটিতে তাহার সমস্ত অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ একসঙ্গে হইয়া একটি ক্ষীণ দীপশিখার মত জ্বলিতেছে, সে দীপশিখা কাঁপিতেছে না। ক্রমে সেই আলোটুকুও আর রহিল না। তখন ভিতরের এবং বাহিরের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধ অন্ধকার ভরিয়া অদৃশ্য আলোর স্পন্দনের মত বিচিত্র নীরবতার সুরে প্রশ্ন হইল, "তোমাকে যদি ফিরাইয়া লই এবং আবার পৃথিবীতে তোমাকে আসিতে হয়, কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহ?"

অজয়ের সমস্ত অস্তিত্ব, তাহার হইয়া উত্তর দিল, "ভারতবর্ষে।"

আবার প্রশ্ন হইল, "ফিরিয়া আসিয়া যদি কাহারও অপেক্ষা করিতে হয়, কাহার জন্যে অপেক্ষা করিবে?"

এবারেও অজয়ের অস্তিত্ব ভরিয়া ছাপাইয়া উত্তর হইল, "যে-কটি মানুষের পরিচয় এ-জীবনে পাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য।"

অন্ধকার গলিয়া যাইতে লাগিল। চেতনা কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল। একটুকরা তীব্র রোদ অজয়ের চোখের উপর পড়িয়া তাহার চোখকে পীড়া দিল। নন্দকে কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, আর দুইদিন পরে তাহার পরীক্ষা। জীবন-পণ করিয়া, দুঃসহ দুঃখকে অনাহারকে অনিদ্রাকে হাসিমুখে সহ্য করিয়া, রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত আগ্রহে এই পরীক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছে। হয়ত কলিকাতার সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন এবং অধিকার আর কাহারও তত ছিল না, তাহার যত ছিল। এত কঠিন সাধনার পথশেষে সাফল্যের দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। হাসিমুখে সে চলিয়া গেল, যেন এ সাফল্যে লোভ করিয়া কাহাকেও সে ফাঁকি দিতে চাহিতেছিল, রগড় হইতেছিল, রগড়টা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার সেই হাসি মনে করিয়া অজয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়াছিল, দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে ডাকিতে লাগিল, "নন্দ রে, নন্দ," আর অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

২৫

এবারেও নন্দের খোঁজ কেহ করিল না।

সমস্তটা দিন অজয় আশায় আশায় রহিল, নিজে হইতেই সে ফিরিয়া আসিবে। একাকী এত বড় ভূতুড়ে বাড়ীটাতে সমস্ত রাত্রি অস্বস্তিতে তাহার ঘুম আসিল না। হয়ত এখনই নন্দ আসিয়া পড়িবে, ঐ হয়ত বাহিরের উঠানে তাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে; সে যা ছেলে, হয়ত অজয়ের ঘুম ভাঙাইতে চাহে

না বলিয়া বারান্দায় পড়িযাই নাক ডাকাইতেছে, এমনই ধারা আশাও সেইসঙ্গে জাগিয়া রহিল। কিন্তু নন্দ ফিরিল না।

পরের দিন রবিবার, আফিস-আদালত সব বন্ধ, খবর লইবার ইচ্ছা থাকিলেও খবর পাইবার উপায় নাই। সোমবারে উপর্য্যুপরি উপবাস ও অনিদ্রার ক্লান্তিতে অজয়ের চলচ্ছক্তি লোপ পাইয়াছে। মনকে বুঝাইল, এই অবস্থায় পড়িলে নন্দও ঠিক তাহারই মত ব্যবহার করিত। আশ্চর্য্য, এই বিপুল পৃথিবীতে সুখে দুঃখে দীর্ঘ আঠারোটা বৎসর অতিবাহিত করিয়াও এই স্বল্পভাষী নিরহঙ্কার বালক নিজের জীবন দিয়া কাহারও জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে নাই। নন্দেব কেহ বন্ধু নাই। অবশ্য ভাবিয়া দেখিতে গেলে অজয়েরও কেহ বন্ধু নাই। এই ত সুভদ্র। অজয়কে সে যে এত ভালবাসিত, পক্ষীমাতার মত ডানা মেলিয়া তাহাকে সারাক্ষণ সমস্ত-প্রকার আঘাত-অবমাননা হইতে আবৃত করিত, আজ সেই সুভদ্র অজয়ের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে তাহার কথা একবারও কি মনে করে? কিন্তু বন্ধু বলিতে পৃথিবীতে সুভদ্রেরই বা কে আছে? বীণার কথা ক্রমাগত কানে বাজিতে থাকে—

'কোনো মানুষের কথাই কি ভাবেন একবারও—কেউ কারুর ভালমন্দেও নেই আপনারা।'

···কিন্তু এমন যে বীণা, সেও কি অজয়ের কথা আজ একবার ভাবে? সে কোথায় আছে, কেমন আছে, বাঁচিয়া আছে কি না জানিতে চায়? অজয় তবু ত নন্দের কথা সমস্তক্ষণই ভাবিতেছে। লালবাজারে গিয়া তাহার খোঁজই না-হয় করে নাই, কিন্তু এবার সে ফিরিলে দুইজনে অন্ততঃ পেট ভরিয়া যাহাতে খাইতে পায় সেজন্য প্রাণপণ করিয়া সে প্রস্তুত হইতেছে। আর তাহার অন্তর্য্যামী জানেন, নন্দ ফিরিয়া আসিলে সে খুসী হয়, অত্যন্ত বেশী খুসী হয়। আর কোনো কারণে না হউক, এই পুরান ভাঙা ভূতুড়ে বাড়ী, লোহার গরাদে দেওয়া সরু সরু দরজা-জানালা, মাকড়সার জালে জড়ান অন্ধকার আনাচ-কানাচ, আগাছার ঝাড়

…সমস্ত রাত ধরিয়া দুতলার বারান্দায়, সিঁড়িতে, ছাতে কি যে সব দুপ্‌দাপ্‌ ফিস্‌ফাস্‌ শব্দ…যে কোনো একটা মানুষ কাছে থাকিলে প্রাণে তবু ভরসা থাকে।

আধ-ময়লা বিছানাটাতে বালিসে বুকের ভর দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে দিন-রাত অবিশ্রান্ত নাটকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিতেছে, কাটিতেছে, আবার লিখিতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপে যে! কোনো-এক সময় বইটা শেষ হইবে এবং হয়ত আশাতীত সাফল্যের মধ্যে শেষ হইবে, এই চিন্তাই বইটিকে শেষ করিবার পথকে বাধার মত হইয়া জুড়িয়া থাকে, যত বেশী তাড়াতাড়ি করিতে যায় তত বেশী করিয়া দেরি হয়।

তবু সত্যসত্যই বইটি একদিন শেষ হইল। সেদিন অজয়ের সে কি আনন্দ। জীবনে আর কখনও আর কোনও কিছুতে এতখানি আনন্দ সে পায় নাই, নিজের কাছে মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিল। সেদিন একাদিক্রমে তৃতীয় দিনের উপবাস চলিতেছে। শেষ ডাল-ভাত-পুঁইয়ের চচ্চড়ি খাওয়ার পর যে ছয়টি পয়সা বাকী ছিল তাহা দিয়া একদিস্তা কাগজ কিনিয়াছিল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে কলতলায় গিয়া আঁজলা করিয়া জল খাইয়াছে, এক পয়সার ছোলাভাজাও এই ক'দিন জোটে নাই। কিন্তু সেই কৃচ্ছ্রসাধন তাহার সার্থক হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা অজয়ের চেয়ে বেশী আর কাহার আছে? সে জানে, তাহার এই প্রথম উদ্যমেই বইটি আশাতীত-রূপ ভাল হইয়া উৎরাইয়াছে।

বইটিকে অভিনয় করাইবার চেষ্টা কাহার যোগে করিবে, কাহাকে প্রথম বইটি পড়িতে দিবে, আগে হইতেই ঠিক ছিল। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের এক গানের জলসায় দুই বৎসর আগে লোকটির সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ। তখন পাখোয়াজে খুব ভাল হাত বলিয়াই কানাইয়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। আজ বাংলা দেশে কানাইলাল ঘোষের নাম শোনে নাই এমন লোক বিরল। প্রতিভাবান্‌ অভিনেতা, কৃতী নাট্যকার এবং শক্তিশালী প্রযোজক বলিয়া তাহার নাম অন্ততঃ

কলিকাতায় সকলের মুখে মুখে। সহরের শ্রেষ্ঠ যে নাটমন্দির, তাহার উপর কানাইলালের একাধিপত্য। তখন সান্ধ্য অভিনয়ের এক পর্ব্ব শেষ হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্বের আয়োজন চলিতেছে। রঙ্গমঞ্চের পিছনে এই দিক্‌টা দিয়া স্ত্রীদের এবং পুরুষদের পৃথক্ পৃথক্ গ্রীন্‌রুমে যাইবার রাস্তা। দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় কানাইলালের ঘর, একাধারে তাঁহার রূপসজ্জাগার ও বৈঠকখানা। অজয়কে দেখিবা মাত্র কানাই চিনিতে পারিলেন, সৌজন্য সহকারে তাহাকে বসাইলেন, যত শীঘ্র সম্ভব নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেখিবেন এ প্রতিশ্রুতিও না চাহিতেই আদায় হইল। সেদিন আর বেশী কথা বলিবার সময় ছিল না, আসিবার মুখে একটা চাকর দুপেয়ালা চা এবং কিছু খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলি কাজে লাগিয়া গেল।

সে রাতটা ছটফট করিয়া কাটিল, পরের দিনটাও। কি ভুলই সে করিয়াছে, আজিকার দিনের মধ্যে বইটা পড়িয়া রাখিতে কানাইকে সে বলিয়া আসে নাই। …শরীর মন দুইই এলাইয়া পড়িতেছে, হয়ত কাল আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা থাকিবে না। জানে, এক দিনেই কিছু আর বইটা কানাইয়েব পড়া হইয়া যায় নাই; ইহাও জানে, এত বেশী গরজ প্রকাশ করিলে নিজেকে অত্যন্তই ছোট করা হইবে। তবু সন্ধ্যায় কে তাহার ক্ষুৎপীড়িত ক্লান্ত দেহটাকে জোর করিয়া টানিয়া কানাইয়ের দরজায় হাজির করিল।

কানাইয়ের ঘরে আজ দস্তর মত লোকের ভিড়। সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিবার ঘটা দেখিয়াই অজয় বুঝিল, বইটি পড়া হইয়াছে, এমন কি দলের মানুষগুলির মধ্যে তাহা লইয়া একপালা আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। এতটা সত্যই সে আশা করে নাই। কতক্ষণে ভিড় কাটিয়া যাইবে কম্পিতবক্ষে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময় কানাই বলিয়া উঠিলেন, "আপনার বইটা পড়লাম, খুব ভাল হয়েছে। ষ্টেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নেই এমন মানুষের পক্ষে যে-ধরণের সব ভুল করা স্বাভাবিক, আপনি তাও কোথাও করেননি দেখছি। খুবই আশ্চর্য্য বলতে হবে।"

কোনও কিছু লইয়া আশ্চর্য্য হওয়া অজয়ের স্বভাব নহে। আশাতীতের সঙ্গে, অভাবিতের সঙ্গে পরিচয় জীবনে আরও বহুবার তাহার হইয়াছে।

কানাই বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা আপনি ভাবেননি। বইটা মুসলমান-ইতিহাস নিয়ে লেখা। বাংলা দেশে ত এ অভিনয় চলবে না।"

অজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, কথাটা ধারণা করিতে সময় লাগিতেছে, অবশেষে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সে কি, কেন?"

কানাই বলিলেন, "মুসলমানরা চটবে। শেষকালে কি আবার একটা riot বাধাবেন? আপনি জানেন না দেখছি, কিন্তু গত আঠারো বৎসর বাংলা দেশে মুসলমান-ইতিহাস নিয়ে লেখা কোনো নাটকের অভিনয় হয়নি।···দরকারই বা কি? হিন্দু ইতিহাস, বৌদ্ধ ইতিহাসে নাটকের প্লটের কি কিছু অভাব আছে? যত খুসি লিখুন না?"

ভাল করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে অজয়ের শরীর-মনে এতটা জোর আর অবশিষ্ট নাই। কহিল, "মুসলমানদের খুসী হওয়ার কথাই ত বইটার সবটাতে।"

কানাই কহিলেন, "তা কি জানি মশায়! নামগুলো বদ্‌লে বৌদ্ধ ক'রে দিন, আপদের শান্তি হয়ে যাক্। শাহজাহানকে করুন বিম্বিসার, আউরংজীবকে অজাতশত্রু, দেখুন কালকে রিহার্সাল ধরিয়ে দিচ্ছি।"

অজয় কহিল, "নাম বদ্‌লে দেব কি মশায়? তা কখনো হয়?··· চরিত্রগুলোর চাইতেও মুসলমান-ইতিহাসের ব্যাক-গ্রাউণ্ডটাই যে আসলে ঢের বড় জিনিষ বইটাতে।"

কানাই কহিল, "তা ত জানি, কিন্তু কি করতে পারি বলুন?"

অজয় কহিল, "আপনি বইটা ভাল ক'রে আর একবার প'ড়ে দেখুন, আলমগীর চরিত্র আমি যে-রকম ক'রে গড়েছি তাতে মুসলমানদের সত্যিই খুব খুসী হবার কথা। তাঁর স্বভাবে এমন কিছু রাখিনি যা সত্যি সত্যি দোষের—"

কানাইলাল একটু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি তাই ভাবছেন, কিন্তু ভারতে

মুসলমান-ধর্ম্মের বিস্তৃতির চেষ্টার আসল উদ্দেশ্যটা তাঁর ছিল রাজনৈতিক, একথা শুনলে কোনো ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান খুসী হবে না।"

একটি সুশ্রী চেহারার যুবক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোয়ালে এবং নারিকেল তৈল সহযোগে মুখ হইতে গ্রীজ পেণ্টের অবশেষ ঘসিয়া তুলিতেছিল, কহিল, "আলমগীরের কথা না হয় ছেড়েই দাও না কানাই, কিন্তু ঐ যে শাহজাহান, তাকে অজয়বাবু করেছেন পাগলাটে, বুড়ো, ইডিয়ট,—সে ব্যক্তিও যে মুসলমান সেটা কেন ভাবছ না ?"

একটি স্থূলদেহ ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ অজয়েরই মত অভ্যাগত, হাসিয়া কহিলেন, "সত্যিই ওদের কথা কিছু বলা যায় না মশায়। কিসে যে চটবে, কিসে যে চটবে না, নিজেরাও তা জানে কি না সন্দেহ। সাধ্যমত ওদের না ঘাঁটানই ভাল।"

পাণ্ডুলিপির খাতা-কয়টি একটা খবরের কাগজে মুড়িয়া লইয়া অজয় উঠিয়া পড়িল। কানাইলাল দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিলেন, কহিলেন, "আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না! নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বইটা ফেরাতে হ'ল। এমন একখানা বই অনেক তপস্যা ক'রেও পাওয়া যায় না, কিন্তু যা লক্ষ্মীছাড়া দেশ! যদি বৌদ্ধ-ইতিহাস নিয়ে কিছু লেখেন, সকলের আগে তার ওপর আমার দাবী রইল।"

পথে বাহির হইয়া অজয়ের মনে হইল, বইটা যে চলিল না তাহা তত বড় দুর্ঘটনা নহে, কিন্তু আসিবার মুখে কালকের সেই খোঁড়া চাকরটা আজও যে সম্মুখের টেবিলে তাহার জন্য এক পেয়ালা চা আর খাবার রাখিয়া যায় নাই সেই দুঃখ কিছুতে সে ভুলিতে পারিতেছে না। ভাবিল, আজ কানাইয়ের ঘরে বহু জনসমাগম।—সে একলা থাকিলে চা আর খাবার আজও হয়ত তাহার জুটিয়াই যাইত। এখন আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না, বইটা ফিরিয়া পাইবার পর আর বসিয়া থাকাও চলিত না।...বইটা পড়িয়া শেষ করিতে কানাইলালের আরও কয়েকটা দিন দেরি হইলেই দেখা যাইতেছে ছিল ভাল।

নাঃ, সত্যিই এটা লক্ষ্মীছাড়া দেশ। এদেশে কাহারও কিছু লেখা উচিত নয়।—কাহারও কিছু করাই উচিত নয়।

অজয়ের শরীর কাঁপিতেছে, চলিতে গিয়া পা টলিতেছে। আস্তে আস্তে দুইএক পা করিয়া অগ্রসর হয় আর ভাবে, এখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথার চাপ। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটি স্পন্দনকে সে যেন লগুড়াঘাতের মত অনুভব করিতেছে।

একটা আলোর থাম ধরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

অনেকদিন আগে শোনা বিমানের একটা কথা আজ এতদিন পর অজয়ের মনে লাগিয়াছে। সত্যই একটা লক্ষ্মীছাড়া দেশে জন্মাইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার আর কোনও অপরাধ নাই। মিথ্যামিথ্যি নিজেকে এতদিন সে তিরস্কার করিয়াছে। যদি আর কোনও দেশে জন্মাইত, হয়ত গান গাহিয়াই জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত। অন্ততঃ তাহার এতদিনের এত প্রাণপাত পরিশ্রম আজ এমন করিয়া এত তুচ্ছ কারণে ব্যর্থ হইত না। সে জানে বইটা ভাল হইয়াছে, আজ কানাইলালের ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখভাবে, কানাইলালের নিজের প্রতিটি কথায় বারবার সেকথা ধরা পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ বাজারে যে-সমস্ত বই সচরাচর চলে এবং প্রশংসা পায় সেগুলির তুলনায় বইটা ভালই হইয়াছে, তবু ইহা হইতে একবেলার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাও তাহার সাধ্যে নাই!

কিন্তু আজ আর এত কথা ভাবিতে ভাল লাগিতেছে না। ক্ষোভ করিবার, রাগ করিবার, অভিমান করিবার মত মনের অবস্থাও আজ তাহার নাই। পথের পাশে একটা খাবারের দোকান। রাশি রাশি কচুরি, শিঙাড়া, সন্দেশ, বরফি, পান্তুয়া স্তূপাকার করিয়া সাজান রহিয়াছে। ভাবিল, ইহার সমস্তই কি বিক্রয় হইবে? কতক নিশ্চয়ই ফেলা যাইবে। একটা শিঙাড়া পাইলে খাইয়া আকণ্ঠ-জলপান করিয়া সে কি গভীর তৃপ্তি লাভ করিতে পারে!

একবার সত্যই মনে হইল, অন্ধকারে লুকাইয়া হাত পাতে। কাহারও নিকট একটা পয়সা চাহিয়া লয়।…নিজের চিন্তাতে এত দুঃখেও নিজেরই তাহার হাসি পাইল। সত্যই সে কিছু আর হাত পাতিবে না, কিন্তু যদি পাতেই, একটা পয়সা তাহাকে কে দিবে ? এদেশে ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে, তৎপরিবর্তে তাহাকে খাটিয়া খাওয়ার সুপরামর্শ দেওয়া এখন রীতি। খাটিলেই খাইতে পাওয়া যায়, একথা বলিয়া নিজেকে এবং পরকে প্রবঞ্চনা করিতে কাহারও বাধে না।

কিছুদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, বুঝিল, দাঁড়াইয়া থাকাও চলিবে না। পাশে যে দোকান দেখিল তাহারই খোলা দরজায় ঢুকিয়া পড়িল এবং চৌকাঠ পার হইয়াই সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। মনে হইল, পায়ের নীচে হইতে হঠাৎ কে মাটি সরাইয়া লইল। হাঁটুর নীচে হইতে পা-দুইটা সেইসঙ্গে যেন তাহার নাই। চতুর্দ্দিকের পৃথিবী বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, তাহাকে ঘিরিয়া ছোট ভিড় জমিয়াছে। কে একজন বলিল, "মিরগীর ব্যামো… বড়বয়ের ছিল, ও আমি দেখলেই চিনতে পারি।" আর একজন কে পশ্চাৎ হইতে হাঁক দিয়া কহিল, "মুখটা একবার শুঁকে দেখ্‌ত রে!" তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করিল, "না না, সেসব কিছু না, দেখছ না কি রকম শাদাটে মুখ। বোধ হয় হার্টের অসুখ। চোখেমুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলে উপকার হত।" কিন্তু অজয় কোথাকার কে, তাহার জন্য ক্লেশস্বীকার করিয়া কেহ আর জল আনিতে গেল না। কেবল একটু পরে অজয় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া শেষোক্ত মানুষটি তাহাকে ধরিয়া একটা টুলের উপর বসাইয়া দিল।

ভিড় ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। দূর হইতে দোকানী স্বয়ং মোটা গলায় হাঁক দিয়া কহিল, "কি মশাই, এখন একটু ভাল বোধ করছেন ?"

অজয় বলিল, 'হ্যাঁ! ধন্যবাদ। আর একটুক্ষণ বসতে পারি ?"

দোকানী বলিল, "অবাধে। যতক্ষণ খুসি ব'সে যান। কি হয়েছিল আপনার ?"

অজয় বলিল, "পায়ে পা বেধে প'ড়ে গেলাম। শরীরটা ভাল ছিল না।"

দোকানী বলিল, "কাছেই কি আপনার বাড়ী?"

অজয় হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সংক্ষেপে কহিল, "না, দূরে।"

দোকানী বলিল, "যতক্ষণ দরকার জিরিয়ে একটা গাড়ী ডেকে চ'লে যান।" তারপর নিজের কাজে মন দিল।

বসিয়া বসিয়া অজয় ক্লান্ত অলস দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্‌টাকে দেখিতে লাগিল।—পুরান বইয়ের দোকান। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাটী, সকল ভাষার বই। দশবৎসরের পুরাতন ডায়েরী, অকেজো রেলওয়ে টাইম-টেবল্‌, অপ্রচলিত আইনের কেতাব, ডজন ডজন রহিয়াছে। অবশ্য সেই সঙ্গে কাজের বইয়েরও অভাব নাই। অজয় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই একটি কলেজের ছেলে গোটা ছয়-সাত বই রাখিয়া তিনটি টাকা লইয়া গেল। অজয়ের সহসা মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে কালো অন্ধকারের স্তূপগুলি যেন টলিতে টলিতে সরিয়া গেল। একটা কালো কঠিন লোহার সিন্দুকের গায়ে মাথা খুঁড়িতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তাহার কুলুপে চাবি দেওয়া নাই। বিনা বাক্যব্যয়ে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া সে বাড়ীর পথ ধরিল।

সন্ধ্যায় একপয়সার একটা শিঙাড়া চাহিয়া লইয়া খাইবার কথা যাহার মনে হইয়াছিল, রাত্রিতে একসঙ্গে পাঁচপাঁচটা টাকা পাইয়াও যে সে খুব বেশী খুসী হইল তাহা নহে। অন্ততঃ খুশী যতটা হইল, ঠিক ততটাই অনুতাপ তাহার সঙ্গে মিশিয়া রহিল।···তাহার এত আদরের বইগুলি! লোকে পেটের দায়ে কোলের ছেলেকেও বিক্রয় করে শুনিয়াছিল, কথাটার অর্থ আজ হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহাছাড়া, যদিও টাকার মূল্যে বইগুলির মূল্য হয় না, তবু এতগুলি বই, পাঁচটা মোটে টাকা!

এত যে দুর্ব্বল বোধ করিতেছিল, মাখন-সহযোগে দুইটুকরা রুটি এবং একটি অম্‌লেট পেটে পড়িতেই সে দৌর্ব্বল্য এবং ক্লান্তি কোথায় মিলাইয়া গেল। তিনদিন

উপবাসী ছিল, ইচ্ছা করিলেই সেকথা এখন আর সে মনে না আনিতে পারে। কিন্তু তাহার এত আদরের বইগুলিকে রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে চোরাই মালের মত বহন করিয়া সে যে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে, সে কথাই কি মনে করিয়া রাখিবার? পৃথিবীতে এমন কি কথাই বা আছে যাহা মনে করিয়া রাখিতে পারিলে সে খুসী হয়? এতদিন ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন লইয়া কাটিত, আজ গোলদীঘির পুরান-বইয়ের দোকানটা ছাড়াইয়া আর বেশীদূর অবধি নিজের ভবিষ্যৎকে চেষ্টা করিয়াও ত সে ভাবিতে পারিতেছে না। মনে পড়িল, দু-মাসের উপর হইতে চলিল তাহার পিতা তাহার খবর লন নাই। আর্থিক সম্বন্ধ শেষ হইবার পর সেও যে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখে নাই, তাহা ভাবিল না। কলিকাতার বন্ধুদের ইচ্ছা করিয়াই নিজে সে কিছু করিতে দেয় নাই, তবু তাহাদিগকে লইয়াও তাহার মনে অভিমানের শেষ নাই। আজ সকলকে, সমস্ত-কিছুকে সে ভুলিয়া যাইতে চায়। চতুর্দ্দিক্ হইতে খণ্ডিত তাহার এই অতিক্ষুদ্র জীবনকে লইয়া অকারণে এত বেশী আড়ম্বর আর সে করিতে চাহে না। কোথাও তাহার জন্য কিছুমাত্র বেদনা জাগিতেছে না, তাহার অনাহারের দুঃখ কাহারও মুখের অন্নপানীয়কে বিস্বাদ করিতেছে না, এ উপলব্ধি তাহার সমস্ত জীবনকে জুড়িয়া থাকুক। তাহার অতীত নাই, তাহার ভবিষ্যৎও নাই। পুরাতন অজয়, ঐন্দ্রিলাকে যে ভালবাসিত, দিনান্তে বীণাকে দেখিতে পাইলে যে খুসী হইত, তাহার যেন মৃত্যু হইয়াছে। এখনকার অজয়ের কোন স্মৃতি নাই, সে স্মৃতির আনন্দ-বেদনাও নাই। উপবাসে যেমন গ্লানি কাটিয়া গিয়া শরীরের মধ্যে একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা আসে, তাহার এই বৈরাগ্যও তেমনই তাহার মনের মধ্যে একটি শুচি শুভ্র প্রসন্নতা আনিয়া দিল। কোনও কিছু লইয়া ক্ষুব্ধ হইবার, পীড়িত হইবার, অনুশোচনা করিবার তাহার আর কোনও প্রয়োজন রহিল না।

২৬

সুভদ্র ছাড়া ক্লাবে আর নিয়মিত এখন যে আসে সে ঐন্দ্রিলা। সুলতাকেও সব দিন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, সুযোগ পাইলেই বালিগঞ্জে বীণার কাছে গিয়া জোটেন। মেয়েদের মধ্যে আরও কেহ কেহ, ছেলেদেরও দুএকজন লুকাইয়া বালিগঞ্জেই সান্ধ্য মজলিশ জমাইতে যায়, ঐন্দ্রিলা তাহা জানে। বিমানেরও খুব ইচ্ছা, রিহার্সালটা হাজরা রোডে না হইয়া বালিগঞ্জে হয়, কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাহাকে আমল দেয় না। মনে যাই থাকুক, মুখে বলে, "সেখানে গেলে কাজ ত হবে না, আড্ডাই হবে সারাক্ষণ। বলুন, অভিনয়ে দরকার নেই, তারপর আড্ডা দিতে চলুন, আমি বাধা দেব না।" মনে যে কি আছে, নিজেও সে ভাল করিয়া তাহা জানে না। বাড়ীতে মায়ের জ্বালায় দুদণ্ড তিষ্ঠান এমনিতেই তাহার প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সম্প্রতি কন্যা অভিনয়ে নামিতেছে শুনিয়া তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়াছেন যে দিনের মধ্যে খানিকটা সময়ও বাহিরে কোথাও পলাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেও একদিন ক্ষেপিয়া যাইবে। কিন্তু কেবল মায়ের কাছ হইতে পলাইতেই যে সে ক্লাবে আসে তাহা বলিলে সত্যকথা বলা হইবে না। মায়ের উপর রাগ করিয়া খানিকটা আসে তাহা ঠিক, বীণার উপরে রাগ করিয়াও খানিকটা। ক্লাবে অজয় ছাড়া অন্য মানুষগুলি কি মানুষ নহে, যে একজনের অভাব হইতেই এমন করিয়া আর-সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হইবে? অথচ এই বীণাই কথায় কথায় মানুষে মানুষে সম্পর্ককে এত বড় করিবে, যেন তুচ্ছতম মানুষকেও তার শ্রেষ্ঠ মূল্যটি দিতে সে যেমন জানে এমন আর কেহ জানে না।

অজয়ের কথাও কি কোনও একরকম করিয়া ঐন্দ্রিলার মনে আছে? অজয় আগ্রহ করিয়া ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে ডাকিত, ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে দেখিতে পাইলে তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, এই চিন্তায় ঐন্দ্রিলার কি লুকান কোনও

সুখ আছে? ক্লাবে আসিয়া সেই চিন্তা হইতে এতটুকু সুখও কি সে পায়?… সুভদ্র সুখী হইবে ভাবিয়া ক্লাবে অবশ্য সে ত আসেই।

ঐন্দ্রিলাকে ক্লাবে পাইয়া সুভদ্রের সবটুকুই যে সুখ তাহা নহে, বাছিয়া বাছিয়া ঠিক এই সময়েই ক্লাবের বনিয়াদে ভাঙন ধরিতেছে লক্ষ্য করিয়া তাহার দুঃখ বহুগুণ বেশী। এক এক করিয়া সভ্যসংখ্যা কমিতেছে। কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও সুভদ্র কিছু করিতে পারে না। তাহার কেবলই মনে হয়, ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া আনিয়া সে অপদস্থ করিল। শেষ অবধি অভিনয়ই যে হইবে তাহার ঠিক কি? যদি না হয়, অবস্থাটা খুবই চমৎকার দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুভদ্রের সে আকর্ষণী শক্তি নাই, আন্তরিকতার মধ্যে যাহার জন্ম, মানুষকে মানুষ যাহা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহার জীবনের আরও গভীরতর জায়গায় কত মানুষ আসিয়া ঘুরিয়া গেল, কাহাকেও সে বাঁধিতে পারিল না ত, বাঁধিবার চেষ্টাই কখনও সে করে নাই, আজ অত্যন্ত বেশী বাহিরের জায়গায়, কেবলমাত্র কথার আদানপ্রদান উপলক্ষ্য করিয়া একদল মানুষকে ধরিয়া রাখিতে আশা করে সে কি সাহসে? সুভদ্রের দিন সত্যই বড় দুঃখে কাটিতেছে।

বিমান তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া বলিতে চায়, ক্লাবের মানুষগুলির পরস্পর-সম্পর্কের মধ্যে একটুখানি আন্তরিকতার মশলা-সংযোগ করিবার চেষ্টা করিত একমাত্র বীণা। তাহাকে বাদ দিয়া ক্লাব জমাইবে আশা করিয়া থাকে যদি ত সুভদ্র ভুল করিয়াছে।

সুভদ্র বলে, "তাঁকে ত আর আমরা বাদ দিইনি, তিনিই আমাদের বাদ দিয়েছেন।"

বিমান বলে, "কিজন্যে দিয়েছেন তা ত তুমি জানোই ভাল ক'রে। তোমার উচিত তাঁকে আবার ধ'রে আনতে চেষ্টা করা।"

সুভদ্র বলে, "ওসব জোর-জবরদস্তিতে আমি বিশ্বাস করি না, তা ত জানোই।"

বিমান বলে, "কোথায় আর জানি। তোমার বিবেচনায় একমাত্র ঘুঁসির জোর ছাড়া আর কোনোরকমের জোরকে কেউ কাজে লাগাবে না। ক্লাবের কনষ্টিট্যুশনটা বদলে কুস্তির আখ্ড়া ক'রে নাও, সহজেই সব গোল মিটে যাবে।"

সুতরাং গোলটা আপাততঃ থাকিয়াই যায়।

বীণা বাড়ী ছাড়িয়া এই ক'দিন বাহির হয় নাই বটে, কিন্তু বাড়ীতে সে বসিয়া নাই। বীণা চুপচাপ বসিয়া আছে, এই অভাবনীয় দৃশ্য চোখে দেখিবার লোভে সময়ে-অসময়ে সুলতা আসিয়া হাজির হন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। সম্প্রতি দুতিনদিন দুই সখীতে অজয়ের ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিবার নানাপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব প্ল্যান লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সুলতা মাঝেমাঝে বলেন, "ক্লাবে তুই কি সত্যিই আর যাবি না ঠিক করেছিস্ ?"

বীণা বলে, "তোমার কর্ত্তার ব্যবহারে আমি একেবারে মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছি, সুলতাদি। ক্লাব আর না। পুরুষ জাতের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।"

সুলতা হাসিয়া বলেন, "তারিরই ব্যবস্থা করছিস্ বটে।"

ব্যবস্থা আরও অনেক কিছুরই সে করে। অজয়ের তিরোধানের পর হইতেই সে স্থির করিয়াছিল, আশেপাশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে একটু গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। প্রিয়গোপালের কাছে হার মানিয়াছে। বাড়ীতে ব্রিজের আড্ডা জমাইয়া তাঁহার মনকে গৃহাভিমুখী করিবে ভাবিয়াছিল; তিনি এখন রাত্রিতে বাড়ী থাকেন বটে, কিন্তু এমন ভাবে ব্রিজে ডুবিয়া থাকেন যে সে না থাকারই সামিল। হেমবালার সঙ্গে ঐন্দ্রিলার সম্পর্কের গলদ কোনখানে তাহা ঠিক ধরিতে পারে না বলিয়া সেদিকে বিশেষ কিছু করিতে পারে না।

ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া বীণা একবার বলিয়াছিল, "ক্লাব তোর ভাল লাগে না বেশ বুঝতে পারি, শুধু শুধু একটা মানুষকে চটিয়ে যে কি সুখ পাস্

তা তুই-ই জানিস্।” অভিনয়ে ঐন্দ্রিলা পার্ট লইতে চাহিলে হেমবালার পক্ষ হইয়া বীণাও তাহাকে বিধিমতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল ঐন্দ্রিলার আরও বেশী রোখ চাপিয়া গিয়াছে। অগত্যা বীণা ভাবিতেছে, কে জানে বাপু, হয়ত সুভদ্র-ঐন্দ্রিলার মধ্যেও লুকানো মনের সম্পর্ক কিছু একটা সত্যই আছে। যদি নিশ্চয় করিয়া জানিতে পায়, না-হয় তাহাদের মধ্যেকার আড়াল ঘুচাইতে প্রাণপণ করে। এমন যে পুঁটি এবং ভবতোষ, তাহাদেরও ইতিমধ্যে দুই-দুইবার সে ডাকিয়া চা খাওয়াইয়াছে। পুঁটি তাহার পর হইতে বীণার আর পিছন ছাড়ে না। বীণার কাছে সে সেলাই শিখিতেছে। বীণা বলিয়াছে, তোমার হষ্টেলের রাস্তা দিয়ে আর হাঁটবে না যদি কথা দেয়, ত তোমার রেশম পশম সুতো সমস্ত জোগাবার ভার ওকে দিই।”

আর সকলেরই কথা বীণা ভাবে, কেবল কি-কারণে বলা যায় না, বিমান সম্বন্ধে সে নিষ্ঠুর। সুলতা ইহাই লইয়া তাহাকে একবার তিরস্কার করিলে সে বলিয়াছিল, “কি জানি বাপু, সত্যি ওর ওপরে আমার কিছু রাগ নেই। তবে ওকে জব্দ করতে পারলে আমার লাগে ভাল। একটা ঝাঁঝাল কথা ব'লে এই মনে ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায়, যে অন্ততঃ মানে বুঝতে গোল করবে না।”

বীণা কি অবশেষে সুভদ্রের ক্লাবের সমস্যারও একটা সমাধান করে? একটির পর একটি করিয়া সুভদ্রের ক্লাবের খসিয়া-পড়া মানুষগুলিকে সে কাছে টানে। বাড়ীতে ডাকে, না ডাকিতেও অনেকে আসে, সেই যাহারা সুযোগ পাইলেই বীণাকে ঘিরিয়া গোল হইয়া ভিড় করিত; মেয়ে পুরুষ দুয়েরাই। একদিন রিহার্সালের পর ঐন্দ্রিলাকে পৌছাইতে আসিয়া সুভদ্র দেখিয়া গেল, সেখানে পুরাদস্তুর ক্লাব বসিয়াছে। সে যেমনটি চাহিতেছিল, তাহাই। এখানে এখন আর স্ত্রী-পুরুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়া বসে নাই। একটি অপরূপ আত্মীয়তার সূত্রে বীণা অলক্ষ্যে এই মানুষগুলিকে একসঙ্গে করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছে।

বীণার জন্মদিনের তখন আর বেশী দেরি নাই, সেই উপলক্ষ্যে শহরের বাহিরে কোথাও চড়িভাতি করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বীণা আপত্তি করিয়া বলিতেছে, "হাঁ, আমিও একটা মানুষ, আমার জন্মদিনে আবার চড়িভাতি হবে।"

একজন ভক্ত বলিল, "আর কারুর জন্মদিন কাছাকাছি নেই তার করব কি ?"

বীণা বলিল, "জন্মদিন নেই বা থাকল কারুর।"

ভক্ত বলিল, "তা কি হয় ? উৎসব করতে হলে জন্মদিন চাই। এই শিক্ষাই ত এতদিন ধ'রে আপনার কাছে পাওয়া। মানুষকে বড় ক'রে ধ'রে রেখে তারপর আর সব-কিছু।"

অনেক রাত অবধি স্নলতাকে সেদিন বীণা ধরিয়া রাখিল। নিভৃতে তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মানুষকে বড় ক'রে ওরা উৎসব করতে চায়, কিন্তু সেই একই কারণে আমার জীবনে যে কোনো উৎসব থাকতে নেই, একথা ওদের আমি কি ক'রে বোঝাব ?"

ইহারই দিন-তিনেক পরে আবার একবার অজয়ের দরজায় ঘা পড়িল।

দরজায় ঘা পড়া সম্বন্ধে অজয়ের মনে এখন একটা কুসংস্কারাপন্ন ভয়। তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়া হাতের আঙুলে চুলগুলিকে ঠিক করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখে, প্রিয়গোপাল ও স্নলতা স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া! এত বিস্মিত হইল, নমস্কার করিতে স্নদ্ধ ভুলিয়া গেল। স্নলতাই আগে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "অজ্ঞাতবাস কাটল, শ্রীবৎস মহারাজ ?"

অজয় বলিল, "কি ক'রে কাটল তাই ভাবছি; কারণ শনির প্রকোপ একেবারেই কাটেনি এখন পর্য্যন্ত।"

স্নলতা বলিলেন, "তা না-ই কাটুক, সম্প্রতি এই শনিঠাকুরের প্রকোপটা সাম্‌লান ত! আপনি Box No. w332কে চিঠি লিখেছিলেন না ? ইনিই হচ্ছেন Box No. w332"

প্রিয়গোপাল বিলাতী প্রথায় সম্মুখের দিকে ঈষৎ একটু ঝুঁকিলেন।

অজয়ের মনে পড়িল, মাত্র দুইদিন আগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিল, কে একজন গ্রন্থকার নিজের কয়েকটা ইংরেজী আইনের বই বাংলায় তর্জ্জমা করাইতে চান, ভাল বাংলা লেখা অভ্যাস আছে এমন একটি অনুবাদকে তাঁহার প্রয়োজন, মাসে ১৫০৲ মাহিনা।—অনুবাদক নিজের বাড়ীতে বসিয়া কাজটা করিতে পারিবেন। কাজটা পাইবে আশা করিয়া চিঠি লেখে নাই।

বহু পূর্ব্বেই যে অতিথিদের ভিতরে ডাকা উচিত ছিল, অজয় তাহা জানিত। ডাকিতে হইবেই, ইহাও তাহার অজানা ছিল না। তবু কি মনে করিয়া দেরি করিতেছিল সে বলিতে পারিবে না। কোনও অভাবিত উপায়ে সমস্যাটা মিটিয়া যাইবে, আজও কি এই আশাই সে করিতেছিল? সহসা সচকিত হইয়া বলিল, "ভেতরে আসবেন না?

সুলতা কহিলেন, "আপনি ডাকলেই আসতে পারি।"

সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীটার গরাদে দেওয়া সঙ্কীর্ণ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে জীর্ণ তক্তপোষের উপর অতিথিদের বসিতে দিয়া অজয় লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। জানালাটাকে ভাল করিয়া খুলিয়া দিল, কেরোসিন কাঠের বাক্সটার মধ্য হইতে সুলতার জন্য একটা হাতপাখা বাহির করিল।

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "আপনি বসুন।"

সুলতা কহিলেন, "বসবেন এখন, সম্প্রতি তুমি একটু ওঠ দেখি!"

প্রিয়গোপাল উঠিলে দেয়ালের আলনায় লম্বিত একটি শাল পাড়িয়া লইয়া অজয়কে কহিলেন, "শীত ত কেটে গেছে, এটা নিশ্চয়ই আর এখন আপনার কিছু কাজে লাগে না?"

অজয় বলিল, "না, রাখবার আর জায়গা নেই, তাই ওটা ওখানে ঝুলছে।"

অজয়ের ময়লা বিছানা বালিশ সেই শালটা দিয়া সুলতা চাপা দিয়া দিলেন। ধূলিঝুল যথাসাধ্য ঝাড়িয়া কেরোসিন কাঠের টেবিলটাকে নিপুণ হাতে গুছাইয়া দিলেন। রেড়ীর তেলের বাতিদানটাকে টেবিলের নীচে চালান করিয়া বলিলেন,

"দিনের বেলা এটা বাইরে থাকবার কিছু কি দরকার আছে?" অজয়কে স্বীকার করিতে হইল, দরকার নাই। নন্দ যে গেলাসটাতে জল খাইত, এই ক'দিন সেটা মেজের এককোণে ধূলিধূসরিত হইয়া পড়িয়া আছে। সেটাকে ধুইয়া মুছিয়া জল গড়াইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, তারপর পিছনের স্বল্পপরিসর বাগান হইতে যে-একটি পল্লবিত আম্রশাখা মুকুলিত মঞ্জরীর অর্ঘ্য বহিয়া অজয়ের জানালার কাছে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাহা হইতে কয়েটি গুচ্ছ ভাঙিয়া লইয়া সেই গেলাসে সাজাইয়া দিলেন।

অজয় বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। প্রিয়গোপাল বলিলেন, "দেখছেন কি? এখনো ত আসলই বাকী।"

স্থলতা বলিলেন, "না, হয়েছে, আর বাকী কিছু নেই।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বাকী কিছু নেই কিরকম? আমের বীচি থেকে গাছ হবে, বোল ধরবে, আম ফলবে, পাকবে, সে খেলাগুলো আজ দেখাবে না?"

স্থলতা মৃদু হাসিলেন। অজয় ব'লিল, 'সত্যিই আপনি—আপনি যাদু জানেন।"

প্রিয়গোপাল কহিলেন. "তা আর বলতে? নইলে আমার মত মানুষ—"

স্থলতা কহিলেন, "থাক থাক, তোমাকে যাদু করতে স্বয়ং Circeও পারত কিনা সন্দেহ, আমি ত কোন্ ছার!"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "দেখছেন ওর বিনয়? নিজেকে Circeর সমকক্ষও মনে করে না।"

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর অজয়কে বাহিরে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া স্থলতা কহিলেন, "কাজটা আপনি করবেন?"

অজয় বলিল. "আপনার কাছে কিছু ত আর লুকানো নেই। আমার পুরানো পরিচিত জগৎটায় ফিরে যাবার মত অবস্থায় আমি এখন আর নেই।"

স্থলতা একটু ভাবিয়া লইয়া কহিলেন, "তা বেশ, আসতে না চান, আসবেন না। উনি আপনাকে কাজ বু'ঝয়ে দিয়ে যাবেন, বাড়ী ব'সে করবেন।"

অজয় বলিল, "বেশ, করব, কিন্তু পারিশ্রমিক ব'লে কিছু নিতে পারব না।"

সুলতা কহিলেন, "তা কি হয় কখনো? তা কেন উনি আপনাকে করতে দেবেন?"

অজয় নতমুখে ধীরভাবে বলিল, "কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কোনও পরিশ্রমের মূল্য নিতেও আমি পারব না।"

সুলতা কহিলেন, "আপনি জিনিষটাকে কিভাবে দেখছেন তা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি ভাববেন না। এ কাজটার কথা তাহলে থাকুক। কিন্তু আপনি খুবই worried বুঝতে পারছি, শরীরও আপনার ভেঙে গিয়েছে। এ রকম একলাটি এক কোণে প'ড়ে না থেকে বন্ধুবান্ধব পাঁচজনের সঙ্গে মিলে চেষ্টা করলে, পাঁচজনকে চেষ্টা করতে দিলে অবস্থাটার প্রতিকার হওয়া কি একটু সহজ হত না?"

অজয় বলিল, "হয়ত হত, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য নেবার দরকার সত্যিই আছে সেইটে ভাল ক'রে আগে জানতে চাই।"

অজয়কে আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া সুলতা কেবল কহিলেন, "হুঁ!"

প্রিয়গোপাল ভিতর হইতে ডাকিলেন, "হ'ল তোমাদের? আর কতক্ষণ একলা ব'সে থাকব?"

সুলতা বলিলেন, "এই যে যাচ্ছি। শুনুন অজয়বাবু। আমারই ভুল হতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক, যে, জিনিষটাকে আপনি যে ভাবে দেখেন, আমরা সেভাবে দেখিনে। বন্ধুদের সাহায্য সব সময় যে কেবল সাহায্য হিসেবে নিতে হয় তা নয়, কর্ত্তব্য হিসেবেও নিতে হয়। বন্ধুকে সাহায্য ক'রেই মানুষের বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না, তার কাছে সাহায্য নিয়ে সে কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে হয়। সেটা না নিলে মমতার যে অভাব প্রকাশ পায় তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এটা বোঝা ত শক্ত নয়, সাহায্য নেবেন না ব'লে যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আপনার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করা তাদেরও সেই সঙ্গে কঠিন হচ্ছে?"

অজয় বলিল, "কথাটাকে ওভাবে কখনো চিন্তা করিনি।"

সুলতা কহিলেন, "তাহলেই বুঝুন, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দেওয়া নেওয়াতে বিশেষ তফাৎ নেই কিছু, একটিকে ছেড়ে আর একটির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। বন্ধুদের স্নেহ-সহানুভূতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, নিজে দুঃখ ভোগ ক'রে, সেই দুঃখ তাদের দিয়ে আপনি তাদের কোনো উপকার করছেন না। এইটেই বরং তাদের বলছেন, বন্ধুত্ব ভাবাবেগের জিনিষ। মনেই তার উদয়, মনেই তার লয়। অপরের কাছ থেকে কোনো স্বার্থত্যাগ আশা করেন না এইজন্যেই, যে, নিজেও কারুর জন্যে কোনো স্বার্থত্যাগ করতে আপনি প্রস্তুত নন। পৃথিবীতে অপরের জন্যে স্বার্থত্যাগ, অপরের জন্যে চিন্তা, অপরের জন্য হাসিমুখে দুঃখভোগ, এ-সমস্তের আপনার কাছে কোনো অর্থ নেই, কেবল নিজেকে নিয়ে থাকারই অর্থ আছে। স্বার্থবুদ্ধি থেকে কোনো কাজ করা আপনার সাধ্য নয় তা জানি; কিন্তু হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ। আপনাকে আমি বলছি, আপনি দেখবেন।"

অজয় নীরবে দুই ঠোঁট চাপিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, "আমাকে আর তিরস্কার করবেন না। যদি হবার হয় এইতেই আমার চৈতন্য হবে।"

সুলতা প্রিয়গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমাদের হয়েছে, এসো তুমি, এইবার যাওয়া যাক।" অজয়কে বলিলেন, "যদি কিছুমাত্র সহৃদয়তা আপনার মনে থাকে, আপনার উচিত হবে সুভদ্রের সঙ্গে দেখা করা, বীণার সঙ্গে দেখা করা।—আজ এই পর্য্যন্তই রইল।"

পথে আসিতে প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বোঝাতে পারলে একটুও?"

সুলতা কহিলেন, "নিজে ইচ্ছা ক'রে যে ভুল বুঝবে তাকে বোঝানো আমার কর্ম্ম নয়। দুঃখ পেতে এবং দিতেই ওর ভাল লাগে। আসলে মনের দিক্ দিয়ে ও পূরোদস্তুর একটি সুইসাইডের টাইপ।"

প্রিয়গোপাল একটা হাই তুলিয়া কহিলেন, "তবু ওর মধ্যে কি দেখলে তোমরা সবাই মিলে কে জানে ?"

স্থলতা কহিলেন, "ওর দুঃখটাকেই দেখেছি।" তারপর চুপ করিয়া গেলেন।

২৭

কলেজের পর বাড়ী না গিয়া ঐন্দ্রিলা সেদিন সোজাসুজি হাজরা রোডে গিয়া হাজির হইল। একরাশ ধোপার কাপড়ের ওপার হইতে স্থলতা কহিলেন, "কি রে ইলু, আজ যে এত সকাল সকাল ?" সে কথার কোনও সদুত্তর তাহার মুখে জোগাইল না। স্থলতার কচি ছেলেটাকে জুটাইয়া আনিয়া অনভ্যস্ত হাতে তাহাকে এমন চটকাইল, যে তাহার আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে সদসৎ কোনও প্রকার উত্তর শুনিবারই স্থলতার আর অবসর রহিল না। সেই অবকাশে ছাতে চলিয়া আসিয়া আধ ঘণ্টা-খানেক পায়চারি কবিয়া বেড়াইল।

হেমবালাকে লইয়া সত্যসত্যই ঐন্দ্রিলার বিপদের একশেষ হইয়াছে। ভ্রাতার সংসারে আসিয়া তাঁহার স্বভাবের সে তেজ কোথায় গিয়াছে, নিজের কন্যাকেও এখন সোজাসুজি কিছু বলিতে তিনি ভয় পান। কিছুদিন ধরিয়া কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া ভ্রাতার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যায় কি সমস্ত নিভৃত আলোচনা চলিতেছে। বীণার তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করিবার যোগ্য বলিয়াই সে এতদিন মনে করে নাই, কিন্তু ঐন্দ্রিলা আজ অকস্মাৎ সেই সূত্রে তাঁহাকে কঠিন কয়েকটা কথা শোনাইয়াছে। বলিয়াছে, পিতা হইতে কোনওদিন দিদি তোমাকে ত কম মান্য করে নাই, বলিবার যাহা তাহা তাহার মুখের উপর না বলিয়া তোমার ভাইয়ের মুখ দিয়া যদি তোমাকে বলিতে হয় তাহা

হইলে নিজের সেই মান তুমি বজায় রাখিবে কিরূপে? রাগের মাথায় আরও কিছু হয়ত বলিয়াছে, এখন সব ভাল করিয়া মনে নাই। হেমবালা সেই হইতে শয্যা লইয়াছেন। পায়ে ধরিয়া বিস্তর সাধাসাধি করিয়াও বীণা তাঁহাকে সকালের খাবার স্পর্শ করাইতে পারে নাই।

কলেজ হইতে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরভিনয় দেখিতে তাহার ইচ্ছা করে নাই।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা দেখিতে না চাহিলেই ত আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার অবসান হইয়া যাইবে না, যখনই বাড়ী ফিরুক হেমবালার দুর্দ্দম অভিমান তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই থাকিবে। ফিরিতে সে যত বেশী দেরি করিবে, হেমবালার অভিমান তত বেশী হইবে। কিন্তু আসল ভয় সেটা নয়। এতদিন কন্যা ছিল অভিমানের একমাত্র অবলম্বন। এবারে বীণার সংসারযাত্রার সঙ্গেও তাঁহার মান-অভিমানের পালা সুরু হইয়াছে। এই ভাবে চলিতে থাকিলে শেষ অবধি কোথায় গিয়া তিনি দাঁড়াইবেন কে জানে?

হায় রে, যে ছিল রাজরাণী, তাহার আজ এ কি দুর্গতি! ইহার চেয়েও বড় কি দুর্গতি তাঁহার কপালে লেখা আছে কে জানে? যা ক্রোধন তাঁহার স্বভাব, স্বামীর সংসারের মত হঠাৎ কোন্‌দিন ভাইয়েরও সংসার ছাড়িয়া হয়ত একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইবেন। বাবা গো, ভাবিতেও ঐন্দ্রিলার বুকের রক্ত যেন জমিয়া বরফ হইয়া আসে!

দেয়ালের আলিসায় বাহুর ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ঐন্দ্রিলা আর কোনও দিকে মনটাকে জোর করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বেচারা সুভদ্রবাবু! ক্লাবে এবার সত্যসত্যই ভাঙন ধরিয়াছে। বিসর্জ্জনের অভিনয়ও হয়ত শেষ অবধি হইবে না, হাওয়ার প্রয়োজনও কিছু নাই। কিন্তু ক্লাবের জন্য টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যেই যে অভিনয়ের আয়োজন, ভদ্রলোক সেকথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ক্লাব নিশ্চয় টিঁকিবে না জানিয়াও, রোজ

ছুটাছুটি করিয়া লোক জুটাইয়া আনিয়া রিহার্সালের আসর জমানোটা ঠিক আছে। সুলতা বলেন, "ওকে তুই চিনিস্ না। ক্লাব নিশ্চয়ই টিকবে না, কেবল যে সেই কথাটাই তার জানা তা নয়, অভিনয় শেষ অবধি হবে না এও নিশ্চয় ক'রেই জানে। তবু যতদিন একজনও মানুষকে ধ'রে আনতে পারবে, এনে সে রিহার্সাল দেওয়াবে।"

বাস্তবিক কথায় কথায় নিজের মতামত জাহির করা সুভদ্রের স্বভাব, কিন্তু এই একটা জিনিষ তাহার স্বভাবে আছে যা তাহার সমস্ত রকম মতবাদের বাহিরের। অন্ততঃ সে-সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচার করিতে কখনও তাহাকে শোনা যায় নাই। শুদ্ধমাত্র কাজের মধ্যেই হয়ত তাহার মনের কিছু একটা আশ্রয় আছে, কে জানে। অথবা সমস্ত রকম কাজেরই প্রতি তাহার আসল মমতা এত কম, যে সেগুলির একেবারে মরামুখ না দেখা পর্য্যন্ত কিছুতেই দমিবার কথা তাহার মনে হয় না।

হাতের কাজ চুকাইয়া আসিয়া ছাতের সিঁড়ির মুখ হইতে সুলতা ডাকিলেন, "ইলু!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এসো।"

সুলতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "না, আর আসব না। জানতে এলাম তোর জন্যে কি চা করতে দেব, না বাড়ীই যাবি আমার সঙ্গে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি এখুনি যাচ্ছ নাকি আমাদের বাড়ী?"

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ। বিকেলে তোদের বাড়ী চা খাবার নেমন্তন্ন বীণাকে ধ'রে আদায় হয়েছে। অবিশ্যি তুই চাস্ ত এইখানে থেকে যেতে পারিস্।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বাপ রে, বাড়ীতে তোমাকে চা খেতে ডেকেছে আর আমি থাকব না, দিদি কি তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে? তাছাড়া আমাকে বলেওছিল চায়ের কথা।"

প্রিয়গোপাল তখনও কোর্ট হইতে ফিরেন নাই। ঐন্দ্রিলাকে লইয়া বালিগঞ্জে

আসিয়া স্থলতা দেখিলেন, বীণা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়া আছে। তাহার জানা অজানা ভক্তদের, বন্ধুদের, সকলকে চা খাইতে ডাকিয়াছে। হল্‌দে শেড দেওয়া আলোর মৃদু গাম্ভীর্য্য, ড্রয়িং রুম গমগম করিতেছে। বহুজনসমাবেশের মধ্যে কানাকানি করিয়া কথা বলা সহজ, ঘাড় সুদ্ধ বীণার মাথাটাকে একটু কাছে টানিয়া স্থলতা কহিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এ করেছিস কি ?"

বীণা কহিল, "কি করেছি ?"

স্থলতা কহিলেন, "তোকে নিভৃতে খবরটা দেব ব'লে এলাম, ইলুকে সুদ্ধ রেখে আসছিলাম, সে থাকতে চাইল না, আর তুই এদিকে বিশ্বসুদ্ধকে জুটিয়ে নিয়ে ব'সে আছিস ?"

বীণা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সবাইকেই কি আর জুটিয়েছি, নিজে থেকেও কেউ কেউ জুটেছে। সে যাক। নিভৃতে কথা বলবার সুযোগ তুমি এরপর ঢের পাবে। আসল যে কথাটা তোমার আমায় বলা দরকার, সে আমার শোনা হয়ে গিয়েছে।"

স্থলতা বলিলেন, "সে কি, কার কাছে শুনলি ?"

বীণা বলিল, "তোমার কর্ত্তাকে হঠাৎ কি শুভমতিতে ধরল, দুপুরে টেলিফোন ক'রে আমায় সব বলেছেন।"

স্থলতা গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখেছ কাণ্ড! নাঃ, পুরুষ জাতকে সত্যিই বিশ্বাস নেই। এতবার ক'রে বলতে বারণ করলাম, নিজে তোকে সারপ্রাইজ দেব ব'লে; প্রাণ ধ'রে সেটুকু স্বার্থত্যাগ আমার জন্যে আর করতে পারলেন না।"

বীণা কহিল, "যাক্, এ নিয়ে তুমি আর রাগ কোরো না স্থলতাদি। রাগারাগি করা, দুঃখ করা আজকের দিনে বারণ।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ব্যাপারখানা কি শুনি ? কি তোমাদের হ'ল আজ হঠাৎ ? আজকের দিনটা আমার চোখে ত এমন কিছু আশ্চর্য্য ঠেকছে না, অন্য দিনগুলিরই

মত হাড়-জ্বালানেই ত দেখতে পাচ্ছি। বরঞ্চ অন্যদিনের চেয়ে ঢের বেশী রাগারাগি ক'রে আজি সুরু করেছি।”

অনাহূত এবং রবাহূতদের দলে বিমান ছিল। অজয়ের খবরটা ততক্ষণে জানাজানি হইয়া গিয়াছে, অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল, “যার জন্যে এত ঘটা তাকেই কেন কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?”

বীণা কহিল, “বেচারা একবার বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল, তাকে দেখবার গরজ আপনাদের এত বেশী যে জ্বালাতন হয়ে এবারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।”

ঐন্দ্রিলা কহিল, “অজয়বাবু ফিরেছেন?”

বিমান কহিল, “শীগগিরই ফিরবেন, খবর পাওয়া গিয়েছে।”

বীণা কহিল, “ভাগ্যিস বিমানবাবু ছিলেন, তাই খবরটা পাওয়া গেল।”

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, “হেঁয়ালী না ক'রে, কি হয়েছে ছাই বলো না।”

সুলতা সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিলেন।

অজযের কৃচ্ছ্রসাধনের বর্ণনা শুনিয়া ঐন্দ্রিলা ইহার পর একেবারেই গম্ভীর হইয়া গেল।

চা আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাহু! বীণা উঠিয়া গিয়া তদানুষঙ্গিক আহার্য্য পরিবেষণে রত হইল; বিমানের মুখে চোখে আজ খুসি উপচিয়া পড়িতেছে। বীণার নিকট হইতে ক্রমাগত মুখনাড়া পুরস্কার লাভ করা সত্ত্বেও কিছুতেই সে তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। কহিল, “যদি বলেন ত আপনাকে বৌবাজারে নিয়ে যাই।”

বীণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, “কেন, আমাকে আপনার সঙ্গে না দেখতে পেলে অজয় বাবু খুসী হবেন না?”

বিমান এবারে জিভ কাটিয়া বলিল, “বাপ রে, এতবড় কথা ম'রে গেলেও আমার মনে আসত না।”

বীণা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ম'রে গেলে বড় ছোট কোনো রকম কথাই মানুষের মনে আসে না।"

বিমান বলিল, "আমি বলতে চাচ্ছি ম'রে গিয়ে নতুন ক'রে জন্মালেও আপনাকে আমার পাশে দে'খে কেউ খুসী হচ্ছে এমন কথা আমি ভাবতে পারতাম না।"

এবারে বীণা হার মানিল, ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক, থাক, ঢের compliment দেওয়া হয়েছে, এবারে চুপ ক'রে এক জায়গায় ব'সে চা-টা খেয়ে নিন দেখি।"

সকলের একপালা চা খাওয়া হইয়া গেলে প্রিয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া সুভদ্র আসিল। সমস্ত দিন নানা ধাঁদায় বাইরে বাইরে ঘুরিয়াছে, অজয়ের খবর সে জানিত না। যথারীতি রিহার্সালে উপস্থিত হইবে মনে করিয়া ক্লাবে আসিয়াছিল, প্রিয়গোপাল তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন। সেদিন ক্লাব সুরু হইতেই পূজারীদের কোরাসও সুরু হইয়াছে, "ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ডু বেয়ে, ডাকিনী নৃত্য করে" …দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ডাকিনীর নৃত্য কি পদার্থ সে বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কাহারও বিন্দুমাত্র অভাব নাই! সুভদ্র কখন আসিল, কখনই বা চলিয়া গেল কেহ তাহা আর সেদিন লক্ষ্য করিল না।

একপ্লেট স্যাণ্ডুইচ হাতে করিয়া বীণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রিয়গোপাল কহিলেন, "দেখেছ ভদ্র, বীণা দেবী আসলে তোমার সবচেয়ে বড় rival। তুমি এত ক'রে ক্লাব জমাতে পারনি, এখানে কেমন অবলীলায় তা জমেছে।—আমি ত তাই বলি, এসব কি পুরুষ মানুষের কাজ?"

সুভদ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "ছোঁড়ার pride ব'লে যদি কোনো জিনিষ থাকে। একটু দুঃখ কর্, তা না, হাসি হচ্ছে।"

বীণা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাসবেন না ত কি! দুঃখ করবার হয়েছে কি

শুনি? ক্লাবটা সম্প্রতি নাহয় আমার বাড়ীতে বসছে, আসলে এটা ত সেই সুভদ্রবাবুরই ক্লাব?"

প্রিয়গোপাল কহিলেন, "বীণা দেবীর লজিক মানুষ যদি জীবনের সব ক্ষেত্রে মানতে পারত তাহলে অনেক দুঃখই পৃথিবীতে থাকত না।"

সুভদ্র কহিল, "মন্দিরা কেমন আছে, ভাল?"

বীণা কহিল, "ওর আবার ভাল থাকা-থাকি কি? দুদিন ভাল থাকে ত তিনদিন বিছানা নিয়ে শোয়। আজ উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছে।"

সুভদ্র কহিল, "একটু তাকে আনতে বলুন না, দেখব।"

বেহারাদের একজনকে মন্দিরার সন্ধানে বীণা উপরে পাঠাইল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, পিসীমা মন্দিরা বাবাকে নীচে আসিতে দিতেছেন না, বলিতেছেন, নীচের ভিড়ে গরমে তাহার অসুখ করিবে।

কথাটা শুনিতে পাইয়া ঐন্দ্রিলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, সেদিন আর নামিল না। হৃষীকেশ কি একটা কাজে এই মহলে আসিয়াছিলেন, হেমবালাকে লইয়া গোলযোগ সুরু হওয়ার পর হইতে এই কয়দিনই মাঝে মাঝে তিনি আসিতেছেন। সকলে উৎসব করিতেছে, ঐন্দ্রিলা একাকী শয্যা গ্রহণ করিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন তাহার কিছু একটা অসুখ করিয়াছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নানা রকম করিয়া তাহাকে জেরা করিলেন। ঐন্দ্রিলা কিছুতেই স্বীকার করিল না, তাহার কিছু হইয়াছে। ভাগিনেয়ী মিথ্যা কহে না, হৃষীকেশ জানিতেন। চিন্তাকুল মুখে প্রস্থান করিলেন।

বেশ রাত করিয়া চায়ের আসর ভাঙিলে সুলতাকে লইয়া বীণা উপরে আসিল। কহিল, "ইলু যে এত সকাল সকাল শুয়েছিস?···কিছু মনে কোরো না সুলতাদি। আমি এই ধড়াচুড়োগুলো খুলে ফেলি। গরমে একেবারে ভূত পালাচ্ছে।"

সন্ধ্যাবেলাকার শাদা বেনারসীর সাজ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া বীণা একখানি সরুপাড় ঢাকাই কাপড় পরিয়া আসিল। এলো খোঁপা

খুলিয়া ফেলিয়া মাথাটাকে একটা ঝাঁকানি দিল, টলটলে সুন্দর কপাল ঘিরিয়া, নিটোল গ্রীবামূল ছাইয়া স্ফীত কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িল। তাহার দেহ ভরিয়া আজ উন্মুখ-যৌবনের জোয়ার ডাকিয়া যাইতেছে, কিছুতে তাহাকে সম্বৃত করা যাইতেছে না। মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া সুলতা কহিলেন, "সত্যি, অজয় লক্ষ্মীছাড়ার বুদ্ধিসুদ্ধি যদি কিছু থাকত! কি জিনিষ যে অপাত্রে বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।"

ঐন্দ্রিলা বীণাদের দিকে পিছন করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, কহিল, "বাবা, সুলতাদি পুরুষ হলে দিদির আর নিস্তার ছিল না।"

সুলতা কহিলেন, "তা ত ছিলই না। কিন্তু তোর হল কি হঠাৎ, jealousy? তুই যে কত সুন্দর সে আবার আমাকে বলতে হবে কেন, বলবার মানুষ ত হাজিরই ছিল। সবাই চ'লে যাবার পরেও বেচারা সুভদ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে ছিল। অত চাল দেখিয়ে উঠে চ'লে এলি যে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "হাঁ, আমি ত সারাক্ষণই চাল দেখাতে ব্যস্ত।"

সুলতা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেন। কহিলেন, "শোন্। আমরা ত ভেবে মাথামুণ্ডু কিছু ঠিক করতে পারছি না। অজয় কেন এল না বলতে পারিস্?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তিনি কখন কি মনে ক'রে কি করেন তার সবই ত সারাক্ষণ তোমরা বুঝছ, এই একটা জায়গায় তাঁকে না-হয় না-ই বুঝলে?"

সুলতা কহিলেন, "আমার কিন্তু কথা কয়ে মনে হয়েছিল, ঠেলায় প'ড়ে বুদ্ধিসুদ্ধি এবারে খানিকটা হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সে বৃথা আশা।··· কি রে বীণি, তুই যে কিছু বলছিস না?"

বীণা নিজের বিনুনি লইয়া ব্যস্ত ছিল, কহিল, "কি আবার বলব?"

সুলতা কহিলেন, "বেশ, বেশ, যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মা গো মা, বিয়ে সুদ্ধু? কই, আগে ত সেকথা কিছু শুনিনি।"

এমন ভাবে বলিল, যেন সত্যসত্যই বিবাহের কথাই হইতেছিল। তাহার বলিবার ধরণে আমোদ পাইয়া বীণা এবং সুলতা দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

নীচে হেমবালার ঘরের কয়েকটি জানালাই পরপর শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

"অনেক রাত হয়েছে, এবার যাই," বলিয়া সুলতা উঠিয়া যাইতেছিলেন, এবারে ঐন্দ্রিলা জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল, কহিল, "কথাটা শেষ না ক'রে মোটেই যেতে পাবে না। কিছু এমন রাত হয়নি, আর হলেও তাতে কিছু এসে যায় না।"

বীণা কহিল, "কথাটা চট ক'রেই আমি শেষ করছি। অজয়বাবু আসুন না-আসুন তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

সুলতা কহিলেন, "তোর হল কি বল্ দেখি?"

বীণা কহিল, "তোমার কর্ত্তার কাছে থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়েছি।"

"ও তাই বল্। তারপর?"

"কাল ভোরে উঠেই নিজে যাব সেইখানে।"

সুলতা হাসিতে গিয়া হেমবালার কথা ভাবিয়া মুখে হাত চাপা দিলেন। ঐন্দ্রিলা সেই হাসিতে যোগ দিল না। একটু নড়িয়া বসিয়া কহিল, "দোহাই তোমার দিদি, ঐ কাজটি কোরো না। লোকটির মস্তিষ্কের স্ফীতি এমনিতেই কিছু কম নয়, সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে তুমি তার কিছু উপকার করবে না।"

বীণাও হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল, "তা স্ফীতি নাহয় একটু বাড়বেই। তার ঝুঁকি সামলাতে হবে ত আমাকেই?"

ঐন্দ্রিলা এবার একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, "সেইটেই তুমি এখনো নিশ্চয় ক'রে জানো না।"

বীণার হাসিতে এবার অলক্ষ্যে অল্প-একটু বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। কহিল, "এবারে জেনে নেব। তুই যা ভয় করছিস তাই যদি হয়, ঝুঁকি সামলাবার ভার যদি আমি ছাড়া আর কারুর ওপরই পড়ে, তাহলে ত আমার আরোই ভাবনা করবার কথা নয়।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে কথায় পারি না। যা ভাল ব'লে বুঝি বলেছি, এবারে তোমার যা-খুসি কর গিয়ে।" বলিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল।

বীণা আর হাসিতেছে না। ঐন্দ্রিলার কথা হয়ত তাহার মনে লাগিয়াছে। কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার হাসি। ঐন্দ্রিলার কথা তাহার মনে লাগে নাই।

স্থলতা এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এবারে কহিলেন, "ইলুর কথাটা সত্যি সত্যি ভেবে দেখবার মত বীণি, তা তুই যাই বলিস। তুইই বা কি এমন বানের জলে ভেসে এসেছিস? নিজেকে না-ই বা এত স্থলভ করলি? একদিক্ দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে তোর যাওয়া ত হয়েছেই। আমি যে সত্যিসত্যিই ওঁর scribeএর সন্ধানে অজয়বাবুর দরবারে গিয়ে হাজির হইনি, সে ত তিনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন? আমার যাওয়া মানেই তোর জন্যে যাওয়া।"

বীণা তবুও চেষ্টা করিয়া হাসিতেছে। ক্রমাগত বলিতেছে, "আমি বাপু যাবই, সে তোমরা যাই বল।"

২৮

প্রিয়গোপাল এবং স্থলতা চলিয়া যাইবার পর অজয় অনেকক্ষণ শাল ঢাকা দেওয়া বিছানাটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রথমেই নন্দকে মনে পড়িল। বেচারা নন্দ! পাছে অজয়ের মনে কোথাও কোনও বেদনার স্পর্শ লাগে এই ভয়ে জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতেও হাসিমুখ করিয়া সে চলিয়া গেল। আজ সে যে বাঁচিয়া আছে তাহার ঠিক কি? অথচ কেউ তাহার আর নাই জানিয়াও

অজয় দুই পা হাঁটিয়া গিয়া তাহার খোঁজ লয় নাই। কলহ করিয়া সুভদ্রকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু ছাড়িয়া আসিবার সময় তাহার দিক্‌টা একমুহূর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা করে নাই। সকলের কৌতূহলের পাত্র করিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ তাহাকে সে দিয়া আসে নাই। পিতাকে মনে পড়িল। তিনি না-হয় বড় আশায় নিরাশ হইয়া বেদনা পাইয়া দূরে রহিয়াছেন, কিন্তু সে কি বলিয়া এতদিন একটিবার তাঁহার সন্ধান লয় নাই? পিতার কর্ত্তব্য দেশ-কাল-পাত্র বিচারে সাধ্যাতিরিক্ত করিয়াই তিনি করিয়াছেন, কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্য সে নিজে কতটুকু করিয়াছে, যে, হিসাব করিয়া ওজন করিয়া অভিমান দিয়া অভিমানের ঋণ শোধ করিতে গেল? নিজের তরুণ হৃদয়ের এতটুকু বেদনায় তাহার অস্তিত্ব সুদ্ধ অবসন্ন হইয়া আসে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার বহু-বিফলতা, বহু-বেদনা জর্জ্জরিত হৃদয়ের দিকে কখনও কি সে চাহিয়া দেখিয়াছে?

সুলতা সত্যই বলিয়াছেন, অজয় স্বার্থপর। শুধু হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে নহে, জীবনের সর্ব্বত্র সমস্ত-কিছুতেই তাহার স্বার্থপরতা। ভাবিতে লাগিল, পিতা, নন্দ, সুভদ্র, ইহাদের কাহাকেও কোনওদিন সত্য করিয়া সে ভালবাসে নাই। তাহার অন্তরে ভাবাবেগের যে একটি বিলাসিতা আছে, শুধু তাহারই প্রয়োজনে অন্তরের মধ্যে ইহাদিগকে সে লইয়াছে। মনে হইল, হয়ত ঐন্দ্রিলাকেও সত্য-সত্যই সে ভালবাসে নাই। ভালবাসিতেছে কল্পনা করিয়া নিজের মনের চতুর্দ্দিকে একটি মোহলোক সৃষ্টি করিয়াছে, আসলে ঐন্দ্রিলা অপেক্ষা ঐ মোহটিতেই তাহার বেশী প্রয়োজন। সত্য বটে, বেদনাই এই মোহের অধিকাংশ উপাদান, কিন্তু নিজেকে লইয়া ব্যথা পাওয়াও তাহার ব্যাধিগ্রস্ত মনের এক বিলাসিতা। নতুবা ঐন্দ্রিলার জীবনে কোনও দুঃখবেদনা থাকা সম্ভব কিনা সেকথা কখনও সে চিন্তা করে নাই কেন?

একবার ভাবিল, এখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, নন্দের খোঁজ লয়, সুভদ্রের হাত ধরিয়া তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করে, পিতাকে চিঠি লেখে, বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে

দেখা করে। কিন্তু পলকে চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিমান ভিড় করিয়া আসিল। পিতাকে এতদিন পর সে কি লিখিবে? লিখিবে, যাহা বুঝিয়াছিলাম, ভুল বুঝিয়াছিলাম, নিজের হাতে নিজেকে গড়িতে পারিব এই দর্প আমার মনে ছিল, সে-দর্প বিধাতা ভাল করিয়াই চূর্ণ করিয়াছেন। সুভদ্রকে কি বলিবে? বলিবে, তোমার স্নেহকে অপমান করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে শাস্তি দাও নাই, শাস্তি দিবে না জানিয়াই আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। নন্দের সঙ্গে দেখা করিয়াই বা তাহাকে সে কি বলিবে? বলিবে, তোমার কোনও কাজে আমি লাগি নাই। এতদিনের মধ্যে দুই পা হাঁটিয়া আসিয়া একবার তোমার খবর লইয়া যাইতে পারি নাই। আজ হঠাৎ এইদিকে আসিয়া পড়িয়াছি, ভাবিলাম, তোমাকে কিঞ্চিৎ পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়া যাই। আর ঐন্দ্রিলা!…এই যে তাহার অধোগতির পরিপূর্ণ মূর্ত্তিটিকে স্বলতা এবং প্রিয়গোপাল আজ প্রত্যক্ষ করিয়া গেলেন, অজয় কি আশা করে ঐন্দ্রিলা সেকথার কিছু জানিবে না? আর না জানিলেই বা এই ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে কোন্ মুখে গিয়া সে দাঁড়াইবে? কি তাহাকে বলিবে? ইহার পর সহস্র কশাঘাতেও চিন্তা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।

স্বলতাকে দেখিয়া অবধি প্রিয়-সংসর্গের জন্য উপবাসী চিত্ত লোলুপ হইয়াছিল, এবার নিজের কাছ হইতে বাধা পাইয়া নিরুপায়তার দুঃখে বারম্বার সে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মন তাহার শত্রু। নতুবা তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ এবং তাহার মধ্যে আজ এই মুহূর্ত্তে দেড় ক্রোশের মাত্র ব্যবধান। কিন্তু দূর হইতে লুকাইয়াও যে ঐন্দ্রিলাকে দেখিয়া আসিবে ততটুকু স্পর্দ্ধাও সেই অদৃশ্য শত্রু তাহার জন্য আজ অবশিষ্ট রাখে নাই।

সে-রাত্রিতে সে ঘুমাইল না, মনের মধ্যেকার এই গোপন শত্রুকে বাছা বাছা নিষ্ঠুর আঘাত বৃষ্টি করিয়া জর্জ্জরিত করিতে লাগিল।

সকালে যে-অজয়ের ঘুম ভাঙিল, সে অজয় পীড়িত, আর্ত্ত, বিপন্ন। সে

অজয় আর সহিতে পারিতেছে না। একটুখানি বিশ্রামের জন্য, বেদনার একটু বিরতির জন্য সে লালায়িত। চোখ চাহিয়া অবধি কি যে সে আশা করিতেছে, কাহাকে সে দেখিতে পাইবে ভাবিতেছে? অকারণে সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া আছে, কতবার ভুল করিয়া ভাবিয়াছে, বাহিরের দ্বারে কেহ করাঘাত করিতেছে। যখন শেষ অবধি কেহ আসিল না, অকারণেই তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখন বুঝিল, তাহার মন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে আশা করিতেছিল, আর কেহ না আসুক, সুলতার নিকট খবর পাইয়া বীণা অন্ততঃ ছুটিয়া আসিবে। এমন যে বীণা, সেও কি আজ এই দুঃখের দিনে অজয়কে পরিত্যাগ করিয়াছে? সে সুলতার প্রিয়সখী, সুলতার মুখে অজয়ের দুর্গতির কাহিনী সে-ই সর্ব্বাগ্রে শুনিয়াছে।

পরের দিনও কেহ আসিল না, তার পরের দিনও না। বহুদিন পরে ধীরে অজয়ের মধ্যেকার দর্পী মানুষটা, ক্রোধনস্বভাব মানুষটা মাথা তুলিতেছে। নিজেকে যত খুসি সে অবজ্ঞা করিতে পারে, আঘাতে অপমানে জর্জ্জরিত করিতে পারে, কিন্তু অপরে তাহাকে করুণার চক্ষে দেখিতেছে ইহা প্রাণ গেলেও সে সহিতে পারে না।

শান্ত সমাহিত চিত্ত লইয়া যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার তাহার কথা ছিল, অসহিষ্ণুতায় তাহার আয়োজন করিল। নিদারুণ অবজ্ঞায় নিজের চারিদিক্ হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া প্রতি মানুষের নিভৃততম অন্তরের মধ্যে অসীমতার যে এক-একটি রুদ্ধ সিংহদ্বার, একেবারে তাহার কপাটের উপর আঘাতের পর আঘাত বৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিল, পৃথিবীর বিচারে যাহা সম্পদ্, বারম্বার তাহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিতেছ, আনন্দের পথ হইতে, প্রেমের পথ হইতে কোন্ সুদূরের অভিমুখে তুমি আমাকে ডাক দিতেছ। তুমি জানো, অল্প লইয়া, তুচ্ছতা লইয়া কোনও দিন আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি জানো, সমস্ত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র তোমার ভরসায় আমি বসিয়া আছি। দ্বার খোল, হে

বন্ধু, খোল দ্বার, বহু দুঃখের মধ্য দিয়া, বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া যে চরিতার্থতার পথ কাটা হয়, সেই পথে আমার হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চল। দুই দিন দুই রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় বধির অন্ধকারের বেদীতলে মাথা খুঁড়িয়া সে নিজেকে রক্তাক্ত করিল। বেদনার মূল্য চূড়ান্ত করিয়া দিয়া দিল। কোনও আশা, কোনও আনন্দ, কোনও অহঙ্কার নিজের জন্য রাখিল না। কিন্তু এত করিয়াও অন্ধকার কাটিল না। বধিরতায় সাড়া জাগিল না। কেবল দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তিকে একটি মাত্র ধ্যানের মধ্যে সংহত করিয়া আনিয়া পরিপূর্ণ চৈতন্যের আলোয় নিজেকে দেখিতে গিয়া আবারও নিজেকে সে হারাইতে বসিল। নিজের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের অবসান হইয়া যাওয়া যে কি ভয়াবহ, অজয়ের তাহা অজানা ছিল না। সহসা মনে হইবে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। একটি অপরিচিত দেহ, অপরিচিত মন, অপরিচিত স্মৃতি আশ্রয় করিয়া সে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিজের সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বকে নিজের বলিয়া আর সে অনুভব করিবে না। হয়ত নিজের কোনও বাক্য, কোনও ব্যবহারকেও আর সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে না। মনে মনে দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার যাহা খুসি আমাকে লইয়া তুমি কর, যে দুঃখ ইচ্ছা হয় দাও, যাহা কাড়িতে চাও কাড়, কিন্তু আমার নিজের মধ্যে আমার একটু যে শেষ অবলম্বন তাহাকে এমন করিয়া বিপর্য্যস্ত করিও না। আমার আশৈশবের পরিচয়েব সুন্দর আমিটিকে তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও, তারপর তোমার কাছে আর আমি কিছু চাহিব না।

কিন্তু সহসা কি হইল, এই নির্য্যাতিত দুঃখী সর্ব্বহারার জীবনেও বিদ্রোহের রূপ লইয়া পরিত্রাণ দেখা দিল। সহসা দুই হস্তের মুষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া আকাশে চাহিয়া সে বলিল, না, এ নিরর্থক, আমার এই দুঃখের তপস্যার কোনও অর্থ নাই। নিজেকে বিড়ম্বিত করিয়া নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনও কাম্যফলই আমি লাভ করি নাই। নিজের মধ্যে এবং নিজের বাহিরে সীমাহীন শূন্যতায় আমার জীবনব্যাপী বেদনাকে অপচয়িত করিয়াছি।

এই কয়দিন যে-দরজার গোড়ায় মাথা খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়াছিল, সেই দরজা খুলিল না বটে, কিন্তু অপর দিক্‌কার অপর একটা বন্ধ দরজা সহসা ঝনৎকার করিয়া খুলিয়া গেল। অজয়ের দেহ কণ্টকিত হইল। সে অনুভব করিল, শুধু ভয়ই যে পাপ তাহা নহে, দুঃখ পাওয়া এবং দুঃখকে শিরোধার্য্য করাও মানুষের পাপ, অন্ততঃ তাহার জীবনে তাহার অন্ধকারের যে তপস্যা তাহাই তাহার সব চেয়ে বড় পাপ। যে পাপ তাহার বুদ্ধিতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। যে পাপ তাহাকে আত্মসর্ব্বস্ব করিয়াছে অথচ আত্মসর্ব্বস্ব বলিয়া নিজেকে চিনিতে দেয় নাই। যে পাপ সমস্ত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে অতি সহজে তাহাকে সন্ধি করাইয়াছে। যে পাপ বলিয়াছে, পরের জন্য কিছু করিবার তোমার সাধ্য কোথায়—নিজেকে লইয়াই তোমার দুর্ভোগের শেষ নাই। অনুভব করিল, পাছে অপরের জন্য ভাবিতে হয়, সেই ভয়ে নিজের জীবনে বেদনা পুঞ্জীভূত করিয়া নিজের জন্য ভাবনার সে শেষ রাখে নাই।

সেই মুহূর্ত্তে স্থির করিল, দেবতার মধ্যে তাহার যে আশ্রয় নাই, নিজের মধ্যে তাহার যে আশ্রয় নাই, সেই আশ্রয় তাহার চারিপাশে পরিচিত প্রিয় মানুষগুলির মধ্যে তাহার আছে। মুহূর্ত্তের পরিচয়ে চিরকালের ভাবিয়া যাহাকে সে ভালবাসিতেছে, সে-ই তাহার একমাত্র চিরকালের। ইহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যগুলিতে ইহার পর কিছুতেই সে আর ত্রুটি ঘটিতে দিবে না। কর্ত্তব্য হইতে নিজের দুঃখ-বেদনাকে বড় করিয়াছিল, এবারে নিজের জীবনে কোনও দুঃখ-বেদনার স্থান যথাসাধ্য সে আর রাখিবে না। সে সহজ হইবে, সে সুস্থ হইবে। অজয়ের চারিদিকে বাতাস যেন এতদিন জমাট বাঁধিয়াছিল, আজ এতক্ষণে সেই চাপ-বাঁধা বাতাস গলিতেছে, বুক ভরিয়া সে নিঃশ্বাস লইতে পারিতেছে।

আর দ্বিধামাত্র না করিয়া ফিরিয়া সে লালবাজারের পথ ধরিল। কিছুদিন আগে লালবাজারের থানার একতলার যে ঘরটায় কি একটা কাগজে সে সহি

দিয়া গিয়াছিল, আজ গুর্খা, সার্জ্জেণ্ট, কয়েদী গাড়ী এবং রাইফলের ভিড় কাটাইয়া আবার সেটাতে ঢুকিতে যাইবে, পাশের বারান্দা হইতে ধুতিপরা একটি রোগা কালো বাঙালী ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কি মশায়, আপনার যে দেখছি ভারি বেজায় গরজ। কোথায় চলেছেন, অমন ক'রে হনহনিয়ে। একটু দাঁড়ান, দুটো কথা হোক, পকেটগুলো দেখি আগে, তারপর ত ভেতরে যেতে পাবেন? কি নাম আপনার?"

"শ্রীঅজয় রায়।"

"কাছাকাছিই কোথাও থাকেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বৌবাজারেই একটা গলিতে।"

"তা বৌবাজারের গলিগুলির কি নাম নেই?"

এই যাঃ, গলির নামটা যে কি, অনাবশ্যক-বোধে অজয় একদিনও তাহার খোঁজ করে নাই। উপায়? একেই ত তাহার এই পোষাক, এই চেহারা, তদুপরি নিজের ঠিকানা বলিতে না পারিলেই হইয়াছে আর কি! তাড়াতাড়ি কহিল, "আমার সম্বন্ধে যা যা জানতে চান পরে সব শুনবেন এখন। সম্প্রতি আমার একটা উপকার করুন।"

"বটে? তা বেশ, বলুন কি করতে হবে।"

"আমার একটি বন্ধুর খোঁজ নিয়ে দিন।"

"আপনার বন্ধু? এমন স্থানে? পুলিশে কাজ করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে না, এই ক'দিন আগে জানি না কেন তাকে ধ'রে আনা হয়েছে। শ্রীনন্দলাল মিত্র।"

"নন্দলাল মিত্র...নন্দলাল মিত্র...উঁহু, মনে পড়ছে না। চার্জ্জটা কি?"

"তা ত জানি না, তবে আমি বলতে পারি, কোনো অপরাধ করা তার স্বভাবে সম্ভবই নয়।"

"লোকটাকে যখন চোখেই দেখিনি এবং আমার কেস নয় তখন এ নিয়ে

আপনার সঙ্গে আর তর্ক করব না। আপনার কথাই শিরোধার্য্য ক'রে নিচ্ছি।"

"তার সঙ্গে কোনো রকমে কি একবার দেখা হয়?"

"আপনি তার কে হন?"

"কেউ না। কিন্তু আসলে ভাইয়ের চেয়েও বেশী।"

"বেশী না হয়ে ঠিক মাপ-সই ভাই হলে চেষ্টা ক'রে দেখা যেত। একজন উকীল সঙ্গে ক'রে আনতে পারেন?"

প্রিয়গোপালের নামটা কিছুতেই তখন অজয়ের মনে আসিল না। মাপ-মতন ভাইয়ের প্রসঙ্গের পর মাপ-মতন উকীলদের কথাই সে ভাবিল, প্রিয়গোপাল ব্যারিষ্টার। উকীল বন্ধু তাহার কেহ নাই, বন্ধু নহে এমন উকীল জুটাইবার মত সঙ্গতি নাই।

বাড়ী ফিরিবার পথে আবার ইহাই মনে করিয়া খুসী হইতে চেষ্টা করিল যে, আসিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া সেই রোগা কালো লোকটি তাহার গলির নামটা আবার জানিতে চাহে নাই। আশ্চর্য্য, বাড়ীর নম্বরটা সে ঠিক জানে, রাস্তার নামটাই জানে না,. নামের পাটা কোথায় কোন্‌দিকে আছে দেখিয়া আজই এই ত্রুটি সে সারিয়া লইবে।

কিন্তু রাস্তার নাম না-হয় জানা হইল, মনের উপর হইতে অবসাদের ভার ত নামিতেছে না। লালবাজারে অত্যন্ত অনাত্মীয়-সমাবেশের মধ্যে এবং নন্দলালকে দেখিতে না পাইয়া সে-অবসাদ যেন আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। না, মনটাতে কিছুতেই সে স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছে না। তাহার চারিপাশের পৃথিবীও যেন কেমন অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত। আজ সে যেদিকে চাহিতেছে, কদর্য্যতা দেখিতেছে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসাম্য দেখিতেছে, অস্বাস্থ্যের গ্লানি দেখিতেছে। চতুর্দ্দিকের এই সীমাহীন ব্যাধিক্লিন্নতার মধ্যে নিজের জন্য কোথায় কোন্ মন্ত্রবলে স্বাস্থ্যের নীড় সে রচনা করিতে চাহে?···দুই পাশের পায়ে-চলা পথের অবর্ণনীয় নোংরামি। সন্দেশের দোকানের পাশে কুকুর-বিড়ালের মৃতদেহ চাপা দিয়া

রাখিবার জায়গা। আজ সেখান হইতে একটা পূতিগন্ধময় ঘোড়ার শব সরানো হইতেছে। রোগ-বিগলিত-দেহ ভিক্ষুকের দলের পাশে বেলফুলের মালা বিকাইতেছে। পথের লোকের কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন পোষাক, বিচিত্র ছাঁদের গতি। কেহ সোজা চলিতেছে না, একে অপরের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া যাইতেছে, পায়ে পা ঠেকিতেছে, সকলেই যেন পা-দুটাকে টানিয়া চলিতেছে। মনে পড়িল, বিমান বলিত, সোজা হয়ে হাঁটেই না কি কেবল, সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, সোজা হয়ে বসে না, সোজা হয়ে শোয় না পর্য্যন্ত, কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে। একটা লোক কলার খোসাতে পা হড়কাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল, উদ্দেশে বহুক্ষণ ধরিয়া গালি পাড়িল কিন্তু খোসাটাকে সরাইয়া রাখিয়া গেল না, কাহার জন্য রাখিবে? একটি স্ত্রীলোক যাইতেছে, কাহারও বাড়ীর ঝি হইবে, একটি পাতলা শাড়ী মাত্র পরিয়াছে, রোদটা ওপাশে···

কলিকাতা! মনে মনে টালিগঞ্জ হইতে বরানগর পর্য্যন্ত নিত্যকার দেখা পথঘাট, লোকজন, তাহাদের সুখদুঃখ আশাভয়সম্বলিত জীবনযাত্রাকে বারম্বার মনের মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সে ভাবিতে লাগিল। ইহার সমগ্রতায় কোথায় বহুযুগের ভারতবর্ষের তপস্যার রূপ, ইহার কোন্ স্তরে আর্য্য সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, ইস্‌লামীয় সভ্যতার অবশেষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপই বা ইহার মধ্যে কোথায়? অপরাপর দেশের মানুষ আজ অতি-মানুষ হইয়া বিবর্ত্তিত হইবার সাধনা করিতেছে, কলিকাতার কদর্য্যতায় ব্যাধিজীর্ণতায় যথেচ্ছাচারে এ কি জিনিষ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছে? অতি-মানুষ? মানুষ? না তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোনও জীব? অথবা কিছুই কি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছে?

যে বাসে যাইতেছিল, আশান্বিত হৃদয়ে তাহার মধ্যে তাকাইল। ঘাড়ের চুল চামড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটা, একজন স্থূলকায় হ্যাটবুট শোভিত বাঙালী ভদ্রলোক সম্ভবতঃ তাঁহার অফিসের ছোট সাহেবের মত নাক উঁচানো মুখভঙ্গি করিয়া বসিয়া আছেন, খর্ব্ব নাসিকাতে ভঙ্গিটা মানাইতেছে না। তাঁহার পাশে এক দরিদ্র

মুসলমান বসিয়াছে, সতর্ক হইয়া তাহার ছোঁয়া বাঁচাইতেছেন। ঠিক সম্মুখেই একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া একটি মহিলা জড়সড় হইয়া বসিয়া আছেন, মনে হইতেছে তিনি ভদ্রলোকের কেহ নহেন, কেননা ঠিক তাঁহার পাশেই একজন মাড়োয়ারী হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া পা উঠাইয়া বসিয়া একমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

বিরক্তিতে অজয়ের দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ক্রমে দেখিল, ইহারা কেহ শারীরিক সুস্থ নহে, সজীব নহে, স্বাভাবিক নহে, কেহ যে পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে এমন মনে হয় না, ইহাদের সকলেরই চোখে কি অব্যক্ত ভয়ের ভাব, যেন প্রত্যেকের জীবনের মর্ম্মস্থানটিতে কোন্ পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেবল সেইখানে ইহারা সকলেই যেন পরম নির্লিপ্ততায় বিমানের ধরণে ঠোঁট টিপিয়া হাসিতেছে। চরমতম দুর্গতির মধ্যেও বিদ্রোহ করা কাহাকে বলে ইহারা জানে না।

একটি বৃদ্ধ গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপবিষ্ট অন্য একটি ভদ্র-লোককে বলিতেছেন, "একটা দিন ছাড়া পাবার জো আছে? বাড়ীতে হাসপাতাল বসেছে। গিন্নির হৃদ্‌রোগ, এখন তখন বললেই হয়, মেজো মেয়ের সূতিকা, ছোট ছেলের আমাশা, যে ছেলেটা বি-এ দেবে এবারে সে আবার সম্ভবতঃ কালাজ্বর বাধিয়েছে, সকালে বিকালে জ্বর উঠছে, জানি না কি আছে অদৃষ্টে। একটা ত গেল বছর কলেরাতে গেল।"

অপর ভদ্রলোকটি একটা পান লইয়া মুখে পূরিতে পূরিতে বলিলেন, "আমায় আর কি শোনাচ্ছেন মশাই? সব ম'রে-ঝ'রে ত দুটি নাৎনীতে ঠেকেছে। বড়টির এবার বিয়ের সম্বন্ধবাদ করব ভাবছিলাম, ডাক্তাররা টিবি সন্দেহ করছেন।"

ঘৃণা ক্রোধ এবং গ্লানি করুণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে।

প্রথম ভদ্রলোকটি একটু পরে আবার কহিলেন, "মনে ক'রে শীগগির টিকে দেওয়াবেন। এবারে মড়কের বৎসর।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক একটু হাসিয়া যেন নিজের মনেই কহিলেন, "আর মশায়, সব বৎসরই মড়কের বৎসর।"

ঐ হাসিটি অজয় কিছুতে ভুলিতে পারিতেছে না। সে নিজে মাঝে মাঝে ঠোঁট টিপিয়া বিমানের ধরণে হাসে, সেও কি ঐ একই জাতের হাসি? ভাবে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনও দেশের মানুষ এই হাসি ঠিক এমনই করিয়া কি হাসিতে পারে? ভাবে, এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য, এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অজ্ঞান, অস্বাস্থ্য, পরাধীনতা, ইহার মধ্যে কোথায় কি লইয়া আমাদের গর্ব্ব?

নীরবে নতমস্তকে পুরান পোড়ো বাড়ীটাতে ঢুকিতে যাইতেছিল, সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরিয়া দাড়াইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দ্রুত পথ অতিবাহিত করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, আমি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যে-সত্যের প্রতীক্ষা ছিল আমার জীবনে, সেই সত্যকে আমি আজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাই সত্য, এই সত্য।

পথচারী লোক দু-একজন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ফিরিয়া দেখিল।

২৯

চৈত্র অপরাহ্ণের প্রখরতর রৌদ্র, তবু অজয় বালিগঞ্জ অবধি সমস্ত পথ হাঁটিয়াই আসিল, ছুটিয়া আসিলও বলা চলে। আজও অনাহূত আসিল, এবং অসময়ে আসিতেছে এই সংশয়কে মনে স্থান দিল না। কবে এক নিভৃত সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলাকে স্পর্দ্ধা করিয়া কি বলিয়াছিল, ঐন্দ্রিলা সে কথা ভুলিয়াছে কিন্তু সে নিজে ভোলে নাই। আজ তাহার সেই স্পর্দ্ধিত প্রতিশ্রুতির ঋণ শোধ করিবার পালা। আজ ঐন্দ্রিলাকে সে বলিবে বলিয়া আসিয়াছে, আমি ক্লান্তি মানি নাই, দেশের বহু দুর্ভাগ্যের, অশেষ প্রকার দুর্গতির একটিমাত্র যে মূলগত রহস্য, তাহা আজ আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের

অতলতল হইতে সত্যের সেই মহামণিটিকে তোমারই জন্য আমি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।

কিন্তু বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, ঐন্দ্রিলাকে খবর দিতে বলিতে তাহার বাধিল। বীণা এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, সুতরাং বেহারাকে তাহারই সন্ধানে উপরে পাঠাইয়া, একতলার বসিবার ঘরে কম্পিতবক্ষে সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটু পরে বেহারা আসিয়া খবর দিল, বড়দিদিমণি কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন তাহাও কিছু বলিয়া যান নাই। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় রাহু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে, চা খেয়ে যাবেন, বসুন। আমি ছোড়দিকে ডেকে আনছি।" সঙ্গে সঙ্গেই দুম্‌দাম্‌ শব্দ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে উপরে চলিয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা নামিয়া আসিয়া কহিল, "বসুন। দিদি কখন ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই যদিও। মন্দিরা আবার গুছিয়ে অসুখ বাধিয়েছিল, এই দু' দিন বাড়ী ছেড়ে একবারও বেরতে পায়নি বেচারা। আজকেই জ্বরটা ছেড়েছে, আমারও কলেজ নেই, ফাঁক পেয়ে তাই একটু বেরিয়েছে।"

অজয় কিছু শুনিল কিনা সে-ই জানে, কহিল, "ও। আর সবাই বেশ ভাল আছেন?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ভালই ত আছি। আপনি?"

অজয় কহিল, "ভাল।"

তাহার পর কথা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। ইহার পর মন্দিরা কাঁদিতেছে বলিয়া হেমবালা যখন সংবাদ পাঠাইলেন, তখন আর দ্বিধামাত্র না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। "চা খেয়ে যান। না, চা খেয়ে যেতে হবে," বলিয়া রাহু অনেক টানাটানি করিল, কিন্তু কিছুতেই অজয়কে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীর দরজায়ই বিমানের সঙ্গে দেখা। রোল্ড্‌ গোল্ড্‌ বাঁধান ছড়ি ঘুরাইয়া সে বাহির হইয়া চলিয়াছে। যেন কিছুই ঘটে নাই এমনই ভাবে সে বলিল, "বালিগঞ্জে গিয়েছিলে?" কেবল অলক্ষিতে অজয়ের একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া আস্তে একটু টিপিল।

আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া অজয় কহিল, "বীণাদেবী বাড়ী নেই, অসুস্থ মন্দিরাকে নিয়ে তাঁর বোন ভারি ব্যস্ত, তুমি কি ও-বাড়ী যাবে এখন?"

বিমান কহিল, "পাগল! এতদিন পরে দেখা, তোমাকে মোটেই আজ ছাড়ছি না।"

অজয় ফিরিয়া তাহার হাতটিকে একটু টিপিয়া দিল।

দুই বন্ধুতে হাঁটিয়াই চলিল। প্রশ্নে প্রশ্নে বিমান অজয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নিজে হইতে কিছুই প্রায় তাহাকে বলিতে হইল না। কিন্তু যে কথাটি সব চেয়ে আজ তাহার বেশী বলিবার, বারেবারেই গলার কাছে আসিয়া তাহা বাধিয়া গেল। চারিপাশের পরম নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে ঐ একটিমাত্র কথাই কিছুতেই কেমন খাপ খাইতে চাহিল না। মনের মধ্যে অন্ধকারের সঙ্গে অজয়ের দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামের শেষে তাহার আজিকার এই জয়লাভ, যেন অজয়েরই কাছে অভাবনীয়। পৃথিবীর আর কোথাও হইতে তাহার ঠিক মূল্যটি সে পাইবে না।

কহিল, "সুভদ্রের কথা যে একবারও বলছ না? তার কি খবর?"

বিমান কহিল, "এই ক'দিন কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে সে এত অস্থির ছিল, যে সব দিন তার সঙ্গে দেখাও হয়নি আমার।"

অজয় কহিল, "রিহার্সাল চলছে?"

বিমান কহিল, "উঁহু। আমার একটা মোটা মতন পার্ট ছিল, কিন্তু শেষ অবধি আমি করব না বলাতে সব ভেস্তে গিয়েছে।"

অজয় বলিল, "তুমিও পার্ট নিয়েছিলে নাকি? নিয়েছিলে যদি ত করলে না কেন?"

বিমান বলিল, "আমি বলেছিলাম টাকাই যদি নিতে হয় ত তার ভাগ অভিনেতাদের দেওয়া হোক, অন্তত যারা চাইবে তাদের। এদেশে সবরকম কুকার্য্যের দাম আছে, সে দাম দিতে বা নিতে কেউ লজ্জা পায় না। কিন্তু যত দোষ আর্টের। ছবি-আঁকিয়েরা, লিখিয়েরা, গাইয়েরা, অভিনেতারা অন্যদের মনোরঞ্জন করবে, কিন্তু নিজেরা দুবেলা পেট ভ'রে খেতেও পাবে না, এ নিয়ম খাটবে না। আমার দলে যে একজনকেও পাইনি তা বুঝতেই পারছ।"

অজয় কহিল, "সুভদ্র খুব চটেছে তোমার ওপর?"

বিমান কহিল, "ও কি কখনও কারো ওপর চটে? চটতে হলে দরদ থাকা চাই। সেই জিনিষটির ওর মধ্যে অতি মারাত্মক অভাব।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে পর অজয় কহিল, "তারপর অভিনয় ক'রে কিছু রোজগার করতে ত পেলে না, ছবি-টবি বিক্রী হচ্ছে? কি ক'রে চলছে তোমার?"

বিমান কহিল, "আমার দিন যেমন ক'রে চলে। আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে। কিন্তু সে বিদ্যা তোমার ত আয়ত্ত নেই, তোমার দিন কি ক'রে চলছে?"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বই বে'চে।"

বিমান কহিল, "দোকান করেছ?"

অজয় হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, দোকান করবারই মত অবস্থা বটে।"

বিমান কহিল, "তবে কি, ফেরি?"

অজয় কহিল, "তা, ফেরি বলতে পার, তবে তুমি যা ভাবছ, তা নয়। কলেজের টেক্‌ষ্টগুলো বইয়ের দোকানে বিক্রী ক'রে ক'রে চালাচ্ছি!"

বিমান অকস্মাৎ অনেকখানি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল,

কহিল, "পুরনো বই বে'চে সত্যি এতদিন চালান যায়? আশ্চর্য্য, কথাটা আগে কখনও ভাবিনি। বাড়ীতে আমার কতগুলো পুরনো বই প'ড়ে আছে এখনও যেন," কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে বিমর্ষ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "ঢের হাঁটা হয়েছে, এবারে চল একটা বাসে কিম্বা ট্রামে উঠি। ট্রামগুলোই ভাল এ পাড়ার, কপালজোর থাকে ত সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী দু-একটির দেখা পাওয়া যেতেও পারে।"

অজয় কহিল, "সেইটেই কি আসল দরকার না সত্যি সত্যি কোথাও যাওয়ার মতলব আছে?"

বিমান কহিল, "আসল দরকার কোনটা জানি না, তবে তোমার বৌবাজারের বাড়ীটাতে একবার যেতে চাই সেটা ঠিক।"

অজয় কহিল, "কি হবে সেখানে গিয়ে?"

বিমান কহিল, "কেবল বইগুলোই বেচেছ, না আর যা-কিছু ছিল সবই ঐ ক'রে গেছে দে'খে আসব।"

অজয় কহিল, "না, এতদূর এখনো নামিনি।"

বিমান কহিল, "নামনি, নামবে শীগ্‌গিরই। সময় থাকতে থাকতে সেগুলোকে উদ্ধার ক'রে আনা যাক, তারপর তুমিও এস। নয়ত গতিক যা দেখছি, কোনদিন নিজেকে সুদ্ধ বে'চে দিয়ে ব'সে থাকবে।"

অজয় বলিল, "সেটা করতে পারলে মন্দ হত না, অন্ততঃ অবস্থাটা সেই রকমই প্রায় দাঁড়িয়েছে। তোমার নিমন্ত্রণটা অবশ্য গ্রহণ করছি না, বৌবাজারের খালি বাড়ীটাতেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা নেই, কালকের দিনটাও যে কি ক'রে চলবে আমার, তা আমি জানি না।"

বিমান কহিল, "নিজে সাধ ক'রে যদি দুঃখ ডেকে আন, অন্যে আর কি করতে পারে?"

অজয় কহিল, "এতদিন তাই করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমাকে সত্যিই বলছি,

দুঃখে আমার অরুচি ধ'রে গিয়েছে। আসলে ওটা রুচি-অরুচির ব্যাপারই মোটে নয়, দুঃখ পাওয়াটাই মানুষের পাপ।" অজয়ের গলা কাঁপিয়া গেল, কহিল,"আমি কি যে অনুভব করছি, কথা দিয়ে তা বোঝাতে পারছি না। একটা কোথাও চল, স্থির হয়ে একটু বসবে। আমি যা বলতে চাই, তা ভাল করে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।"

বিমান কহিল, "তুমি কি বলতে চাও, তা তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি। আজ সারাদিন খেয়েছ কিছু ?"

অজয় কহিল, "খেয়েছি, কিন্তু কথাটা তা নয়।"

বিমান কহিল, "কথাটা যাই হোক, সে পরে শোনা যাবে, আপাততঃ আমি তোমায় ব'লে রাখছি তুমি একটি আস্ত গাধা।"

অজয় কহিল, "কেন, গাধামিটা কি দেখলে ?"

বিমান কহিল. "সেই কবে থেকে তোমার তিনশোটা টাকা প'ড়ে আছে আমার কাছে, গিয়ে যে দিয়ে আসব তার সুদ্ধ উপায় রেখে যাওনি।"

অজয় কহিল, "আমার তিনশো টাকা ? বাবা পাঠিয়েছেন ?"

বিমান কহিল, "মোটেই তোমার বাবা পাঠাননি, তাহলে সে টাকা আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার বাবাকে ফিরে পাঠাতাম, আমাকে ত তুমি জানই। কুড়িটা টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে মনে নেই ? সেইটেই সুদে বেড়ে এতখানি হয়েছে।"

অজয় কহিল, "কি যে আবোল তাবোল বকছ, কুড়ি টাকা দুমাসে সুদে বেড়ে তিনশো হয় ?"

বিমান কহিল, "দু মাসেরও দরকার হয়নি, তোমার টাকায় রেস্ খেলতে গিয়ে একদিন দাঁও মেরে ফিরেছি। অর্দ্ধেকটা নিজের পাওনা ব'লে নিয়েছি, তোমার ভাগটা সেই থেকে আমার কাছে প'ড়ে আছে।"

মনে মনে কহিল, আমার সত্যিই বুদ্ধি আছে। অজয়ের বাবা পরের

ছেলেদের একেবারেই চিনতে পারেন না এমন কথা এখন আর জোর ক'রে বলি কি ক'রে? তবে, খুব দরকার হলে বিবেচনা-পূর্ব্বক খরচ করতে বলেছিলেন, তাঁর সে কথাটা কেবল রাখা হল না। কিন্তু বাবাঃ, ঢের করেছি, আর নয়। মদ খাওয়াই ছেড়ে দিতে হয়েছে, পাছে নেশার ঝোঁকে এই টাকাটাতে হাত দিয়ে ফেলি। আজকে প্রাণের মায়া ছেড়ে খাওয়া যাবে।

রেসে জেতা টাকা বলিয়া অজয় প্রচুর আপত্তি করিল, কিন্তু বিমান কিছুতেই শুনিল না। কহিল, "দুঃখে না তোমার অরুচি ধ'রে গিয়েছে? কোনো রকমের রেস্‌ও খেলবে না, আবার পৃথিবীতে সুখীও হবে, এমন অঘটন কখনও ঘটবে আশা কোরো না।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ী হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া আসিয়া, দুইজনে আবার গড়ের মাঠের পথ ধরিল। বিমান কহিল, "এতটাই বুদ্ধি যখন তোমার হয়েছে, তখন সুখ বলতে কি বোঝায়, চল আজকের দিনে তা একটু পরখ ক'রে দেখবে।"

অজয় কহিল, "তাই চল। সত্যি, জীবনটাকে একটু উপলব্ধি করতেই চাই। কিরকম যে হয়ে গিয়েছি, নিজের বলতে কেউ কোথাও নেই, কিছু নেই, কেমন ক'রে জানব যে বেঁচে আছি?"

বিমান বলিল, "বেশীদূর জানতে দেবার সাহস আমারও নেই, তবু চল দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বিমানের পরিচিত দীপালোকিত সেই হোটেলে দুই বন্ধুতে ঢুকিয়া পড়িল। বিমান কহিল, "তোমাকেই খাওয়াতে হবে কিন্তু!"

অজয় কহিল, "তুমি খাবে, সে আর কতবড় কথা? কি খেতে চাও বল।"

খান্‌সামা মেনুকার্ড লইয়া আসিলে, অজয় বাছা বাছা খাবারের ফর্দ্দ করিল,

শুনিয়া বিমান কহিল, "শুধু শুধু কতকগুলো খাবার খেয়ে কি হবে? বয়, ওয়াইন্ লিষ্ট্টা নিয়ে এস ত দেখি।"

অজয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, "না, বিমান না। ঐটি কিছুতেই চলবে না।"

বিমান কহিল, "আঃ, অমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? বয়-বাবুর্চ্চিগুলো শুনলে কি ভাববে বল দেখি? তোমারই না হয় চলবে না, আমার ত চিরকালই চলছে, আজই বা তার ব্যতিক্রম কেন হতে যাবে?"

বয় আসিয়া ওয়াইন্ লিষ্ট্ রাখিয়া দাঁড়াইল। বিমান আঙুল বুলাইয়া লিষ্ট্ দেখিতে লাগিল, বলিল, "ব্র্যাণ্ডি গন্ধের জন্যে খেতে পারবে না, হুইস্কি ভাল লাগবে না, শেরী মেয়েরা খায়, পোর্ট রুগীদের জন্যে ব্যবস্থা। আচ্ছা তুমি ত কবি? হোয়াইট্ ওয়াইন্ একদিন একটু খেয়ে দেখ।"

অজয় বলিয়া উঠিল, "হোয়াইট্, রেড কিছুই আমি খাব না, তা তুমি বেশ জান। তুমি নিজে কি খাবে, সেইটেই বল না?"

অর্ডার দেওয়া হইয়া গেল, বয় আসিয়া দুজনের সম্মুখে দুইটি খালি ওয়াইন্ গ্লাশ রাখিয়া গেল। অজয় নিজের গেলাশটাকে ঠেলিয়া টেবিলের মাঝখানে সরাইয়া দিয়া বলিল, "এই একটি জিনিষকে সত্যি সত্যি আমি ভয় করি।"

বিমান কহিল, "তা ত করই। দুঃখেই কেবল অরুচি ধরেছে, সুখে রুচি হতে তোমার এখনও ঢের দেরি। সম্প্রতি বয়টা আসছে, ওর সামনে খুব বেশী গোল কোরো না। গেলাশটা তুলে আমার গেলাশের সঙ্গে ঠেকিয়ে, একটু অন্ততঃ মুখের কাছে ধোরো। নইলে এ যা হোটেল, আমাকে সুদ্ধ এর পর কেউ আর সেলাম করবে না।"

স্বচ্ছ, শুভ্র দলিত দ্রাক্ষারসে দুইটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, বয় জিজ্ঞাসা করিল, "কুছ খানা হুজুর?"

বিমান বলিল, "দাঁড়াও দেখছি।" তারপর মেনু কার্ডে মুখ আড়াল করিয়া ইংরেজী ভাষার সহায়তায় অজয়কে ধমকাইয়া কহিল, "ফর্ হেভন্স্ সেক্, এই নিয়ে এখানে একটা সীন্ কোরো না। ঐটুকু ত জিনিষ, পেটে পড়লে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ওটুকু খেয়ে ফেল, এরপর না হয় আর খাবে না।"

অতি সন্তর্পণে পাত্রটি উঠাইয়া লইয়া অজয় এক চুমুক পান করিল। বরফ দেওয়া দ্রাক্ষারস সমস্তদিনের ক্লান্তির পর মুখে অতি সুস্বাদু লাগিল। খানসামা খাবারের অর্ডার লইয়া চলিয়া গেলে সন্তর্পণে আর এক চুমুক পান করিল।

বিমান বলিল, "কি, কেমন লাগছে ?"

অজয় বলিল, "খেতে কিছু মন্দ লাগছে না।"

বিমান বলিল, "সে কথা বলছি না। খেয়ে কিছু খারাপ লাগছে ? তরল অগ্নি পান করছ ব'লে মনে হচ্ছে ?"

অজয় বলিল, "না ত।"

বিমান নিজের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া বলিল, "বাকিটুকু খেয়ে ফেল। এ জিনিষটা নামেই মদ্য, যে কোনোরকম ফলের রস, পেটে গিয়ে খানিকক্ষণ থাকলে ঐ হয়।"

দ্বিতীয় পাত্রও যখন নিঃশেষ হইবার মুখে তখন অজয় ভাবিতে লাগিল, জিনিষটাতে য়াল্‌কহল্ জাতীয় নিশ্চয়ই কিছু নাই, দুই পাত্র খাইয়াও সে কোনও পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছে না ত ? চিন্তাসূত্র কাটিয়াও যাইতেছে না, চতুর্দ্দিক্ সম্বন্ধে তাহার উপলব্ধিও সমান সজাগ রহিয়াছে। জিনিষটা তাহার মুখে সত্যই অত্যন্ত সুস্বাদু বোধ হইতেছে, তাহা ছাড়া এতগুলি টাকা খরচ করিয়া কিনিয়া শেষে বিমান সবটা খাইয়া উঠিতে না পারিলে, হয়ত ফেলিয়াই যাইতে হইবে। তৃতীয় পাত্র যখন ঢালা হইল, তখন ইহাই ভাবিয়া সে আর আপত্তি করিল না।

বুঝিল, সে সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল, তৃষ্ণাটা মিটিয়া গিয়া এখন তাহার ভাল বোধ হইতেছে। হঠাৎ এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া, মন হইতে যে একটা দুর্ভাবনার গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, তাহার জন্যও শরীরটা আজ অনেকটা হাল্কা বোধ হইতেছে। আজ বহুদিন পর সহজ মানুষের মত আলোভরা উৎসবভরা পৃথিবীর দিকে সে চাহিতে পারিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রবহমান প্রখর আলোর স্রোতকে আজ তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। দুই চোখ দিয়া সেই আলোককে সে যেন দ্রাক্ষারসেরই মত পান করিতে লাগিল। হোটেলের একোণ ওকোণ হইতে মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের কলহাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। সে হাসির শব্দও আজ তাহার কাছে আঙুরের নির্য্যাসের মতই সুস্বাদু লাগিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া এক-একটি হাসির শব্দ হইতে অন্তরালবর্ত্তিনী এক-একটি অদৃশ্য নারীকে সে মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় বিমান বলিল, "আচ্ছা তুমি ত কবি? মনে আছে সেই কবিতাটা, যাতে একজন পারসিক সূফী বলছেন, ওগো সাকী, তোমার ঐ স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্র ভ'রে সুদৃশ্য, সুস্বাদু, সুরভিত, সুশীতল সুরা আমার হাতে এনে দাও, আর আমার কানে কানে অবিশ্রান্ত বল, এ সুরা, সুরা সুরা।"

অজয়কে স্বীকার করিতে হইল, কবিতাটি তাহার পরিচিত নহে। অর্থটাও হঠাৎ বোধগম্য হইল না, বলিল, "খেতে দেওয়াই কি যথেষ্ট নয়? কানে কানে বলতে হবে কেন?"

বিমান কহিল, "কবি হয়েও বুঝলে না? চোখ দিয়ে দে'খে, জিহ্বায় আস্বাদ গ্রহণ ক'রে, নিঃশ্বাসে সৌরভ নিয়ে, হাতের স্পর্শে কাছে পেয়েও মন তৃপ্ত হয় না, এমনি সে জিনিষ। কান দিয়েও তাকে শুনতে ইচ্ছে করে।"

অজয় একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। বহুক্ষণ ধরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া

কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল। এরূপ সুন্দর কবিতা হাফিজের দেশ ছাড়া আর কোথাও লেখাই হইতে পারে না, বলিল। বিমানকে বারবার করিয়া অনুরোধ করিল, কবিটির কি নাম, এবং কোথায় কবিতাটি সে পড়িতে পাইতে পারে, বিমান যেন নিশ্চয় সে খবর তাহাকে দেয়।

বিমান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ কহিল, "বল দেখি, she sells sea-shells on the sea-shore ?"

অজয় কহিল, "she sells sea-shells on the sea-shore। কিন্তু হঠাৎ ওকথা যে ?"

বিমান বলিল, "কিছু না। এইবার বল তোমার কথা। স্থির হয়ে ব'সে যা আমাকে শোনাতে চাইছিলে। হঠাৎ এ অঘটন কেন ঘটল, দুঃখে তোমার অরুচি ধ'রে গেল।"

এবারে গভীর আবেগের ভাষায় অজয় তাহার বক্তব্যটিকে ব্যক্ত করিল। কহিল, "একথাটা আমার বরাবর মনে হত যে, আলাদা ক'রে আমাদের দেশের বহুমুখী সমস্যাগুলিকে মেটাতে চেষ্টা করলে কোনোদিন মিটবে না। সেগুলিকে একসঙ্গে ক'রে একটিমাত্র বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে ধ'রে যেদিন দেখতে পাব, সেইদিন তাদের সামাধান সম্ভব হবে। সেই সাধনাই ছিল এতদিন আমার জীবনে, যে জন্যে কোনো দুঃখকে আমি দুঃখ মনে করি নি, কোনো আত্মনির্য্যাতন আমার কঠিন মনে হয় নি। সে সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ আমার ঘটেছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের গোড়া কোনখানে। অতীতের কোনো এক সময়ে আমাদের সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে, দুঃখকে সম্মান করতে, ভিক্ষাবৃত্তিকে মর্য্যাদার আসনে বসাতে, এবং সুখী হবার মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকে গায়ের জোরে অবজ্ঞা করতে। আমি ভারতবর্ষের বাইরে কখনও যাই নি, তবু আমার মনে হয়, আর কোনো দেশের মানুষ দুঃখকে ঠিক এমন ক'রে

এতখানি বড় করেনি। জীবনকে প্রতিপদে প্রত্যাখ্যান, বৈরাগ্য দিয়ে তাকে অপমান, সেই অপমানের প্রতিশোধ দেশব্যাপী লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে আমরা পাচ্ছি। মনুষ্য-জীবন অনিত্য ব'লে প্রতিবেশী মানুষকে পর্য্যন্ত আমরা শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছি। এ জাতি দুঃখ পাবে না ত পাবে কে? দুঃখভোগে আমাদের লজ্জা নেই। চরমতম অমর্য্যাদায় আমাদের লজ্জা নেই।…কেবল লজ্জা নেই? তাই নিয়ে গর্ব্ব করতে চাইলেই আমরা করতে পারি। সেই গৌরবেরই ইমারত এত যুগ ধ'রে আমরা তৈরী করেছি। আমাদের বহু সহস্রবৎসরের সভ্যতার ইতিহাস দুর্গতির চরম তলায় তলিয়ে যাবার সাধনার ইতিহাস।"

বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল। অজয় কহিল, "হাসছ যে?"

বিমান কহিল, "তোমার সত্যি ধারণা, এইটেই আমাদের দেশের একমাত্র সমস্যা? তা তোমার বেশী দোষ নেই। আমি তোমাকে এমন আরো দশটা সমস্যার কথা এই মুহূর্ত্তে বলতে পারি, যার যে কোনো একটার থেকেই একটা দেশের ভারতবর্ষের সমান দুর্গতি হতে পারে। কোন্‌টাকে ফেলে কোন্‌টাকে দেখবে? তুমি যা বলছ, তার মানে এই দাঁড়ায় যে আমাদের দেশের সমস্ত দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত সেইদিন, যেদিন আমরা দেশের মনকে অন্তর্ম্মুখী হতে ডাক দিয়েছি। দুদিক্ সামলান যায় না। ভারতবর্ষের আত্মিকতা তার পার্থিব সুখ-সুবিধার বিরোধী। এক নিলে আর ছাড়তে হয়। আমরা খুব স্পিরিচুয়্যাল জাত ব'লে গর্ব্বও করব, আবার যারা ঘোর বস্তুবাদী তাদের সঙ্গে বস্তুর বখরা নিয়ে কাড়াকাড়ি করব, এ হয় না। আত্মাকেই ভারতবর্ষ যদি কামনা ক'রে থাকে, তবে কায়মনোবাক্যে তাকে ত্যাগী হতে হবে। সে ত্যাগ, ত্যাগের বিলাস নয়, সে ত্যাগের মূর্ত্তি বিকট। সে ত্যাগ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, অজ্ঞানে, অস্বাস্থ্যে, পরাধীনতায়। আর পার্থিব প্রতিযোগিতার আসরে নামবার ইচ্ছা যদি মনে থাকে, তাহলে আত্মিকতার, অতীন্দ্রিয়ের, জীবনাতীতের দোহাই পাড়া চলবে না। জীবনকেই কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরতে হবে, স্বাভাবিক চিন্তাকে, স্বাভাবিক

বুদ্ধিকে, স্বাভাবিক বিচারকে। তোমাকে খুব বেশী শক্‌ট্ ক'রে দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়, নয়ত বলতাম, সে অবস্থায় প্রয়োজন হলে রেস্‌ও খেলতে হবে এবং দ্রাক্ষা সে অরুচি থাকলে চলবে না।"

বিমান তাহার কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই তর্ক সুরু করিয়াছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও ছাড়িয়া দেওয়া চিন্তা-সূত্রের খেই আবার কুড়াইয়া লওয়া অজয়ের কঠিন হইল। সে কহিল, "আজ অন্ততঃ অরুচির পরিচয় আমি কিছু দিচ্ছি না। গেলাসটা আবার ভ'রে দাও।"

ইহার পর আরও এক ঘণ্টা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় একই প্রসঙ্গের আলোচনা চলিল। দুইজনেরই মনের চারিপাশ হইতে সমস্ত প্রকার বাধার আড়াল ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাওয়াতে এমন-সমস্ত গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ পাইল, যাহার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে নিজেদেরও তাহাদের পরিচয় ছিল না। আজ তাহাদের ভয় রহিল না, ভিতরের এবং বাহিরের কোনও জুজুর শাসনকে আজ তাহারা মান্য করিল না। আজ কয়েকটি মুহূর্ত্ত তাহারা মুক্ত হইয়া বাঁচিল। ক্রমে কথায় অসংলগ্নতা দেখা দিল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহাদের আলোচনা আগুনের মত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অভিভূত মনের সম্মুখেও তাহাদের দেশ সারাক্ষণ জাগিয়া রহিল। বিমান চিরদিনের মত আজও এই বলিয়া শেষ করিল, যে একটা হতভাগা দেশে তাহারা জন্মিয়াছে, সে দেশের কোনও সমস্যা কোনওদিন মিটিবে না। শুধু শুধু তাহা লইয়া ভাবিয়া কি হইবে? অতএব—

বিমানের কথার শেষের দিক্‌টা অজয়ের কেমন যেন কানে পৌঁছিল না। হঠাৎ মনে হইল চোখের সম্মুখে সব-কিছু যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। শরীরটাও ঠিক সুস্থ বোধ হইতেছে না। যেন শুইতে পারিলে ভাল বোধ হইত। "এখন উঠতে হচ্ছে," বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

বিমান বলিল, "দাঁড়াও, বিলের টাকাটা দিয়ে নাও আগে।"

অজয় বলিল, "বয়কে ডাকো।" বয় বিল লইয়া আসিলে, তাহার পাওনা চুকাইয়া দিয়া অজয় বলিল, "এবারে চল, আর বসতে শুদ্ধ পারছি না, শরীর খারাপ লাগছে।"

বৌবাজারের বাড়ীটাতে, অন্ধকারে শিথিল কম্পিত হস্তে তালাতে চাবি ঢুকাইতে গিয়া, পায়ে কিসের একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ হইতে তন্দ্রা এবং মোহের ঘোর কতকটা কাটিয়া গেল। আতঙ্কে এক পা পিছাইয়া গিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "কে?"

অন্ধকার নড়িয়া উঠিল, উত্তর হইল, "আমি নন্দ।"

তাহাকে কিছু না বলিয়াই অজয় সোজাসুজি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নন্দ একটু অবাক্ হইয়া তাহাব পায়ের কাছে বিছানার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিল। সন্তর্পণে তাহার পায়ে হাত রাখিয়া বলিল, "অজয়দা, অসুখ করেছে কিছু?"

তন্দ্রার মধ্যেও অজয়ের মনে পড়িল, সে মাতাল। দেবশিশুর মত নিষ্পাপ এই ছেলেটি, দুঃখের আগুনে বারংবার যাহার অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে সে অজয়ের চরণস্পর্শ করিতেছে। সবেগে সে পা সরাইয়া লইল। নন্দ বলিল, "কি হয়েছে অজয়দা? কেন এমন করছেন?"

অজয় কেবল বলিল, "কিছু হয়নি।"

ইহার পর অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, কাতর ভয়াকুল দৃষ্টিতে নন্দ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। একবার সে বলিল, "সুভদ্রদাকে খবর দেব?"

অজয় আতঙ্কিত হইয়া কহিল, "না, না, কাউকে ডাকতে হবে না। বলছি ত কিছুই হয় নি।"

তারপর আবার মোহের ঘোর তাহার চৈতন্যকে ঘিরিয়া আসিল।

নন্দ বসিয়াছিল, উঠিয়া পড়িল। আজ এতদিন ধরিয়া এই মুহূর্ত্তটিরই প্রতীক্ষায় কি সে হাসিমুখে এত দুঃখ ভোগ করিয়াছে? দুঃখের মূল্য দিয়া অজয়ের

যে দ্বিগুণিত স্নেহকে সে পাইবে আশা করিয়াছিল তাহার পরিচয় কি এই? বিকালে পাঁচটায় সে ছাড়া পাইয়াছে, তাহার পর হইতে অজয়ের জন্য পথ চাহিয়া রাত এগারোটা অবধি সে কাটাইয়াছে। তাহার এত আগ্রহ ভরা পথ চাওয়ারও কি এই পুরস্কার? অজয় শিরে হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে নাই, এমন কি একবার জানিতেও চাহে নাই সে কেমন আছে, কোথায়, কোন্ অবস্থায় এতদিন সে ছিল।

অজয় ঘুমায় নাই, জাগিয়াও ঠিক ছিল না। মোহাবিষ্ট মন লইয়াও সে অনুভব করিল, কি একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি সে করিয়াছে। অথচ এমন সাধ্য নাই যে উঠিয়া সেই গোল মিটাইয়া দেয়। মাথা তুলিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। তাহা ছাড়া, কিছু বলিতে গিয়া ধরা পড়িবার ভয়ও আছে। ভয়টা নিজের জন্য তত নয়, নন্দের জন্য যত। বুঝিতে পারিতেছিল, ধরা পড়িলে নন্দেরই প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা করা হইবে।

ভোরের দিকে ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। যেন স্থইচ টিপিতেই মুহূর্ত্তে জাগরণের আলোর প্লাবনে ঘর ভরিয়া ভাসিয়া গেল। দেখিল, নন্দ ঘুমাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বরাত্রির ব্যবহারের জন্য অজয়ের মনে লজ্জা বা ধিক্কারের লেশমাত্র নাই। নন্দকে জাগাইয়া তুলিয়া সে বলিল না, এতদিন তোমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সে অধিকার সত্যই আমার আজ নাই। আমি অধঃপতনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছি। কাল আমার ব্যবহারে তোমার প্রতি যে রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাকে ঘৃণা করিয়া, তোমার মন হইতে চিরদিনের জন্য আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তুমি তাহার প্রতিদান দাও। আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করিও না। কাল রাত্রির যে অভিজ্ঞতা, সে যেন তাহার অভিজ্ঞতা নয়, এমনই ভাবে নন্দকে ঠেলিয়া তুলিল। বলিল, "ওঠ, ওঠ, আর কত ঘুমোবে?"

নন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া এমন প্রসন্ন হাস্যে মুখটিকে ভরিয়া তুলিল

যেন সত্যই কোথাও কিছু হয় নাই। যেন নিজেই অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছে, এমনই ভাবে বলিল, "বাবা, এত বেলা হয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি।"

অজয় বলিল, "চল, আজ রবিবার দিনটা যে দিকে দুচোখ যায়, টো টো ক'রে ঘুরে আসি। পথে যেতে যেতে তোমার সব খবর শুনব।"

দুজনে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, কাপড়জামা পরিয়া বাহির হইতে যাইবে, রাস্তার দরজার কাছে বীণা তাহাদের গতিরোধ করিল। অজয় কহিল, "এ কি, আপনি ?"

নন্দ সন্তর্পণে একপাশে সরিয়া গেলে বীণা কহিল, "আমি ব'লেই ত মনে হচ্ছে। চিনতে যে পেরেছেন এই ঢের।"

অজয় কহিল, "নিজে কষ্ট ক'রে কেন এলেন ? আমায় খবর দিলেই ত হত।"

বীণা বলিল, "বেশ ত, নিজেই নাহয় খবরটা দিচ্ছি। এবার চলুন।"

অজয় বলিল, "কোথায় ?"

বীণা বলিল, "কোথায় আবার ? আমাদের বাড়ীতে। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। কাল বিকেলে সুলতাদিকে সঙ্গে ক'রে এসে দুবার ঘুরে গেছি। মেয়েটা হঠাৎ অসুখে পড়ল, তা না হলে আরো আগেই আসতাম।"

অজয় বলিল, "আজকের দিনটা বাদ থাক।"

বীণা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আজকেই আপনাকে যেতে হবে।"

অজয় মনে মনে আজিকার দিনটা নন্দের জন্য নিবেদন করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত দিন তাহাকে লইয়া বেড়াইয়া তাহাকে হোটেলে খাওয়াইয়া, সিনেমা দেখাইয়া, কল্যকার অনিচ্ছিত রূঢ়তর প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বলিল, "আপনি দয়া ক'রে এই একটা দিন আমাকে মাপ করবেন, আমি কাল নিশ্চয়ই যাব, কথা দিচ্ছি।"

বীণা বলিল, "পৃথিবী সুদ্ধ সকলে কেবল আপনাকেই দয়া করতে থাকবে, আপনি কারুর দিকে দেখবেন না, এই ব্যবস্থাটা হলে আপনার খুব সুবিধা

হয় জানি, কিন্তু সেই সুবিধা এই একটা দিন অন্ততঃ আপনাকে আমি দেব না।"

অজয় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগিল। বীণাকে দেখিবামাত্র তাহার দেহমনের এই কয়দিনের সঞ্চিত গ্লানি পলকে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল। বসন্তের স্বর্ণিম প্রভাত বহুদিন পরে আজ আবার অতিথির রূপে তাহার হৃদয়দ্বারে ঘা দিল। আলোকমণ্ডিত নীলাকাশ, সুখস্পর্শ দক্ষিণ বাতাসে চ্যূতমঞ্জরীর সৌরভ, পথতরুশাখায় পাখীদের কলগান, এই সমস্তই এতদিন ধরিয়া তাহার মন হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার একখানি প্রিয়মুখের পরিচয়পত্র সঙ্গে লইয়া পরমাত্মীয়ের রূপে তাহার চেতনার দ্বারে আসিয়া ভিড় করিল। এক এক করিয়া অন্তরের প্রীতির অর্ঘ্য দিয়া, তাহাদের সে হৃদয়ের ভিতর লইতেছিল। বিগত দিনগুলির অন্ধকারের স্মৃতি, হেয়তার, পরাজয়ের, বেদনার গ্লানি, এ-সমস্তকেই জঞ্জালের মত দূরে ফেলিয়া, তাহাদের জন্য সে স্থান করিয়া লইতেছিল। দুঃখে সত্যই তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া আজ বিদ্রোহ। বড় ইচ্ছা করিতেছিল, বীণার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। বীণার উজ্জ্বল বাসন্তী রঙের শাড়ী, তাহার রূপজ্যোতিঃকে আজ উজ্জ্বলতর করিতেছিল। সে যে ঐন্দ্রিলার আত্মীয়া, সেদিনকার মুক্ত প্রভাতাকাশের নীচে সেই মুহূর্ত্তটিতে সেই উপলব্ধির আর তুলনা ছিল না। এক পরিপূর্ণ অপরূপ সৌন্দর্য্যলোক হইতে, তাহার অযাচিত সাদর আহ্বান আসিতেছিল। অজয়ের বুক দুঃসহ আনন্দে দুর্দ্দমনীয় লোভে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। তবু নন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় এ লোভকে সে সম্বরণ করিল। আজ এই দিনটিকে দুঃখী নন্দ, স্বজনহীন দেবানুগ্রহবঞ্চিত নন্দকে মনে মনে সে দান করিয়া রাখিয়াছে। যে জিনিষ দুঃখের পাওনা সে জিনিষের ভাগ আনন্দকে, ঐশ্বর্য্যকে প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই সে দিতে পারিল না। ভিখারীর অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইয়া, উৎসবের নৈবেদ্য সাজাইতে তাহার মন উঠিল না।

কিন্তু বীণাকে সে কথা বলিতে পারিল না, বীণা বুঝিলও না। অধীর হইয়া বলিল, "চলুন।"

অজয় মৃদুস্বরে বলিল, "আপনাকে মিনতি ক'রে বলছি, আজকের দিনটা কেবল আমাকে ক্ষমা করুন।"

বীণার ঠোঁটদুটি একবার মৃদু কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তখনই নিজেকে দমন করিয়া, এবং একহাতে শাড়ীর প্রান্ত সম্বরণ করিয়া সে ফিরিল। বাহিরে আস্টিন দাঁড়াইয়াছিল, ড্রাইভার পশ্চাতের দিকে হাত বাড়াইয়া দরজা খুলিয়া দিল। দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিয়া, স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া বসিল। গ্যাসের আবেগে গাড়ী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে যে কত আনন্দ করিয়া আসিয়াছিল, এবং কি বেদনা লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, বেদনা জিনিষটার সঙ্গে অত্যন্ত গভীর পরিচয় থাকাতে, অজয়ের তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র দেরি হইল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই ছুটিয়া বীণার পাশে গিয়া গাড়ীর সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই বলিল, "আমায় ক্ষমা করলেন, ব'লে যান।"

বীণা তাহার দিকে চাহিল না। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ক্ষমা ক'রেই এসেছিলাম।"

একরাশ ধূলা উড়াইয়া গাড়ী দ্রুত বাহির হইয়া গেল। বসন্তের প্রভাতে গাড়ীঘোড়ার শব্দ, তীব্র রৌদ্র, ধূলি-ধূমাচ্ছন্ন বাতাস, রাস্তার পিচ ও পেট্রোলের গন্ধ ভিন্ন আর কিছু রহিল না।

৩০

মাথাটা তখনও অবধি কেমন ভার হইয়া আছে, কোন ভাবনাই ভাল করিয়া গুছাইয়া ভাবিবার ক্ষমতা নাই, তবু অজয়ের মনে হইতে লাগিল, হয়ত আজ আবার নন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকে নিজে আঘাত করিয়া বেদনা পাইবার এই সুযোগকে সে সৃষ্টি করিয়াছে। কে এই মহাশত্রু একেবারে তাহার অস্তিত্বের মূলে আসন পাতিয়া বসিয়া এমন করিয়া তাহার তুচ্ছতম সুখেও বাদ সাধিতেছে। কতবার ভাবিয়াছে, নিজের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া ইহার সঙ্গে সে যুদ্ধ সুরু করিবে, কতবার যুদ্ধ করিয়াছেও, কিন্তু কোন্‌টি যে তাহার আসল 'আমি' বেশীক্ষণ তাহা ঠিক রাখিতে পারে নাই বলিয়া জয়-পরাজয়ে কোনও আগ্রহ শেষ অবধি তাহার অবশিষ্ট থাকে নাই। এমনই ভাবে চিরকাল চলিয়াছে। এমনই ভাবে চিরকাল চলিবেও। নিজেকে লইয়া এই সংশয়, নিজের সঙ্গে নিজের পক্ষপাতহীন এই সংগ্রাম কোনওদিন তাহার শেষ হইবার নহে।

বহুক্ষণ পথের উপরই অধোমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নীরবে অধোমুখেই ঘরে গিয়া একটা বই খুলিয়া বসিল। নন্দও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে আসিল, কিন্তু সাহস করিয়া কোনও কথা কহিতে পারিল না। বাহিরে বসন্তের একটি অনির্ব্বচনীয় প্রভাতের অসীমতা ভরা আয়োজন ম্রিয়মাণ পুষ্প-পল্লবের মত ব্যর্থতায় ঝরিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অজয় কহিল, "বেশ ত আমরা দুজনেই? বেরুব ঠিক ক'রে তারপর দিব্যি চুপচাপ ব'সে আছি। এসো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

নন্দ কহিল, "আমার আজ একটুও বেড়াতে ইচ্ছে করছে না। আজকের দিনটা থাক না অজয়-দা। শরীরটাও তত ভাল নেই, শুয়ে থাকতেই মন চাইছে।"

অজয় জেদ ধরিয়া কহিল. "তা কি হয়? আজ তোমার সঙ্গে আগে থাকতে আমার কথা হয়ে আছে, তুমি এখন 'না' বললে চলে কখনো?"

নিজের ধরণে নন্দেরও জেদ কম নহে। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি ত ঘরের মানুষ, আমার সঙ্গে আবার এত কথার আঁটা আঁটি কি? উনি এসেছিলেন, রোজ ত ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না? তাছাড়া কাল সুভদ্রদার সঙ্গে দেখা হতে তিনি বলছিলেন, আজ বরানগরে তাঁদের পার্টি না কি একটা আছে—"

অজয়ের হঠাৎ কি হইল, প্রায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল. "তা বেশ, যেও না। সেকথা আমাকে আগে বললেই ত হ'ত। আজ কি খাবে-দাবেও না ঠিক করেছ?"

নন্দ এমনভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িল, যেন এত বেলাতেও যে তাহাদের খাওয়া হয় নাই সেজন্য সে একলাই কেবল দায়ী। বলিল, "আপনি স্নান সেরে আসুন, তারপর আমি যাচ্ছি।"

স্নানের পর দুইজনে বাহির হইতে আহারাদি সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মুক্তি পাওয়ার পর নন্দ যথাস্থানে ফিরিয়াছে কি-না সংবাদ লইবার জন্যই সম্ভবতঃ পুলিশের একজন লোক অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অজয় ছাতে চলিয়া আসিল এবং কাঠফাটা রোদ মাথায় করিয়া বহুক্ষণ সেখানে পায়চারী করিয়া বেড়াইল। বিশেষ কিছুই যে ভাবিল তাহা নহে। বীণার বিষণ্ণ মুখ জীবনে এই প্রথম দেখিয়াছে, সেই স্মৃতি ঈশানের একখণ্ড কালো মেঘের মত ক্রমে তাহার চিত্তাকাশ আবৃত করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে। আর কোনও কথা ভাবিবার অবকাশ আর বিশেষ নাই।

বেলা যখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, তখন নীচে আসিয়া দেখিল, নন্দ বাড়ী নাই, হয় ত কাছেই কোথাও গিয়াছে, তাহার খোঁজ করার কোনও প্রয়োজন সে বোধ করিল না। আজ একাকী শেষ একবার নিজের সঙ্গে মুখোমুখী করিবার ইচ্ছায় রৌদ্রপ্লাবিত সহরের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু পথে বাহির হইয়াই তাহার কি হইল, নিজের দিকে আর তাকাইতে ইচ্ছা করিল না। যেন সেখানেও নন্দ ঘুমাইতেছে, তাহার ঘুম সে ভাঙাইতে চাহে না। এবারে তাহার ভিতরের এবং বাহিরের আকাশ জুড়িয়া বীণার জলভারাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি নিবিড় হইয়া আসিল।

বরানগরের বাগান অজয়ের অজানা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই আসিয়া সে পৌঁছিল।

নীচে গেটের কাছে রমাপ্রসাদ দাঁড়াইয়া অতিথিদের স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছিল, অজয়কে দেখিয়া এত উৎসাহিত হইল, যে নিজের কর্ত্তব্য সুদ্ধ ভুলিয়া গেল। বাগানের পথে, দীঘির ধারে ধারে কাঁকর বিছানো সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া সে অজয়কে উপরের বসিবার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

পুরু গালিচা বিছানো ঘর। চেয়ার, টেবিল, সোফা, প্রভৃতি আস্‌বাবগুলিকে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া সরাইয়া রাখিয়া সকলে মেঝের উপর গোল হইয়া বসিয়াছে। চিরাচরিত প্রথা মত এক দিকে মেয়েরা ও অপর দিকে ছেলেরা বসিয়াছে, এ-দলের সঙ্গে ও-দলের কথার আদানপ্রদান চলিতেছে না। এক কোণে একটু স্থান করিয়া বসিয়া অজয় বিপুল আগ্রহে সেই জনসমাবেশের মধ্যে তিনিটি পরিচিত প্রিয় মুখের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু বীণা, ঐন্দ্রিলা, সুভদ্র, এ তিনের কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না।

বসিয়া বসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত বিলাতি তৈলচিত্রের নকল এবং বিগত শতাব্দীর ধরণের বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন দেখিয়া যখন ক্লান্তি ধরিয়া গেল তখন উঠিয়া দুতলার খালি ঘরগুলিতে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা ঘরে প্রিয়গোপাল জন-কয়েক লোক জুটাইয়া ব্রিজের আড্ডা জমাইয়াছেন, ইচ্ছা করিয়াই সেই দিকে গেল না। একটা ছোট ঘর একেবারে দীঘির ঠিক উপরেই জলটুঙ্গির ধরণে তৈয়ারী, সেইখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। দীঘির ওপারে খানিকটা ঘাসের জমি, সেইখানে ছেলেদের কেহ কেহ প্যারালাল বারের উপর

চড়িয়া বসিয়াছে, কেহ কেহ দোলনায় দোল খাইতেছে। এপারে রান্না-বাড়ীতে একদল মেয়ে রন্ধনে ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যে সুলতা রহিয়াছেন, উপরের জানালায় অজয়কে দেখিয়া মৃদু হাস্যে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

সরিয়া আসিয়া আর-একটা জানালা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দীঘির জলে মাছের খেলা দেখিতেছে, হঠাৎ পশ্চাতে মেয়েদের কোলাহল শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল। সুভদ্র, ঐন্দ্রিলা ও রাহু আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুলতা সম্ভবতঃ অজয়েরই সন্ধানে উপরে আসিয়াছিলেন, কহিলেন, "ও কি, বীণি কোথা?"

সুভদ্র কহিল, "তাঁর শরীর ভাল নেই ব'লে আসতে পারলেন না।"

মেয়েরা আবার কোলাহল করিয়া উঠিল। সুলতা বলিলেন, "নিজের জন্মদিনে সবাইকে চড়িভাতিতে ডেকে তারপর শরীর ভাল নেই কি রকম? কি অসুখ রে ইলু?"

ঐন্দ্রিলা ঝাঁঝিয়া বলিল, "আমায় কিচ্ছু জিজ্ঞেস কোরো না সুলতাদি, আমি বাপু জানি টানি না কিছু।"

সুলতা বলিলেন, "বেশ ত মজা। অসুখ যদি কিছু হয়েও থাকে, তাই নিয়েই ত তার আসা দরকার। আমি যাচ্ছি তাকে আনতে।" বলিয়া হঠাৎ অধোমুখ অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অজয়বাবু, আপনি চলুন আমার escort হয়ে।"

অজয়ের সেখানে উপস্থিতি একেবারে অকল্পনীয় বলিয়াই সুভদ্র বা ঐন্দ্রিলা দুজনের কেহই তাহাকে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, তাহার নাম হইতেই উভয়ে সচকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু অজয় চকিত দৃষ্টি তুলিয়াই নামাইয়া লইল বলিয়া উহার পর আর কিছু দেখিতে পাইল না।

ঐন্দ্রিলার সঙ্গে কল্যকার প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণটির মত আজও তাহার মন কি এক নামহীন বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া রহিল। মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। সুলতা যে কি মনে করিয়া escort স্বরূপে তাহাকে সঙ্গে লইতে

চাহিতেছেন, তাহা অপর কেহ না বুঝিতে পারিলেও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার ভয় হইতেছিল, যদি ঐন্দ্রিলাও তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকে। কিন্তু উত্তেজনা-বিব্রত দেহমন লইয়া সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। স্থলতা আর একবার আহ্বান করিতেই তাঁহার সঙ্গে সে নীচে নামিয়া গেল। তাহার জীবনে অদৃষ্টের আব-এক নিষ্ঠুর পরিহাস স্বরু হইয়া গেল।

কিন্তু বীণাকে অবলম্বন করিয়া তাহার জীবনে একটি ভ্রমাত্মক নিষ্ঠুর নাট্যরচনা যে স্বরু হইতে পারে ইহা অস্ফুটভাবে অনুভব করা সত্ত্বেও বীণা তাহার চিত্তকে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত করিল না। বীণার সদা-চঞ্চল চিত্তবেগ, তাহার অফুরন্ত বেগবান্ হাসির স্রোত, তাহার চিরপ্রফুল্ল মুখশ্রী কেমন অলক্ষিতে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠে। তাহার নিজের যে কোনও দুর্ভাবনা নাই, এই কারণেই তাহার সম্বন্ধেও কিছু ভাবিতে ইচ্ছা করে না। সে যেন ঠিক পুবাপুরি মানুষ নহে, সে যেন খানিকটা আলোভরা, হাসিভরা চপল আনন্দ। কোনও হিসাব-নিকাশের বন্ধনে তাহাকে বাঁধা যায় না।

ইহা ছাড়া সদাহাস্যময় প্রফুল্লতার এই একটি মায়া আছে, যে-কোনও কারণে সেই হাসি ম্লান হইয়া যাইতে দেখিলে অলক্ষিতেই অপরের মনে একটা অকারণ অস্বস্তি জাগিয়া উঠে। অপ্রাকৃতকে ভয় কবিবার মানুষের যে আদিম প্রবৃত্তি, এই অস্বস্তি সেই জাতীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ সকালে বীণা ম্লান মুখে ফিবিয়া আসিয়াছে, সমস্ত দিন তাহার সেই ম্লান মুখ অজয় এক মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারে নাই। আজ তাহার জন্মদিন বলিয়াই যে সে আজ এত আগ্রহে অজয়কে চাহিতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া অজয়ের অনুশোচনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। জন্মদিনের এই উৎসবেব আয়োজন না-জানি কতদিন ধরিয়া কত আগ্রহে সে করিতেছিল, কল্পনার কত কমনীয় রঙে এই দিনটিকে সে গড়িতেছিল, আজ নিজেই উৎসবে যোগ দেয় নাই, ইহা হইতেই কত বড় আঘাত সে যে বীণাকে আজ করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল। বীণার

সুন্দর মনটি হইতে সেই কুৎসিত আঘাতের শেষ স্মৃতিটিকেও প্রাণপণ চেষ্টায় মুছিয়া দিতে সে আজ কৃতসঙ্কল্প হইল।

বেশী কিছু তাহার করিতে হইল না। মোটরগাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়াইতেই দেখা গেল, বীণা উপর হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরোহীদের দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। অজয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই ঠোঁটচাপা একটি গর্ব্বিত হাসিকে সে কিছুমাত্র লুকাইবার চেষ্টা করিল না। সেই হাসিটিকে অজয়ের ভাল লাগিল। অজয়দের সঙ্গে সঙ্গে সেও তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিল। সুলতা তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "বলে ত পাঠালি অসুখ করেছে, এদিকে ত যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছিস্।"

শাড়ীর আঁচলটাকে ঘুরাইয়া পরিয়া বীণা হাসিয়া উত্তর দিল, "বা রে, নিজের জন্মদিনে একটু সাজবও না বুঝি।"

সুলতা বলিলেন, "থাক্ থাক্, ঢের ন্যাকামী হয়েছে, এইবার চল্।"

কিন্তু বীণা একটা আসন টানিয়া লইয়া বসিল। আজ জন্মদিনে যে উৎসবকে সে এতদিন ধরিয়া প্রাণপণে কামনা করিয়াছে, সেই উৎসবের ক্ষেত্র এক মুহূর্ত্তে এইখানেই তাহার রচিত হইয়া গিয়াছে। ইহার বেশী আর কোনও উৎসবের সেদিন সত্যই তাহার প্রয়োজন ছিল না। বীণার দেখাদেখি অজয়ও তাহার নিকটের আর একটা আসন অধিকার করিয়া বসিল দেখিয়া সুলতা আর কিছুই বলিলেন না। একবার কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে তাহাদের দেখিয়া লইয়া, "মামীমা'র সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসছি" বলিয়া পা টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

তাঁহার এই ছল করিয়া সরিয়া যাওয়ার ভিতরকার অর্থটি অজয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু বীণার কাছে আসিয়া তাহার চিত্ত স্বতঃই কেমন সহজ হইয়া যায়, সুলতার ব্যবহারে বিব্রত বোধ করাটা তাহার তাই অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। বীণার দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিল, "আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

বীণা বলিল, "এমন বেহিসাবী কথা কেন বলেন? ক্ষমা ত আগেই একবার চেয়ে রেখেছেন, এবং এসেছেন যে সেটা চোখেই এখন দেখতে পাচ্ছি।"

একটু পরে গলার স্বর একটু নামাইয়া আবার বলিল, "সেই ত এলেন, তখন এলেই ত পারতেন।"

অজয়ও মৃদু স্বরেই বলিল, "সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব ব'লেই এসেছি।" অন্তরের সহজ অনুভূতির কথাই বলিল, কিন্তু কোথা হইতে কি সুর আসিয়া তাহার কণ্ঠে লাগিল, লক্ষ্য করিল না যে বীণার কর্ণমূল কি এক অস্পষ্ট সুখাবেগের ইঙ্গিতে আতপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার সেই কথা-কয়টির সুর বীণার অন্তরের কোন্ সুপ্ত তারে গিয়া আঘাত করিল, কি দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্যে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিল।

ইহার পর আরও কিছুক্ষণ দুজনে পাশাপাশি বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে তাহারা কথা কহিল। অতি তুচ্ছ বিষয়ে তুচ্ছ কথাগুলি আজ কোন্ মন্ত্রে অপরূপ হইয়া দেখা দিল। পরস্পর পরমাত্মীয় বোধে তাহারা নির্ব্বিরোধে সেই মুহূর্ত্ত কয়টির কাছে আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা সেখানে প্রণয়ী নহে, পুরুষ এবং নারী নহে, অথচ একটি দৃঢ় কিন্তু অলক্ষ্য সখ্যের বন্ধনে তাহাদের দুইটি চিত্ত পরস্পরের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িল, একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মাধুর্য্য তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া রহিল।

সুলতা যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, তখন কিছুতেই আর দেরি করা চলিতে পারিত না। অজয় এবং বীণা বুঝিতে পারিল, এত দেরি করিয়া চড়িভাতির নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাহারা সত্যই অবিচার করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। পথে আসিতে সুলতা বীণার কানে কানে কহিলেন, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ ত, আসবি না ব'লে পাঠিয়ে আসবার জন্যেই তৈরি হয়ে ছিলি কেন?"

বীণাও তাহার কানে কানেই বলিল, "আমি জানতাম তোমরা আসবে।"

স্থলতা বলিলেন, "ইস্, শুনতে সুদ্ধ, শিখেছিস্?" অজয়কে যে তিনিই ডাকিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন, সে কথাটা অপ্রকাশ থাকিয়া গেল।

তৈলচিত্রে ভারতীয় চিত্রকলার নহে, কিন্তু ভারতীয় তক্ষণ শিল্পের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে, একদল শ্রোতা জুটাইয়া বিমান এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে এমন সময় সদলবলে বীণা আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার আর কেবল মেয়েরা নহে, তাহাদের সঙ্গে ছেলেরাও কোলাহল করিয়া উঠিল। বিমান অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদু হাস্যে কহিল, "অসুখ করলেই আপনার চেহারা খুব ইম্প্রুভ করে দেখছি।"

বীণা বলিল, "আপনি বলতে চান অসুখের কথাটা বানানো, এই ত? এত সহজে জিততে পারবেন না। অসুখ করেছিল, কিন্তু স্বীকার করছি সেরে গিয়েছে।" বলিয়া অপাঙ্গে অজয়ের দিকে চাহিল। বিপদ্ হইল অজয়ের। সে আসিয়া অবধি ঐন্দ্রিলাকেই লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার জন্য ঐন্দ্রিলার মনের কোনও কোণে এতটুকুও যে স্থান আছে ইহা সে কখনও মনে করিত না, কিন্তু সে বীণাকে ভালবাসে এ ধারণাও কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া ঐন্দ্রিলার মনে সে জন্মাইয়া দিতে পারে না। অথচ আজ সমস্ত-কিছু এমন ভাবে ঘটিতেছে যে ঐন্দ্রিলা কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিলেই ভুল বুঝিবে। এই ভুলকে কি বলিয়া, কি করিয়া সে ভাঙিয়া দিবে? কিছু বলিবার উপলক্ষ্য ত ঘটে নাই, কেহ কিছু বলে নাই, শুনিতেও চায় নাই, যাহা কিছু ঘটিবার, অত্যন্ত অস্পষ্ট আভাসে ইঙ্গিতে ঘটিতেছে। বীণাকে আঘাত করিয়া সে জানাইতে পারে, কিন্তু এই সদাহাস্যময়ীকে কোন্ অপরাধে সে আঘাত করিবে? তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও আর লাভ নাই, আজ সমস্ত সন্ধ্যা যে ব্যবহার তাহার নিকট হইতে বীণা পাইয়াছে, তাহার পর কোনও উপেক্ষাকেই সে আর উপেক্ষা বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। খুব ইচ্ছা করিতে লাগিল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ব্যবহারে আজ অন্ততঃ নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু সে সময় ত আসে নাই। তাহার এই পরাজয়-

চিহ্নিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে যদি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়? যদি তাহার সেই আত্মপ্রকাশকে অকল্পনীয় স্পর্দ্ধা মনে করিয়া কলকণ্ঠে সে হাসিয়া উঠে?

ঐন্দ্রিলাকে সে নমস্কার করিল; দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসিয়া ঐন্দ্রিলা নীরবে প্রতিনমস্কার করিল।

সুভদ্র এককোণে দাঁড়াইয়া রমাপ্রসাদের সহিত কথা বলিতেছিল, অগ্রসর হইয়া বলিল, "এসমস্ত একেবারে চলবে না।"

সকলে একটু সচকিত হইয়া উঠিল। বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চলবে না?" সুভদ্র বলিল, "এভাবে সব আলাদা হয়ে ব'সে থেকে কি লাভ? আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না, সবাই সবাইকার সঙ্গে মিশছে, গল্প করছে। মাঝখানকার এই বৈতরণীটাকে বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলেদের বা মেয়েদের কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া আজ কিন্তু মনে হইল না, যে এই বৈতরণী পার হইতে কাহারও সত্যই কিছুমাত্র আপত্তি আছে। বীণা মৃদুস্বরে সুলতাকে বলিল, "গরজ থাকলে সুভদ্রবাবুকে কাণ্ডারী না ক'রেও বৈতরণী পার হওয়া যায়।"

সুলতা বলিলেন, "তোর মত গরজ সবা'র নেই সেটা ঠিক।"

বীণা বলিল, "গরজ না থাকে ত যে যেমন আছে থাক্ না।"

সুলতা বলিলেন, "গরজটা সকলের হয়ে সুভদ্রের আজ একলার এবং সেইটেই আজকের মতো অন্ততঃ যথেষ্ট হবে ব'লে বোধ হচ্ছে।"

সুভদ্র তখন সকলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া whispering খেলাটা কি পদার্থ তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছে। বলিতেছে, "সবাইকে যোগ দিতে হবে। প্রথমে ছেলেদের দিক্ থেকে whispering সুরু হবে। যে কোনও একটা কথা দিয়ে সুরু করলেই চলবে। একবারের বেশী কেউ শুনতে চাইলেও শুনতে পাবে না। Whispering এর সুরু কি কথা নিয়ে হয় সেটা নোট ক'রে রাখা হবে এবং শেষ হলে কোন্ কথা কি কথায় এসে দাঁড়ায় সবাইকে তা বলা হবে।"

ছেলেদের মধ্যে যে বাহিরের দিকে সকলের শেষে বসিয়াছিল সে তাহার প্রতিবেশীর কানে "রান্নার আর কত দেরি" বলিয়া কথা স্থরু করিল। স্থভদ্র চীৎকার করিয়া বলিল, "বিমান, ঐন্দ্রিলা দেবী, আপনারাও এসে বস্থন।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমরা অন্ততঃ আর কিণ্ডারগার্টেনের উপযুক্ত নেই। Whispering না ক'রেও অবাধে মিশতে পারছি।"

"তা হোক, তবু এসে বস্থন," বলিয়া স্থভদ্র নিজে বসিয়া পড়িল। বিমান এবং ঐন্দ্রিলা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। রাহু কখন পা টিপিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল কেহ লক্ষ্য করিল না।

ছেলেদের দিকে সকলের কানে কানে কথা বলা হইয়া গেলে শেষ ছেলেটি নাক মুখ চোখ লাল করিয়া উঠিয়া মেয়েদের দিকে গেল এবং সব-কাছে যাহাকে পাইল তাহার কানের ছয় ইঞ্চির মধ্যে মুখ লইয়া কতকটা উচ্চস্বরেই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রায় ছুটিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। মেয়েদের মধ্যে কানাকানি চলিতে লাগিল। কানাকানি শেষ মেয়েটির কাছে পর্য্যন্ত গিয়া পৌছাইলে স্থভদ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি শুনেছেন বলুন।"

মেয়েটি বলিল "আনারকলির দেশ।"

একটা কাগজের টুকরা হাতে তুলিয়া আনিয়া স্থভদ্র বলিল, "whispering স্থরু হয়েছিল, এই ব'লে,—'রান্নার আর কত দেরি'।"

সকলে একসঙ্গে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কানাকানি ক'রে যে কথাটা স্থরু হয়েছিল সেটা আমি নাহয় একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করছি। খুব বেশী রাত ক'রে আর কি দরকার?"

রাত করাতে অনেকেরই কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু খাওয়ার কথা হইতেই সকলে সে-বিষয়ে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। স্থভদ্র দমিবার পাত্র নহে, সে কাহাকেও কিছুমাত্র আমল না দিয়া সেই মেয়েটিকে দিয়া আবার খেলা স্থরু করাইল। "রাত এখনো কিছু হয়নি" বলিয়া কানাকানি স্থরু হইল। একটু পরে

দেখা গেল মেয়েদের মধ্যে একটি সকৌতুক চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। নীল-শাড়ীপরা চশমা-চোখে মেয়েটি তাহার প্রতিবেশিনীর কানে কানে কথাটা শেষ করিতেই পিঠে দস্তুরমত দারুণ রকমের একটি মুষ্ট্যাঘাত লাভ করিল। চতুর্দ্দিকে হাসির একটা রোল উঠিল। সুভদ্র বহুকষ্টে সকলকে থামাইয়া আবার খেলা সুরু করাইল বটে কিন্তু শেষ মেয়েটি কিছুতেই তাহার নিকটতম প্রতিবেশী ছেলের কানে শোনাকথার পুনরাবৃত্তি করিতে রাজি হইল না। আঁচলে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল। কথা যাহারা সুরু করিয়াছিল, তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে অত্যন্ত নির্দ্দোষ কথাটির ভয়াবহ একটা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছে, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করিয়া তাহারা কথাটা জানিয়া লইল এবং সকলে মিলিয়া এ-উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল। সুভদ্রের এবং অন্য কাহারও কাহারও অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও হাসির কথাটা যে কি, ছেলেদের দিকের কাহারও তাহা জানিবার কোনও উপায় রহিল না। মেয়েটিকে ডাকিয়া বীণা বলিল, " যা তা একটা বানিয়ে ব'লে দে-না বাপু, কানে কানে বলা হলেই ত হ'ল।"

৩১

ঘি-ভাত, ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, চিংড়ির কাটলেট, মাছের মুড়া দিয়া ডাল, সরিষা সহযোগে ইলিশ মাছ ভাতে, মাংস, টমেটোর চাটনী, তারপর পায়েস এবং মিষ্টি।

মহা কোলাহলে সকলের খাওয়া শেষ হইলে দেখা গেল, রাত তখনও আটটা বাজে নাই এবং আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। দিনের বেলা অসহ্য গরম পড়িয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ দিক্ হইতে ফুরফুরে হাওয়া দিতেছে। সে হাওয়ার স্পর্শ বেশ শীতল, শরীর জুড়াইয়া যায়। সুভদ্র কখন্ কোথায় বসিয়া

খাইয়াছে কেহ তাহা লক্ষ্যও করে নাই, হঠাৎ সকলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমরা ঠিক করেছি আজ সকলে মিলে হেঁটে দমদম পর্য্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরব। এখান থেকে তিন মাইলের কিছু বেশী হবে, এক ঘণ্টার বেশী লাগবে না।"

সকলে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। ঐন্দ্রিলা ছাতের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া এককোণে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেও কোন প্রতিবাদ করিল না। সুভদ্রের প্রস্তাব সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহা বোঝাও সহজ ছিল না।

সুভদ্র বলিল, "ঠিক হয়েছে আলাদা আলাদা দল ক'রে বেরনো হবে, এবং এক-এক দলে দুজন ক'রে ছেলে এবং দুজন ক'রে মেয়েরা থাকবেন।"

এই অভিনব প্রস্তাব শুনিয়া অনেকেরই বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিল, কিন্তু সুভদ্র যে বুদ্ধি করিয়া একজোড়ার সঙ্গে আর-এক জোড়া পরস্পর প্রহরার জন্য জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে ইহাতে সকলেই একটু আশ্বস্ত বোধ না করিয়াও পারিল না। ছেলেদের মধ্যে যাহারা লাজুক তাহারাও কোনও না কোনও সঙ্গীর পাল্লায় পড়িয়া কোনও-না-কোনও একটা দলে ভিড়িয়া যাইতে লাগিল। মেয়েরা মোটের উপর খুব সাহস দেখাইল। অনভ্যস্ততার মায়ায় অবলীলায় এবং দ্বিধা মাত্র না করিয়া তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গেও বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

শেষ দল বাহির হইয়া গেলে দেখা গেল, ছয়টি মানুষ আর বাকী। সুলতা, বীণা, ঐন্দ্রিলা, সুভদ্র, অজয় এবং রাহু। ঐন্দ্রিলা বলিল, "আমাদেরও কি অর্ডিন্যান্স মানতে হবে?"

সুভদ্র বলিল, "নিশ্চয়।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, 'দুটো পুরো দল আর ত হবে না। আপনারা চারজন বেরোন, আমি রাহুকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুভদ্র বলিল, "তা কি হয়। রাহুকে নিয়ে আপনি একলা বেরোবেন কিরকম? এ ত কলকাতার পথ নয়, কত রকম বিপদ্ হতে পারে।"

স্থলতা বলিলেন, "দাঁড়ান, আমি খুব ভাল ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। অজয়বাবু বীণা আর আমি যাচ্ছি, স্নভদ্রবাবুর দলে রাহু আর ঐন্দ্রিল থাকবে।"

রাহু প্রচণ্ড আপত্তি তুলিয়া বলিল, সে কিছুতেই অজয়বাবুর সঙ্গে ছাড়া যাইবে না। স্থলতা কিছুমাত্র না দমিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "বেশ রাহুকেও আমি নিচ্ছি। দুটো দলই ভাঙা না হয়ে একটা দল অন্ততঃ পূরো হবে তাহলে।"

স্থলতা যে কি মনে করিয়া এইরকম করিয়া দল গড়িবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া অজয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল, "চলুন অজয়বাবু" বলিয়া রাহু তাহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া প্রায় টানিয়াই নীচে নামাইয়া আনিল। স্থলতা বীণাকে সঙ্গে করিয়া নামিলেন।

কিছুক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "স্নভদ্রবাবু, আমায় একটা গাড়ী ডেকে দেবেন? দিদি মোটরটাকে বিদায় ক'রে দিয়ে গিয়েছে দেখছি। আমার শরীরটা একেবারে ভাল নেই, এতক্ষণই জোর ক'রে ছিলাম। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চাই।"

স্নভদ্র বলিল, "কাউকে কিছু না ব'লে আপনি চ'লে গেলে ওরা মহা চেঁচামেচি করবে।—একটুখানি চলুন না, কতটুকুই বা পথ!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "না না, আমায় সত্যিই যেতে হবে।"

স্নভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার মুখে একটু-খানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "আপনি সত্যিই কিণ্ডারগার্টেন ছাড়াননি এখনো। শুধুশুধু বড়াই করছিলেন।"

ঐন্দ্রিলা একথার জবাব না দিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। স্নভদ্র বলিল, "একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন, এগিয়ে গিয়ে আপনার স্থলতাদিদের ধরব।"

ঐন্দ্রিলা অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, স্থলতাদিরা থাকুন। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

দুজনে পাশাপাশি চলিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলা যে অত্যন্ত অনিচ্ছাতে তাহার সঙ্গে

যাইতেছে এই কথাটি বেদনার মত হইয়া সারাক্ষণ সুভদ্রের মনে বিঁধিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার কুণ্ঠায় নিজে কুণ্ঠিত হইয়া অনেকখানি পথ তাহার সঙ্গে কোনও কথাই প্রায় সে কহিতে পারিল না। বাংলার তরুণ-তরুণীদের সামাজিক মিলনের মধ্যেকার যে অপ্রাকৃত এবং কুৎসিত কুণ্ঠার আবরণকে মুক্ত করিয়া দিবে বলিয়া সে এতদিন ধরিয়া এত সাধনা করিয়াছে, আজ এই সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটিকেই সেই কুণ্ঠা অনুভব করিতে দিতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। নিজে কুণ্ঠা বোধ করিয়া অপরাধ করিতেছে তাহাও সে অনুভব করিল। অবশেষে যখন দমদমের পথ আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে তখন সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া কাটাইয়া অকস্মাৎ সে কথা কহিল। বলিল, "পথ ত শেষ হয়ে এল। এত যে ভয় পেয়েছিলেন, ভয়ের কিছু ঘটল কি ?"

এতক্ষণব্যাপী নীরবতার পর এত হঠাৎ সে কথাটা বলিল যে ঐন্দ্রিলা প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিল, তার পর কিছুক্ষণ সুভদ্র কি বলিতে চাহিতেছে তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। যখন বুঝিল, হাসি দমন করিতে পারিল না।

সুভদ্র বলিল, "আমি জানি রাহুর সঙ্গে আপনি বেশ আসতে পারতেন, আসতে চেয়েওছিলেন। কিন্তু ভয়ের কারণ হয়ত তাহলেই কতকটা ছিল।"

ঐন্দ্রিলা মুখে হাসি লইয়াই বলিল, "তা ত ছিলই।"

সুভদ্র বলিল. "তবে ? আমার সঙ্গে এসে কোন্ অসুবিধাটা আপনার হয়েছে বলুন। কি অপরাধে রাহুর চেয়েও escort হিসাবে আমি মন্দ।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আপনি বেশ ভাল escort। সারাপথ চুপ ক'রে না থেকে যদি কথা বলতেন তাহলে আরো বেশী নম্বর দেওয়া যেত।"

সুভদ্র বলিল, "এখন নম্বর দেওয়ার বেলায় যতই উদারতা দেখান. গাড়ী ডাকতে বলবার সময় আপনি কিছুমাত্র আমার প্রতি সুবিচার করেন নি। আপনারা কেন এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন না, যে দুটো মানুষ পথ দিয়ে এক-সঙ্গে কিছুক্ষণ চললে কিংবা একসঙ্গে ব'সে কিছুক্ষণ কথা বললে তাতে পৃথিবীর

কোনো চণ্ডী কিছুমাত্র অশুদ্ধ হয় না। আমরা দুজনে এই পথটুকু হেঁটে আসবার ফলে আমাদের দুজনের পথ হাঁটা হয়েছে, তাছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আর-কোনো জিনিষের এতটুকু নড়চড় হয়নি। আপনি এও ভাববেন না যে আজ এক দিন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে বেড়াবার অধিকার দিয়েছেন ব'লে আমি ক্রমাগত সেই অধিকার আমার আছেই মনে করতে থাকব এবং তার কোনো সুবিধা আপনার কাছ থেকে নেব। সমস্ত জিনিষকে একেবারে তাদের সহজ চেহারায় সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবার শক্তি আমার আছে কিম্বা অন্যরকম ক'রে তাদের দেখবার শক্তি আমার নেই।"

ঐন্দ্রিলা বুঝিতে পারিল, সুভদ্র উত্তেজিত হইতেছে। তাহাকে শান্ত করা প্রয়োজন। পূর্ব্বগামী দলগুলি তখন অদূরে ষ্টেশনের ধারে আসিয়া মিলিয়াছে; তাহাদের কোলাহল স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। গতির বেগ মন্দীভূত করিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "শুনুন সুভদ্রবাবু: কথাটাকে আমিও যে একেবারে চিন্তা করিনি তা নয়। এক সময় ছিল, যখন কিছু ভাববার প্রয়োজন যে আছে তাই আমার মনে হত না, সেজন্যে আমি কখনো ক্লাবেও আসতাম না, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে কথাটাকে আমি ভেবেছি। আমি সত্যিই স্বীকার করছি, আপনার সঙ্গে আসতে কুণ্ঠা বোধ ক'রে আমি আপনার প্রতি অবিচার করেছি। তার কারণ আপনি – আপনি।"

সুভদ্র বলিল, "আমি ত ঐটুকুই কেবল বলি। মানুষে মানুষে তফাৎ আছে তা ত আমি জানিই। মানুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে রাত ন'টায় একলা পথে বেরিয়ে পড়া যায় তা আমি মনে করি না। আমার অভিযোগ হচ্ছে, আপনি আমাকে বেশ ভাল ক'রে জানেন, আপনি মনে মনে নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে আমা হতে আপনার কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, তবু আমাকে ভয় না ক'রে পারেন নি!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ঐ জায়গাটায় আপনি একটু ভুল করেছেন। ভয় আপনাকে

আমি একটুও করিনি। কিন্তু পৃথিবীতে আপনি ছাড়াও লোক আছে, সহজ জিনিষকে সহজভাবে দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।"

সুভদ্র বলিল, "তাদের তা দেখতে অভ্যস্ত করবার ভার আমাদের ওপর। তা না ক'রে তাদের ভয় পেলে অবস্থাটার কোনোদিনই কি প্রতিকার হবে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভয়টা কাটাতে হবে স্বীকার করি, কিন্তু ভয় কাটাতে বললেই কাটান যায় না।"

সুভদ্র বলিল, "যায়। আমি বলছি, যায়। আজকেই কি অনেকখানি ভয় আপনার কেটে যায়নি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভয়টা যদি আপনাকে হত তাহলে, অনেকখানি কেন, একেবারেই কেটে যেত। কিন্তু আমি যাদের ভয় করি তারা সব আসছে পরে।"

সুভদ্র এক ঝটকায় সমস্ত তর্কের জাল দুহাতে সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমরা এই আধঘণ্টা এক সঙ্গে বেড়িয়ে আসার ফলে ভয়ঙ্কর কিছু অনর্থপাত ঘটবে?"

ঐন্দ্রিলা অবলীলায় তর্ক করিতেছিল, হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। সুভদ্রের এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সত্য যে সুভদ্রের আজকার বেড়ানোর পার্টির গল্প কলিকাতায় তাহাদের পরিচিত সমাজে প্রায় প্রত্যেক ড্রইংরুমে এবং খাইবার টেবিলে কয়েকদিন ধরিয়া চলিবে। সমাজ সম্পর্কে যাঁহারা উদারনৈতিক বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, তাঁহারাও এই লইয়া নানারূপ মন্তব্য করিতে ছাড়িবেন না। ঐন্দ্রিলা এবং সুভদ্র সম্বন্ধে ত কথা তাহাদের দলের লোকদের মধ্যেই উঠিবে। কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যকে সে কি সত্যই কিছুমাত্র ভয় করে? নিজের মনের মধ্যে তাকাইয়া সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে পারিলে পৃথিবীর কাহারও কোনও মন্তব্যকে সে সত্যই ভয় করে না। কিন্তু ভয়ের কারণ ত শুধু তাহাই নহে। এই যে তাহার চোখের সম্মুখে অজয় এবং বীণাকে লইয়া

একটি বিচিত্র সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে, সে ত জানে ইহার মধ্যে অর্থ যতখানি অনর্থ তাহার চেয়ে বেশী, অথচ সমস্ত ব্যাপারটার মূলে দুইটি মানুষের অত্যন্ত সহজ মেলামেশা ভিন্ন আর কিছুই ত নাই। কিন্তু কতগুলি মানুষের জন্য কত দুঃখের আয়োজনই হয়ত ঐটুকুর সূত্র ধরিয়া নীরবে হইয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা করিতে লাগিল, সুভদ্রকে সেই কথাটা বলে। এমন হইতে পারে, হয়ত তাহারই ভুল হইতেছে। হয়ত যে জিনিষকে সে সংশয় মনে করিতেছে, তাহার মধ্যে সংশয় কিছু নাই. বীণা এবং অজয় পরস্পরের কাছে খুব সহজভাবেই ধরা পড়িয়াছে। সুভদ্র সে-বিষয়ে কি ভাবে তাহা অন্ততঃ সে জানিয়া লইতে পারিত কিন্তু পাছে ধরা পড়িয়া যাইতে হয়, এই ভয় আসিয়া বাধা দিল।

সুভদ্র মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, এইটেকেই test case ক'রে দেখা যাক্। যদি সত্যই কিছু ঘটে তাহলে তর্কে আপনার জিত। আর কিছু যদি না ঘটে তাহলে হার মানবেন, স্বীকার ক রে যান।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "স্বীকার করছি।"

দুইজনে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া তফাৎ হইয়া গেল।

বীণা পথে বাহির হইয়াই বলিয়া উঠিল, "বা সুলতাদি, কি সুন্দর রাস্তা!"

সুলতা বলিলেন, "তে৷র চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই এখন পবম সুন্দর লাগবে।"

কিন্তু বাস্তবিক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আলোছায়া-বিচিত্র জনবিরল কৃষ্ণচূড় বীথিটির সত্যই অপরূপ শোভা হইয়াছিল। তবে ইহাও সম্ভবতঃ সত্য যে সেদিন সেই শোভাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বীণা অপেক্ষা বেশী আর কাহারও ছিল না। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, সমস্ত অস্তিত্বকে তাহার মধুময় মনে হইতেছিল। কি সে পাইয়াছে এবং কি সে পায় নাই, সেই হিসাব করিতে তাহার মন উঠিতেছিল না। বহুদিন পর হারাইয়া-যাওয়া অজয়কে সে

ফিরিয়া পাইয়াছে, আজ সারা সন্ধ্যা তাহাকে সে কাছে পাইয়াছে, এখনও সে তাহার পাশেই আছে, এইটুকু জানাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতিকার মত উহার বেশী আর কোনও সুখ, ইহারও বাড়া আর কোনও সৌভাগ্য কল্পনা করাও তাহার ক্ষমতার বাহিরে। অজয়কে বলিল, "সত্যিই রাস্তাটা খুব সুন্দর দেখতে, নয় ?"

অজয় বলিল, "সুন্দর বই কি ?"

বীণার কানের কাছে মুখ লইয়া সুলতা মৃদুস্বরে বলিলেন, "চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।"

বীণা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ত খুব সাধু আছ তাহলেই হ'ল।"

অজয় ব্যাপারটাকে অনুমান দ্বারাই বুঝিতে চেষ্টা করিল এবং ভুল করিল না।

বীণা বলিল, "সেদিনকার রাত্রে চাঁপাফুল কুড়নো মনে আছে আপনার ?"

দুর্দ্দমনীয় আবেগে অজয়ের সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল, সেদিনকার রাত্রির বিস্মৃতপ্রায় সুখাবেশ আবার তাহাকে অভিভূত করিল, জোরের সঙ্গেই বলিল, "সেদিনকার কথা ভুলব না।"

সুলতা সন্তর্পণে রাহুকে লইয়া পিছনে পড়িয়া গেলেন। এমনভাবে গতিবেগ কমাইতে লাগিলেন যাহাতে ক্রমে আর তাহাদের কথার গুঞ্জন সুদ্ধ আর শুনিতে পাওয়া না যায়। রাহু অত্যন্ত ছটফট করিতে লাগিল, তাহাকে নানা অসম্ভব গল্প শুনাইয়া থামাইয়া রাখিতে লাগিলেন। বলিলেন, আলিপুরে একটা বাঘ আসিয়াছে, তাহার লেজটা সমুখের দিকে এবং মাথাটা পিছনে। কথাটা শুনিতে খুবই অদ্ভুত শোনাইল কিন্তু রাহু অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, সত্যিই এই বাঘটা কি হিসাবে অন্য বাঘগুলির হইতে আলাদা। সাক্ষীস্বরূপে বীণাকে উপস্থিত করিবার জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি।" সুলতা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্বীকার করিলেন, কথাটা সর্ব্বৈব তাঁহার বানানো, বীণার সাক্ষ্য একেবারেই

অনাবশ্যক, কিন্তু রাহুর ডাক শুনিয়া অজয় এবং বীণা থামিয়া গিয়াছিল, সুতরাং চারজন আবার একসঙ্গে হইতে হইল। সুলতা বীণার কানে কানে কহিলেন, "রাহুকে আমি সাম্‌লাচ্ছি, তোরা একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তা ধ'রে বেরিয়ে যাস্।"

বীণা বলিল, "তার পরে ?"

সুলতা বলিলেন, "আমি রাহুকে নিয়ে এগিয়ে যাবার পর ইচ্ছে হয় এই পথ দিয়ে ফিরবি, নয়ত ডানদিকের কোনো রাস্তা দিয়েই ঘুরে যেতে পারিস্।"

অজয়কে লইয়া একলা হইয়াই বীণা কহিল, "রাস্তাটা চেনেন ?"

অজয় কহিল, "না।"

বীণা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে। যেমন ভোরবেলা আসেননি, এখন তার শাস্তিস্বরূপ রাত দশটা অবধি আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব।"

বীণার এই শাস্তি-ব্যবস্থাতে তাহার কোনও দুঃসাহসিকতা যে আছে, তাহার সাবলীল হাসি শুনিয়া এবং তাহার স্নিগ্ধ সরল মুখের দিকে চাহিয়া অজয়ের তাহা একবারও মনে হইল না। বলিল, "ওরকম ক'রে যদি শাস্তি দেন, তাহলে ক্রমাগতই যে অপরাধ করতে থাকব।"

বীণা বলিল, "অপরাধ আপনি অমনিতেই অনেক করবেন, তা বেশ বুঝতেই পারছি, তার জন্যে কোনো প্রলোভনের আপনার দরকার হবে না।"

নানা কথায় সময় বহিয়া চলিল, কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে আসিয়া পড়িল, কাহারও সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার কথা মনে হইল না। হঠাৎ বীণা বলিয়া উঠিল, "এ জায়গাটা দেখছি আমার জানা। বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়েই খুব পুরনো একটা দীঘি, তার পারে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ী। চারদিকে বন। চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে আনি।"

অজয় বলিল, "বাঘটাঘ নেই ত ?"

বীণা বলিল, "আপনার মতো বীরপুরুষ সঙ্গে থাকতে বাঘকে ভয় কি ?"

বড়রাস্তা হইতে নামিয়া কাঁটাবনের মধ্যে দিয়া ক্ষীণ পথের রেখা ধরিয়া চলিয়া তাহারা তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বীণা পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল, অজয় নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়া বেশ কিছুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ জ্যোৎস্নাদীপ্ত একটি প্রকাণ্ড দীঘির পারে আসিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "Thalata ! Thalata ! কি সুন্দর !"

অজয়ের কবিচিত্তে সমস্ত জিনিষটি একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যস্বপ্নের মত হইয়া দেখা দিল। সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য্যের অনাবিল রসে তাহার অন্তর ভরিয়া লইতে লাগিল।

দীঘির যেদিক্‌টাতে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেদিক্ হইতে একটু দূরেই পুরানো ভাঙা একটা বাড়ী বনের অন্ধকারের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রায় সবকটা দেয়ালই খসিয়া পড়িয়াছে, একদিকের খানিকটা দেয়াল ভাঙা একটু-খানি ছাত মাথায় লইয়া কোনওপ্রকারে খাড়া আছে মাত্র। বাড়ীটির ঠিক সম্মুখেই একটি বাঁধানো আধভাঙা ঘাট। বীণা নৃত্যচপল পায়ে ছুটিয়া গিয়া ঘাটের একটা পৈঠার উপর বসিয়া পড়িল। অজয়কে এবার সে ডাকিল না। হঠাৎ তাহারও মনের উপর শুব্ধ জ্যোৎস্নাস্তিমিত রাত্রি, জনসমাবেশ হইতে দূরে সেই নিভৃত বনের রহস্যসমাকুল মায়া কি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, অজয় কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহার অনতিদূরে আর একটি পৈঠায় বসিল তাহা সুদ্ধ সে বুঝিতে পারিল না।

অজয় বলিল, "সত্যিই ভারি চমৎকার জায়গা। কাছেই কোথাও বেলফুল ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছেন ?"

বীণা বলিল, "বাড়ীটার পেছনে প্রকাণ্ড বেলফুলের ঝাড়। গন্ধরাজ, রঙন,

এসমস্তও আছে। কবে কে বাগান করেছিল, তারা ম'রে কোন্ কালে ভূত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওগুলো আজও মরেনি।"

অজয় বলিল, "আপনি একটু বসুন এখানে, আমি কিছু ফুল সংগ্রহ ক'রে আনছি।"

বীণা বলিল, "আসুন, জন্মদিনের একটা উপহার আপনার কাছ থেকে অন্ততঃ পাওয়া যাবে।"

ত্বরিত পদে অজয় উঠিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না, সে কি করিতেছে। তাহারও অজ্ঞাতে এ কোন্ গোপন প্রভাব ধীরে ধীরে বীণা তাহার উপর বিস্তার করিতেছে। অথচ ইহাকে প্রভাব বলিয়া চিনিবার উপায় নাই, যদি চিনিতে পারিত, সতর্ক হইত। বীণাকে যেন ঘটা করিয়া, চেষ্টা করিয়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে হয় না, যেন সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে সকলের উপর তাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের মত ইহাকে বিনা দ্বিধায় মানিতে হয়, ইহাকে লইয়া বিচার বিতর্ক নিষ্ফল।

একরাশ যূঁই গন্ধরাজ বেলফুল রঙনে রজনীগন্ধায় রুমাল বোঝাই করিয়া অজয় ফিরিয়া আসিল। বীণা যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে তাহার পায়ের কাছে মাটিতে ফুলগুলিকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া সে বলিল, "এই নিন্।"

বীণা বলিল, "ছি ছি, ও কি করলেন? ওগুলোকে মাটিতে রাখলেন কেন?" বলিয়া মুঠি মুঠি করিয়া ফুলগুলিকে আঁচলে উঠাইতে প্রবৃত্ত হইল। একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ লইয়া অজয়ের হাতে দিয়া সে বলিল, "এইটি আপনি নিন্।"

অজয় বলিল, "শিরোধার্য্য করা গেল।"

বীণা বলিল, "টিকি ত দেখছি না আপনার মাথায়, শিরোধার্য্য আর কি ক'রে করবেন।"

উচ্ছ্বসিত হাসিগল্পের বান ডাকিতে লাগিল। কথার মাঝখানে কতগুলি ফুল

হাতে লইয়া খোঁপায় পরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বীণা বলিল, "কোথায় কি গুঁজছি জানি না, পেছনদিকে দুটো চোখ থাকলে মন্দ হত না।"

অজয়ের হঠাৎ চমক ভাঙিল। বুঝিতে পারিল, অবস্থা ক্রমেই বিপদসঙ্কুল হইয়া আসিতেছে। অথচ সে নিরুপায়। কোনও কথা না বলিয়া নিঃশব্দে বীণার পশ্চাতে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, এবং কম্পিত হস্তে কয়েকটি ফুল কোনওরকমে তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিল।

বীণা বলিল, "যাক্, এইতেই হবে। বসুন।"

অজয় যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে আবার পূর্ব্বের জায়গায় আসিয়া বসিল। বীণা বলিল, "আপনাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না?"

অজয় মুখে ম্লান হাসি আনিয়া বলিল, "মনে আবার কি করব?" কিন্তু তাহার মনে মনে যে কি হইতেছিল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন।

বীণা একটা গন্ধরাজ লইয়া নাকের কাছে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে বলিল, "আজ জন্মদিনে আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছে করছে।"

অজয় ভাবিল, ভালই হইল। হয়ত এই সম্পর্ক পাতানোর সূত্রে তাহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে তাহার একটা সহজ সমাধান হইয়া যাইবে। উদ্‌গ্রীব হইয়া সে বলিল, "সে বেশ ত। কি সম্পর্ক পাতাতে চান বলুন।"

বীণা একটু ভাবিয়া বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ভেবে দেখছি।"

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিলে হঠাৎ সে মাথা ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, যেগুলো মনে পড়ছে তার একটাও মনে ধরছে না।"

অজয় আবার শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাছে অলক্ষিতে বিপদ্ কোনও দিক্ হইতে আসিয়া অকস্মাৎ ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি বলি, আমি ত আপনার চেয়ে বয়সে বড়—"

বীণা বলিল, "থাক থাক, ঢের হয়েছে। এমনিতেই ত সর্দ্দারির জ্বালায় অস্থির, তার উপর আবার বয়সে বড়র সম্পর্ক নিয়ে কাজ নেই।"

অজয় বলিল, "বয়সে ছোটর সম্পর্কই না হয় একটা নিচ্ছি।"

বীণা বলিল, "শুনুন। নিজেদের ফাঁকি দিলে চলবে না। এমন সম্পর্ক নিতে হবে যাকে জীবনে আমরা সত্য ক'রে তুলতে পারব। এইবার ভাবুন।"

অজয় এবারে ভাল করিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিল। অন্তরের কি গভীর সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠা হইতে সে এই কথা-কয়টি বলিল ভাবিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল। ইহার অন্তরে কোথাও কোনও আত্মপ্রবঞ্চনা নাই, যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করে তাহাকে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করাই ইহার স্বভাব। ইহার নিকট হইতে কোন্ অকল্যাণ অজয় আশঙ্কা করিতেছে? যেখানে সত্য অনাবৃত সেখানে কোনও অকল্যাণ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। বীণার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যাহাই হউক, সেই-সম্পর্কের মধ্যে কোনও অসত্য, কোনও অন্যায় কোনওদিন প্রশ্রয় পাইবে না, ইহা অনুভব করিয়া সে আশ্বস্ত হইল। সমস্ত মন সাহসে ভরিয়া বলিল, "তেমন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে এখনই কি কিছু নেই?"

বীণা বলিল, "আছে নিশ্চয়। সেইটেরই একটা নাম খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি।"

অজয় বলিল, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক?"

বীণা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও সে যখন কোনও কথা কহিল না তখন অজয় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনে ধরছে না, না?"

বীণাও মৃদুস্বরেই কহিল, "মনে ধরা না ধরার ত কেবল কথা হচ্ছে না। আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবচেয়ে কঠিন সম্পর্ক, আমাদের জীবনে আমরা তার মর্য্যাদা রাখতে পারব কিনা। বন্ধুত্বের ওপর দাবী যা তার কথা বোঝা সহজ, কারণ তার কোনা সীমা নেই। কিন্তু বন্ধুত্বের অধিকারের সীমা

আমাদের হয়ে নির্দ্দেশ ক'রে দেবার কেউ নেই তা কি সব সময় মনে রাখতে পারব ?"

অজয়ও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। বীণা বন্ধুত্বের এমন একতরফা ব্যাখ্যা কেন করিতেছে তাহা কিছু বুঝিতে না পারিয়াও সে কহিল, "চেষ্টা ত করতে পারব ?"

বীণা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা বন্ধু, আজ থেকে চেষ্টা করা যাবে।"

অজয়ও উঠিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিভ্রাট ঘটিল। কিছুক্ষণ হইতে আকাশে মেঘসঞ্চার হইয়া জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ গাঢ়বর্ণের মেঘে তাহা সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া গেল। বীণা বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ।"

অন্ধকারের মধ্য হইতে অজয় বলিল, "যেখানে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন, মেঘ কেটে যাওয়া পর্য্যন্ত।"

কিন্তু মেঘ কাটিল না। অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। বীণা বলিল, "এখন উপায় ?"

অজয় বলিল, "বৃষ্টি যদি স্থরু হয় তাহলেই বিপদ্। তার আগে যেমন ক'রে হোক বেরিয়ে পড়তে হবে।" কিন্তু কথাটা শেষ হইতে না হইতে প্রবল বাতাসের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি পড়িতে স্থরু হইল।

অন্ধকারে বীণাকে অস্পষ্ট একটু আভাসের মত দেখা যাইতেছিল, গায়ের চাদরটা লইয়া তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এইটে ভাল ক'রে মুড়ে দিন।"

বীণা বলিল, "আপনি ?"

অজয় বলিল, "আমার জন্যে ভাববেন না।"

কিন্তু বীণার জন্য ভাবিয়াও অজয় কিছুই স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া চলিল, এবং বেশ বোঝা গেল অবিলম্বে কোথাও আশ্রয় না

না লইলে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইবে। বীণার গায়ের চাদর দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, ঘাটের চাতাল হইতে ভাঙা বাড়ীটার সিঁড়ি পর্য্যন্ত অস্ফুট একটি পথের রেখা রহিয়াছে। অজয় আর কিছুই চিন্তা করিল না, অন্ধকারে বীণার দিকে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া ব'লিল, "আমার হাতে হাত দিন।" বীণা তাহার প্রসারিত হাতে নিজের হাতটি স্থাপন করিলে, তাহাকে টানিয়া লইয়া সে দ্রুতবেগে সেই ভাঙা বাড়ীটার আশ্রয়ে গিয়া উঠিল। বৃষ্টি মুষলধারে নামিল।

গা হইতে ভিজা চাদরটা খুলিতে খুলিতে বীণা কলহাস্য করিয়া উঠিল। "বাবা, একে এই পেছল পথ, তার ওপর ষা˙ক'রে আপনি টান দিলেন, আর একটু হলেই উল্টে পড়তে হত।"

অজয় বলিল, "মাপ করবেন, কোথাও লেগে যায়নি ত?"

বীণা বলিল, "না। আপনি নিশ্চয় আমায় মনে মনে খুব গাল দিচ্ছেন।"

"অজয় বলিল "কেন, আপনাকে গাল দিতে যাব কেন?"

বীণা বলিল, "আপনাকে আমিই ত এনে এই বিপদে ফেললাম।"

অজয় বলিল, "এর মধ্যে আমার বিপদ্ আবার কোন্‌খানে? ভিজতে আমার ভালই লাগে। আমি আপনার কথা ভাবছি।"

বীণা বলিল, "আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। ভিজতেও ত বেশ ভালই লাগছিল।"

অজয় হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তাহলে শুধুশুধুই আপনাকে নিয়ে এই টানা-হেঁচড়াটা হল।"

বীণাও হাসিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে জীর্ণ বাড়ীটার স্বল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে দুইজনে অত্যন্ত কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আকাশ-পৃথিবীর অত্যন্ত নিবিড় নিরবকাশ আলিঙ্গনের মধ্যে তাহারা আবার তাহাদের চতুষ্পার্শ্বকে হারাইয়া

ফেলিল। হাসিগল্পের স্রোত অফুরন্ত গতিতে বহিয়া চলিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎবিকাশের অবকাশে অজয় একএকবার বীণার সুন্দর হাস্যদীপ্ত মুখখানিকে দীপ্ততররূপে দেখিতে পাইতেছিল। আজ সমস্ত বিশ্বব্যাপী অন্ধ বিরূপতার মধ্যে ঐ একটিমাত্র মুখ এমন একটি বিশিষ্ট আত্মীয়তা লইয়া তাহার চোখে প্রতিভাত হইতেছিল, যে তাহার সম্বন্ধে শেষ কুণ্ঠার বাধাটিকেও অবলীলায় সে অতিক্রম করিল। এমন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে সে দেখিল, যেমন করিয়া ইতিপূর্ব্বে আর কোনও নারীকে সে দেখে নাই। এমনভাবে বীণার রূপরশ্মিতে নিজ অন্তরের সহস্রদীপে সে আগুন ধরাইল যেমন কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া সে মনে করে নাই। বীণার হাসির ছোঁয়াচে তাহার সমস্ত চিত্ত হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে কোনও বিচার-বিতর্ক সংশয়শঙ্কার জন্য তিলমাত্র স্থান রহিল না।

হঠাৎ আকাশ পৃথিবী কাঁপাইয়া চতুর্দ্দিকে আগুন ধরাইয়া ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইল। মনে হইল, জীর্ণ বাড়ীটা ধ্বসিয়া গেল। মনে হইল, তাহাদের দুইজনের মাঝখানে যেন বজ্র পড়িল। অজয়ের মনে হইল, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার সংজ্ঞা রহিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, দেখিল, বীণা প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বক্ষঃলগ্ন হইয়া আছে। একটুখানি সরিয়া বিদ্যুতের আলোয় তাহার মুখটি দেখিয়া লইতে গেল, কিন্তু বীণা অধিকতর শক্তিতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অজয় পলকের মত দেখিল, তাহার সদা-প্রফুল্ল হাস্যসমুজ্জ্বল মুখটি ভয়ের বিবর্ণতায় কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। অপরিসীম করুণায় তাহাকে সে আরও কাছে টানিয়া লইয়া আশ্রয় দিল।

৩২

কাপড় ছাড়িয়া মুখহাত ধুইয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলা আলোটা নিবাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় বাহিরে বারান্দায় হৃষীকেশের চটির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। একটুখানি কাশিয়া দরজার বাহির হইতেই তিনি ডাকিলেন, "ইলু, ঘুমিয়েছ ?"

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সে বলিল, "না, মামাবাবু।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "বীণা তোমার সঙ্গে ফেরেনি ?"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, তবে এখুনি এসে পড়বে। আমরা সব দমদমা অবধি হেঁটে আসছিলাম, বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও আট্‌কা প'ড়ে থাকবে।"

শান্তস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া হৃষীকেশ নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দুতলায় সিঁড়ির পাশ হইতে হেমবালাকে চকিত ছায়া ফেলিয়া সরিয়া যাইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা বুঝিল, ব্যাপার এত সহজে মিটিবার নহে।—প্রয়োজন হইলেই হেমবালার চিন্তাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার ক্ষমতা এতদিনে সে অর্জ্জন করিয়াছিল, শুইয়া শুইয়া হৃষীকেশের বীণা সম্বন্ধে গভীর নিশ্চিন্ততাটিকে প্রদীপ্ত ধ্যানমন্ত্রের মত করিয়া নিজের মনের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। সত্যই ত দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ঘটে নাই, নিজেকেও অকারণেই নানা ভয়কল্পনা দিয়া এতক্ষণ সে পীড়িত করিয়াছে। প্রথমে কোনও সামান্য কারণে অজয়দের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকিবে, বীণা সঙ্গে থাকিলে ওরূপ কারণ মিনিটে দশটা করিয়া ঘটিতে পারে, পরে দূর পল্লীর এক নির্জ্জন প্রান্তে বৃষ্টি তাহাদের পথরোধ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ত কোথাও নাই।

অজয় যে সত্যই বীণাকে ভালবাসে না, আজই বিশেষ করিয়া সেই ধারণা

কেন জানি তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অজয়ের সমস্ত বাক্য এবং ব্যবহারকে মনে মনে ওজন করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া বারম্বার সে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে লাগিল। অজয় মুখ ফুটিয়া ঐন্দ্রিলাকে কোনওদিন কিছু বলে নাই। ঐন্দ্রিলা সম্বন্ধে মনোযোগের কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি কখনও সে প্রকাশ করে নাই। কতদিন ঐন্দ্রিলাকে সামান্য একটু কুশলপ্রশ্ন পর্য্যন্ত সে করিতে ভুলিয়াছে। তবু কোন এক রহস্যময় উপায়ে তাহার নীরবতা, তাহার অমনোযোগ, তাহার অসৌজন্যের মধ্য দিয়াই ঐন্দ্রিলা সম্বন্ধে তাহার বিশেষ মনোভাবটি যেন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহার চোখের সেই কেমন একরকম গভীর দৃষ্টি। ঐন্দ্রিলা সব-কিছুকে নিজের ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, সেই দৃষ্টিকে কখনও সে ভুল করে নাই, করা সম্ভবই নহে।

নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সে বুঝাইল, অজয় তাহাকে ভালবাসুক ইহা সত্যই সে কামনা করে না। নিরর্থক তাহাকে ভালবাসিয়া একটা মানুষ দুঃখ পায়, ইহা কেন সে চাহিবে? অজয়ের প্রেমের প্রতিদানে তাহাকে কিছুই ত সে দিতে পারিবে না? কিন্তু তাহার স্বভাবে তাহার আশৈশবের সত্যনিষ্ঠা। সত্য যত অপ্রীতিকরই হউক, নিজের কাছে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেই সে চায়। বীণা এবং অজয়কে অবলম্বন করিয়া এই যে চতুর্দ্দিকে মিথ্যার জাল বোনা হইতেছে, ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াও ত মিথ্যাচার, তাহাই বা সে কেন করিতে যাইবে?

হঠাৎ ঝড়ের একটা ঝটকার মত ঘরে ঢুকিয়া দুম্ করিয়া দরজাটাকে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "ঘুমোস্‌নি এখনও ইলু?"

অজয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াই বীণাকে ঐন্দ্রিলা মনে মনে ক্ষমা করিয়া রাখিয়াছিল, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঘুমোবার জো রেখেছ কিনা? কি হচ্ছিল এত রাত ধ'রে?"

বীণা প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "সব বলছি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বোলো এখন, আমি ত পালিয়ে যাচ্ছি না। আপাততঃ ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছাড়ো ত। কি ক'রে এলে, সাঁত্‌রে?"

বীণা বলিল, "প্রায় তাই। গড়পারের এদিক্‌টায় নৌকোয় এলে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসা যেত। মোটরের এঞ্জিনে জল ঢুকে সে যা কাণ্ড!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কার মোটরে এলে?"

বীণা বলিল, "ঐ যা, নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তা চেহারাটা দে'খে রেখেছি ভাল ক'রে। গাল-পাট্টা দাড়ি, মাথায় কালো কাপড়ের পাগ্‌ড়ি—"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে এসেছ বোঝা যাচ্ছে।"

বীণা বলিল, "ওটা আমি করিনি, করেছেন অজয়বাবু। আমি শ্রদ্ধার দানটা গ্রহণ করেছি।"

বীণা বলিল, "বড় কাজই করেছ। ভদ্রলোকের বুঝি অনেক টাকা, না?"

বীণা বলিল, "সত্যিই ত, ও কথাটা ভেবে দেখিনি।"

ঐন্দ্রিলা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। বলিল, "আচ্ছা, ভেবো এখন, পরে। সম্প্রতি ভিজে কাপড়গুলো ছাড়ো। এই ত সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ।"

"এই ছাড়ছি", বলিয়া বীণা বিছানার একপাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। "কি করছ? বিছানাটাকে সুদ্ধ দিলে ভিজিয়ে" বলিয়া ঐন্দ্রিলা হাঁহাঁ করিয়া উঠিতেই সেও উঠিয়া পড়িল, তারপর নিজের মনে একটু হাসিয়া আলনার কাছে গিয়া কাপড় বদ্‌লাইতে প্রবৃত্ত হইল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার এমন ভাবান্তর ত প্রায় দেখা যায় না, কি হয়েছে তোমার আজ? ট্যাক্সি ভাড়া কত হয়েছে খোঁজ নিয়েছিলে? কতদুর থেকে আসছিলে?"

বীণা বলিল, "তা বেশ অনেক দূর থেকেই। দমদমার সেই পুরনো দীঘিটা

মনে আছে ? সেই যে ভাঙা বাড়ীটার ধারে, বনের মধ্যে, ইস্কুল থেকে সেখানে একবার আমরা outing করতে গিয়েছিলাম ?”

নির্জ্জন তরুছায়াঘন নিবিড়তার মধ্যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বীণাকে লইয়া অজয় একাকী ছিল একথা শুনিতে পাওয়া মাত্র ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যটা কেমন করিয়া উঠিল। এধরণের চাঞ্চল্যের সঙ্গে জীবনে তাহার পরিচয় এই প্রথম। শুষ্ক মুখে একটা ঢোঁক গিলিয়া কষ্টে উচ্চারণ করিল, “ভিজে কাপড়গুলো ছাড়ো।” নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনার কোনও কারণ অনেক ভাবিয়াও সে স্থির করিতে পারিল না।

ভিজা জামাটার হুক খুলিতে খুলিতে বীণা শ্লথ দেহে টানিয়া টানিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। জামা খুলিয়া চুলের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিল, আগুল্‌ফ-লম্বিত সিক্ত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িল। শাড়ীটাকে খুলিয়া তাল পাকাইয়া আল্‌নার নীচে ফেলিয়া রাখিল। বলিল, “আজ আর একটু হলে দুজনকেই মরতে হ’ত।”

ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বের মত সহজ সুর ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “কি হয়েছিল ?”

গা হইতে ভিজা কাপড় আরও কতগুলি খুলিয়া ফেলিয়া বীণা নীচু হইয়া পায়ের কাছ হইতে সেগুলিকে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, “বজ্রপাত !”

ঐন্দ্রিলা বলিল, “সত্যিকারের ? কোথায় ?”

বীণা বলিল, “ভাঙা বাড়ীটার ছাতে।”

অন্য সময় হইলে হয়ত ইহা লইয়া ঐন্দ্রিলা রসিকতা করিতে ছাড়িত না। কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করিল, অজয় এবং বীণার প্রসঙ্গ লইয়া রসিকতা করিবার প্রবৃত্তিও তাহার চলিয়া গিয়াছে। আল্‌না হইতে একটি পাট করা রাতের কামিজ এবং একটি কোঁচানো সরুপাড় ঢাকাই শাড়ী পাড়িয়া সেগুলিকে কোলে করিয়াই বীণা আবার আসিয়া বিছানার একপাশে বসিল। তারপর হঠাৎ নিজের কোলে

মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল। সেই যে হাসি সুরু হইল, কিছুতেই তাহা আর থামিবার নাম করে না।

ঐন্দ্রিলা বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এত হাসির কি পেলে হঠাৎ?"

বীণা বলিল, "ওকে আজ খুব জব্দ করা গেছে।" বলিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া পরম তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি মানুষকে জব্দ করবে, এ আর একটা বেশী কথা কি? ঐ করতেই ত আছ সারাক্ষণ।"

বীণা হাসিতে হাসিতেই বলিল, "জব্দটা এবারে আমি অন্ততঃ ইচ্ছে ক'রে করিনি, ভয়ে একেবারে জ্ঞান হারিয়েছিলাম।"

ঐন্দ্রিলা তীব্রস্বরেই বলিল, "কি কীর্ত্তি ক'রে এসেছ শুনি?" তার পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "যাই ক'রে এসে থাকো, আমাকে কিছু শোনাতে হবে না বাপু, শুনতে আমি সত্যিই চাই না।"

বীণা উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে একটুখানি দম লইয়া কহিল, "না শোনাই ভাল।" তারপর কিছুক্ষণ হাসির অবশিষ্ট আবেগটুকুকে বহিয়া যাইতে দিয়া যেন নিজের মনেই বলিল, "আমার যেমন কপাল! মনের মতন একটা মানুষ যদি বা জুটল, আকাশ ভেঙে বাজ না পড়লে কিছুতেই আর তার সাড়া পাবার জো নেই। এখন কেবল ভাবছি, কপাল-জোরে আজকেই নাহয় বাজ একটা পড়েছে, এর পরে উপায় হবে কি? আমি ইচ্ছে করলেই ত যখন তখন বজ্রপাত বা ভূমিকম্প ঘটাতে পারব না?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "থাক্ থাক্, অমন বিচিত্র বেশ নিয়ে আর এত রসের গল্প করতে হবে না। শীগগির কাপড় বদ্‌লে নাও, আমার বাপু ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।"

বীণা উঠিয়া বলিল, "তুমি শোও, আমি দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবোব এখন।"

সেদিন বহুক্ষণ ধরিয়া বহুযত্নে সে প্রসাধন সম্পন্ন করিল। অনুকূল ভাগ্যের কাছে অমনি করিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া যখন আলো নিবাইয়া শুইতে গেল তখন ঐন্দ্রিলা ঘুমাইতেছে; অন্ততঃ ঘুমাইতেছে মনে করিয়া তাহাকে আর ডাকিল না। কিন্তু অকস্মাৎ অন্ধকারে অল্প একটু পাশ ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "হাসি থামল তোমার?"

চাদরটাকে টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বীণা কহিল, "হ্যাঁ, আজকের মত।"

ঐন্দ্রিলা আর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "এত হাসবার কি হয়েছিল শুনি?"

বীণা আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাজ পড়ার শব্দে ভয় পেয়ে···

বক্তব্যের বাকীটুকু কথাতে না বলিয়া ঐন্দ্রিলাকে সে নিবিড় বাহুবন্ধনে বাঁধিযা লইল।

বীণার বাহুবন্ধন হইতে সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া তাহার পিঠে সশব্দে একটি চপেটাঘাত করিয়া ঐন্দ্রিলা আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। বীণা অনেক ডাকাডাকি করিল, ঐন্দ্রিলা সাড়া দিল না, কিন্তু অনেক রাত অবধি কি একটা ভয়ের মত আবেগে রহিয়া রহিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কি যে ব্যাপার বীণা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আজ কোনও কিছু লইয়াই খুব বেশীক্ষণ ভাবা তাহাব সাধ্য ছিল না, একটু পরেই নিদ্রার সঙ্গে পরিপূর্ণ বিস্মৃতি আসিযা সব আড়াল করিয়া দিল।

প্রভাতে বুকের মধ্যে এক অনামা বেদনার ভার লইয়া ঐন্দ্রিলার ঘুম ভাঙিল। যেন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পীড়িত হইতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের মূর্ত্তিটা ভুলিয়া গিয়াছে, বিভীষিকার অবশেষটুকু মনে আছে। পূবদিকের তিনটা জানলার একটা তাহারা সর্ব্বদাই খুলিয়া শুইত, কাল ঝড় বাদলের জন্য সেটাও বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, তবু ঘরের মধ্যে সমস্ত-কিছু পরিস্ফুট হইয়াই চোখে পড়িতেছে। বুঝিল, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের দরজাটা খুলিয়া দিতে তাহার

কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যেন সব-কিছুর ঠিক সেই পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি সে আজ আর দেখিতে পাইবে না; আকাশ, পৃথিবী, মেঘ, রৌদ্র, জীবনের আলোয় চোখ মেলিয়া অবধি যাহা-কিছুর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতম পরিচয়, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কি যেন এক প্রচ্ছন্ন প্রবঞ্চনা, আজ একমুহূর্ত্তে এতদিনকার সেই প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে।

অজয়কে সে ভালবাসে না, অজয়ের ভালবাসারও কোনও মূল্য যে তাহার কাছে আছে তাহাও নিজের মনে সে স্বীকার করিত না। তবু অজয়কে প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই সে শ্রদ্ধা করিত। তাহার কারণ, সে বিশ্বাস করিত, অজয় মনে যাহা অনুভব করে বাক্যে এবং ব্যবহারে কখনও তাহার অন্যথাচরণ করে না। অজয়ের সমস্ত বাক্য, সমস্ত ব্যবহারকে সে তাই একটি বিশেষ মূল্যে মূল্যবান্ করিয়া দেখিত। আজ তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে প্রবঞ্চিত হইয়াছে। তাহার মনের শ্রদ্ধাকে প্রথম হইতেই অজয় ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর অপর যে-কোনও মানুষেরই মত নিজের আসল মূর্ত্তিটি লুকাইয়া চলাই অজয়েরও স্বভাব।

বীণা ঘুমাইতেছিল, অন্যদিনের মত আজ আর তাহাকে সে ডাকিয়া উঠাইল না। পরীক্ষার পড়ার তাড়া ছিল, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া বই লইয়া বসিল। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পৃথিবীতে শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষ যদি কেউ নাই থাকে ত তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া হইবে কি? পিতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিত, কিন্তু মা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাঁহাকে ভাবিতে সুদ্ধ তাহার এখন ভয় করে। মামাবাবু বাকী আছেন, সে আশা করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকে সে অটুট রাখিতে পারিবে। অজয়ের কথা কিছুতেই আর ভাবিবে না, এই সঙ্কল্পকে ধরিয়া থাকিতে গিয়াই সমস্ত দিন সে অজয়কে ভাবিতে লাগিল।

হেমবালা সেদিন কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী কাহারও সঙ্গেই কথা কহিলেন না।

এমন যে মন্দিরা, সেও কয়েকবার দিদিমাকে ডাকিয়া, তাঁহার শাড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিয়া সাড়া না পাইয়া মুখ কালো করিয়া তাহার আয়ার কাছে ফিরিয়া গেল। ঐন্দ্রিলা এসমস্তই লক্ষ্য করিল, এবং সঙ্গেসঙ্গেই মন হইতে সব ঝাড়িয়াও ফেলিয়া দিল। কিন্তু বিকাল অবধি হেমবালাকে বার-পাঁচেক হৃষীকেশের মহলে আনা-গোনা করিতে দেখিয়া তাহার একেবারেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বীণা রান্নার তদারকে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে ছাতে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "মা বোধহয় একটা কিছু গোল পাকাবার চেষ্টায় আছেন।"

বীণা কহিল, "কি ক'রে বুঝলে ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সকাল থেকেই ঘনঘন মামাবাবুর মহলে যাতায়াত চলছে।"

বীণা কহিল, "ও! তা ত জানিই। বাবা আমাকে একবার ডেকেও পাঠিয়েছিলেন।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তাই নাকি ? কই আমাকে ত কিছু বলনি।"

বীণা কহিল, "তুমি সকাল থেকে যেরকম মুখ ক'রে আছ, তোমার কাছে এগুতেই ভরসা পাইনি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কালকের ব্যাপার নিয়ে কথা ত ? তা তোমাকে কি বললেন মামাবাবু ? ফাঁসী দিতে চাইলেন ?"

বীণা কহিল, "উঁহু। বললেন, তোমার পিসীমা এখনকার দিনের আদব-কায়দায় ত অভ্যস্ত নন্। তোমাদের কোনও ব্যবহারে তাঁর খুব বেশী খটকা না লাগে এইটে তোমরা দেখো।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তুমি কি বললে ?"

বীণা কহিল, "আমি বললাম, তা পিসীমাদের সময়কার আদব-কায়দায় আমরাও ত অভ্যস্ত নই, কিসে তাঁর খটকা লাগবে বা লাগবে না তা আমরাই বা কি ক'রে বুঝব ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মামাবাবু শুনে হাসলেন বুঝি ?"

বীণা কহিল, "হাসির কথা শুনে বাবাকে হাসতে কবে দেখেছ? অত্যন্ত গম্ভীর মুখ ক'রে বললেন, তুমি যা বলছ তাও সত্যি, তারপর চশমাটাকে নাকে তুলে দিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে বসলেন।"

বৃদ্ধ-সম্পর্কিত একটি প্রীতি-স্নিগ্ধতা ভরা অনাবিল হাসির স্রোতে দুই বোনের মনের মধ্যেকার বিরূপতার আড়াল কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া গেল।

বীণা কহিল, "পিসীমাই নাহয় এখনকার দিনের আদব-কায়দা জানেন না, যাঁরা জানেন তাঁরাও যে বড় সহজে ছেড়ে কথা কইবেন তা মনে কোরো না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি তা মনে করিনি। আমার সে ভয় তোমার চেয়ে বেশীই বরং আছে তা তুমি জানো। কেন, তারও পরিচয় পেলে নাকি কিছু?"

বীণা বলিল, "আজকের সন্ধ্যার আসরে মেয়েদের কারও শুভাগমন হয়নি, লক্ষ্য করনি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "লক্ষ্য করিনি, কিন্তু তুমি বললে ব'লে এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। তুমি বলতে চাচ্ছ কালকের ব্যাপার নিয়ে বাইরেও কথা উঠেছে?"

বীণা কহিল, "উঠল ত বয়েই গেল।—কেউ আর আসবে না, এই ত? তা না এলে আমি ত বাঁচি। সবাই আসেন আড্ডা দিতে, হাঙ্গাম পোয়াতে হয় ত আমার। কিন্তু আমি ভাবছি, সুভদ্রবাবুদের কি হল! লোকের কথায় ভড়কে গিয়ে আত্মজনকে ত্যাগ করবেন এমন আদর্শচরিত্র মানুষ তিনি ত অন্ততঃ নন্?"

পরদিন ভোরে ঐন্দ্রিলার নামে ডাকে সুভদ্রের একখানি চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে :

"তর্কে আপনারই জিত হয়েছে। হার-জিত এত শীগগির সাব্যস্ত হবে তা কিন্তু আমি মনে করিনি। প্রিয়দা ভোর থেকে কোর্টের কাগজপত্র দেখবার অবসর পাননি, তাঁর বাড়ীতে কোর্ট বসেছে। যে ক্লাব নিজে থেকেই উঠে গিয়েছে, হঠাৎ তাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে বিশ্বসুদ্ধর উৎসাহ যদি দেখতেন।

"আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি এইজন্যে যে আমি এতদিন পরে সত্যিই

আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এবং যেহেতু আমার মতবাদ নিয়ে একদিন আপনার কাছেই সব-চেয়ে বেশী জোরের সঙ্গে আমি গর্ব্ব করেছিলাম, আপনার কাছেই সর্ব্বাগ্রে আমার ভুল স্বীকার করা উচিত।

"প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্লাবটাকে formally আজ থেকে উঠিয়ে দিচ্ছি। এদিক্ দিয়ে কিছু গ'ড়ে তোলবার আমার সমস্ত চেষ্টাই যে পণ্ডশ্রম তা কিছুদিন থেকে মনে মনে আমি অনুভব করছিলাম। আজ এ ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে, যে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে আধাআধি রফার মত এমন বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। আমি যাদের নিয়ে দল গড়তে চেয়েছিলাম, শেষ অবধি তাদের মধ্যে অনেকে পরস্পরকে চিনতও না। যে পরস্পর-পরিচয়ের সূত্র ধ'রে প্রীতিতে সহানুভূতিতে সমাজ-জীবন সার্থক হয়, তার অত্যন্ত মারাত্মক অভাব আমার এই ছোট দলটির মধ্যে ছিল। কিন্তু কেবল আমার দলটিকে দোষ দিলে হবে কি? এ অভাব দেশের সর্ব্বত্র। আমরা সভাসমিতিতে যাই, নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা শুনি। উপসনালয়ে যাই, নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা শুনি। সামাজিক মিলনের ক্ষেত্রেও নিজের জায়গাটিতে ব'সে বক্তৃতা দিই বা বক্তৃতা শুনি। নিজের আশেপাশের মানুষগুলির মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখি না। দশহাত ব্যবধান মাঝে রেখে কচিৎ যে কটাক্ষের খেয়া-পারাপার চলে, সেটা সমাজ-চৈতন্যের জিনিষ নয়, সমাজ-সৃষ্টির পূর্ব্বেও পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ছিল। আসলে ও জিনিষ অসামাজিক এবং কোনো কোনো হিসাবে নরনারীর পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধার দ্যোতক। আমি আজ খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করছি, নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধে এই অসামাজিক অশ্রদ্ধা অপারচয় এবং অর্দ্ধপরিচয়ের মধ্যেই সব-চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পায়।

"প্রিয়দাকে যাঁরা অনুযোগ করছেন তাঁদেরও আমি দোষ দিই না, কারণ আমি জানি, অর্দ্ধপরিচিতদের ঘনিষ্ঠ মিলনের যে সুযোগ সেদিন আমরা ক'রে দিয়েছিলাম তার অপব্যবহার হয়ত কোথাও কোথাও হয়েছে। ভবতোষদের এবং পুঁটিদের

শেষ অবধি আমরা রাশ মানাতে পারিনি। আমার দুঃখ প্রিয়দার জন্যে। আপনাদের কথা ভেবেও দুঃখ পাচ্ছি, অকারণেই এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে আপনাদের নাম জড়িয়ে গেল। প্রিয়দা আমাকে ক্ষমা করতে বাধ্য, কেননা এসম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে আছে। আপনাদের ক্ষমা চাইতে পারি সে-সাহস আমার নেই।

"আপনাদের করুণা উদ্রিক্ত করবার জন্যে লিখছি, আমার দু-একটি রোগিণী ছিলেন, চিকিৎসক হিসাবেও তাঁদের কাছে যাওয়া আমার নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এঁদের একজনের কথা বলতে পারি, তাঁর অসুখটা মারাত্মক এবং আমার চিকিৎসায় তাঁর সেরে ওঠবার খুব বেশী সম্ভাবনা ছিল।"

হঠাৎ বীণার দিকে ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "থাক্, অমন অপূর্ব্ব মুখ ক'রে আর তাকাতে হবে না। এই নাও, পড়।"

চিঠিটিকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া আবারও তাহার স্থানে স্থানে চোখ বুলাইযা লইয়া বীণা কহিল, "বেচারা সুভদ্রবাবু!"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বেচারা কিজন্যে?"

বীণা কহিল, "অমনি খচ্ ক'রে লাগল! বেচারা এই জন্যে যে এত ত বুদ্ধিমান্ মানুষ, তবু একটা সহজ কথা এত কষ্ট ক'রে তাঁকে বুঝতে হল। কি লিখবে জবাবে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কি আবার লিখব? কিছুই লিখব না।"

বীণা কহিল, "বা রে! ভদ্রলোক এত ক'রে ক্ষমা চেয়েছেন, তাও যদি সত্যিকারের অপরাধ কিছু হত। ক্ষমা করতে পারার এমন সুযোগ পুরুষমানুষের বেলায় ছাড়তে হয়? কিছু লিখবি না কি রকম? আমি বলি, কাল বিকেলে চা খেতে ব'লে চিঠি লিখে দে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সে কাজ ত তোমার, তুমিই তাহলে কর।"

বীণা কহিল, "খুব যে সাহস বাড়ছে দেখছি। কাজের ভার আমাকে যদি

দাও, আমি নিজের মত ক'রে করব। স্বয়ং গিয়ে ধ'রে নিয়ে আসব।—অজয়-বাবুকেও অবিশ্যি আনব সেই সঙ্গে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমাকে বাধা দেবে কে?

৩৩

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া অজয় বুঝিতে পারিল, বজ্রপাত ভাঙা বাড়ীটার ছাতেই কেবল যে আজ হইয়াছে তাহা নহে, তাহার জীবনের মাঝখানেও হইয়াছে। অথচ তাহার অন্তর্য্যামী জানেন এতবড় শাস্তি একটুও তাহার পাওনা নয়। বীণাকে তাহার ভাল লাগে একথা ত নিজের কাছে কখনও সে অস্বীকার করে নাই; খুব বেশীই ভাল লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয়ও ত নিঃসংশয় ভাবেই জানে, এই ভাল লাগার মূলে ঐন্দ্রিলা কতখানি। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কি আজ আর তাহা বিশ্বাস করিবে? ঐন্দ্রিলা বিশ্বাস করিবে?

বীণার সম্বন্ধে তাহার চিত্তগতি অত্যন্ত সহজ স্রোতেই চিরকাল বহিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন কোনওদিন সে অনুভব করিত না, আজও করে নাই। বিমানের সঙ্গে, নন্দের সঙ্গে তাহার যে দ্বিধাহীন অসঙ্কোচ সম্পর্ক, বীণাকেও তেমনই সম্পর্কের মধ্যে কেন সে কাছে পাইবে না এ প্রশ্ন বারম্বার নিজকে সে করিয়াছে। অবশ্য বীণা নারী, [illegible] সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া তাহার সাধ্য ছিল না, কিন্তু হওয়া কর্ত্তব্যও হইত না। বেচারি বীণা! অজয় না থাকিলে ভয়েই আজ হয়ত তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইত। তাহাকে আশ্রয় না দিয়া, নিষ্ঠুর হইয়া বুকের কাছ হইতে দূরে ঠেলিয়া দিলেই বুঝি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা হইত? এক ভয়াতুর বিপন্না নারী, একটু আগে যে তাহাকে

বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, ঐরূপেই বুঝি তাহার প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য, বন্ধুর কর্ত্তব্য করা হইত ?

বীণার কথাও বলিতে হয়, ভয়ের প্রথম আবেগটা কাটিয়া যাইবামাত্র সেও অজয়কে মৃদু অথচ দৃঢ় হাতেই দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। অজয়ও তাহাকে বাধা দেয় নাই। তারপর হইতে দুজনেই তাহারা এমন ব্যবহার করিয়াছে যেন মাঝখানকার এই কয়েকটা মুহূর্ত্ত সত্যসত্যই তাহাদের জীবনে আসে নাই, অথবা আসিয়া থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করিবার মত কিছু নহে।

কিন্তু অন্যায় করে নাই, যত জোরের সঙ্গে নিজেকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল তত বেশী করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে জানিত না, ঐন্দ্রিলা সত্যসত্যই কতখানি তাহার মনকে জানে। সামান্য একটু চোখের দৃষ্টির বিনিময়ে, ব্যবহারেব একটু বিশেষ সলজ্জ আড়ষ্টতায় তাহার হৃদয়ের কত গভীর রহস্যই ঐ বুদ্ধিমতী মেয়েটির নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তাই, হয়ত যে কিছুই জানে না, বীণার কাছে ভুল জানিয়া ভুল বুঝিয়া তাহার চিত্ত পাছে চিরদিনের মত বিমুখ হইয়া যায় এই ভয়ে অজয়ের বুকের রক্ত হিম হইয়া জমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার জীবনে সমস্যা-সংশয়ের যেন অভাব ছিল, তাই আজ আবার এই এক অভিনব এবং বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হইল। ক্লান্তিতে এমনিতেই তাহার দেহমন অবসন্ন হইয়া আছে, দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে যাহার ক্লেশ বোধ হয়, সে কি শক্তি লইয়া এই সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে? তাহার সমস্ত অস্তিত্ব একটুখানি বিশ্রামের জন্য ক্ষুধিত হইয়া ছিল, স্থির করিল, সম্প্রতিকার মত আবার পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে।

হয়ত একটি সুখস্পর্শের স্মৃতি গোপনে গোপনে তাহার বুকের তারে অতি মৃদু করুণ স্বরে আঘাত করিতেছিল, হয়ত নিজের কোনও ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণে নিজের কাছে সে অস্বীকার করিতেও চাহিতেছিল, যে কারণেই হউক, নিজের চতুর্দ্দিকে নির্লিপ্ততার প্রাচীর রচিত করিয়া তাহার মধ্যে অতঃপর সে

আত্মরক্ষা করিল। স্থির করিল, ধারাবর্ষণের শীতল আর্দ্রতার মধ্যে একটুখানি সুকোমল উষ্ণতায় যে-মানুষটা বীণার কমনীয় দেহের স্পর্শ পাইয়াছিল, সে অজয় নহে, আর কেহ। সে-মানুষটার সঙ্গে অজয়ের পরিচয় মাত্র চতুর্ব্বিংশ বৎসরের। অজয় যে তাহাকে চিরন্তন মনে করিতেছে, অন্তরতম মনে করিতেছে, ইহা মায়া।

কিন্তু দেখা গেল, দুপুর রাত্রি অবধি অজয় যে জলে ভিজিয়াছিল সে-জিনিষটা অন্ততঃ মায়া নহে। শেষরাত্রির দিকে সমস্ত শরীরে ব্যথা হইয়া জ্বর আসিল। মনে করিল, দুর্ব্বল শরীরে বহু উত্তেজনায় গাটা একটু গরম হইয়াছে, অল্পেতেই সারিয়া যাইবে। ফিরিয়া অবধি নন্দকে দেখিতে পায় নাই, হয় নিজেই কিছু না বলিয়া কোথাও সে চলিয়া গিয়াছে অথবা ঘটনাচক্র চলিয়া যাইতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। পরদিন সমস্তদিন অনাহারে অন্ধকার গরাদে-দেওয়া স্যাঁৎসেতে ঘরটায় অজয় একলা পড়িয়া রহিল। বিকালের দিকে আগুনের মত হইয়া গা তাতিয়া উঠিল। এঁদো গলির এক মাথায় পোড়োবাড়ীর মত এই বাড়ীটা, কেউ যে সহসা এদিকে আসিয়া পড়িবে এমন ভরসা ছিল না। একবার ভাবিল, উঠিয়া গিয়া একটা গাড়ী ডাকে এবং কোনও রকম করিয়া সুভদ্রদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে চলিয়া যায়, কিন্তু সুভদ্রের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কথার আদান-প্রদান সেদিন অতি সামান্যই হইয়াছিল। অজয় কেমন করিয়া জানিবে একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া সুভদ্র তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে কিনা।

রাত্রিতে ঘুমাইল, না অচেতন হইয়া রহিল, বুঝিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া নন্দের একটুকরা চিঠি অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল। নন্দ লিখিয়াছে:

'অজয়দা, আমার কোনো অপরাধ ছিল না, কিন্তু নিজের পথে নিজের দুঃখ-দুর্ভাগ্য নিয়ে একলা চলতে এরা আমাকে দেবে না, আমাকে পথ থেকে নেমে যেতে বাধ্য করবে। যেদিকে পা বাড়াচ্ছি, জানি না কোথায় গিয়ে ঠেকব। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি, নন্দ।'

বুঝিল, আর ইচ্ছা করিলেও সুভদ্র বা অপর কাহারও আশ্রয়ে যাইবার

তাহার উপায় নাই। সম্পূর্ণরূপে সে চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছে। কষ্টে উঠিয়া কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া খাইতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

সমস্তদিন অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় কাটিল। যখনই ভাবিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল, উদ্ধারের নানা উপায় ভাবিয়া দেখিল। ভাবিল, প্রাণপণ জোরে চীৎকার করিবে, যদিই দূরের বড় রাস্তা বা আশপাশের কোনও বাড়ী হইতে কেহ শুনিতে পায়। কিন্তু সমস্ত বুকে এমন ব্যথা হইয়াছে, জোরে নিঃশ্বাস লইতে সুদ্ধ কষ্ট হয়। যদি পিওনটা কোনও গতিকে আসিয়া পড়ে তবে তাহাকে দিয়া সুভদ্রকে সংবাদ দেওয়া যায়। কিন্তু পিওন কাহার চিঠি লইয়া আসিবে? যদি পিতার কাছ হইতে চিঠি আসে? পিতার কথা মনে হইতেই অজয়ের দুর্ব্বল বুকটা রুদ্ধ অশ্রুর বিপুল আবেগে শতধা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। মনে পড়িল, তাহার সামান্য একটু মাথা ধরিলে উদ্বেগে তাহার বাবার আহারনিদ্রা ঘুচিয়া যাইত। একটুখানি তাহার গা তাতিলে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কাছছাড়া হইতেন না। যখন সে অনাহারে মরিতে বসিয়াছিল, তখন পিতার প্রতি কোনওদিন এতটুকু অভিমান তাহার হয় নাই, সে জানিত অবস্থাটাকে সে নিজে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, পিতাকে সেদিককার সমস্ত দায়িত্ব হইতে ইচ্ছা করিয়া মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু আজ যে সে সত্যসত্যই মরিতে বসিয়াছে, ইহা ত তাহার নিজের কোনও অপরাধের দরুণ হয় নাই।

ক্রমাগত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বুকের ব্যথা যখন আরও বাড়িয়া গেল তখন পিতার চিন্তাকেও জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া দিল। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, অবিরাম বারিপাতের ঝর্ঝর শব্দ কানে করিয়া দুর্ব্বল দেহে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ঘুম কিছুতেই আসিল না। এক-একবার তন্দ্রার মত ঘোর চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আসে, তখনই নিজের ঘোরতর বিপদের কথা মনে হইয়া চমকিয়া জাগিয়া যায়। মনটাকে শান্ত করিবার জন্য ঐন্দ্রিলাকে ভাবিতে চেষ্টা করিল, বুকের দ্রুত স্পন্দনের সঙ্গে মিলাইয়া সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি-ঐশ্বর্য্য-ভরা

নামটিকে বহুক্ষণ সে মন্ত্রের মত করিয়া জপ করিল। ক্রমে ভিতর এবং বাহিরের অন্ধকার ভরিয়া একটি আবেশময় সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ধীরে তাহার চেতনাকে ঘিরিয়া মোহজাল বিস্তার করিল। আধঘুম আধ-জাগরণে আজও সে অনুভব করিল, এই অপরূপ আবেশ, তাহার চিত্তের এই আনন্দ-বেদনা-মিশান অভিনব ব্যাকুলতা ঐন্দ্রিলাকে ঘিরিয়া স্পন্দিত তরঙ্গিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার কোথায় যেন বীণারও স্পর্শ অতি গভীর করিয়া রহিয়াছে। ঐন্দ্রিলার অনিন্দিত দেহকান্তি, তাহার দীপ্তিময় মন, এবং এ-সমস্তকে অতিক্রম করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক্‌কার যে-একটি নামহীন বিপুল রহস্য হইতে এই সৌন্দর্য্য-স্রোত সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে, হাস্যময়ী বীণাই যেন হাত ধরিয়া তাহার পিপাসিত চিত্তকে সেই স্রোতের তীরে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। নিজের প্রেমের জ্যোতিঃতে অজয়ের প্রেমকে সে দৃষ্টিদান করিতেছে। আধ চেতনায় ইহার বেশী স্পষ্ট করিয়া আর কিছু সে অনুভব করিল না। ধীরে নিদ্রা আসিয়া সব অনুভূতিকে মগ্ন করিয়া দিল।

জ্ঞান হইতেই প্রথমে অনুভব করিল, বাতাসে কি একটা পরিচিত উগ্র গন্ধ। কপালে কাহার করস্পর্শ। চোখ তুলিয়া দেখিল, সুভদ্র। কষ্টে উচ্চারণ করিল, "তুমি?"

সুভদ্র বলিল, "নিতান্ত বাঁচা তোমার অদৃষ্টে আছে, তাই গিয়ে পড়েছিলাম। যাক্, এখনও কথা বলবার চেষ্টা কোরো না, এই ওষুধটুকু খেয়ে ফেল, তারপর আবার চুপ ক'রে ঘুমোও।"

দেখিল, সুভদ্রের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে তাহার পূর্ব্বেকার সেই ঘর। ওষুধ খাওয়া হইলে বারণ না মানিয়া আবার কথা কহিল। বলিল, "এখানে কখন এলাম?"

সুভদ্র বলিল, "এসেছ এরই মধ্যে একদিন। পরে সব শুনো এখন। সম্প্রতি কি রকম বোধ করছ? জ্বরটা ত খুব ক'মে গিয়েছে।"

সুভদ্র আবার তাহার কপালে হাত রাখিল, দুর্ব্বল হস্তে চোখের উপর টানিয়া অজয় সেটাকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল। সুভদ্র কিছুই বলিল না, অন্য হাতের আঙুলগুলিকে গভীর স্নেহে নীরবে তাহার চুলের মধ্যে চালনা করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে বিমানের গলা শোনা গেল,

"Some little germ will find you some day…"

সঙ্গে সঙ্গে বীণার, "Little germদের একটা খুব গুণ আছে, তারা কথায় কথায় কানের কাছে গলা ছেড়ে গান ধরে না। তা আবার অমন গান।"

বিস্মিত ভীত দৃষ্টিতে অজয় সুভদ্রের মুখের দিকে চাহিল। মৃদু হাসিয়া সুভদ্র বলিল, "বীণা দেবী। রোজই দুবেলা আসছেন।" সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় চামচ হাতে গাছ-কোমর বাঁধা বীণা আরক্ত মুখে ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখের স্বাভাবিক স্বচ্ছ রং যেন আগুন-তাতে আরও স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, ভিতর হইতে উষারুণের দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অজয় সম্বিৎ লাভ করিয়াছে দেখিয়াই প্রায় ছুটিয়া সে তাহার কাছে আসিল, কহিল, "কেমন আছেন? ভাল আছেন? বাবা, এতরকম বিপদ্‌ও না নিজের জন্যে আপনি বাধাতে পারেন!"

বালিশে কনুয়ের ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া অজয় ক্ষীণস্বরে কেবল কহিল, "আপনি!" সুভদ্র তাড়াতাড়ি তাহাকে শোয়াইয়া দিল।

বীণা দুইহাত কোমরে রাখিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি। তার হয়েছে কি?"

অজয় বলিল, "আপনি এলেন কেন কষ্ট করতে?"

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কষ্ট সবটাই প্রায় করা হয়ে গিয়েছে, কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু করা এখন আর আপনার সাধ্যে নেই। আরও কষ্ট যাতে না করতে হয় এখন দয়া ক'রে সেই ব্যবস্থাটা করুন। একটু তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।"

অজয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার আর ছিল না। কিন্তু যে-সমস্যার সূত্রপাত মাত্র দেখিয়া ভয়ে সে জ্ঞান হারাইয়াছিল, তাহা যে বেশ জালের মত নিবিড় হইয়া ঘিরিয়া আসিতেছে, এবং সেই জালের মধ্যে সে যে নিরুপায় হইয়া জড়াইতেছে, ইহা বুঝিতে পারা সে-অবস্থাতেও তাহার কিছু-মাত্র কঠিন হইল না। কিন্তু দেহমন ভরিয়া আজ তাহার এমন গভীর ক্লান্তির জড়তা, যে আজ আর ইহা লইয়া ভয়ও সে পাইল না।

চৌকা চেয়ারগুলির একটাকে টানিয়া লইয়া বীণা অজয়ের বিছানার পাশে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া সুভদ্র বলিয়া উঠিল, "বসছেন যে বড়? ওদিকে খাবার বসিয়ে এসেছেন উনুনের ওপব, মনে আছে?"

"ওই যাঃ, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম," বলিয়া বীণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুভদ্র বলিল, "তোমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার মত চিকিৎসক আর বীণা দেবীর মত নার্স একসঙ্গে পেয়েছ।"

অজয় বলিল, "সে ত হল, কিন্তু ওঁর সাম্‌নে বিছানায় শুয়ে থাকতে সুদ্ধ আমার লজ্জা করছে। ওকে কেন তোমরা আসতে দিলে?"

সুভদ্র বলিল, "আমরা আসতে দিলাম মানে? উনিই ত এসে আমাদের প্রথমে ডেকে নিয়ে গেলেন। তা উনি থাকাতে অপরাধটা কি হয়েছে? সেই থেকে যা উনি করছেন তোমার জন্যে!"

বীণার পায়ের শব্দ আবার শুনিতে পাওয়া গেল। দরজার চৌকাঠ পার হইতে হইতে সে বলিল, "আমায় ত খুব তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, জিনিষটা ঠিক হল কিনা আপনার গিয়ে দেখবার কথা ছিল তা বুঝি ভুলে গেছেন?"

সুভদ্র আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক কথা, চলুন যাচ্ছি।"

কিন্তু বীণা পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে বেশ করিয়া গুছাইয়া বসিল, বলিল, "থাক্, আর যেতে হবে না। আমি নামিয়ে রেখে এসেছি।"

একটা তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে বিমান আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ডান হাতের উল্টা পিঠে অজয়ের জ্বর পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বেড়ে আছে অজয়। বর্ষা আর একটু ভাল ক'রে নামুক, ঠিক করেছি রোজ রাত্তিরে জলে ভিজব।"

বীণা বলিল, "আর কিছু লাভ না হোক, আপনার গলাটা তাহলে একটু ভাঙে।"

বিমান বলিল, "নিতান্ত ভগবান্ রসনায় ধার দেননি, তাইত গলার জোরটা অভ্যেস করেছি।"

বীণা বলিল, "ভগবানের এমন অপবাদ আপনি ছাড়া কেউ দেবে না।"

সুভদ্র বলিল, "দুদিন বেচারা না খেয়ে আছে, ওকে খেতে দিয়ে দিলে হয় না?"

বীণা বলিল, "দিচ্ছি, জুড়োক। এইমাত্র ত উনুন থেকে নামল।"

অজয় বুঝিল, একটুক্ষণের জন্যও তাহার কাছাছাড়া হইতে ঠিক তখনই বীণার ইচ্ছা করিতেছে না। কৃপা-পরবশ হইয়া কহিল, "একটু দেরি হলে কিছুই এসে যাবে না। তাছাড়া এইমাত্র ত ওষুদ খেয়েছি।" সুভদ্র কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে অবাক্ হইতেছে লক্ষ্য করিয়া বীণা এরপর উঠিয়া পড়িল, এবং ট্রেতে করিয়া ধূমায়িত খাবারের বাটি, ফিডিং কাপ, জলের গেলাস ইত্যাদি আনিয়া পরম যত্নে অজয়কে আহার করাইল।

বিকালে পাঁচটার একটু আগে বীণা আবার একবার অজয়ের খবর লইতে আসিয়া দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। ভয়ে ভয়ে কহিল, "কতক্ষণ ঘুমচ্ছেন?"

সুভদ্র কহিল, "আপনি যাবার পর থেকেই।"

বীণার গলার কাছটা কাঁপিয়া গেল, কহিল, "এবারে জাগিয়ে দেব?"

সুভদ্র চিকিৎসকোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই না। ঘুমনোটাই ওর এখন সব চেয়ে বেশী দরকার। নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলে রোগীকে যতটা বিশ্রাম দেওয়া যায় দিতে হয়।"

বীণা তবু বলিল, "কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন, না কলাকের মত মূর্চ্ছার ভাব এটা, তা দেখাও কি কর্ত্তব্য নয় ?"

সুভদ্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিল, "উঁহু, মুর্চ্ছা এটা হতেই পারে না। আপনি কেন ভাবছেন ? নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান, যদি দরকার হয় আমিই আপনাকে খবর দেব।"

সে যে আসিয়াছিল, অজয়কে তাহা জানাইয়া যাওয়া হইল না বলিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে, নতমস্তকে ধীরপদে বীণা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তাহার গাড়ী গলিব মোড় ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলে সুভদ্র তাড়াতাড়ি বিমানের দরজায় গিয়া ঘা দিল। ঘুম জড়ান চোখে দ্বার খুলিয়া দিয়া চোখ হইতে দিনের আলোকে আড়াল করিয়া বিমান কহিল, "কেন বাবা এই গভীর রাত্রে হল্লা করতে এলে? কি ব্যাপার ?"

সুভদ্র বলিল, "তুমি শীগ্‌গির যাও, বিমান। যে কেউ একজন ভাল ডাক্তারকে ডেকে আনো গে। আমি জানি, সারিয়ে দিতে পারব। কিন্তু যদিই না পারি ? নিজের হাতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না।"

বিমান কহিল, "ঐ কথাটা রোজ দুবেলা ক'রে তোমার বলা চাই ? কি হয়েছে চল দেখি। আমি তোমায় বলছি, তোমার ওষুদেই ও সারবে।"।

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়াই বীণা দেখিল, ঐন্দ্রিলা আরও আগেই স্নান সারিয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিয়াছে। বলিল, "এখনো ত ভাল ক'রে অন্ধকারই কাটেনি, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছ ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "না দে'খে আঁকা ছবি কি রকম দাঁড়ায় দেখছি।"

আর কিছু না বলিয়া বীণা মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

নীচে বসিয়া চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাইতেছে এমন সময় হৃষীকেশ ধীরে ধীরে আসিয়া টেবিলের একপাশে দাঁড়াইলেন।

টেবিলের উপরে বাংলা ইংরেজী খবরের কাগজ আরও যে দুএকটা পড়িয়া ছিল, সেগুলিকে লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, "অজয় কি এখন একটু ভাল আছেন ?"

বীণা বলিল, "হ্যাঁ, একটু ভাল। কিন্তু খুব বেশী সাবধান না হলে একটুতেই বিপদ্ বাধতে পারে।"

হৃষীকেশ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমায় আজও কি যেতে হবে ?"

বীণা বলিল, "যাওয়াই উচিত। না গেলে তাঁর এবং অন্যদের খুবই অসুবিধা হবে।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাঁকে দেখতে আর কে সেখানে আছেন ?"

বীণা একটু বিপদে পড়িল। তাড়াতাড়ি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "সুভদ্রবাবু আছেন, কিন্তু তিনি থাকা না-থাকা প্রায় সমান কথা। তিনি খুব ভাল চিকিৎসক বটে, কিন্তু রোগীর সেবা করতে মোটেই অভ্যস্ত নন।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "ও কাজটা সবাই পারে না, সেটা ঠিক। কিন্তু তোমাদের নিয়ে আজ সকালে একটু গুরুসদয়বাবুর বাড়ী যাব ভেবেছিলাম। তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ তা জানো বোধহয়। অনেকদিন ধ'রে তোমাদের দু'বোনকে দেখতে চাচ্ছেন। তিনি তোমার মার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।"

বীণা বলিল, "আর দুদিন পরে গেলে চলে না বাবা ? অজয়বাবু আর-একটুখানি সেরে উঠলেই যাব।"

হৃষীকেশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা চলে।" তারপর চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে একটু কাশিয়া লইয়া আবার বলিলেন, "তোমার পিসীমা বলছিলেন, অজয় যদি কিছু মনে না করেন তাহলে তিনি তার শুশ্রূষার ভার নিতে পারেন। তাতে তাঁর কিছু কি অসুবিধা হবে ?"

বীণা বলিল, "পিসীমা ? পিসীমা সেখানে কেন যাবেন ?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাতে দোষ কিছু ত নেই মা! তাছাড়া তোমরা হাজার হোক সবাই ছেলেমানুষ ত? তোমার পিসীমার এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেক বেশী। ও যখন ছোট ছিল, তখন হাতে কিছু কাজ না থাকলে আমায় বিছানায় শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, নয়ত পাখা নিয়ে ব'সে হাওয়া করত। কখনো তাতে ওকে ক্লান্তি বোধ করতে দেখতাম না। অন্যের সেবা করতে ওর একটা আনন্দ ছেলেবয়স থেকেই ছিল। ও খুব আগ্রহ ক'রেই যেতে চাইছে।"

বীণা কি জবাব দিবে কিছুক্ষণ তাহা ভাবিয়া পাইল না। তারপর বলিল, "আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। কে জানে, অজয়বাবু কি মনে করবেন। পিসীমার সঙ্গে তাঁর ত একদিন একটুখানিমাত্র পরিচয় হয়েছে। তিনি যা লাজুক, নিশ্চয় ভয়ানক অসুবিধা বোধ করবেন।"

হৃষীকেশের মুখে আবার চিন্তার গভীর রেখাপাত দেখিতে পাওয়া গেল। বলিলেন, "হুঁ!" তারপর নীরবে বসিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ বীণা বলিয়া উঠিল, "বাবা! আমি যাই এটা কি তুমি ইচ্ছে কর না?"

হৃষীকেশ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, তা ঠিক নয়। যাওয়া প্রয়োজন যদি হয়, যেতে ত হবেই। তবে—"

বীণা বলিল, "না গিয়ে পারলেই ভাল, এই তোমার মনে হয়?"

হৃষীকেশ বলিলেন, 'তাও ঠিক নয়। যাওয়াতে কিছুমাত্র দোষ আছে তা আমি মোটেই মনে করিনে। যদি তা করতাম তাহলে তোমাকে প্রথমেই তা বলতে আমার বাধা ছিল না।"

বীণা বলিল, "বাধা না থাকলেও তুমি আমায় বলতে না, তা আমি জানি। আমি নিজে যা ভাল বুঝেছি, চিরকাল তাই ত করতে পেয়েছি। কখন্ কোন্ কাজে তুমি আমায় বাধা দিয়েছ?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "বাইরে থেকে বাধা দিলেই আসল জায়গাতে সব সময়ে ত বাধে না। তাছাড়া আমি যা বুঝব সেইটেই যে ঠিক বোঝা, তাই বা বলব কি ক'রে? যে-ধরণের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বুড়ো হয়েছি, তোমাদের জীবনের ধারা ঠিক সেই খাতে ত বইছে না, তোমাদের কথা নিয়ে আমার বরং ভুল করবারই সম্ভাবনা বেশী।"

বীণা বলিল, "তুমি যে ঠিক এই রকমই ভাবো তা আমি জানি। কিন্তু ভুল করার সম্ভাবনা যে তোমার বেশী তা হয়ত ঠিক নয়। অজয়বাবুর ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে কোন্ জায়গায় তোমার খটকা লাগছে আমার সেটা জানতে অন্ততঃ পারা দরকার, তুমি ভুল বুঝছ না ঠিক বুঝছ সেটা নিজে বিচার ক'রে তাহলে আমি দেখতে পারি।"

হৃষীকেশ আবার কিছুক্ষণ কাগজগুলি লইয়া টেবিলের একধার হইতে অন্যধারে সরাইয়া ভাঁজ করিয়া করিয়া রাখিলেন, "তারপর বলিলেন, তোমার পিসীমা বলছিলেন এই নিয়ে বাইরে একটা কথা উঠেছে।"

বীণা শক্ত হইয়া বলিল, "আমার একটি স্বজনহীন পীড়িত বন্ধুর বিপদে তাকে সাহায্য করছি, এ নিয়ে বাইরে কথা উঠবার কি মানে?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তুমি এ নিয়ে উত্তেজিত হোয়ো না মা, তা হয়ে কিছু লাভ নেই। কথাটা উঠেছে এইটে জেনে নিয়ে বেশ ক'রে ভেবে কর্ত্তব্য স্থির কর।"

বীণা বলিল, "আমার কর্ত্তব্য স্থির করা আছে। বাইরে যতখুসি কথা উঠতে পারে।"

হৃষীকেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা, মানুষের জীবনে বাইরেটার ত স্থান আছে, সেটার দাবীও দাবী।"

বীণা বলিল, "একসঙ্গে সব দাবী সব সময় মানুষে মেটাতে পারে না। সম্প্রতি আমার বন্ধুর দাবী আমার কাছে এত বড় যে আর কোনো দাবী

আব কারও আমার ওপর যদি থাকেও তার কথা আমার ভাববার সময় নেই।”

হৃষীকেশ মুখটিকে একটু কালো করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা”, তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেলেন। যতক্ষণ দুতলার সিঁড়িতে এবং উপরে তাঁহার চটি জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, বীণা কান পাতিয়া রহিল। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেও উপরে উঠিয়া কাপড় বদলাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ী আনাইয়া অসময়েই বাহির হইয়া পাড়ল।

বীণাকে হঠাৎ বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা প্রায় ছুটিয়াই তেতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বীণার মোটর দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ সেস্থান ছাড়িয়া সে নড়িল না। কাল সন্ধ্যায় আড়ালে দাঁড়াইয়া বীণার মুখে অজয়ের একটু ভাল থাকার সংবাদ সে শুনিয়াছে, তাহাতে যদিও তাহার দুশ্চিন্তা বিশেষ কিছু কমে নাই, তবু প্রথম দিন অজয়ের জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকার সংবাদ শুনিয়া ভয়ে তাহার হাত-পা যেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সেই ভয়ের ভাবটা কাল একটু কমিয়াছিল। আজ আবার নূতন কি ঘটিল যে বীণা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোর হইতেই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল? হয়ত অসুখ বাড়িয়াছে, টেলিফোনে তাহার ডাক আসিয়াছে। হয়ত বীণা গিয়া অজয়কে দেখিতে পাইবে না। ঐন্দ্রিলা বুঝিতে পারিল, ভয়ের উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

সেই ঝড়ের রাত্রির পর হইতে নিজের অবাধ্য মনটার সঙ্গে সে নিষ্ঠুর হইয়াই বোঝাপড়া আরম্ভ কারয়াছিল। বারম্বার নিজেকে বুঝাইতেছিল, বীণা তাহার পরমাত্মীয়া, অন্য সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, বীণা সুখী হোক ইহাই তাহার কামনা করা উচিত। এমন হইতে পারে, অজয়ের অনভিজ্ঞ নমনীয় মন তাহাদের

উভয়েরই সম্বন্ধে অব্যবস্থিততার দোলায় দুলিতেছে। ইহাও সম্ভব, ঐন্দ্রিলা ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে বীণাকে পরাজিত করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে। কিন্তু বীণার প্রতি প্রচুর আন্তরিক স্নেহ সত্ত্বেও, সে যে তাহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নামিতেছে ইহা চিন্তা করিতেও যেন তাহার গ্লানি বোধ হইতেছিল। নিজের মনে অন্ততঃ একটা জায়গাতে নিজেকে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতীত করিয়া সে ভাবিতে চায়। অন্ততঃ একটি মানুষের কাছে সে এমন মূল্য পাইতে চায় যে মূল্য একান্তভাবে তাহার একলারই পাওনা। যাহার জন্য বিনিময়ে ইচ্ছা হইলেই সে কিছু দিতে পারে, নাও দিতে পারে। ইহা তাহাব অহঙ্কার নহে। ভালবাসাকে এই রকম করিয়াই আশৈশব সে ভাবিত। যাহাকে ভালবাসিত প্রতিদানের আশা না রাখিয়াই বাসিত, এবং কাহরও ভালবাসা ভিক্ষা করিয়া কিম্বা বিরোধ করিয়া পাইয়া তাহার মন ভরিত না। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত যেখানে তাহার যত বন্ধু জুটিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও নিজে যাচিয়া সে জোটায় নাই, যদিও তাহাদের প্রায় সকলকেই অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে সে ভালবাসিয়াছে। আবার সেই একই কারণে এমন অনেককে সে ভালবাসিয়াছে যাহারা কোনওদিন তাহার মনের সেইদিক্‌টাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিবে না।

বীণার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন যদি নাও থাকিত, তবু একমাত্র এই কারণেই অজয়কে যে সে ভালবাসে ইহা তাহাকে সে জানিতে দিতে পারিত না। অজয় নিজে হইতে তাহাকে বুঝিয়া লইবে এই অপেক্ষায় শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। সে অঘটন কিরূপে ঘটিত তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজনও তাহার কিছুমাত্র ছিল না, সুতরাং দুঃখভোগের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট করিয়াই বিধাতা তাহাকে গড়িয়াছিলেন এবং নিজেও সে তাহা জানিত। তাই সব প্রকারে সব বিষয়ে অজয়ের নিকট হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া বীণার সঙ্গে তাহার মিলনের পথকে সুগম করিয়া দিবে ইহাই সে মনে মনে স্থির করিতেছিল।

কিন্তু এই তিন দিন নিজের মনকে সংযত করিয়া রাখা তাহার অসাধ্য

হইয়া উঠিয়াছে। আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা আবারও সে আরম্ভ করিয়াছিল। সুভদ্রের চিঠিটি বারবার বাহির করিয়া পড়িয়া অজয়কে নূতনতর দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। সত্যই ত অপরিচয়ের মধ্যে কলুষ যত প্রশ্রয় পায় এত আর কিছুতেই নহে। অজয় যদি তাহাকে ভালই বাসে, কেন সে সমস্ত বাধা দুই হাতে ঠেলিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, মুক্তকণ্ঠে বলে না, আমি তোমাকে ভালবাসি, অন্তরের পরমতম পরিচয়ে তোমাকে আমি কাছে পাইতে চাই? কেন সে এমন করিয়া চোরের মত নিজের চারিদিকে আড়াল রচনা করিয়া চলে, ভিখারীর মত অন্ধকারে লুকাইয়া হাত পাতে? অজয়ের চোখের যে গভীর দৃষ্টি একদা তাহাকে অভিভূত করিত, ভাবিতে চেষ্টা করিল, সে-দৃষ্টি কলুষিত। সে-দৃষ্টি সত্যকার ঐন্দ্রিলাকে দেখে না, দেখিতে চায় না। অপরিচয়ের পার হইতে যতটুকুকে দেখা যায় কেবল সেইটুকুই দেখে এবং সেটা শ্রদ্ধা করিয়া দেখিবার মত জিনিস নয়। অজয়ের সম্বন্ধে নিদারুণ বিরূপতায় মনকে ভরিয়া তুলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার অসুস্থতার সংবাদে মুহূর্ত্তে সব ওলটপালট হইয়া গেল। ঐন্দ্রিলার সমস্ত আকাশ ভরিয়া একটি বিশীর্ণ শুষ্ক রোগ-পাণ্ডুর মুখ এবং একটি বেদনা-ভাবাতুর আর্ত্তদৃষ্টি জাগিয়া রহিল। কোথায় সে দৃষ্টিতে লালসার কলুষ? পৃথিবীতে দুঃখ যেন কোনও অপরাধ করে না, অথবা করিলেও তাহার কোনও অপরাধ অপরাধ নয়! সেই হইতে তাহার মনের উপর কোনও আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল আর অবশিষ্ট থাকে নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুভব করিবার অবকাশও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐন্দ্রিলার চিন্তাস্রোতকে ব্যাহত করিয়া পশ্চাৎ হইতে হৃষীকেশ ডাকিলেন, "ইলু!"

চমকিয়া ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "কি মামাবাবু?"

হৃষীকেশ বলিলেন, "অজয়দের বাড়ীর কাছে কোন্ একটা জায়গা থেকে বীণা টেলিফোন করছিল—"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "অজয়বাবুর অসুখ কি বেড়েছে?"

হৃষীকেশ কহিলেন, "চিন্তার কিছু কারণ নেই। তবে জানতে চাচ্ছে, তুমি কি তাঁকে দেখতে যাবে? যদি যেতে চাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আরও আগেই আমার একবার বোধহয় যাওয়া উচিত ছিল।"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমি যাব।"

যথারীতি দ্বিতলায় হেমবালা তাহার পথরোধ করিলেন, কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

সে কহিল, "অজয়বাবুকে দেখতে।"

হেমবালা কহিলেন, "তোর কি ধারণা, তুই এরই মধ্যে একেবারে স্বাধীন হয়েছিস্?"

সে কহিল, "দোহাই তোমার, তুমি এখন আমায় দেরি করিও না মা। আমি ফিরে এসে তোমার কথার জবাব দেব।"

মামার সঙ্গে যাইতেছে একথাটা স্বচ্ছন্দে মাকে বলিতে পারিত, কিন্তু বলিল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ ইতিমধ্যে আর-একবাব মাত্র হেমবালাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন,

"যতদিন আমাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুমি জানিতে না, আমা হইতে তোমার কোনও অহিত হয় নাই। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর সুখে দুঃখে আমাদের এক সঙ্গে কাটিয়াছে, আমি কখনও তোমার কোনও ভয়ের কারণ হই নাই। আজ আমাকে পরিপূর্ণ করিয়া জানো বলিয়াই কি আমা হইতে তোমার অকল্যাণ ঘটিতে সুরু হইবে? তেইশ বৎসরের সেই গভীরতর পরিচয় অপেক্ষা আমার এক মুহূর্তের একটা ভুলের পরিচয়ই কি তোমার কাছে বড় হইল? ইলুর কথা যদি বল, আমার প্রভাব তাহার উপর কোনও কালেই পড়ে নাই। সে বিবাহযোগ্যা, তাহার

সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজেই করা চলে যাহাতে কোনও কালেই আমা দ্বারা তাহাকে প্রভাবান্বিত না হইতে হয়। তুমি আমার চরিত্রের দিক্‌টাই কেবল ভাবিতেছ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ আমার মধ্যে কিছু কি আর নাই? আমার সুখের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমার মধ্যে আমার ভালমন্দ অতীত-ভবিষ্যৎ মিলাইয়া যে মানুষটা, সেটা কি কিছুই নহে?"

হেমবালা সে-চিঠির জবাব দেন নাই। নরেন্দ্রনারায়ণের প্রথম পত্রের সঙ্গে এইটিকেও তাঁহার হাতবাক্সের ডালার তলায় সমস্ত কাগজপত্রের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ বহুকাল পর দুইটি চিঠিকেই বাহির করিয়া আদ্যোপান্ত আবার পড়িয়া দেখিলেন। একটিতেও এমন কোনও কথা নাই যাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, যাহার জবাব তিনি দিতে পারেন। লিখিতে বসিয়া চিঠি-দুইটির কথা, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা, নিজের কথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না, লিখিলেন,

"আমি ফিরে যেতে রাজি আছি, যদি তুমি কথা দাও, অবিলম্বে ইলুর বিয়ের সব ব্যবস্থা করবে। দেখবে, বিয়ে তার মাতৃ-পিতৃবংশের, তার শিক্ষা-সহবতের যোগ্য হয়। আমার অনুরোধে তুমি ওকে কলকাতায় ওর মামার কাছে থেকে পড়তে পাঠিয়েছিলে, সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার ভাইয়ের মত মানুষ হয় না। কিন্তু শোকে দুঃখে বিবাগী মানুষ, তাঁর মনটার এখন আর কিছু ঠিক নেই। সংসারে থেকেও তিনি আর এখন ঠিক এ সংসারের নয়। এমন কাজের ভার তাঁকে দিতে চাই না, যা তিনি নিজের মত ক'রে বহন করতে পারবেন না। তা' ছাড়া, ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ একাজের ভার বাস্তবিক তোমার। কন্যা-সম্প্রদানের অধিকার পিতা হিসাবে তোমারই আছে, তুমি বর্ত্তমানে আমার নেই। তোমার সে কর্ত্তব্য করা হয়ে গেলে তারপর আমরা একসঙ্গে থাকব কি থাকব না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কিছু দরকার থাকবে না।"

৩৪

সুভদ্র হৃষীকেশকে সিঁড়ির পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেলে নীচে বসিবার ঘরে ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া বীণা তাহার কানে কানে বলিল, "বাবা, তোর সঙ্গে আর পারা যায় না! অজয়বাবুর কি সত্যিসত্যিই কিছু হয়েছে, তিনি দিব্যি আছেন। খেটে খেটে সুভদ্রবাবুর এই ক'দিনে এমন অবস্থা হয়েছে, ওর মুখ দেখলে কান্না পায়। এত বুদ্ধি ক'রে তোকে ডেকে পাঠালাম, ওকে একটু cheer up করবার জন্যে, আর তুই বাবাকে সুদ্ধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কি করব বল, তোমার মত এত বুদ্ধি ত আর সকলের ঘটে নেই। তোমার মনে যে সত্যি সত্যি কি আছে তা কি ক'রে বুঝব। তাছাড়া মামাবাবুকে আমি মোটেই সঙ্গে আনিনি, তিনি বরঞ্চ আমাকে ডেকে আনলেন সঙ্গে ক'রে। নয়ত আমি যে আসতাম না, তা ত জানোই।"

বীণা বলিল, "বাবা হঠাৎ কি মনে ক'রে চ'লে এলেন তাই ভাবছি। পিসীমার ভয়ে তোকে একলা ছাড়তে ভরসা হ'ল না ব'লে কি?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার পিসীমাকে ভয় আর কে না করে বল?"

চৌকা চেয়ারগুলির একটাতে ঐন্দ্রিলাকে বসাইয়া নিজে সে সেটার হাতার উপর আড় হইয়া বসিল। হাসিয়া বলিল, "বিমানবাবু এখনো প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছেন, জানিস্?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "শুনতে পাচ্ছি না ত।"

বীণা বলিল, "সত্যিই কি আর নাক ডাকছে? ঘুমুচ্ছেন এত বেলা অবধি! তা ওপরে গিয়ে কান পেতে থাকলে হয়ত নাসিকা-গর্জ্জন শুনতে পেতে পারিস্।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "শুনতে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নই। তাছাড়া ওপরে হয়ত আমি যাবই না মোটে।"

বীণা অত্যন্তই অবাক্ হইয়া কহিল, "সে কি রে! অজয়বাবুকে দে'খে যাবি না?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "ভালই যদি আছেন ত ঘটা ক'রে দেখতে গিয়ে কি হবে? অসুখ বেড়েছে মনে ক'রে এসেছিলাম।"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া বীণা কহিল, "তা'হলেও এতদূর এসেছিস্, দেখা না ক'রে চ'লে গেলে ভদ্রলোক কি ভাববেন?"

ঐন্দ্রিলা একথার কোনও জবাব দিল না। তাহার কথা শুনিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বীণা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। অজয় ভাল আছে জানিয়া তাড়াতাড়ি বড় সাধ করিয়া ঐন্দ্রিলাকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে সে আজ ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে জানে, ঐন্দ্রিলা নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালবাসে, মানুষের সঙ্গ কোনওদিনই তাহার পছন্দ নয়। তাছাড়া অবিবাহিতা মেয়ে নিঃসম্পর্কিত ছেলেদের মেসবাড়ীতে ডাকিলেই আসিয়া হাজির হয় না, তাহাও ঠিক। ঐন্দ্রিলার ও সব দিকে আরও বেশীই আঁটা-আঁটি। আর কিছুতেই সে আসিবে না জানিয়াই অজয়ের অসুখ উপলক্ষ করিয়া তাহাকে সে ডাকিয়াছিল, কথাটা পিসীমার কানে উঠিলেও ইহা লইয়া অতঃপর খুব বেশী গোলযোগ তিনি করিবেন না। শেষ অবধি আশা করে নাই যে ঐন্দ্রিলা আসিবে। সে যে আসিয়াছে ইহাই ত এক রহস্য। আসিয়াছেই যদি, অন্ততঃ বীণার মুখ চাহিয়াও তাহার আনন্দের ভাগ এতটুকু লইয়া গেলে কি ক্ষতি হইত? এতদূর আসিয়াও অজয়কে না দেখিয়াই সে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এত বাড়াবাড়িও ত সে কখনও করে না?

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা আর কত দেরি করবেন কে জানে?"

ঐন্দ্রিলা হাসিয়া কহিল, "দেরি করুন আর নাই করুন, তোমার তাতে কিছু আসে যায় কি?"

বীণা কহিল, "কিছু না। তুইও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে পালাবি না জানতে পেলেই আমি খুশী।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি ত পালাবই, আর মামাবাবুও নিশ্চয়ই তাই আশা করবেন।"

বীণা কহিল, "হাঁ, তুই ত বাবাকে কতই জানিস্! বাবা পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে কিছু আশা করেন না। যদি ওঁর মনে হয় একলা উনি বাড়ী ফিরে গেলে পিসীমা তাই নিয়ে রসাতল বাধাবেন, তাহলে চুপচাপ কোনো একদিকে চ'লে যাবেন দেখিস্। আমরা বাড়ী ফিরবার আগে আর ওদিক্ মাড়াবেনই না। পিসীমা ভাববেন, বাবাকে রেখে আমরাই আগে চ'লে এসেছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আসল কথা, থাকতে আমি চাই না। অজয়বাবু ত ভালই আছেন, থেকে কি করব?"

বীণা কহিল, "ভাল না থাকলে যেন তুই কতই করতিস্। কিন্তু কথাটা তা নয়। অজয়বাবু যে পরিমাণে ভাল আছেন, সুভদ্রবাবু ঠিক সেই পরিমাণেই ভাল নেই। আর সেইজন্যেই তোকে থাকতে বলছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার ওসমস্ত পচা রসিকতা এখন রাখো ত? নিজেকে দিয়ে পৃথিবী-সুদ্ধু বিচার কোরো না। তোমার কাছে জীবনটা না-হয় একটা তামাসা, হাসির অভিনয়। সবাই তা মনে করে না।"

বীণা আহত হইয়া কহিল, "দেখ্, ঐ খোঁটাটা তুই আর আমাকে দিস্‌নে। ওবিষয়ে কারও যদি কিছু বলবার অধিকার থাকে ত আমারই আছে, তোর নেই। জীবনে হাসিকান্না দুয়েরই সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, ও দুয়ের একটাকেও তুই ভাল ক'রে জানিস্ না।"

ঐন্দ্রিলা একথার জবাবে একটু মুখভঙ্গি করিল মাত্র, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছিল, তাই আর প্রতিবাদ করিল না।

সুভদ্র ভয় করিতেছিল, হৃষীকেশ প্রথমেই অজয়ের চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত

করিতে বলিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মানুষে যাহা করে, কোথায় কে তাঁহার পরিচিত ভাল ডাক্তার আছে তাহার কাছে চিঠি লিখিতে বলিবেন। কিন্তু এদ্বয়ের কোনওটাই তিনি করিলেন না। চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অবশ্য জানিতে চাহিলেন। "আমিই ওকে দেখছি" বলিতে গিয়া অকারণেই সুভদ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। হৃষীকেশ কেবল "ও" বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন, বাহিরেও তাঁহার মুখে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। সুভদ্রের কাছে অজয়ের রোগের বিবরণ পূর্ব্বাপর সমস্ত স্থির হইয়া শুনিয়া লইয়া হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশে ওর কে আছেন?"

সুভদ্র কহিল, "ওর বাবা আছেন।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "তাঁকে ত অবশ্যই খবর দেওয়া হয়েছে।"

"না" বলিতে গিয়া এবারও সুভদ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। একটু কাশিয়া গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "ভেবেছিলাম অল্লেতেই সেরে যাবে। খবর দিয়ে দেব কি?"

হৃষীকেশ আসন ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "হ্যাঁ, তা দিলেও হয়, খবর দিতে ক্ষতি ত কিছু নেই।"

নীচে আসিয়া ঐন্দ্রিলাকে কহিলেন, "আমার জন্যে তুমি তাড়াতাড়ি কোরো না মা, আমার বৌবাজারে একটু কাজ আছে, সেরে ফিরবার পথে তোমায় তুলে নিয়ে যাব।"

দুটি চোখে করুণ মিনতি ভরিয়া সুভদ্র ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিল। কিন্তু ঐন্দ্রিলা কেন যে এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাহা সে নিজেও জানে না। বলিল, "তোমাকে আবার কষ্ট ক'রে আসতে হবে না মামাবাবু। আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

হৃষীকেশ বলিলেন, "অজয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি এক মিনিট বোসো, আমি চট ক'রে দেখাটা ক'রে আসছি।"

সুভদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা আসিয়াছে এ-সংবাদ অজয়কে কেহ দেয় নাই। বীণা যে তাহাকে আসিতে ডাকিয়াছে তাহাও সে জানিত না। সিঁড়িতে কতকগুলি পায়ের শব্দ, খোলা দরজায় ঘরের মধ্যে চকিত একটুখানি ছায়াপাত, তারপরেই ঐন্দ্রিলা। অজয়ের প্রথমে মনে হইল, সে ভুল দেখিতেছে। এমনিতেই তাহার মনটা ঠিক স্বাভাবিক নহে, তদুপরি এই দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র সাধন, অসুস্থতা,— আরও আগেই যে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে নাই তাহাই ত যথেষ্ট। মনের মধ্যে কোন্ এক জায়গায় বীণা এবং ঐন্দ্রিলা বহুদিন হইতেই একটি মাত্র মাধুর্য্যের উপলব্ধিতে এক হইয়া মিশিয়া আসিতেছিল। সেই রোগেরই ছোঁয়াচ আজ কি তাহার চোখে লাগিয়াছে? মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিল, বীণাকেই ঐন্দ্রিলা বলিয়া ভুল করিতেছে।

ঐন্দ্রিলা একটুক্ষণ থামিয়া থমকিয়া কহিল, "এই নাকি আপনার ভাল থাকবার নমুনা?"

যেন এক সঙ্গে একশটা ঢাকে কাঠি পড়িল, এমনই ভাবে অজয়ের বুকের মধ্যে, কানের কাছে, সমস্ত শিরা-উপশিরা ভরিয়া চঞ্চল রক্তস্রোত কোলাহল করিয়া উঠিল। নিজে সে উঠিতে যাইতেছিল, সুভদ্র বাধা দেওয়াতে তাহা আর পারিল না। সে অসুস্থ, সে দুর্ব্বল, বহু তপস্যায় যে দেবতাকে আজ সে কাছে পাইয়াছে তাহার সম্মুখে নত মস্তকে উঠিয়া দাঁড়াইবার সাধ্যও তাহার নাই। নিজের এই অক্ষমতার গ্লানিতে তাহার দেহ যেন আরও অবসন্ন হইয়া আসিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কোনদিনই ত শরীরে কিছু ছিল না, এখন ত হাড় ক'খানা কেবল বাকী আছে। বাবা, কি চেহারাই করেছেন, ভয় করে দেখলে!"

ঐন্দ্রিলা জানিত না, কাহাকে কি বলিতেছে। অজয়ের ভিতরটাকে কে

যেন মোচড় দিয়া ভাঙিয়া থেঁৎলাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিল। হায়রে, তাহার শরীরে হাড় ক'খানাই কেবল অবশিষ্ট আছে বটে, আর এই যে তাহার বুক ভরিয়া রক্তস্রোতের দ্রিমি'দ্রমি তালে উদ্দাম নৃত্য, দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া এই যে তাহার আলোকের তপস্যা, তাহার দেহের মধ্যে তাহার দেহাতীত এই যে প্রবলতর প্রখরতর জীবন্ত সত্তা, ঐন্দ্রিলার সে অন্তর্দৃষ্টি কোথায় যে এ-সমস্তকে সে দেখিতে পাইবে? এতদিন ধরিয়া এত প্রাণপাত সংগ্রাম, দিন হইতে দিনে বিরামহীন এত দুঃখের সাধনা, কিছুতে সে অভিভূত হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সমস্ত সহ্যশক্তি মুহূর্ত্তে কে এমন করিয়া অপহরণ করিয়া লইল? পৃথিবীতে এই একটি মানুষ, একমাত্র যাহার দৃষ্টিতে নিজেকে দেবত্যর মত মহিমা-মণ্ডিত করিয়া ধরিবার তপস্যা ছিল তাহার জীবনে, তাহারই কাছে এমন একান্ত নিঃস্বতায় পরাজয়ে ধূলিধূসরিতদেহে ধরা পড়িয়া যাইবার অপযশ তাহার ললাটে লেখা ছিল কে জানিত? কে ঐন্দ্রিলাকে আসিতে বলিয়াছিল, কেন সে আসিল? মরিতে মরিতেও তাহার মুখখানি একবার দেখিতে পাইবার ইচ্ছাকে অজয় ভুলিয়াও মনে স্থান দেয় নাই।

যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে মুখে একটু হাসি লইয়া সে তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়া বসিতে গেল। কিন্তু হাসি নিজে হইতেই মিলাইয়া যাইতেছে, অজয়ের সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সুভদ্র হাঁ হাঁ করিয়া তাহার বিছানার পাশে ছুটিয়া আসিল। "কি করছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" বলিয়া আবার জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতে গেল। এবার অজয় বাধা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে শক্তিতে কুলাইল না। হঠাৎ একসময় শিথিল মাথাটাকে বালিশের উপর ঝুপ করিয়া ফেলিয়া মূর্চ্ছাতুরের মত সে এলাইয়া পড়িল। ঐন্দ্রিলা ভীত কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সুভদ্রবাবু? অসুখটা আবার বাড়ল কি?" একটা ওষুধের বড়ি মধুতে মাড়িয়া অজয়ের জিভে ঠোঁটে মাখাইয়া দিতে দিতে সুভদ্র যেন নিজের মনে

মনেই বলিতে লাগিল, "ও কিছু না, কিছু না, ও এক্ষুণি সেরে যাবে।" ফিরিয়া চোখ চাহিতে অজয়ের পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী দেরি হইল না, কিন্তু এবারে ঐন্দ্রিলার দিক্ হইতে দুই চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টিকে প্রাণপণে সে ফিরাইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা যেন সত্যসত্যই সেখানে নাই, যেন এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিয়া পীড়িত হইয়াছে।

সুভদ্র বলিল, "এখন কেমন বোধ করছ?"

বহুদিন পর আবার আজ একসার পিপীলিকা অজয়ের মেরুদণ্ড বাহিয়া মস্তিষ্কের দিকে যাত্রা করিয়াছে। খুব যে ক্রুদ্ধ হইয়া সুরু করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু বলিতে বলিতে ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। বলিল, "ঐ একটা silly কথার জবাব যদি মিনিটে দুবার ক'রে দিতে হয় তাহলে যে কোনো সুস্থ লোকও কিছুক্ষণের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।"

অত্যন্ত বিপন্ন একটু হাসি মুখে লইয়া সুভদ্র ঐন্দ্রিলার দিকে ফিরিয়া চাহিতে গেল, দেখিল, সে নিঃশব্দে কখন সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

সুভদ্রের দিক্ হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া অজয়ও ফিরিয়া চাহিল। ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে না পাইয়া কহিল, "উনি চ'লে গেলেন?"

সুভদ্র কহিল, "তাই ত দেখছি।"

"তোমাকে কিছু না ব'লেই?"

"হয়ত বলেছিলেন, আমি শুনতে পাইনি।"

অজয়ের রাগ পড়িয়া গিয়াছে। বুকের কাছটা ফাঁকা। সেই শূন্যতাই এখন বেদনার মত হইয়া বাজিতেছে। অনুতাপ করিবে না এই সঙ্কল্প লইয়া প্রাণপণে নিজেকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলাকে বিদায় করিয়া দিয়া বীণা উপরে আসিল, বিমানও ততক্ষণে আসিয়া জুটিয়াছে। বীণা ও বিমান একসঙ্গে হইলেই যেমন অকারণ কথাকাটাকাটির দ্বৈরথ যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ঐন্দ্রিলা চলিয়া যাইবার পর হইতে অজয় একটিও কথা কহে নাই। এমন যে সুভদ্র সেও আজ একটু দমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরে আসিয়া অজয়কে একবার দেখিতে পাওয়া মাত্রই বীণার মনের উপর হইতে সমস্ত ভার যেন কোন্ মন্ত্রের মায়ায় পলক ফেলিতে নামিয়া গিয়াছে। সেই হইতে কথার উপরে কথা, হাসির উপরে হাসির স্রোত আছড়াইয়া পড়িয়া আহত প্রতিহত হইয়া আবর্ত্তে আবর্ত্তে অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। অজয়ের আজ কিছু ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু বীণা তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? বাহির হইতে অজয়ের মুখের চেহারা আজ সত্যই অনেক ভাল দেখাইতেছে, সুভদ্র বলিয়াছে, ভয়ের কোনও কারণ আর নাই, আজ বীণা সুখী হইবে না ত সুখী হইবে কে?

কথার মধ্যে একটু দম লইয়া বীণা বলিল, "সুভদ্রবাবু যেন কি। এদিকে ত ছেলেমেয়েদের খেলাবার ভাবনায় চোখে ঘুম নেই, ইলুকে দে'খে এমনই বিষম ভড়কে গেলেন যে তাকে দু'মিনিট থাকতে সুদ্ধ বলতে পারলেন না?"

বিমান বলিল, "বোধহয় ভাবলেন, আপনার দিকে আপনি একলাই যথেষ্ট। কোনো reinforcementএর আপনার প্রয়োজন থাকলেও আপনাকে সেটা জুটিয়ে দেওয়া এই তিনটি নিরীহ প্রাণীর পক্ষে নিরাপদ্ হত না।"

বীণা কহিল, "আপনাদের সকলের হয়ে সব কথার জবাব দেবার জন্যে কি বিমানবাবুকে রেখেছেন?"

বিমান কহিল, "জবাব আমি ওঁদের কথারও দিয়ে থাকি, সে ওঁরা বেশ ভাল ক'রেই জানেন। তা আপনি একেবারে একলা কথা ব'লে যদি সুখ পান ত আমি না-হয় চুপ ক'রে যাচ্ছি।"

বীণা কহিল, "তাই গেলেই ত বাঁচি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান কহিল, "কিন্তু একটা কথা। ঐন্দ্রিলা দেবী এমন হঠাৎ এসেই চ'লে গেলেন কেন?"

বীণা কহিল, "নিতান্ত অজয়বাবু অসুস্থ শুনে দেখতে এসেছিলেন, ভাল আছেন জেনেই আর অপেক্ষা করেন নি।"

হঠাৎ বিছানা হইতে অজয় বলিয়া উঠিল, "অত্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন বোধ হয়?"

সুভদ্র চাপা গলায় তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল, কহিল, "কি আজে বাজে বকছ অজয়? না-হয় তুমি অসুস্থ, তুমি বদ্‌মেজাজী, সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছেও এ ধরণের কোনো কথা শুনব আমরা তা প্রত্যাশা করি না।"

অজয়ও রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি প্রত্যাশা কর বা কর না তাতে আমাব কিছু আসে যায় না। সত্য যা তা আমার কাছে আজ শুনবে। আমি এই তোমাদের ব'লে দিচ্ছি, উনি আমায় দেখতে আজ এ বাড়ীতে আসেন নি। আমি রোগ-শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে কেমন কাৎরাচ্ছি তাই দেখতে এসেছিলেন। শুনতে খুব খারাপ শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করব, উপায় নেই। তবে সেই সঙ্গে এটাও বলছি, দোষটা কেবল তাঁরই নয়। আমাদের কারও কাছেই মানুষের মানুষ ব'লে কোনো মূল্য ত নেই, দুঃখের মূল্যে, দুর্গতির মূল্যে আমাদের মূল্য। দেবতার আসনে দুঃখকে বসিয়ে দু-হাজার বছর ধ'রে আমাদের এই সভ্যতা তৈরি হয়েছে। চারদিক্‌কার এই দুঃখ, দুর্গতি, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আর তার মধ্যে দেশজোড়া সভ্যতার আস্ফালন। আশ্চর্য্য যে আমাদের লজ্জাও নেই।"

বিমান বলিয়া উঠিল, "হ্যালো! এ কি কাণ্ড! যদ্দিন জ্বর ছিল ভুল বকলে না, আজ টেম্পারেচার নেমে গিয়ে ডিলিরিয়াম সুরু হ'ল?"

অজয় লম্বা করিয়া একটা নিঃশ্বাস লইল, কহিল, "হ্যাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে খাঁটি কথা বলতে গেলেই সেটা ডিলিরিয়ামের মত শোনায়, তা জানি। আবাব একটু মাথার গোলমাল না থাকলে খাঁটি কথা মুখ দিয়ে বেরোয়ও

না দেখেছি। সেইজন্যেই আমার জীবনের সব চেয়ে গভীর উপলব্ধির কথাটা তোমায় যেদিন বলতে গিয়েছিলাম, প্রথমেই শ্যাম্পেনের প্রয়োজন হয়েছিল। ভাবছ, কোন্ কথার থেকে কোন্ কথায় এসে পড়েছি। কেন বুঝছ না, যে, আজ যদি আমি সুস্থ থাকতাম, ভাল থাকতাম, কিছুতেই এ বাড়ীতে আসবার কথা ঐন্দ্রিলা দেবীর মনে হত না।—যদি আমাদের আনন্দের ভাগ, গৌরবের ভাগ তাঁকে দিতে ডাকতাম, বাধানিষেধের আর অন্ত থাকত না। তিনি এসে'ছলেন কারণ আমি হার মেনেছি, পথ চলতে ধূলোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছি, কারণ আমার গর্ব্ব করবার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো মূল্য চাইবাব আমার উপায় নেই, দুঃখের মূল্যে কৃপা বড় জোর কেবল চাইতে পারি।"

সুভদ্র বলিল, "ভাল কথা, জ্বরে বেহুঁস হয়ে যখন প'ড়ে ছিলে, কৃপা ক'রেও কেউ যদি সেদিকে না যেত ত খুব খুসী হতে?"

অজয় বলিল, "জানি না, হয়ত হতাম না, কিন্তু ভাল ক'রে কিছু গুছিয়ে ভাববার, তর্ক করবার মত অবস্থায় আমার মনটা এখন নেই।"

বিমান বলিল. "কি জানি বাপু, কি যে এমন ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার হঠাৎ ঘটল, আমি ত ভেবে কিছু ঠিক কবতে পারছি না।"

অজয় হাঁপাইয়া গিয়াছিল, থামিয়া থামিয়া কহিল, "ঐখানটায় তুমি ভুল করছ। মারাত্মক কিছুই ঘটেনি। আর আমি তা বলিও নি। তুমি ত জানোই এই রকম ক'রে কথাগুলোকে আজ আমি নতুন ভাবছি না। দুঃখও ত কম পাইনি, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজের দুঃখ-দুর্গতিকে বড় হ'তে দিতে আমার আর ভাল লাগে না। আমি যদি কাল চুরি ক'রে জেলে যাই, তখন ত তোমরা দল বেঁধে নিশান উড়িয়ে আমাকে দেখতে আসবে না? দুঃখ পাচ্ছি জেনেই বা কেন এস? দুঃখ পাওয়াটাও ত এক সমানই পাপ? সেই কথাটাই হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, তাই উত্তেজিত হয়েছিলাম।"

সুভদ্র বলিল, "সম্প্রতিকার মত উত্তেজনাটা রাখো, নয়ত আবার জ্বরজাড়ি কিছু

বাধাবে। তখন তোমার মধ্যে তোমার সেই দুর্গতিকে বড় যদি আমরা নাও করি, তোমাকে নিয়ে আমাদের নিজেদের দুর্গতির শেষ থাকবে না।"

বীণা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। হঠাৎ উঠিয়া ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে বিমান কহিল, "ও কি, কোথায় চলেছেন ?"

বীণা কহিল, "বাড়ী। বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে, তাছাড়া অজয়বাবুর এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আর সব-কিছুর থেকে বেশী।"

তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া প্রতিবাদ করিতে আজ বিমানেরও সাহসে কুলাইল না।

বীণাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া বিমান কহিল, "ব্যাপারটা আমার কেমন ভাল ঠেকছে না। কোথাও কিছু একটা গোল বেধেছে নিশ্চয়। দেখলে না, কারুকে কিছু না ব'লে হঠাৎ উঠে কি রকম চ'লে গেলেন ? ও রকম করা ত ওঁর স্বভাব নয় ? অজয়ের মাথায় একবার রাগ চাপলে তার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। ওঁর কাছে শ্যাম্পেনের কথাটার উল্লেখ কি না করলেই চলত না ?"

অজয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তোমাব কি মনে হয়, কথাটা উনি লক্ষ্য করেছেন ?"

বিমান বলিল, "তোমার চেয়ে মেয়ে-জাতটাকে আমি ত একটু বেশী জানি ? আমি বলছি, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তুমি দেখে নিও।"

অজয়ের অদৃষ্টে আরও দুঃখ যে-ছিল তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু সে-দুঃখের উৎপত্তির ইতিহাসটা একটু অন্য প্রকার।

৩৫

বিকালে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে তেতলার বারান্দায় আসিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার আজ কি হয়েছে বল ত দিদি? শরীর ভাল নেই ব'লে ত স্নানাহারের হাত এড়ালে, সেই থেকে বাইরের কাপড়গুলো সুদ্ধ ছাড়নি, সারাটা দিন বারান্দাতেই কাটিয়ে দিলে। রাতটাও কি ঐখানেই কাটাবে স্থির করেছ? অজয়বাবু ভাল আছেন, কোথায় তোমাকে আজ একটু খুসী দেখব—"

বীণা কহিল, "খুসির আমার কিছু অভাব নেই। হঠাৎ আজ মারাত্মক রকম কুড়েমিতে ধরেছে। চল্, ছাতে বেড়াতে যাবি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "দাঁড়াও, চুল বাঁধাটা শেষ করি আগে।"

ছাতে গিয়া ঐন্দ্রিলাকে অকারণেই এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া বীণা কহিল, "পুরুষ জাতের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় যদি থাকে ত তোকে আমি সত্যি বলছি ইলু, অজয় তোকে ভালবাসে।"

ঐন্দ্রিলা একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "কিসে তোমার তা মনে হ'ল?...তুমি পাগল। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

বীণা কহিল, "তুই হঠাৎ গিয়ে তেমনি হঠাৎ চ'লে আসায় বেচারা এমন ভীষণ upset হ'ল, যে আমি যা বলছি তাছাড়া আর কোনো অবস্থায় সেরকমটা হওয়া সম্ভবই হ'ত না।"

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিয়া কহিল, "আমার ধারণা কিন্তু একেবারেই উল্টো। আমাকে দে'খে ভদ্রলোক আজ যা মুখ করেছিলেন তা ত তুমি দেখনি, দেখলে আর ওরকম বলতে না।"

বীণা কহিল, "আমি যা বলছি, বোধহয় ঠিকই বলছি!"

যুক্তিটা তাহার নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যাইতেছে কিনা না ভাবিয়াই ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবু সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ হ'য়ো না। সাধারণ বিচারে যে-কথার যে-ব্যবহারের যে অর্থ দাঁড়ায়, ওঁর বেলাতে সে-সমস্তই উল্টো। একেবারে উল্টো দিক্ দিয়ে দে'খে বিচার করলে হয়ত ওঁর সম্বন্ধে ঠিক কথাটা কতক বলা যায়।"

বীণা কহিল, "ও রে, সেকথা কি তুই আর আমার চেয়ে বেশী জানিস্? তবু আমি তোকে বলছি, বোধহয় আমি ভুল করিনি।"

ঐন্দ্রিলার ললাটে এবার একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল। অধীর হইয়া কহিল, "না, তুমি ভুল করছ না, তুমি সব জানো। চুপ কর দেখি এখন। এবিষয়ে আলোচনাটাকে অগ্রসর হ'তে দিতে আমি অন্ততঃ আর রাজি নই।"

বীণা কহিল, "বেশ, চুপ করছি।"

চুপ সে তখনকার মত করিল বটে, কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে আবার একবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়া অজয়ের মুখোমুখি না দাঁড় করাইতে পারা পর্য্যন্ত তাহার অন্তর বিশ্রাম মানিল না। শীঘ্রই তাহার সুযোগও ঘটিয়া গেল। দুই বোনে সুলতার সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিতেছিল, হঠাৎ ড্রাইভারকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়া বীণা কহিল, "এই কদিনের মধ্যে একবারও দেখতে যাওয়া হয়নি। লক্ষ্মীটি তুই বাধা দিস্‌নি। না-হয় তুই গাড়ীতে ব'সে থাকবি চুপ ক'রে।" কিন্তু বিমান বীণার নিকট খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজায় মহা চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল। নিতান্ত পথে ভিড় জমিয়া না যায় এই জন্যই ঐন্দ্রিলাকে তাড়াতাড়ি উপরে আসিতে হইল।

বীণা আজ অজয়কে চোখে চোখে রাখিবে স্থির করিয়াই আসিয়াছিল। ঐন্দ্রিলাও ভাবিল, আসিয়াই যখন পড়িয়াছি, দিদির সন্দেহটা নিতান্তই অমূলক, না তার মধ্যে বস্তু কিছু আছে, যতটা সম্ভব দেখিয়াই যাই। নিজেরও মনে

এই সেদিন অবধি এই সন্দেহ ত আমার ছিল? অজয় তখনও দুর্ব্বল। মুখের রং আরও ফ্যাকাশে মনে হইল। কিন্তু আজ তাহার কোনও ব্যবহারে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা বা উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সেদিনকার ব্যাপারের পর সে একটু সতর্ক হইয়াছে কি? দুই বোনের সঙ্গে অত্যন্ত শান্ত সুস্থির চিত্তে সে কথা বলিল।

কেমন আছে, ঐন্দ্রিলা তাহা জানিতে চাহিলে, "ভালই ত আছি" বলিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, এবার সারিয়া উঠিয়া নূতন একটা বই লইয়া পড়িবে। এক বৎসর দুই বৎসরে সেই বই শেষ হইবার নহে। ভারতে দুঃখবাদের উৎপত্তি এবং সেইসঙ্গে প্রতিপদে সমতালে তাহার অধোগতির ইতিহাস জুড়িয়া এই বই সে রচনা করিবে। উপনিষদের যুগ হইতে সুরু করিবে, বর্ত্তমান যুগে আসিয়া থামিবে।

বীণা ঐন্দ্রিলা সেদিন প্রায় ঘণ্টা-খানেক বসিয়া গেল। বিমানের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বীণা সেদিন একটি-দুটির বেশী কথা বলিল না। বাড়ী ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলা কহিল, "হল ত? কি বুঝলে এবারে বল।"

বীণা কহিল, "নূতন ক'রে কি আবার বুঝতে হবে?

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আসল কথাটা আমার কাছে থেকে শুনবে? ভাল ও কাউকেই বাসে না, তোমাকেও না, আমাকেও না, ওর মাথার সবটাই ওর নিজেকে দিয়ে ভর্তি। সারাক্ষণ নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ওকে বলতে শুনলে?"

বীণা গাড়ীর জানালায় বাহিরে চাহিয়া বসিয়াছিল, এ কথার জবাবে মৃদু হাসিল মাত্র।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বীণা সুভদ্রের একটুকরা চিঠি পাইল,

"অজয়ের জ্বর আবার বেড়েছে। বিমান বাড়ী নেই। সময় ক'রে একটুক্ষণের জন্যেও যদি একবার আসতে পারেন, বড় ভাল হয়।"

যে-লোকটি চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়াই বীণা উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া অজয়ের শয্যাপ্রান্তে হাজির হইল। বলিল, "কি ব্যাপার?"

তাহাকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া সুভদ্র কহিল, "কাল সন্ধ্যা থেকেই একটু ছটফট করছিল, তখন বুঝতে পারিনি কিছু। বার-বার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে চাচ্ছিল, উঠতে দিইনি, তাই নিয়ে ঝগড়া করেছে, বলেছে, চিরজন্ম কি বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দেব? আমরা খেয়েদেয়ে সব ঘুমিয়ে যাবার পর দুপুর রাত্রে হঠাৎ উঠে ছাতে চ'লে যায়, বাকী রাত সেইখানেই নাকি পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছে। জেরার মুখে নিজেই সব বলল। বিমান কাল রাত থেকে বাড়ী নেই। একলা ওকে নিয়ে কি বিপদে যে পড়েছিলাম। এখন আপনি একটু বসুন ত! কয়েকটা গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে। সে আবার এমন জিনিষ, চাকর পাঠিয়ে হবার উপায় নেই।"

সুভদ্র চলিয়া গেলে অজয়ের শয্যাপ্রান্তে ফিরিয়া আসিয়া বীণা স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠে ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিল, "এমন কাণ্ড মানুষে করে? কি হয়েছিল আপনার বলুন ত?"

অজয় কহিল, "শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছিল না। মানুষে কত আর ভুগতে পারে বলুন। ঠিক করেছিলাম, আর ভুগব না। জোর ক'রে অস্বীকার ক'রেই অসুখটাকে তাড়াব। কিছুই আমার হয়নি, এই ব'লে নিজেকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিলাম।"

অজয়ের কথার ধরণে বীণার চোখে অসতর্কে একটু জল আসিয়াছিল, চকিতে অঞ্চল-প্রান্তে সেটুকু মুছিয়া লইয়া বলিল, "ছি, ওরকম করে কখনো? দেখুন ত নিজেব কি দশা করলেন? কেবল বয়সই বাড়ছে, ছেলেমানুষি কি কোনোদিন ঘুচবে না? আপনাকে নিয়ে কি বিপদেই যে পড়া গেছে।"

অজয় বালিশে মাথাটাকে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছিল। তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বীণা কহিল, "মাথায় কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

অজয়ের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই বীণা তাহার শয্যাপ্রান্তে চেয়ারটাকে টানিয়া লইয়া তাহার বালিশের পাশে ঘেঁসিয়া বসিল। একটি হাতের উপর শরীরেব ভার রাখিয়া আড় হইয়া বসিয়া তাহার জ্বরতপ্ত ললাটে, স্রস্ত বিবর্ণ কেশরাজির মধ্যে অতি মৃদু অঙ্গুলি-চালনা করিতে লাগিল। মনে হইল, অজয়ের দেহের সমস্ত রোগযন্ত্রণা নিজের ঐ আঙ্গুলগুলি দিয়া সে যেন শুষিয়া লইতেছে। অজয়ের অস্থিরতা ক্রমে দূর হইয়া গেল, গভীর আরামে তাহার দুই চোখ ভরিয়া তন্দ্রাবেশ নামিযা আসিতে লাগিল। বীণা হাতটাকে এবার সরাইয়া লইয়া তাহাকে ঘুমাইতে দিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ধীরে সে মাথা তুলিল। তারপর কোনও কথা না বলিয়া, বীণাকেও কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সেটাকে অকস্মাৎ সজোরে সে তাহাব কোলের উপব নিক্ষেপ করিল। ব্যাপারটাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার আগেই বীণা দেখিল, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া অজয় দুর্নিবাব ক্রন্দনেব বেগ রোধ করিতে গিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাহার মাথাটাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন, কেন, কি হ'ল আবার? কেন আপনি ও রকম করছেন?" বাহুতে ভর দিয়া বীণার পাশে উঠিয়া বসিয়া অজয় নতমস্তকে বলিতে লাগিল, "বন্ধু, আমার বন্ধু, ভাল লাগে, আমার ভাল লাগে, তোমাকে আমার ভাল লাগে, এই কথাটা তোমাকে কতদিন যে আমি বলতে চেয়েছি, বলতে পেরে আজ বেঁচে গেলাম।"

বীণা কহিল, "ভাল লাগে সে ত ভাল কথা, তাই নিয়ে এত অস্থির হবার কি আছে?"

অজয় কহিল, "কি ভাল যে লাগে তা বোঝাতে পারব না। নিজেও বুঝি না ভাল ক'রে সব সময়। আমার জীবনে আর কোনো সান্ত্বনাই ত নেই। তুমি যদি না থাকতে, তোমাকে দিনান্তে একবার যদি না দেখতে পেতাম, তোমার হাসি না শুনতে পেতাম, জ'মে পাথর হয়ে যেতে হত এতদিনে।"

তাহাব মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বীণা তাহার কপোল-লগ্ন

এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া লইতেছিল, সেই হাতটিকে টানিয়া লইয়া অজয় তাহার উপর নিজের জ্বরতপ্ত ঠোঁট দুইটাকে চাপা দিল, বীণা বাধা দিল না। অকস্মাৎ প্রাণপণ শক্তিতে বীণাকে কাছে টানিয়া অজয় তাহার কানে, তাহার আয়ত দুই চোখের পল্লবে, তাহার টলটলে নিটোল ললাটে, সুকুমার দুইটি অধরোষ্ঠে, সুডোল কণ্ঠতটে চুম্বনের পর চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহার নিঃশ্বাস অপহরণ করিয়া লইল। তাহার কানে কানে বলিতে লাগিল, "বন্ধু, আমার বন্ধু, আমার বন্ধু, আমাকে ভুলিয়ে দাও, আমাকে ভুলিয়ে দাও, আমাকে ভুলিয়ে দাও।"

অজয়ের আলিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া তাহার একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া বীণা বলিল, "কি তুমি ভুলতে চাও, বল?"

অজয়ের মুখে কিছুক্ষণ কথা জোগাইল না। হঠাৎ বাধা পাইয়া বিক্ষুব্ধ মনটাকে গুছাইয়া লইবার সে সুযোগ পাইল। ধীরে কহিল, "আমার নিজেটাকে। নিজেকে নিয়ে আমার সংশয়-সমস্যার অন্ত নেই, নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধেরও শেষ নেই। আমার হাঁপ ধ'রে গিয়েছে, আমি আর পারি না বন্ধু, তোমায় সত্যই বলছি। নিজেকে বড় ক'রেই আমার যত দুঃখ, ভয়, দুরাশা আর ক্লান্তি। এই প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে উঁচু ক'রে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে গিয়েছি, আমার শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ছে। তুমি আমায় সব ভুলিয়ে দাও, তোমার হাসি দিয়ে, দুই চোখের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা দিয়ে, গানের মত তোমার কণ্ঠস্বরের সুধা দিয়ে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে যাই যে সংগ্রাম কিছু আছে, কঠোর তপস্যায় নিজেকে ক্ষয় ক'রে পাবার যোগ্য সত্যই পৃথিবীতে কিছু আছে। ভুলে যাই পৃথিবীতে আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন আছে, আমাকে আর কারুর প্রয়োজন আছে। আমার চারপাশটাকেও তুমি ভুলিয়ে দাও, আমার পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশী, আমার দেশ, সে-দেশের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ।"

বীণার মুখে কি বেদনার রেখা গভীর হইয়া ফুটিয়াছে, তাহার চোখে জল

নাই, দুই চোখের ভারাতুর ক্লান্ত দৃষ্টি কোন্ সুদূরে আজ নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হয়ত ভুলিয়ে দিতে পারি। সে-মায়ামন্ত্র হয়ত সত্যিই আমার জানা আছে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, আমাকেও তুমি বন্ধু ব'লে ডেকেছ। যা-কিছুতে তুমি বেদনা পাও তার থেকে তোমায় দূরে সরিয়ে নিতে পারলেই তোমার সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করা হবে কি না, তা আমায় ভেবে দেখতে হবে।"

অজয় অধীর হইয়া বলিল, "তুমিও তাই বলছ? তোমার কি প্রাণে দয়ামায়া নেই? আমার সুখের কোনো মূল্য তোমার কাছ থেকেও আমি পাব না?"

বাজার ঘুরিয়া বহুক্লেশে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া সুভদ্র এই সময় ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ বিমান বাড়ী না আসিল, বীণা বসিয়া গেল। যাইবার সময় একটিও কথা বলিয়া গেল না। একাকী গাড়ীর মধ্যে তাহার দুই কপোল প্লাবিত করিয়া দুর্নিবার অশ্রুর স্রোত বহিয়া আসিল।

পরদিন বীণা অজয়কে দেখিতে গেল না। তার পরের দিও না। রাত্রিতে ঐন্দ্রিলা জিজ্ঞাসা করিল, "অজয়বাবুকে দেখতে যাচ্ছ না? আবার কি হ'ল তোমাদের?"

বীণা বলিল, "নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। সে নিজেকে ফাঁকি দিক এটাও এখন আর ইচ্ছে করি না।"

"তার মানে?"

"মানে যা তা তোমাকে আগেই বলেছি। আমাকে সে ভালবাসে না। আগে যা-ও একটু সন্দেহ মনে ছিল, এখন আর তার লেশমাত্র নেই। ভাল সে আমাকে বাসে না, তবু, তবু—"

"তবু কি?"

"তার আগে তুই সত্যি কথা একটা বলবি?"

"সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু বলা আমার স্বভাব নয় তা ত জানোই।"

"তা জানি" বলিয়া ঐন্দ্রিলার একটি হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বীণা কহিল, "অজয়কে তুই ভালবাসিস্?"

অজয় সম্বন্ধে বীণার প্রায় সমস্ত ব্যবহারকেই অসহ্য ন্যাকামী বলিয়া ঐন্দ্রিলার মনে হইত। ভাল না-হয় সে বাসেই, কিন্তু সে-কথাটাকে এত আড়ম্বরে ঢাক ঢোল পিটাইয়া জাহির করিবার কি প্রয়োজন? যেন পৃথিবীতে সে-ই একা আজ প্রথম ভালবাসিতেছে। ধরিয়া লওয়া গেল অজয়ও বীণাকে ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসা দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা পৃথিবীতে এতই কি সহজ? সমস্যা কি নাই? সংশয় কি নাই? পাওয়ার পথে সহস্র বিঘ্নের কথা না-হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, পাইয়াও ত মানুষে হারায়? বীণা ইহারই মধ্যে এমন কি পাইয়াছে যে অজয় সম্বন্ধে নিজেকে একেবারে নিঃসংশয় ভাবিতেছে? এমন ব্যবহাব করিতেছে যেন প্রতিবন্ধক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও সম্ভাবনা কোথাও নাই। আজ যখন প্রতিবন্ধক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাই বীণার চিত্তাকাশের সমস্তটাকে জুড়িয়াছে তখন তাহার সেই অতিশয়তাকেও অসহ্য ন্যাকামী বলিয়াই ঐন্দ্রিলার বোধ হইল। ঐন্দ্রিলাকেও যে সে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে ইহাতে সে এত বিরক্ত হইল, যে ভাল করিয়া নিজের মনকে পরীক্ষা না করিয়াই গভীর আত্মপ্রবঞ্চনার অন্তবাল হইতে বলিয়া উঠিল, "অজয় আমাকে ভালবাসে কেবল তাই ভেবেই তুমি খুসী নও, আমিও তাকে ভালবাসি এও তোমায় শুনতে হবে? সবাইকে নিজের মত ভাবা তোমার এক রোগ। ভাল আমি কাউকে বাসি-টাসি না বাপু।"

"তবে শোন্। আমাকে ভালবাসে না তবু আমাকে নিয়ে সে একটা কিছু ভুলতে চায়; কি তা আমি জানি না, নিজে সে স্পষ্ট ক'বে কিছু বলেনি। বলেছে, জীবনে তার অনেক দুঃখ আছে, আমি পারি তাকে সে-সমস্ত ভুলিয়ে দিতে। যেন ভালবাসা দুঃখ পেতে ডরায়। মানুষের আসল যা দুঃখ তা যে ভালবাসার জায়গাতেই তা কি আর আমি বুঝি না? সেই দুঃখের থেকে পরিত্রাণ চায় যে ভালবাসা তা ভালবাসা নামের যোগ্যই নয়।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে পর আবার সে-ই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "দেখ্, প্রথম থেকেই ভুল ক'রে স্বরু করেছি। অনেক সময় অনেক কারণে মনে হয়েছে সে আমাকে ভালই বুঝি বাসে। এখন বুঝতে পারছি, ভালবাসাটা ছিলই, কিন্তু সে তোর জন্যে। আমার কাছে সব ব্যাপারটা এখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছিস্ না, আমারা দুজন পাশাপাশি, একবার একজনকে নিয়ে ভুল বেধে গেলে তারপর সব কিছুরই ভুল মানে বেরনো কত সহজ?"

ঐন্দ্রিলা বলিয়া উঠিল, "আঃ, ঢের হয়েছে, থামো থামো। তোমার ধারণা পৃথিবীতে মানুষের মন জিনিষটাকে একলা তুমিই কেবল বোঝ, আর যারা আছে তাদের কারুর মাথায় কিছু নেই। বাজে কথা কতকগুলো আর ব'লে কি হবে? এইবার চুপ কর। ভাল অনেকেই বাসে, কিন্তু তোমার মত এমন ক'রে মাথা খারাপ খুব বেশী লোকের হয় না।"

সেদিন বেড়াইতে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার মুখে স্বলতা কহিলেন, "এমন ক'রে কেন রয়েছিস্? কি হয়েছে রে, ইলু?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কিছু না", কিন্তু ক্রন্দনের মত একটা আবেগে তাহার মনের আকাশ থমথমে হইয়া রহিল। নিজের কাছে নিজের তাহার আজ এ কি পরাজয়? যে বস্তু তাহার নয় তাহা অন্যে পাইল বলিয়া কেন তাহার এই মর্ম্মদাহ? এ কি ক্ষুদ্রতা তাহার অন্তরে? তাহার মধ্যকার আশৈশবের সেই তেজোদীপ্ত গর্ব্বিত মানুষটির কথা মনে পড়িয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। মনে পড়িল, অপরাধ করিলে তাহার মা যখন তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন, সে বিন্দু-মাত্র বেদনা প্রকাশ না করিয়া সে শাস্তিকে গ্রহণ করিত। একবার মাতা সমস্ত দিনের জন্য তাহার উপর অনাহার-শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের শেষে বিকালে বাড়ীতে অতিথি-সমাগমের ফলে সে কথা ভুলিয়া গিয়া যখন অতিথিদের জন্য আনীত নানা উৎকৃষ্ট আহার্য্যে থালা সাজাইয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছিলেন, সে নিজে তাঁহাকে শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

সেই তাহার আজ এ কি দুর্গতি হইয়াছে? অজয় তাহার কে যে তাহার জন্য এমন করিয়া সে দুঃখ ভোগ করিতেছে? কেন মনকে বারম্বার বাঁধিতে চাহিয়াও সে বাঁধিতে পারিতেছে না? যে পরাজয় তাহার নয়, কেন সেই পরাজয়ের গ্লানিতে এমন করিয়া তাহার অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিতেছে? নানারূপে নিজের মনকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, এমন হইতে পারিত, কলিকাতায় পড়িতে আসা হইত না। সে অবস্থায় বীণা কি করিতেছে, কাহাকে সে ভালবাসিতেছে, কেহ তাহাকে ফিরিয়া ভালবাসিতেছে কিনা তাহা সে জানিতে পাইত না। জানিবার প্রয়োজনও হইত না, এখনই বা সে প্রয়োজন তাহাব কেন হইতেছে? কিন্তু মন বুঝিল না। ক্রমে আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল একটি একটি করিয়া সবগুলিই খসিয়া পড়িতে লাগিল, এমন কোনো কথা বাকী রহিল না যাহা বলিয়া নিজেকে সে ফাঁকি দিতে পারে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া ভাবিতে লাগিল, নিষ্কৃতি সত্যই কি নাই? অপরিচয়ের তীর হইতে দু-দিনে যে গভীরতম অন্তরের উপকূলে উত্তীর্ণ হইযাছিল, তাহাকে দুদিনেই আবার অপরিচয়ের পারে নির্ব্বাসিত করা কি যায় না? নিজের উপর মানুষের এতটুকু জোর কেন থাকিবে না? ভালবাসাই যদি হয়, তাহাই বা মানুষের নিজের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী কেন হইবে?

পরের দিন ভোরের দিকে নবেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া পড়িলেন। হৃষীকেশের মহলে, তাঁহার পড়িবার ঘরে পিতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ হইল। নরেন্দ্র ও হৃষীকেশ দুইজনে নিঃশব্দে মুখোমুখি বসিযাছিলেন, ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলা পিতার পায়ের ধূলা লইল, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ চোখ ভরিয়া আজ দুরপনেয় বিষাদের ছায়া। এতদিন পর পিতাকে দেখিতে পাইয়া কিছুমাত্র যে সে খুসী হইয়াছে এমন মনে হইল না।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরীক্ষা কি হয়ে গিয়েছে?"

সে বলিল, "না, এখনো দিন দশ-বারো দেরি আছে।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল, নরেন্দ্র "আচ্ছা, যাও, তোমার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে" বলিতেই সে-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হেমবালার মুখে হর্ষ বা বিষাদ কোনও কিছুরই আজ প্রকাশ নাই! ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা এতদিনে প্রায় শেষ হইয়াছে, শেষের দিকে এক জায়গায় কতগুলি কথার কিছুতেই অর্থগ্রহ হইতেছে না, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিয়া হেমবালা বইয়ের সেই পাতাটা উন্টাইলেন। তারপর হঠাৎ একসময় বইটা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বোসো।"

তাঁহার হইতে যথেষ্ট দূরেই স্থান নির্দেশ করিয়া স্বামীকে বসিতে বলিয়াছিলেন। তবু নরেন্দ্র বসিলে নিজে আর-একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন, "দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"দাদা কিছু জানেন না, সন্দেহও কিছু করেন নি।

"শুনে সত্যিই খুব খুসী হলাম।"

"ইলু? ইলু গিয়েছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ, এই ত এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা হল।"

কিছুক্ষণের মত স্তব্ধতা। তারপর হেমবালাই আবার কথা কহিলেন।

"আসবার আগে আমাদের ফিরবার সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে এসেছ?"

"অন্যরকম ব্যবস্থা কোনোদিন কিছু করা হয়নি।"

"যে-কোনোদিন আমরা এখান থেকে রওনা হ'তে পারি?"

"যখন খুসি পার।"

"ইলুর পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা ক'রে যাওয়াই উচিত হবে। আগে সেটা ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে, ওকে অনাবশ্যক উৎপীড়ন না করাই ভাল। তাছাড়া আমাদের অভিপ্রায় ওকে এখন বুঝতে দিতেও চাই না, সে-সব পরে সময় বুঝে বললেই হবে।"

"তুমি যা ভাল মনে কর তাই হবে।"

"দাদার ওপর ইলুর বিয়ের ভার যদি দেওয়া চলত তাহলে তোমাকে কষ্ট ক'রে আসতে আমি বলতাম না।"

"তা জানি।"

"তবে এটা তোমাকে বলতে পারি, বাইরে যেমনই দেখাক, আসলে মনে মনে ইলু তোমাকে খুব বেশী ভালই বাসে। আমি যে ওর জন্যে এত করেছি, আমি ওর দুচক্ষের বিষ। তুমি বুঝিয়ে বললে বিয়ে করতে ও খুব সহজেই রাজি হয়ে যাবে।"

হেমবালা আবার কিছুক্ষণ অকারণেই কোলের বইটার কয়েকটা পাতা উল্টাইলেন, তারপর বলিলেন, "আর একটা কথা গোড়াতেই তোমাকে আমার বলা দরকার। কোথাও কারুর কিছু বোঝবার ভুল থাকে, এ আমি চাই না। আমি যে ফিরে যাচ্ছি তার কারণ একমাত্র এই, যে, ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। এদেশে মেয়েজাতকে এমন ক'রেই রাখা হয়েছে, যে-কোনো অবস্থাতেই স্বামী ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর কিছু না থাকতে পারে। চিঠিতে এসব লিখিনি, লেখা যায় না। তুমি অবস্থাটাকে মেনে নিতে রাজি আছ ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "ফিরে যদি এস, কেন ফিরে এলে তা আমি কোনোদিনই জানতে চাইব না।"

বিকালে ঐন্দ্রিলাকে নিভৃতে ডাকিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ যখন বলিলেন, তিনি তাহাকে ও তাহার মাকে ফিরিয়া লইতে আসিয়াছেন, তখন ঐন্দ্রিলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি ফিরে যাব কি না, তা কিন্তু সম্পূর্ণই মায়ের উপর নির্ভর করছে।"

নরেন্দ্র কহিলেন "তিনি ত তোমাকে নিয়ে যেতেই চাইছেন।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সে কথা নয়। আমি যাব কিনা ঠিক করবার আগে জানতে চাই, সেবারে ছুটির পর মা কেন হঠাৎ এমন ক'রে আমার সঙ্গে চ'লে এলেন। সেই থেকে ব্যাপারটাকে একদিনের জন্যে আমি ভুলিনি। এ নিয়ে

আমার কতদিনের কত যে সুখশান্তি নষ্ট হয়েছে তার ঠিক নেই। ঐ সম্পর্কে একটাও কথা যদি অস্পষ্ট থাকে, আমি ফিরে যাব না, এ আমি ব'লেই দিচ্ছি। মায়েরই না-হয় উপায় নেই, কিন্তু আমি মাষ্টারী ক'রে খেতে পারব।"

হেমবালাকে নরেন্দ্র কহিলেন, "ইলু সব জানতে চাচ্ছে, তুমি আমার ইতিহাস সমস্তই ওকে বল, আমার দিক্ থেকে কোনো বাধা নেই।"

হেমবালা কহিলেন, "সে আমি কিছুতেই পারব না।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কাজটা দুরূহ, কিন্তু অনুমতি কর যদি ত আমি নিজেই বলি।"

হেমবালা কহিলেন, "তাও তোমাকে আমি করতে দেব না।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তা না হ'লে মেয়ে যে যাবে না বলছে।"

হেমবালা কহিলেন, "না যাক্ না-ই যাবে।"

নরেন্দ্র একটুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিলেন, "তোমাকে নিয়ে যাব, বড় আশা ক'রে এসেছিলাম।"

হেমবালা কহিলেন, "আমি যাব।"

৩৬

জীবনের সর্ব্বত্র দুঃখভোগের সঙ্গে বিরোধ সুরু করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু এই কয়দিন অজয়ের জীবনে এত বেদনা যতটা কেবল তাহার জীবনেই সম্ভব। দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতায় নিজেকেও নিজে সে অতিক্রম করিয়া গেল। অসুস্থতার গ্লানি, সেই সঙ্গে সে যে অসুস্থ এই চিন্তার দুঃসহতর গ্লানি। প্রেম লইয়া বেদনা, এত করিয়াও নিজের জীবনে প্রেমের প্রদীপ যে সে জ্বালাইতে পারিল না সেই পরাজয়ের গভীরতর বেদনা। বুঝিতে পারিল না, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিয়াও প্রতিদানে কিছুই যে সে পাইল না সেই দীনতা

তাহার বড়, না প্রতিদানে দিবার মত কোনও সম্পদ্ নিজের মধ্যে সে যে খুঁজিয়া পাইল না সেই দারিদ্র্যই তাহার অধিকতর লজ্জাকর।

এতদিন কেবল ঐন্দ্রিলাকে ভাবিয়াই বেদনা পাইত, হাস্যময়ী বীণার চিন্তায় তাহার বেদনাতুর মনের আশ্রয় ছিল, এবারে বীণা ঐন্দ্রিলা উভয়ের চিন্তাই তাহার কাছে সমান বেদনাময় হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার জুড়িয়া যখন জ্বরতাপের অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে অনন্যচিত্ত হইয়া বসিয়া অগ্নিপরিবৃত তাপসের মত অজয় বহুদিন পর আবার একবার তাহার অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে, অপরিমেয়তার সঙ্গে পরিচয় করিতে চেষ্টা করিল। ভাবিতে চেষ্টা করিল, এই দুঃখসুখ লাভক্ষতি, এসমস্তের হিসাব নিরুপায়তার হিসাব। তাহার জীবনের এই-সমস্ত ক্ষুদ্র সমস্যার একটি সহজ সমাধান কোনও একটি বৃহৎ উপলব্ধির মধ্যে নিশ্চয় কোথাও আছে, আশান্বিত চিত্তে এই চিন্তাকে প্রাণপণে সে ধরিয়া রহিল। নগরোপান্তের নিভৃত প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের যে অতলস্পর্শ রহস্যরূপের সন্ধান সে একদিন পাইয়াছিল, অপরিচয়ের কালো অবগুণ্ঠন সরাইয়া সেই রহস্যের চোখে চোখে চাহিবার সাহস সেদিন তাহার হয় নাই। সেদিনও প্রাণপণ করিয়াই তাহাকে মনের কাছ হইতে সে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল এবং জীবনব্যাপী তুচ্ছতাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ক্রমে তাহার কথা সম্পূর্ণ করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাঝখানের এতগুলি দিন ব্যাপিয়া এত যে ঘটনা-পরম্পরা, এত সুখদুঃখ, আঘাত-বেদনা, মান-অভিমান, জয়-পরাজয় তাহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহার মধ্যেকার আসল মানুষটাকে তাহারা কোন্ জায়গায় স্পর্শ করিয়া গেল? সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে সত্যকারের সম্পদ্ কোথায় তাহার কি জমা হইয়াছে? লাভ-লোকসানের হিসাব যদি করিতেই হয়, নিজের মধ্যে কোন্ জায়গায় সে চাহিবে, কোন্ বিচারের মাপকাঠি দিয়া দেনা-পাওনার পরিমাপ করিবে?

তুচ্ছতাকেই যাহারা চরমতম করিয়া জানে, জীবন তাহাদিগকে তুচ্ছতার সম্পদ্ দিয়াই ধনবান্ করে। ছোট সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা লইয়াই জীবন তাহাদের কাছে সত্যের অন্ততঃ একটা পরিপূর্ণ রূপ লইয়া দেখা দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যাহার নিকট তুচ্ছতা তুচ্ছতা বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, অথচ ধ্রুবের সন্ধানে অন্য কোনও দিকে তাকাইবার সাহসও যাহার নাই?

স্থির করিল, এইবার তাকাইবে। আর নিজের নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইবে না। যদি দুঃখ পাইতে হয়, সে দুঃখ তাহার জীবনে সত্য হইবে, মোহ-গ্রস্তের যে সুখ তাহা লইয়া সে সুখী হইবে না। মনে পড়িল, পাপের সঙ্গে, কলুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়াও একদা নিজেকে সে পাইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেকার আসল মানুষটা সেদিনও তাহাব সঙ্গে ছিল না বলিয়া সে পরিচয় ঘটিয়াও তাহার ঘটে নাই। তাহার পর তাহার জীবনে আর যাহা-কিছুই আসিয়াছে, সে সমস্তও ঠিক তেমনই ভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে। সে আনন্দ করিয়াছে, কিন্তু তাহা যেন তাহার নিজের আনন্দ নহে, দুঃখ করিয়াছে কিন্তু সে যেন নিজেকে ছলনা করিয়া দুঃখ দেওয়া, অভিমান করিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কে যেন তাহাই লইয়া লুকাইয়া হাসিয়াছে। বীণা ঐন্দ্রিলাকে লইয়া এই যে এত বেদনা পাইতেছে, সহসা মনে হইল এও যেন তাহার সত্য বেদনা নহে। ঐন্দ্রিলাকে ভালবাসা, বীণাকে ভাল লাগা, এই উভয়েরই মধ্যে কোথায় যেন অতি গভীর আত্মপ্রবঞ্চনা অলক্ষ্যে মিশিয়া রহিয়াছে। নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া জানে না বলিয়া কিছুতেই এই আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল ঘুচিতেছে না, বীণা এবং ঐন্দ্রিলা উভয়েই তাহাব জীবনে ব্যর্থ হইতেছে।

হ্যাঁ, ব্যর্থ হইতেছে। এতদিন ধরিয়া হৃদয়কে রক্তাক্ত করিয়া সে যে ভালবাসিল, সে ভালবাসা তাহার নিজের বা অপরের কোনও কাজেই ত লাগে নাই। তাহার এ ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে কোথাও কাহারও জন্য কোনও কল্যাণের স্বর্গ রচিত হয় নাই। তাহার ভালবাসার মধ্যে কল্যাণের রূপ, সান্ত্বনার রূপ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে সে পরিচয় না পাইলে ইহাকেই বা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া কেমন

করিয়া অন্তরের মধ্যে সে গ্রহণ করিবে? মমতাময়ী বীণা, মূর্ত্তিমতী করুণা-রূপিণী বীণা, দৃঢ়হাতে তাহার আলিঙ্গনপাশ যে সেদিন আল্‌গা করিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে ত ঠিকই করিয়াছিল। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া চিনিতে তাহার মুহূর্ত্তের বেশী দেরি লাগে নাই। অজয়ের স্পর্দ্ধা। কেবল নিজেকে ফাঁকি দিয়াই সে তৃপ্ত হয় নাই, নিরপরাধা বীণাকেও ফাঁকির জালে জড়াইতে গিয়াছিল। অবশ্য সেইসঙ্গে ইহাও সে জানে, বীণাকে অদেয় সত্যসত্যই কিছু তাহার নাই, অন্ততঃ দিবার মত ধন এমন কিছু আছে যাহা দিয়া দিতে পারিলে জীবনধারণ সার্থক হয়। কিন্তু সে কি জিনিষ যাহা সে দিতে পারে, কিরূপেই বা সবদিক্ রক্ষা করিয়া তাহা দেওয়ার মত করিয়া দেওয়া যায়, যতদিন তাহা না বুঝিতে পারিবে, ততদিন বীণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার অধিকারও তাহার আর রহিল না। নিজে হইতে বীণা আর আসিবে না, কেহ বলিয়া না দিলেও অজয় তাহা নিশ্চয় করিয়াই জানে।

এমনই করিয়া সবদিক হইতে সমস্ত রকমে যখন তাহার জীবনের একেবারে ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরিয়াছে তখন বিমান একদিন সান্ধ্যভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মন্দিরা মরণাপন্ন অসুস্থ, হেমবালার দাসী শ্রীক্ষেত্র হইতে তীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে মহাপ্রসাদ খাইতে দিয়াছিল, তাহা হইতে বিষম বিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছে। অজয়ের জ্বর তখন গত কয়েকদিনের তুলনায় অনেক কম, বিমানকে তাহার ভার বুঝাইয়া দিয়া সুভদ্র পড়ি কি মরি বালিগঞ্জে ছুটিয়া গেল।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মন্দিরাকে লইয়া যমে মানুষে লড়ালড়ি। সুভদ্র চিকিৎসার ভার লইয়াছে, হৃষীকেশ তাহাতে বাধা দেন নাই। কিন্তু অজয় সারিয়া উঠিয়া ভাত পথ্য করিল, তখনও মন্দিরাকে লইয়া দুশ্চিন্তার বিরাম নাই।

অজয় যাইতে চাহিয়াছিল, এবারে সুভদ্রই তাহাকে বাধা দিল, কহিল, "আমাশা সারবার মুখে হঠাৎ নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তোমার বুকের অবস্থা এমনিতেই ত ভাল নয়, এই সময় ছোঁয়াচ লাগলে অল্পেতেই বিপদ্ বাধতে পারে।" অতএব অজয় যায় না, কিন্তু অপর-সকলের অপেক্ষা মন্দিরার কল্যাণ-

কামনা সে বেশী জোরের সঙ্গে করে। প্রার্থনা করে, কাঁদে। সুভদ্রকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেয়, সর্ব্বদা সমস্ত দিকে তাহার মনকে সচেতন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। সেইসঙ্গে নিজের মনকে বোঝায়, সে যে যাইতেছে না, বীণা তাহার এই অপরাধকে ক্ষমা করিবে না। হয়ত তাহার জীবনের জট ছাড়াইবার ইহাই এক উপলক্ষ্য হইবে। সে যে কত অযোগ্য তাহা বুঝিতে পারিয়া বীণা তাহাকে ভুলিয়া গিয়া বাঁচিবে। তাহার অসুস্থতায় বীণা প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা করিয়াছিল, আজ বীণার এই ঘোরতর বিপদের দিনে তাহার পাশে গিয়া যে সে দাঁড়াইল না, নিজের সে অকৃতজ্ঞতার অপরাধকে এইরূপ নানা ছলনায় সে ভুলিতে লাগিল।

সুভদ্র কোনওদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহার ফিরিয়া আসিতে কোনওদিন বা গভীর রাত্রি হইয়া যায়। শেষের দিকে সবদিন রাত্রিতেও তাহার ফিরিয়া আসিবার অবসর হয় না। যখন আসে, ক্রমাগত ছটফট করিয়া কাটায়। শেল্‌ফ্‌ হইতে একটার পর একটা বই পাড়িয়া আনে, পাতার পর পাতা উল্টায়, কোনওটাতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। তাহাকে এত চঞ্চল কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন বিমানকে বলিল, "ভাই, তুমি গিয়ে ওঁদের বল, ওঁরা একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনুন, আমার ওপর নির্ভর করতে বারণ ক'রে এসো।"

বিমান বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বলতে হয় তুমি নিজেই গিয়ে বল না।"

সুভদ্র বলিল, "কিছুতেই নিজের মুখ দিয়ে কথাটা বেরুবে না। প্রাণ ধ'রে ওর চিকিৎসার ভার আর কারও হাতে আমি দিতে পারব না। আমি জানি, প্রায় নিশ্চয় ক'রে জানি, ওকে সারিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মরা বাঁচা ভগবানের হাত। যদি কিছু হয়, পৃথিবীকে কেমন ক'রে আমি মুখ দেখাব?"

বিমান বলিল, "তা যদি মনে কর তাহলে চিকিৎসার ভার নিজের হাতে না

রাখাই ভাল। পাশ-করা ডাক্তার অতি বড় মারাত্মক ভুল করলেও তাকে সহজে কেউ কিছু বলতে ভরসা পায় না, কিন্তু বলবার ছুতো পেলে তোমাকে কেউ রেয়াত করবে না, সেটা গোড়াগুড়ি জেনে রাখাই ভাল।”

পরদিন ভোরে সুভদ্র ভয়ে ভয়ে কথাটা বীণার কাছেও পাড়িল। বীণা বলিল, “এই কি আপনার এসমস্ত বাজে সেন্টিমেণ্টের সময়? আমার মেয়ের ভালমন্দের দায় আমার একলার, আর কারুর নয়। আপনার চিকিৎসাই চলবে।” কিন্তু সুভদ্র একবার তাহার মনে সংশয় ধরাইয়া দিয়াই বিপদ্ করিল। চিকিৎসকের নিজের উপর যদি নিজের শ্রদ্ধা না থাকে, অপরের পক্ষে সে-শ্রদ্ধাকে বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হয়। বিকালে মন্দিরার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে বীণার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। শুষ্ককণ্ঠে সুভদ্রকে আসিয়া কহিল, “আপনি কি সত্যিই মনে করেন, শেষ রক্ষা করতে পারবেন না?”

সুভদ্র বলিল, “আমার কতটুকুই বা শক্তি, অভিজ্ঞতাই আর কতদিনের, যে জোর ক’রে কিছু বলব। তবে যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম তা হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছি। যদি আর কাউকে ডেকে দেখাতে চান, আমি বাধা দেব না।”

হেমবালার তরফ হইতে, নরেন্দ্রনারায়ণের তরফ হইতে চিকিৎসা-পরিবর্ত্তনের তাগিদ ছিল। বীণাই এতদিন দৃঢ়তার সঙ্গে সকলের সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। আজ সুভদ্র নিজেই তাহার সেই জোর অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া সে কম্পিতপদে হৃষীকেশের মহলের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া সুভদ্র বিমানের কাছে প্রায় কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, “ভাই, বৃথাই এতদিন এত মেহনত করলাম। যে-সময়টা সব-চেয়ে বেশী আমি ওর কাজে আসতাম তখনই তার কাছে আমি আর থাকতে পারলাম না।”

বিমান সব কথা শুনিয়া কহিল, “দোষটা যখন সম্পূর্ণ তোমার তখন তা নিয়ে

নাকে কেঁদে আর কি হবে? তুমি যাদের কাছে থাকতে পার না, এমনও ত অনেকেরই অসুখ শেষ অবধি সেরে যায়, আশা করা যাক ওরটাও সারবে।"

কিন্তু মন্দিরার অসুখ সারিল না। চার দিনের দিন সুভদ্রই শেষ সংবাদ লইয়া আসিল। বিমানের বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমার চিকিৎসক-লীলা এই পর্য্যন্ত। তোমায় বলছি, ভালবাসতে পারা আমার স্বভাবে নেই, তবু ওকে আমি কি ভাল যে বাসতাম! কিন্তু আমার ভালবাসায় সে জোর কেন ছিল না, যে, ওকে আমি দাবী করতে পারি, সকলকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে বলতে পারি, ও বাঁচুক মরুক আমি দেখব, কারুর কোনো কথায় আমার কিছুমাত্র এসে যাবে না। আমার আত্মাভিমানের কাছে এই ফুলের মত কচি মেয়েটাকে আমি বলি দিলাম।"

তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া বিমান তাহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। একটু থামিয়া সুভদ্র আবার কহিল, "তোমাকে আমার বলা রইল, আমার অনধিকার-চর্চ্চার যত কিছু তোড়াজোড়, বই খাতা শিশি বোতল যন্ত্রপাতি, সব একটা গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে কোথাও একটা পুরনো জিনিষের দোকানে কাল ভোরেই ফেলে রেখে আসবে। ওগুলোকে আর না আমার চোখে দেখতে হয়।"

মন্দিরার মৃত্যু অজয়ের জীবনে যে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া আনিল, একমাত্র দুঃখিনী বীণার তলহীন অশ্রুবারিধির সঙ্গে তাহার হয়ত কতক তুলনা চলে। হৃদয়ের সব কয়টি রুদ্ধদ্বার একসঙ্গে খুলিয়া দিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে ঝড়ের হাওয়ার মত মন্দিরার জন্য হাহাকার, বীণার জন্য হাহাকার, বহিয়া আসিয়া আছাড় পিছাড়ি খাইয়া ফিরিতে লাগিল। এবারে আর কোথাও কোনও আত্মপ্রবঞ্চনার আড়াল রহিল না। যাহার কাছে আর্ত্ত দেহমন লইয়া এতদিন কেবল সে আশ্রয়-কামনা করিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য, সকল দিক্ হইতে সমস্ত প্রকারে তাহার দেহমন হইতে

বেদনার শেষ চিহ্নটিও মুছিয়া লইবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব আলোড়িত করিয়া কেবল এই কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল, তুমি আমার কে তাহা আমি জানি না, তোমাকে ভালবাসি কি বাসি না সে তর্কের আজ আমার কাছে কোনও অর্থ নাই, তোমার দুঃখ আজ তোমা-অপেক্ষা বড় হইয়াছে, আমার নিজের অপেক্ষা বড় হইয়াছে, এই দুঃখ হইতে কোনও দিকে এতটুকুও যদি তোমাকে আমি আড়াল না করিতে পারি, আমি সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইব। এতদিনের মধ্যে একবারও গিয়া মন্দিরার খোঁজ লয় নাই, এই অনুশোচনা মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহার বেশী হইল।

শোকের প্রথম আবেগটা একটু কাটিয়া যাইবা মাত্রই অজয় বীণার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিল। মনে করিয়াছিল, বীণা তাহাকে দেখিয়া একেবারেই মুহ্যমান্ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার কোনও ব্যবহারে কিছুমাত্র অস্থিরতা প্রকাশ পাইল না। অজয়কে নীরবে একটি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া নিজে খোলা জানালায় একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিল। বহুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর অজয় কহিল, "ক্ষমা চাইব না, কারণ জানি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই। সমস্ত জীবন দিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি সে-সুযোগ তুমি আমায় ক'রে দাও, এই ভিক্ষা তোমার কাছে আমি চাইতে এসেছি।"

বীণা নীরব রহিল দেখিয়া সে আবার কহিল, "আমি জানি, তোমাকে দেবার মত বাইরের বিচারে কিছু আমার নেই, কিন্তু আমার কাছে অন্ততঃ আমার নিজেটার চেয়ে বেশী মূল্যবান্ আর কি আছে? আমার শ্রেষ্ঠ যা দেবার তাই তোমাকে আমি দিতে চাইছি।"

বীণার ঠোঁট-দুইটা অল্প একটু কাঁপিল। অজয়ের দিকে সে চাহিল না, চোখ-দুইটাকে একটু নামাইয়া কহিল, "তা হয় না।"

অজয় ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "কেন হয় না?"

"সে আলোচনা আজকের মত থাক।"

"না, থাকবে না, আমি আজই শুনতে চাই। তোমাকে এমন ক'রে দুঃখ পেতে আর একদিনও আমি দেব না, যদি না-দেওয়া আমার সাধ্যে থাকে।"

বীণা বলিল, "হয় না এইজন্যে যে তুমি আমায় ভালবাস না।"

অজয় বলিল, "এই পৃথিবীতে অন্ততঃ তোমার কাছে আমি আত্মগোপন করব না। হয়ত বাসি না। কিন্তু তোমাকে এত যে ভাল লাগে, তার দাম কি কিছু নয়?"

বীণা বলিল, "তুমি জানো না, জানবার তোমার কথা নয়। তার দাম এত নয় যে শুধু তাই সম্বল ক'রে দুজন মানুষ একসঙ্গে ঘর করতে বেরুতে পারে।"

তাহার একটি হাতকে নিজের দুই হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল, "কেন?"

হাতটি আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া বীণা কহিল, "এইজন্যে যে আজ তোমার ভাল লাগছে, কাল আর ভাল না লাগতে পারে। দুজন কাছাকাছি থাকার কত যে বিড়ম্বনা তা ত তুমি জানো না? কেবল আমাকে নয়, পৃথিবীর কোনও মানুষকেই, কোনও কিছুকেই এরপর একদিন ভাল না লাগতে পারে। কি তখন বাকী থাকবে যা নিয়ে সেই চরম দুর্গতিকে ভুলবে?"

অজয় কহিল, "যদি ভালবেসে বিয়ে করতে চাইতাম, কি বাকী থাকত?"

বীণা কহিল, "ভালবাসাটাই বাকী থাকত। সে কখনো মরে না, তার বালাই নিয়ে মানুষ নিজে ম'রে যায়, সে মরে না। তার পরীক্ষাই ত ঐখানে।"

অজয়ের গলার স্বরে হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক জোর আসিয়া লাগিল, বলিল, "কিন্তু মরতে আমি চাই না, আমি বাঁচতে চাই। তোমার কাছে এই প্রার্থনাও আমার যে তুমি আমাকে বাঁচতে দেবে।"

বীণার দুই চোখ ছাপাইয়া এতক্ষণে ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, বেদনার কোনও বিকৃতির চিহ্ন তাহার মুখে নাই, বড় করুণ একটু হাসি মুখে আনিয়া তুবিলিল, "মরতে য ভয় পাও বন্ধু?"

অজয় গলার স্বরে জোর দিয়াই কহিল, "হ্যাঁ, ভয় পাই। একথা আজ আমি স্বীকারই করব, ভয় পাই। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছে এই মিনতি আমার, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। ভয় পেতে সত্যি আমার লজ্জা নেই। এদেশে মহা-আড়ম্বরে মৃত্যুর সাধনা সেই কোন্ যুগ থেকে ত চলেছে, এইবার চলতে হবে বাঁচবার তপস্যা। আমিও বাঁচতেই চাই, তুমি কেবল যদি আমার সহায় হও।"

বীণা কহিল, "কি লাভ হবে, বাঁচবার মত ক'রে যদি বাঁচতে না পারো?"

অজয় কহিল, "বেঁচে থাকতে পারাটাই কি একটা লাভ নয়?"

বীণা কহিল, "আজ মনে হচ্ছে, হয়ত নয়।"

অজয় কহিল, "ম'রে যাওয়ার চেয়ে বেশী লাভ নয়?"

বীণা কহিল, "কি হিসেবে লাভ? দেশবিদেশের বড় বড় কথা আমি কখনো ভাবি না তা ত জানোই, কিন্তু সেইদিক্ দিয়েও যদি দেখ, পৃথিবীর অন্য দেশগুলি আমাদের চেয়ে বেশী কোন্‌দিকে কি লাভ করেছে? তারা বেঁচে আছে, তুমি কি চাও ভারতবর্ষ সেইরকম ক'রে বেঁচে থাকুক? মানুষকে মানুষ ব'লে সে মান্য করবে না, ভালবাসবে না, শাণিত হয়ে থাকবে তার নখর, লোলুপ হয়ে থাকবে তার রসনা, প্রেমহীন, দেবতাহীন সেই জীবনকে কি দেশের জন্যে তুমি কামনা কর?"

অজয় বলিল, "নখদন্তহীন আহত মৃগদেহ হয়ে থাকাটাই কি হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য? কাউকে হিংসা করছি না সত্য, কিন্তু ভালই কি বাসছি? নির্ব্বিচারে সকলকে ভয় করছি, সেইটেই কি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা?"

বীণা বলিল, "তাও নয়। বাঁচবার মত ক'রে বেঁচে থাকবার সাধনা করতে হবে। সেই সাধনা তোমার হোক। সে পথে ভালবাসাকে বর্জ্জন করলে চলবে না, তাতে বোঝা যতই দুর্ব্বহ হোক। সেই হবে তোমার সব-চেয়ে বড় পাথেয়।"

অজয় হঠাৎ নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। বীণার শেষ কথার জবাব চট করিয়া তাহার মুখে জোগাইল না। যখন কথা কহিল, তাহার গলায় পূর্ব্বেকার সেই জোর আর অবশিষ্ট নাই, কেবল দুই হাত একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নতমস্তকে বলিল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি ভালবাসব।"

বীণা উঠিয়া পড়িল, তাহার ঠোঁটের এক কোণে আবার অত্যন্ত করুণ একটি হাসির রেখা, কহিল, "লোভ হচ্ছে, কিন্তু তবু বলছি, পারবে না, সে পারা যায় না।"

অজয় ছুটিয়া গিয়া তাহার দ্বার-রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কাতর মিনতি কণ্ঠে ভরিয়া কহিল, "যদি পারি?"

আবার নীরবতা, আবার কয়েক বিন্দু অশ্রুজল, তারপর বীণা কহিল, "যদি পারো, সেদিন আবার এসো। আমি অপেক্ষাই করব। অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর উপায় কি বল?"

বীণার পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া অজয় কহিল, "কিন্তু তুমি জানো না, জীবনব্যাপী কি দুঃখভোগের মধ্যে তুমি আমায় ফিরে পাঠাচ্ছ। দুঃখ পাওয়া মানুষের সব চেয়ে বড় পাপ, এই সত্যকে বহু দিনের বহু অশ্রুপাতের বিনিময়ে আমি লাভ করেছিলাম—"

বীণা বলিল, "অত ত জানি না, তবে আমার মনে হয়, দুঃখকে অতিক্রম করবার জন্যে যে দুঃখ পেতে হয়, ভালবেসে যে দুঃখ পেতে হয় তা পাপ নয়। দুঃখ যে আমরা পাই না সেই ত বিপদ্, তার সঙ্গে অতি সহজে সন্ধি ক'রে তাকে ভুলে থাকি। যাকে পাপ ব'লে বুঝেছ, তার সঙ্গে সন্ধি করতে তোমাকে আমি দেব না।"

অজয় তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "হয়ত ভালবাসি না বলেছি, কিন্তু একথাও তোমার জানা দরকার, ভালবাসা কাকে বলে তাও খুব ভাল ক'রে আমি জানি না। এমনও হতে পারে, যাদের ভালবেসেছি ভাবছি, তাদের

সত্যিই ভালবাসিনি, তোমাকে যা দিতে পেরেছি, দিয়েছি, সেইটেই সত্যিকারের ভালবাসা। এ ত আমি দেখেছি, অন্যদের কাছে কেবলই নিজকে বড় করি, একমাত্র তোমার কাছে এসে নিজকে ভুলে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম করা আমার সহজ হয়। দেশকে ভালবাসি মনে করি, কিন্তু সত্যই কি ভালবাসি? দেশের দুর্গতি, হাজার দিকে তার হাজার রকম লাঞ্ছনা অবমাননা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করবার আগে আমার আত্মাভিমানকে ঘা দেয়। আমি যে এই দেশের মানুষ সে-অবমাননা তাই আমার গায়ে এসে লাগে, এরই নাম আমার দেশপ্রীতি। মানুষগুলি আমার কাছে কিছু না, আমার আত্মভিমানটাই আসলে বড়।"

বীণা বলিল, "অনিশ্চয়তা এ-সমস্ত ব্যাপারে তোমার মনে খানিকটা আছেই তা আমি বিশ্বাসই করি। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে এখনও তোমার দেরি আছে। সেও ত বিপদ্ কম নয়? তোমার মধ্যেই তুমি যখন নেই, কার ঘর আমি করব? কিন্তু কথাটা তা নয়। নিজেকে ভুলে যেতে পারাটাই কি খুব বড় কথা? মানুষকে নিজের মধ্যে ফিরে পাঠাবার ক্ষমতা এক ভালবাসারই আছে, আর সেই ত তার মূল্য।"

৩৭

ঐন্দ্রিলার পরীক্ষা হইয়া গেল। যা করিয়া সে পরীক্ষা দিল, সে কেবল তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। শোকছায়াচ্ছন্ন গৃহ, অশ্রুবাষ্পে ভারাক্রান্ত গৃহের বাতাস, প্রতিদিনের প্রিয় জীবনযাত্রায় সহসা বিধাতার অকরুণ হাতের স্পর্শে কি মর্ম্মান্তিক কৃতঘ্নতার রূপ। এমন অবস্থায় জীবনধারণের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ-গুলিই কেমন যেন অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয়, প্রোফেসারের দেওয়া নোট, বিজাতীয় ভাষাতত্ত্ব, বহু নামতিথি সম্বলিত সেই ভাষার ইতিহাস, দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণ, এগুলি ত এখন পাগলের প্রলাপেরই নামান্তর।

ঐন্দ্রিলার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইতে চাহে নাই বলিয়া বীণা এই ক'দিন সাধ্যমত তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দূরে থাকিবার জো কি? এবাড়ীতে এমন দ্বিতীয় প্রাণী আর ত কেহ নাই যাহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারে? স্নলতারাও সম্প্রতি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছেন। অশ্রুর স্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিলেই ছুটিয়া ঐন্দ্রিলার কাছে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। দুই বোনে কোনও কথা হয় নাই, সান্ত্বনার্থে বলিবার মত কোনও কথা ঐন্দ্রিলা খুঁজিয়া পায় নাই, দুইজনে গভীর সমবেদনায় পাশাপাশি বসিয়া নীরবেই অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। হৃষীকেশ নিজের পুস্তকের রাশির মধ্যে আরও যেন ডুবিয়া গিয়াছেন, বাড়ীতে অতিথি রহিয়াছে, অতিথির প্রতি অমনোযোগ বশতঃ সাধারণ সৌজন্যের কোথাও অভাব ঘটিতেছে কি না, সে-বিষয়েও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দিনান্তে একবার মাত্র তাঁহার দেখা হয়, দুইজনকে একই ধরণের অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্ন করিয়া, নীরবে তাহাদের চিবুকে মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি নিজের মহলে ফিরিয়া আসেন। কন্যাকে পর করিয়া দেওয়ার ফলে ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও হেমবালা তেমন করিয়া কাছে টানিতে পারেন না, এবাড়ীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার আসন একেবারেই টলিয়া গিয়াছে। মন্দিরা তাঁহাকেও কিছু কম আঘাত দিয়া যায় নাই, কিন্তু বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই, দিবারাত্র নিজের ঘরটিতে একলাই তিনি কাটান, ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বইটি দ্বিতীয়বার পড়া চলিতেছে। তাঁহার মনের কোথায় যে কি অভিমান, যেন মন্দিরার জন্য প্রকাশ্যে অশ্রুবিসর্জ্জনেরও তিনি অধিকারী নহেন। ঐন্দ্রিলা মায়ের এই ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বিরক্ত ও ব্যথিত হইতেছিল, বীণার কাছে এই লইয়া তাহার লজ্জাও ছিল কম নয়। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও বিষয়ে কিছু বলা বা করা তাহার স্বভাব নহে বলিয়া উপলক্ষ্যের অভাবে মাতাকে এতদিন কিছু সে বলিতে পারে নাই। উপলক্ষ্য হেমবালাই জুটাইয়া দিলেন। ঐন্দ্রিলার

পরীক্ষা শেষ হইবার দিন-পাঁচেক পর একদিন তাহাকে নিজের ঘরে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "এইবার ত পড়াশোনা চুকল, এবারে দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করা যাক, কি বলিস্ ?"

ঐন্দ্রিলার মন একে ত স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, থাকিবার কথাও নহে; মৃত্যুর অতি-সান্নিধ্য মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলকে নড়াইয়া দিয়া যায়, ঐন্দ্রিলার বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; তদুপরি মায়ের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার সঞ্চিত বিরক্তি। পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেল। চোখমুখ লাল করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, তা বই কি। দিদির এই ত অবস্থা, বাড়ীতে এমন একটা লোক নেই যে ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখে। এতদিন গণ্ডেপিণ্ডে তাদের খেয়ে সদলবলে প্রস্থান করবার এই উপযুক্ত সময় বটে। তোমার যোগ্য কথাই হয়েছে।"

হেমবালারও মনের এতদিনকার যতদিকের যত জমানো তাপ আজ একসঙ্গে কথার মুখে বাহির হইয়া আসিল, কহিলেন, "দেখ্, তোকে কেউ কিছু বলে না ব'লে ভারি আস্কারা পেয়ে গিয়েছিস্। দুপাতা বই প'ড়ে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। কি এমন কথা হয়েছে যে আমাকে এই রকম ক'রে তুই বলবি ? আমার যোগ্য কথা হয়েছে মানে কি শুনি ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "নিজের দিক্‌টা ছাড়া আর কারও দিকে তাকিয়ে দেখা তোমার স্বভাব নয়, তা না হলে দিদির এই বিপদের সময় তাকে একলা ফে'লে চ'লে যাবার কথাটা তোমার মনে আসত না।"

হেমবালা বলিতে পারিতেন, এখনই চলিয়া যাইতে হইবে এমন কথা ত আমি বলি নাই, যাওয়া যতদিন শোভন দেখাইবে না ততদিন থাকিয়া গেলেই হইল। কিন্তু উত্তেজনার মুখে কথার স্রোত বক্র পথে বহিয়া গেল, কহিলেন, "অন্যের দিক্‌টা আমি দেখি না, তুই দেখিস্, আর এ-অপবাদ তুই আমাকে না দিলে চলবে কেন ? মানুষের কৃতজ্ঞতার বালাই ব'লেও একটা জিনিষ

থাকে, তোর তাও নেই। তোর জন্যে পৃথিবীতে এমন কোন্ দুঃখ আছে যা নিজেকে আমি দিইনি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "মা হয়ে পেটে ধরেছ, সেজন্যে যতটা করবার তা করেছ, আর সেজন্যে সন্তানের কাছে সাধারণ কৃতজ্ঞতা হিসাবে যা তোমার পাওনা সে ত আছেই। কিন্তু তার বেশী কোন্‌দিকে কি আর তুমি আমার জন্যে করেছ? প্রাণপণে হাড় জ্বালিয়েছ।"

ঐন্দ্রিলা চলিয়া যাইতেছিল, হেমবালা প্রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি করেছি, কি করেছি আমি তোর, না ব'লে এঘর ছেড়ে যাস্ যদি ত অতি বড় দিব্যি রইল।"

ঐন্দ্রিলা ফিরিল, হেমবালার একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় কহিল, "কি করেছ তা তুমি বেশ ভাল ক'রে জানো। আমার কাছে কেন জানতে চাইছ? আমি যদি জানতাম তবে ত কথাই থাকত না, কিন্তু জানতে দিতে তোমার সাহস হয়নি। কেন জানতে দাওনি? কি অধিকার আছে তোমাদের আমার কাছ থেকে লুকোবার? যদি পুরোপুরি লুকোতে পারতে, কথা থাকত না। কিন্তু আমার ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে, জানো সবটা লুকোতে পারনি এবং শেষ অবধি কিছুই লুকোতে পারবে না, তবু আমাকে সব বলনি কেন? বললে তোমাদের কি ক্ষতি হত?"

হেমবালা রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "যদি কিছু লুকিয়ে থাকি, তোরই ভালর জন্যে লুকিয়েছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমার ভালর জন্যে লুকিয়েছ! অন্য মানুষের ভালমন্দ তার নিজের চেয়ে বেশী বোঝে, কোনো মানুষেরই এতটা অহঙ্কার থাকা উচিত নয়।"

হেমবালা এবার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া কহিলেন, "তা বেশ, কি তুই জানতে চাস্, উনি ত এখানেই রয়েছেন, ওঁকেই না-হয় গিয়ে জিজ্ঞেস কর্, আমায় কেন সবাই মিলে জ্বালাস্?"

ঐন্দ্রিলা তবুও কহিল, "আমাকে কিছু না বলবার ওঁর অধিকার আছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উনি আমার কিছু ক্ষতি করেন নি, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে তুমি আমার মাথা হেঁট করেছ, তুমি আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছ, আমার আনন্দ কেড়ে নিয়েছ, তুমি আমাকে বলবে না কেন?"

নরেন্দ্রনারায়ণ দুজনেরই অলক্ষ্যে কখন দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একটুখানি কাশিয়া আস্তে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ঐন্দ্রিলা ছিট্‌কাইয়া মায়ের হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিল, তারপর দ্রুতপদে বাহির হইয়া একেবারে ছাতে চলিয়া গেল।

হেমবালার প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নরেন্দ্র নীরবে অপেক্ষা করিলেন, তারপর নিজেই একটা আসন লইয়া বসিয়া কহিলেন, "ও যখন এত ক'রে জানতে চাইছে তখন ওকে সব জানতে দেওয়াই আমাদের উচিত হবে।"

হেমবালা তীব্রস্বরে কহিলেন, "তাহলে তুমি এবং তোমার মেয়ে, দুজনেরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালের মত চুকবে তা ব'লে রাখছি।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তবু ওকে বলতেই হবে। সেদিন এবিষয়ে তোমার সঙ্গে যখন কথা হ'ল, মনে করেছিলাম, যে-কোনো মূল্য দিয়ে হোক, তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে পারলেই আমি সুখী হব। কিন্তু এই ক'দিন মেয়ের অবস্থা দে'খে দে'খে আমার মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছে, তারপর আজকের এই ব্যাপার। আমি এখন বুঝতে পারছি, ওকে কাঁদিয়ে ফে'লে রেখে গিয়ে তোমাকে নিয়েও আমি সুখী হতে পারব না। তুমি ত সুখ-দুঃখ এ দুয়েরই ওপরে, কিন্তু আমার কথা আমি বলছি, ওর দুঃখের পাশে নিজের কোনো সুখভোগই আমার কিছু নয়। আমাদের ত ঐ একটি বই আর নেই, ওকে পর ক'রে দিয়ে তারপর বেঁচে থাকবার আমাদের কি অর্থ থাকবে?"

হেমবালা কথার সুরে শ্লেষ ভরিয়া কহিলেন, "নিজের কীর্ত্তিকাহিনী সব

ওকে বললেই মেয়ে এক মুহূর্ত্তে খুব আপন হয়ে উঠবে, এই আশা কি তুমি করছ ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা করছি না। মানুষ পর হোক, আপন হোক, সেটা তত বড় কথা নয়, সম্পর্কটা সত্য হওয়াই আসল। অন্ততঃ ওর মনে কিছু একটা যে হয়েছে সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই ? কল্পনায় আমার অপরাধকে হয়ত সে অনেকখানি বেশী বাড়িয়ে ভাবছে। নিজের দিক্ ভেবেও তাকে আমার সব বলা প্রয়োজন। না বললে কোনোদিন আমাকে ও ক্ষমা করবে না, তা নিশ্চিত। অপরাধ যা তা ত থাকবেই, তার ওপর সত্যগোপনের অপরাধ আর-একটা বাড়বে। যদি সব বলি, হয়ত সব বুঝে ক্ষমা শেষ পর্য্যন্ত সে আমাকে করতেও পারে। পারবার সম্ভাবনা যখন আছে, তখন সে-সুযোগ আমি ছাড়ব না। তাছাড়া ওকে মানুষ ক'রে তুলেছি যখন, মানুষের মত ব্যবহার তার সঙ্গে করব এবং সেই রকম ব্যবহার প্রত্যাশাও করব।"

হেমবালা লিখিবার চৌকিটায় মাথা গুঁজিয়া আকুল কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, "মানুষের মত ব্যবহার আমারই কেবল এ পৃথিবীতে কোথাও পাওনা নয়। ভগবান্ জানেন, আমার যা দুঃখ তার কোথাও তুলনা নেই।"

নরেন্দ্র তাঁহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, আজ হেমবালা বাধা দিলেন না। নরেন্দ্র কহিলেন, "আমি জানি। আমি সত্য কথাই বলছি। তোমার যে কি দুঃখ তা আমি জানি। এই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাই, যে দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েছি তা দূর করবার ক্ষমতাও একমাত্র আমারই আছে, পৃথিবীর আর কারও ত তা নেই ? সেইটে বুঝে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার আমার যে ন্যায্য অধিকার তা তুমি আমাকে দাও। ইলুকে সব ব'লে সে প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোক।"

হেমবালা কোনও কথা কহিলেন না, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া নরেন্দ্র আবার কহিলেন, "তাছাড়া একটা দিক্ তুমি একেবারেই দেখছ না। যে অপরাধ আমার একলার, মেয়ের কাছে দুজনেই কেন তার জন্যে অপরাধী হয়ে থাকব? সব বলবার ফলে আমি যদি ওকে চিরকালের মত হারাই, তুমি আবার ওকে সম্পূর্ণ ক'রে ফিরে পাবে, আর সেইটেই হবে সব চেয়ে বড় লাভ।"

একতলার পিছনের দিকে একটা বড় ঘরে নরেন্দ্রনারায়ণের বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই দিনই সন্ধ্যায় সে ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া কন্যাকে তিনি চিঠি লিখিতে বসিলেন, লিখিলেন:

'কল্যাণীয়াসু

যে তিনটি মানুষকে লইয়া আমাদের সংসার, তাহাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটি গুরুতর সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে, যে বাধ্য হইয়াই এমন কতক-গুলি কথা তোমাকে আমার বলিতে হইতেছে, যা আর সকলকে বলা চলে কিন্তু নিজের অপত্যকে কিছুতেই বলা চলে না। কিন্তু কাজটা দুরূহ বলিয়াই সেটাকে আমি ভয় করিব না। আমি যে পাপ করিয়াছি, সে-পাপের চরমতম শাস্তি এই চিঠিটি লিখিতে বসিয়াই নিজেকে আমি দিতেছি, কেননা এ শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার পাওয়া প্রয়োজন। ইহার চেয়ে বড় আর কোনো শাস্তি আমার পাওয়া সম্ভব নয়, ঈশ্বর রাধাগোবিন্দজী সে কথা জানেন। দুইটি কথা তোমাকে আমি মনে রাখিতে বলিব। এক, তুমি এবং তোমার মায়ের চেয়ে প্রিয় এজীবনে আমার কিছু কখনও ছিল না এবং এখনও নাই। দুই, আমার এই চিঠিতে আমি যাহাই বলিব, সত্য বলিব; নিজের অপরাধ-স্খালনের উদ্দেশ্যেও কোনও কথা গোপন করিব না বা কোনও কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিব না।

আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে এমন সময় একাধিকবার আসে যখন তাহার শুভবুদ্ধি সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়; সে অবস্থায় কেউ বা ছোটখাটো ভুল করে, কেউ বা এমন কিছু করে যার প্রতীকার প্রাণ-বিনিময়েও

একটা জীবনকালের মধ্যে আর করা যায় না। আমি যাহা করিয়াছি, আমার দিক্ হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার কিছু আর নাই, ইহা বিশ্বাস করি।

যদি এমন হইত, তোমার মাকে যথেষ্ট ভালবাসি না বলিয়া বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া আমি অপরাধ করিতাম, তবে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার অর্ঘ্য উজাড় করিয়া তাঁহাকে দিলে আমার অপরাধের কতক প্রতিকার হইতে পারিত। কিন্তু শ্রদ্ধা এবং প্রীতি একটি মানুষকে যতখানি দেওয়া সম্ভব সে ত চিরকালই দিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাকে দিয়া আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি, আমার সমস্ত জীবন যখন পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সেই অবস্থায় ক্ষণিকের খেয়ালের বশে সর্ব্বনাশের পথে আমি পা বাড়াইয়াছিলাম। যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে, মহাকালের হিসাবের খাতার পাতা হইতে তাহাকে এখন আমি মুছিয়া দিব কিরূপে ?

যাহাকে লইয়া এই সর্ব্বনাশ, তাঁহার পরিচয় কেবল গোপন করিব। যদিও প্রলুব্ধ হওয়া আমার উচিত ছিল না, তবু একথা সত্য যে কতকটা পথ প্রলোভনে ভুলাইয়া তিনিই আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমি স্বয়ং আগ্রহান্বিত হইয়া আরও অগ্রসর হইবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে যখন হাত বাড়াইলাম, তিনি যে কেবল হাতই সরাইয়া লইলেন তাহা নয়, নিজেই অকস্মাৎ দূরে সরিয়া গেলেন।

যতটা দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার এইরূপ আচরণের কোনও অর্থ তখন আমি খুঁজিয়া পাই নাই, আমি অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া গেলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন, ঠাকুরের ভোগে কুকুর মুখ ঠেকাইয়া গেল, তাহার শাস্তি-বিধান করা হইল না।

ঐ মানুষটির অহঙ্কার ছিল অভ্রভেদী। তোমার মায়ের সম্বন্ধে তাঁহার অবজ্ঞা এবং সেইসঙ্গে ঈর্ষ্যারও অবধি ছিল না।

যে প্রাচীন জমিদার বংশে আমার জন্ম, পরাজয়-স্বীকার সে বংশের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। দুর্দ্দান্ত পাঠান-মোগল শাসনের যুগেও এ বংশের স্বাতন্ত্র্য এবং

স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। পরাজয় কেমন করিয়া স্বীকার করিতে হয় সে-শিক্ষা আমারও কোনোদিন পাওয়া হয় নাই। ঐ মানুষটির অহঙ্কার আমারও দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কারকে খুব কঠিন করিয়াই তাই আঘাত করিল। তাহা সত্ত্বেও পরাজয়-স্বীকার করিয়া আমি নিবৃত্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমার পরাজয়ের গ্লানি অলক্ষ্যে তোমার মায়েরও গায়ে যেন লিপ্ত হইয়া যাইতেছে। তোমার মায়ের সম্বন্ধে যে মানুষটির এত অবজ্ঞা, তোমার মাকে উপহাস করিবার উপকরণ তাহাকে নিজ হাতে আমি জুটাইয়া দিয়াছি। তোমার মায়ের স্বামীগর্ব্বের অবধি ছিল না, তাঁহার কাছে রাজাসনে আমি রাজা; আর ঐ মানুষটির দরজায় আমি যে কেবল কৃপাপ্রার্থী ভিক্ষুক তাহা নয়, আমার ভিক্ষার আবেদন সেখানে প্রত্যাখ্যাত, ইহা লইয়া ঐ মানুষটির যেন হাসির শেষ নাই। আমি বোধহয় কিছুদিনের জন্য পাগল হইয়াছিলাম, সারাক্ষণ সেই হাসি শুনিতে পাইতাম। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতাম, শুনিতাম, ঘুমের মধ্যে সেই হাসির শব্দ শুনিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠিয়া বসিতাম।

এ বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ সে সময় আর রহিল না, যে, যদি পরাভব স্বীকার করি, যদি তাহার এই অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করিয়া না দিয়া প্রত্যাখ্যান শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া যাই, তোমার মায়েরও তাহাতে অবমাননা হইবে। যেদিকে যতরকমের যতটা শক্তি আমার ছিল সমস্ত নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া, পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়া, বহু দিবসের অক্লান্ত সাধনায় কাম্যফল একদিন আমার করতলগত হইল। যে অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

তোমার মায়ের মনে তখনো সন্দেহের উদয় হয় নাই, হয়ত কোনও সময়ে তাহা হইতে পারে মনে করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমি অপরাধ স্বীকার করিলাম। বুঝাইয়া বলিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে সুযোগ তিনি আমাকে দেন নাই।

আজ একথাও মনে হইতেছে, ইচ্ছা করিলেই ত লুকাইতে পারিতাম। এমনও এক-একবাব ভাবিতেছি, এই যে দুর্ভোগ ভুগিতেছি তাহা কি আমার সেই পাপের শাস্তি, না সত্যভাষণের শাস্তি?

ইতি

আশীর্ব্বাদক

নরেন্দ্রনারায়ণ।'

৩৮

বীণা বলিল, "এ কি কাণ্ড!"

একটা বড় গোছের সুটকেসে আরও কিছু কাপড়-চোপড় ঠাসিয়া ভরিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমি চলেছি।"

বীণা কহিল, "সে কি, কোথায়? এ কি পাগলামি সুরু করেছিস্? কি হয়েছে রে ইলু?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি কিছু বলতে পারব না।"

বীণা কহিল, "আমাকেও বলতে পারবি না, এমন কি ব্যাপার হঠাৎ ঘটল? লক্ষ্মীটি, বল্ কি হয়েছে।"

ঐন্দ্রিলা শক্ত হইয়া বলিল, "বলতে পারব না, তার বেশী আর কিছু বলা আমার সাধ্যে নেই। তোমাকেও এই অবস্থায় ফে'লে যাচ্ছি, তার থেকে যতটা বুঝবার বুঝবে।"

ঐন্দ্রিলাকে বীণা যত জানিত এত আর কেহ নহে, তাছাড়া ব্যাপার অনুমানে কতক বুঝিল, তাহার গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস্ তা ত বলতে পারিস্?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "স্থলতাদিদের ওখানে।"

বীণা কহিল, "কিন্তু স্থলতাদিরা কলকাতায় নেই তা ত জানিস্ ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "জানি। তাঁদের দেশের বাড়ীতেই কিছুদিনের মত যাচ্ছি।"

"তারপর ?"

"তারপর যদি কপালে থাকে ত আবার দেখা হবে।"

"বাবা! কি স্থদিনই যে চলেছে আমার!" বলিয়া বীণা দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া বিছানার পাশে মাটিতে বসিযা পড়িল।

তাহার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া শাড়ীর আঁচলে তাহার উদ্গত অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে ঐন্দ্রিলা কহিল, "তোমার এমন দুঃখের দিনে আমি তোমার কোনো কাজে লাগলাম না, এ ক্ষোভ আমার মরলেও যাবে না। কিন্তু একটা কথা ব'লে যাচ্ছি, আমাকে খুব নিষ্ঠুর হয়ে বিচার করবার আগে সেই কথাটা মনে কোরো। তুমি যা হারিয়েছ তার তুলনা নেই, কিন্তু যে জিনিষ আজ আমার খোওয়া গেছে তার মূল্য আমার কাছে অন্ততঃ খুব কম ছিল না। কিছুদিন একটু বাইরে কোথাও যেতে না পেলে আমি নিঃশ্বাস আটকে ম'রে যাব।"

বীণা বলিল, "থাক, বলিস্ না, শুনতে চাই না, দরকারও নেই। তোকে নিষ্ঠুর হয়ে বিচার আমি করব না তা তুই ভাল ক'রেই জানিস্। যাচ্ছিস্ যে, কে তোকে নিয়ে যাচ্ছে ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "সুভদ্রবাবুকে বলেছি, আমাকে পৌছে দিয়ে আসতে।"

বীণা একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কহিল, "তা নিয়ে যে কথা উঠবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কথা এমনিতেও কত ওঠে। আর সেইজন্যেই বিশেষ ক'রে আরও ওঁকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। জীবনের আগাগোড়াটাই যে নোংরামি নয়, সেইটে এসময় একটু মনে রাখতে চাই।"

বীণা কহিল, "তুই ব'লেই বলছি। যদিও আমার নিজেরও এতটা সাহস হত কিনা সন্দেহ। আগুপিছু ভাল ক'রে ভেবে দেখেছিস্ ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "পরে ভাবব। ভাববার অবস্থায় আমার মনটা এখন নেই। তোমার গাড়ীটাকে একটু ব'লে দিও দিদি।"

"পিসীমা, পিসে-মশায় ?"

"তাঁদের কাছে আমি বিদায় হয়ে এসেছি। মাকে তুমি একটু দেখো। তুমি দেখবেই জানি, তবু বলছি।"

"বাবা ?"

"ঐ একটি মানুষ পৃথিবীতে আছেন, যাঁকে এ মুখ আমি এখন দেখাতে পারব না। আমার হয়ে তুমিই তাঁকে যা বলবার বোলো।"

রাত দশটায় শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে বীণার সঙ্গে আবার ঐন্দ্রিলার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। এবারে ঐন্দ্রিলারও অশ্রু বারণ মানিল না, বীণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "দিদি, আবার তুমি আমার কাছে কেন এলে ? তোমাকে ছেড়ে যেতে এমনিতেই যে আমার কি হচ্ছে তা আমিই জানি, কেন সেটাকে আরও কঠিন ক'রে দিচ্ছ ?"

সে শান্ত হইলে বীণা কহিল, "আমি কেবল দেখা করতেই আসিনি। তখন বলা উচিত কি না ঠিক করতে না পেরে বলিনি, বলতে এলাম, সুভদ্রবাবু তোকে পৌঁছতে যাচ্ছেন, অজয় ত ভুল বুঝবে না ?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আর সবাই ভুল বুঝলে যতটা ক্ষতি তার চেয়ে বেশী কি ক্ষতি তাতে হবে ?"

বীণা কহিল, "এই শেষবার তোকে বলছি, তুই ভুল করিস্ নি। ও তোকে ভালবাসে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "এ নিয়ে যাবার মুখে তোমার সঙ্গে আজ তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না, তবু বলছি, ভুল তুমিই করছ। আসল কথা, এই ভালবাসাবাসি ব্যাপারটার উপরেই আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে, আমি তোমাকে সত্যিই বলছি। এই যে জিনিষটাকে অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে থাকতে হয়, এই যাকে নিয়ে সংশয়-

সমস্যার শেষ থাকে না। মানুষকে কেন ভালবাসতে হবে, জীবনে তার সত্যিকারের প্রয়োজন কতটুকু, কি সেই প্রয়োজন মেটাবার শ্রেষ্ঠ উপায়, কতটুকু তার ভাল কতটুকু মন্দ, সে-প্রয়োজন মেটাবার পথে সমাজের বিধানই বা কতটুকু মান্য কতটুকু নয়, যেজন্যেই হোক এই-সব প্রশ্ন আজ আমার জীবনে এসে পড়েছে। যদি এ জিনিষটাকে বাদ দিয়ে চলতে পারি, আমার অন্তর্য্যামী জানেন তাই চলতেই আমি চেষ্টা করব। যদি না পারি, শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা যদি বিফলই হয়, আমার মনের এই-সমস্ত দ্বন্দ্ব যতদিন না মিটবে ততদিন অন্ততঃ আমি এ-পৃথিবীর বাইরের মানুষ। আমার ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে, আশৈশব একমাত্র সত্যকে আমি কামনা করেছি, সত্য যা ভাল ক'রে তাকে জেনে একমাত্র সেই পথ ধ'রে আমি চলতে চাই, আমাকে কেউ তোমরা বাধা দেবে না।"

পথে আসিতে সমস্ত পৃথিবীর কি কুৎসিত ক্লেদলিপ্ত চোহারা! ভব্যতাব বহিরাবরণের অভ্যন্তরে লোকালয়ে লোকালয়ে গৃহে গৃহে দিন হইতে দিনান্তরে কি জঘন্য কদর্য্যতার পুনরাবৃত্তি। বাহিরে ইহার সঙ্গে মানুষের বিরোধের শেষ নাই, কিন্তু অস্তিত্বের কোন্ একটা গভীরতম জায়গায় প্রতি মানুষ ইহার সঙ্গে কায়মনো-বাক্যে সন্ধি করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই নির্লজ্জ মিথ্যাচাবই বা কি কুৎসিত।

ক্লান্তিতে চোখে তন্দ্রা জড়াইয়া আসিতেছিল, আধ-ঘুম আধ-জাগরণে হঠাৎ ঐন্দ্রিলার সমস্ত বুকটা হাহাকার করিয়া উঠিল। যে পিতাকে সে ফেলিযা আসিয়াছে তাঁহার জন্য নয়, যে-পিতাকে সে হারাইয়াছে তাঁহার জন্য। দুই হাতে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া সে উঠিয়া বসিল। ক্রমে তন্দ্রার ঘোবেই ভাবিতে লাগিল, যে-জিনিষটাকে কদর্য্য মনে করিতেছি, হয়ত কদর্য্যতাই তাহার সমস্তটা রূপ আসলে নয়। আমার যে-পিতাকে আশৈশব আমি জানিতাম, হয়ত সত্যকারের কোনও কদর্য্যতা তাঁহার স্বভাবে সম্ভব নয়। হয়ত তাঁহার ব্যবহারের

সপক্ষে যুক্তি সত্যসত্যই কিছু আছে। কিন্তু কি সে যুক্তি তাহা কে আমাকে বলিয়া দিবে? কতদিনে তাহা আমি জানিতে পাইব?

নৈহাটিতে স্থভদ্র তাহার গাড়ীর জানালায় আসিয়া তাহার খবর লইল, বলিয়া গেল, "আপনি ব'সে থাকবেন না, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।—গোয়ালন্দে গাড়ী পৌছলে আমি এসে আপনার ঘুম ভাঙাব।"

কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। আর-একটি মানুষের মুখ ক্রমাগত মনে পড়িতে লাগিল, সে মুখ অজয়ের। বুঝিতে পারিল, কত সহজে আজিকার এই দিনটি চির-বিদায়ের দিন হইতে পারে। সে ভারতবর্ষের নারী, পিতামাতার আশ্রয় তাহার টুটিয়াছে, ইহার পর কোথায় কোন্ মহা অন্ধকারে চিরকালের জন্য তাহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, কে জানে? জীবনের নিকট হইতে এখনই তাহাকে কোনও কারণে বিদায় লইয়া যাইতে হয় যদি, ত তাহা লইয়া তাহার মনে কোনও ক্ষোভই অবশ্য থাকিবে না, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আর কোথাও সেই গভীর দৃষ্টি, সেই গর্ব্বোন্নত কিন্তু চিন্তাচ্ছায়াচ্ছন্ন কপাল, কালো অগ্নিশিখার মত কেশরাশি, স্থকুমার নাসিকার নীচে এক সঙ্গে দৃঢ়তা ও কারুণ্যে মণ্ডিত দুইটি ঠোঁট, সর্ব্বোপরি বিদ্যুৎগর্ভ সেই কণ্ঠস্বর তাহার জন্য কোথাও অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না ভাবিতে তাহার হাসি পাইল।

স্থভদ্র ঐন্দ্রিলাকে পৌছাইয়া ফিরিয়া আসিবার আগেই অজয় আবার একবার বীণার কাছে আসিয়া ধরনা দিল। বলিল, "তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছ, আমি কিছুতেই বুঝব না। আমি কেবল একটি কথা বুঝি, তোমাকে প্রাণপণে আমি কামনা করি, তোমাকে না হলে আমার চলবে না।"

বীণা মনে মনে হাসিল, ভাবিল, মনের মানুষটি দুদিন চোখের আড়াল হতেই এত রাগ, এখনই নিজেকে চরম শাস্তি কিছু একটা না দিয়ে দিতে পারলে তোমার আর চলছে না। তোমাকে জানতে ত আমার আর বাকী নেই বন্ধু?

কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। অধোমুখে বসিয়া পায়ের আঙুলে কার্পেটের একটা ফুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

অজয় কহিল, "তোমার পায়ের ঐ আঙুলগুলি থেকে তোমার মাথার চুল পর্য্যন্ত এমন কিছু নেই যা আমার চোখে অসুন্দর। তোমার হাসি, কান্না দুয়েরই মধ্যে আমার অস্তিত্বকে যে কোনো মুহূর্ত্তে আমি ডুবিয়ে দিতে পারি। তোমার রোজকার জীবনযাত্রার এমন কোনো খুঁটিনাটি নেই যা আমার কাছে অসীম রহস্যের মূল্যে মূল্যবান্ নয়। তোমার সব নিয়ে আমার মুগ্ধদৃষ্টিতে তুমি যে কি সুন্দর, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এগুলো কি কিছুই নয়, ভালবাসাটাই সব? আমার এই এত সত্য জীবন্ত কামনা, এর কোনো দাম নেই? এর উপরে আমার যে আনন্দের স্বর্গ আমি তৈরী করতে পারি, পৃথিবীর আর কোন্ কল্যাণ, কোন্ স্বর্গ তার চেয়ে বড়?"

বীণা তবুও নিরুত্তর রহিল দেখিয়া একটু থামিয়া অজয় আবার কহিল, "জীবনের সকল সমস্যার একটা সহজ মীমাংসা নিজেরই অজ্ঞাতে চিরকাল আমি ক'রে এসেছি, সে হচ্ছে আমার নিজের প্রতি নির্ম্মমতা। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু নিয়ে আমার বিরোধ বেধেছে, বিরোধ না ক'রে আমি জয়ী হয়েছি। আমি যে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে না নিতে পারি এই গর্ব্ব দিয়ে নিজের জীবনের শূন্যতা ভরিয়েছি। আজও আমি জানি, আমার জীবনের সমস্যা খুব সহজে মেটে, যদি তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ক'রে ত্যাগ করি। কিন্তু কেন আমি তা করব? তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনে ভালবাসা যা আছে তা থাক না, তার সঙ্গে তোমাকে কোনো-না-কোনো রকম ক'রে আমি মিলিয়ে দেবই। সেই ত হবে আমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা।"

বীণা কহিল, "তোমার কোন্ কথার কতখানি মানে দাঁড়ায় তা তুমি ভেবে দেখছ না। আজ কোনো কারণে তুমি উত্তেজিত হয়ে এসেছ, এ আলোচনা আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক।"

গভীর বেদনায় অজয়ের ঠোঁট দুইটা ভাঙিয়া আসিল। কহিল, "আমার মনে কোনো অন্যায় নেই, না জেনে অপরাধ করি যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি জানি না, এ আশা আমার কেন কিছুতেই যায় না যে এ-পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমায় ঠিক বুঝবে, কোথাও কিছু নিয়ে ভুল করবে না।"

বীণা একটু অনুতপ্ত হইল, কহিল, "না, আমি ভুল করিনি, তুমি বল কি বলতে চাও, আমি শুনছি।"

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া অজয় একটা কথাকেই নানা রকম করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চেষ্টা করিল। বলিল, দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এ দেশের মানুষ নিবৃত্তির মন্ত্র, বৈরাগ্যের মন্ত্র জপ করিয়াছে, তাহার ফলে চতুর্দ্দিকে সভ্যতার এই কঙ্কালাবশেষ অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি। আমার জীবনে স্থরু করিতে চাই আমি তার বিপরীত সাধনা। প্রাণপণে যাহা কামনা করি তাহা লাভ করিতেও প্রাণপণ করিতে চাই, তারপর ফলাফল কি হয় তাহা দেখিব। বলিল, "তোমাকে নিয়ে নিজেকে আমি ভুলব এ তুমি ইচ্ছে কর না, কিন্তু যে-জীবনের মধ্যে আমাকে তুমি ফিরে পাঠাচ্ছ, তোমাকে না ভুললে সেখানেই বা নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে আমি পাব কি ক'রে? তুমি আমাকে হার মানতে দিতে চাও না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেওয়া সেও ত আমার হার মানা? কেন হার মানব? কেন তোমাকে ছেড়ে দেব?"

বীণা কহিল, "কি করবে? সব দিক্ রক্ষা করা যায় না। তা যদি যেত মানুষ মানুষ থাকত না, দেবতা হয়ে যেত। নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষ ব'লেই, তাকে কোথাও কোথাও কিছু ছাড়তে হয়, তোমাকেও হবে।"

অজয় কহিল, "এই কি সব?"

বীণা কহিল, "আর যা আমার বলবার তা সেই দিনই তোমায় বলেছি।"

অজয় দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় বিমানের ছড়ির একটা প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া রাহু আসিয়া ঘরে

ঢুকিল। কহিল, "পার্কে ভল্যান্টিয়ারদের প্যারেড ছিল, বিমানবাবুকে সেখান থেকে ধ'রে এনেছি।"

বীণা কহিল, "রাহু কি সর্ব্বভূতে বিরাজ করিস্? সকলের সঙ্গে সব-জায়গায় তোর দেখা হচ্ছে।"

বিমান কহিল, "শুনলে রাহুসর্দ্দার? তোমার দিদি তোমাকে ভূত বলছেন।"

রাহু বলিল, "সর্ব্বভূত মানে বুঝি ভূত? সর্ব্ব মানে সকল, আর ভূত মানে পদার্থ।"

বিমান কহিল, "তা তুমি একজন ভদ্রলোক, তোমাকে পদার্থ বলাটাও কম অপমান নয়।"

ইহার কিছু পরে বিমানকে রাখিয়া অজয় একাকী বীণাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তারপব আর কি? থাকিয়া থাকিয়া যেমন করিয়া নিজেকে সে সম্পূর্ণ করিয়া হারাইযা ফেলিত, নিজের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের তাহার কোনও অর্থ থাকিত না, তেমনই ভাবে বীণারও কোনও অর্থ তাহার কাছে আর রহিল না। বীণা বলিযা কেহ যেন নাই, ঐ নামের কোনও মানুষ তাহার জীবনে কোনওদিন ছিলও না। সে যেন একটি মাধুর্য্যময় স্বপ্নেব অবশেষ, দূরস্মৃতির একটি নামহীন আবেশময স্বরের ঝঙ্কার মাত্র। ভুলিয়া গেল তাহাকে কথা দিয়াছিল, তোমাকে আমি ভালবাসব। ভুলিয়া গেল বীণা বলিয়াছিল, অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, আমি অপেক্ষা করব বন্ধু। স্বপ্নে কাহাকে কি কথা দেওয়া হইয়াছে তাহা কে কবে আবার মনে করিয়া রাখে? তাহা ছাড়া ভালবাসব, এ-প্রতিশ্রুতিরই বা মূল্য কতটুকু? নিজের অন্তরেব যে-সম্পদ্ ব্যাকুল আগ্রহে বীণাকে সে নিবেদন করিয়া দিতে গিয়াছিল, ভালবাসা হইতে কম মূল্যবান্ বলিয়া তাহাকে সে ত মনে করে না। সেই প্রত্যাখ্যাত নিবেদনের পাশে ভালবাসার নৈবেদ্য সাজাইতে তাহার মন উঠে না।

বীণাকে ভোলে, কিন্তু বীণার নিকট হইতে শোনা একটি কথা ক্রমাগত তাহার কানে বাজিতে থাকে। সবদিক্ রক্ষা করা যায় না, কোথাও কোথাও কিছু ছাড়তে হয়, তা না হলে মানুষ দেবতা হয়ে যেত। ভাবে, হয়ত দেবত্বের লোভই ছিল আমার জীবনে, কিন্তু তা হয় না। আমি মানুষ। ভঙ্গুর আমার জীবন, নশ্বর এই দেহ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমার দান করিবার এবং গ্রহণ করিবার ক্ষমতা। না দিলে আমার পাওয়া হয় না, না পাইলে আমার দেওয়া হয় না। এই দুয়েতে সীমাবদ্ধ হইযা থাকিয়াই আমার মনুষ্যত্ব। কেবল আহরণের মধ্যে সত্য নাই, কেবল ত্যাগের মধ্যেও নাই। এ দুয়ের একটি সহজ সমাধান কোথাও আছে। আমার জন্যও আছে, আমার দেশের জন্যও আছে। সেই সত্যকে আবিষ্কার করা হউক এখন হইতে আমার ব্রত, আমার অনন্যমনের তপস্যা।

বীণা বলিয়া তাহার মনে যে একটি স্বপ্নময় জ্যোতিঃর মূর্ত্তি, মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে সে নমস্কার করে।

বিমান দেশের সবসেরা সমস্যা বলিয়া একটি জিনিষকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দেশের মানুষের গুণকর্ম্ম-বিভাগের বেহিসাব। বলিত. এ দেশের সর্ব্বত্র রামের কাজ শ্যাম করে, শ্যামের কাজ যদু, কারও কাজই তাই ঠিক মত করা হয় না। এ জীবনে কোনও কাজ তাহার করাই হইল না সেই দুঃখে। অসহযোগ-আন্দোলন পর্ব্ব একটু জমিয়া উঠিতেই সুভদ্রের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সে-ই প্রথম উৎসাহ করিয়া তাহাতে যোগ দিল। কহিল, "বাবাঃ, এতদিন পরে এমন একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেলাম যা অন্য কারুর ভাত না মেরেও আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারি।" কহিল, "দেশের man power কে জোয়ালে বেঁধে কাজের অভাবে অকাজে লাগিয়ে দিতে পারার ফলও আখেরে ভালই হবে। এতদিন ধ'রে অব্যবস্থায় এর অপচয়ই ত কেবল হয়ে এসেছে?"

সব চেয়ে বেশী সে অনুভব করিত ও বলিত, দেশের ক্ষাত্র-শক্তির অব্যবহার

ও অপব্যবহারের কথা। তাই ডাক যখন আসিল সে-ই প্রথমে সাড়া দিল। হইলই বা অহিংস সামবিকতা, ভাবিল, ইহারই মধ্যে দিয়া দেশের একটা বড় সমস্যার সমাধান হইবে। একাধারে সে শিল্পী এবং সৈনিক, অন্ততঃ নিজে সে তাই ভাবে। সে বলে, ইংরেজ রাজত্ব থাকুক বা যাক, এদেশের লোককে সামরিক শিক্ষা দিবার ভার লউন কর্ত্তারা। একটা জাতের অপৌরুষ হইতে সাম্রাজ্যের দাম ওঠা সম্ভব নয়। তাহার বিবেচনায়, এদেশের সামাজিক এবং অন্য সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধান বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং তদানুষঙ্গিক discipline এবং অভেদনীতি।

সুভদ্রকে সে দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে বলিয়াছে, "কোনো সমস্যার কথা ভাবতে হলেই তোমরা ত্রিশ কোটী মানুষের termsএ ভাবো, তাই সমাধানও কিছু হয় না। আমার আশেপাশের পরিচিত মানুষগুলির সমস্যার কথাই আমি ঠিক মত ভাবতে পারি না, সাধ্যে কুলিয়ে ওঠে না। সেইটে করতে পারি যদি, একটা জীবনের পক্ষে অতি বড় কাজ হবে। তার বেশী আর কিছু ভাববার আমার রুচি নেই, অবসরও নেই।"

অজয়ও কাছেই ছিল, বিমান কহিল, "নিজের আশপাশের মানুষগুলোর ভাবনা তুমি যে খুব বেশী ভাবো তা মনে করবার ত কোনো কারণ নেই, তুমি কি স্থির করলে? যাবে আমার সঙ্গে?"

অজয় যাইবে না। তাহার জীবনের লক্ষ্য আরও ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ, উদ্দেশ্য বৃহৎ। কি সে উদ্দেশ্য তাহা সে জানে না, কিন্তু যে-জন্য তাহাকে আত্মত্যাগের মূল্য দিতে বলা হইতেছে তাহা অপেক্ষা সেটা বৃহত্তর। দেশের জন্য প্রয়োজন হইলে আত্ম-বিসর্জ্জন সেও একদিন করিবে, কিন্তু নিজেকে এত অল্পমূল্যে ছাড়িয়া দিতে সে চায় না।

আপাদমস্তক খদ্দরমণ্ডিত বিমান নূতন কেনা একটা বহরমপুরী বাঁশের লাঠি কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তিরস্কার করিয়া, তর্ক করিয়া, শ্লেষ করিয়া

যে-সাড়া সে অজয়ের মনে জাগাইয়া রাখিয়া গেল, তাহা চিরকাল জাগিয়া থাকিবার মত। কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যখন হাঁপ ধরিয়া গেল তখন অজয় ভাবিল, বীণাও আর এক-রকম করিয়া এই ত্যাগের মন্ত্রেই আমাকে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল। তা বেশ, ছাড়িতেই যদি হয়, সব ছাড়িব। নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়া অন্য কিছুও হাতে রাখিব না। কাহারও ভালমন্দে আমি নাই, অপরের পাপের ভার আমি লইব না। আমি আমার আত্মজনের কেহ নহি, পরিবারের কেহ নহি, ভারতবর্ষেরও আমি কেহ নহি। বাহিরের বহুকোটি সৌরমণ্ডল সম্বলিত আকাশের অসীমতা, অনাদ্যন্তকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতা হইতে সার্থকতায় বিজয়-অভিযান, ইহার মধ্যে কোথায় আমার স্থান, ইহাদের সঙ্গে কি লইয়া আমার যোগ তাহা আমি খুঁজিয়া বাহির করিব। আমার জন্য থাকুক, আকাশ বাতাস পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য তারা, অসীমতা, অসীমতার দেবতা এবং আমার মধ্যে তাঁহার পরমতম রূপ। আমার মধ্যে আমার চিরকালের সর্ব্বোত্তম যে শ্রেয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখেরও বিনিময়ে তাহাকেই আমি লাভ করিব।

নিজের যে রহস্যরূপ তাহার আজীবনের সমস্ত সঞ্চিত উপলব্ধিকে বারম্বার আলোড়িত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যাইত, তাহার দিবসের আলোককে অর্থহীন করিত, রাত্রির বিশ্রামকে অপহরণ করিত, আজ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আমি যে আমি, আমি একান্ত ভাবেই এত অভিনব, যে আমার সমস্যা আমি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সমাধান করা সম্ভবই নহে। এক মুহূর্ত্তে তাহার আজীবনের সাধনা, তাহার পুঁথিখাতাপত্র, তাহার আশৈশবের সঞ্চিত দেহমন-আত্মার সমস্ত আয়োজন, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনকল্পনা কি বিপুল অর্থহীনতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। এত বয়স ধরিয়া কত মহাপুরুষের জীবনীই সে ত পর্য্যালোচনা করিয়াছে, কত মহাকীর্ত্তি, কত অপরূপ আত্মত্যাগ, কত অভিনব আবিষ্ক্রিয়া, কত ভবিষ্যৎবাণী, কত অনুপ্রেরণা, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের

একবারে অন্তরতম স্থানে এই যে অন্ধকার, সেখানকার জন্য একটি ক্ষীণ দীপবর্ত্তিকাও কোথাও হইতে সে আহরণ করিতে পারিল না।

বাহিরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল, জীবনের প্রবাহ তখনও কলিকাতার পথে প্রখর হইয়া বহিতেছে। চতুর্দ্দিক্‌টাকে সহসা তাহার অনাত্মীয়-সঙ্গমের মত অসহ্য অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইল। জীবনের সুবিপুল সমস্যা শুদ্ধমাত্র নিজের আয়তনের বিশালতাতেই তাহার মধ্যেকার সুপ্ত সাহসকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। বেদনায় অবসন্নচৈতন্য মানুষ যেমন করিয়া অবলীলায় আসন্ন-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তেমনই ভাবে নিজের মধ্যেকার এই রহস্যময় অন্ধকারের সঙ্গে সে পরিচয় করিবে স্থির করিল। উঠিয়া গিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করিয়া লইল, তারপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আর্ত্ত হৃদয়েব সমস্ত শক্তিতে প্রাণপণে এই প্রশ্নটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, আমি কে, আমি কি, আমার সঙ্গে কেমন করিয়া আমার পরিচয় ঘটিবে, সে-পরিচয়ের পরিণাম কি হইবে?

পরের দিন বিমানের সঙ্গে দেখা হইতেই অজয় তাহাকে সংবাদ দিল, সে সংসার পরিত্যাগ করিবে।

বিমান কহিল, "সংসার কোথায় যে পরিত্যাগ করবে? সংসার কর আগে।"

অজয় কহিল, "দুদিক্ সামলানো যায় না, তুমিই একদিন একথা আমায় বলেছিলে। জীবনকে কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরবার পথটাই একমাত্র পথ এক-দিন ভেবেছিলাম, কিন্তু মোহ বড় বেশী, কিছুতে ওদিকে মনটাকে লওয়াতে পারিনি, কেবল ভেবেছি, আমি ব্যর্থ হব, আমার মধ্যে বহুযুগের ভারতবর্ষের সাধনা ব্যর্থ হবে। আজ বুঝেছি, অন্ততঃ আর একটা পথও আছে, এবং এই দুটো পথ কোথায় এক হয়ে মিলেছে যতদিন না জানতে পারব, ততদিন ভারতবর্ষের কৃচ্ছ্রসাধনার পথ, নিবৃত্তির সাধনার পথই আমারও পথ। আত্মার কারবারে নেমে সাংসারিক হিসাবের খাতায় ততদিন অন্ততঃ লাভক্ষতির জমাখরচ লিখব না।"

সন্ন্যাসাশ্রমের বদলে তাহার জন্য রাঁচীর আশ্রমবাস ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিমান উত্তেজনার মুখে বাঁশের লাঠিটাকে ঘুরাইয়াই বাহির হইয়া গেল।

অজয় দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, কেবল তোমার কাছে আমার এই কথাটা নিবেদন কবা থাকুক, একটি মানুষকে অন্ততঃ সত্যসত্যই আমি ভালবাসি। আমার কাছে তুমি যেমন সত্য, তোমার অসীমতা যেমন সত্য, ঐন্দ্রিলাও ঠিক ততখানি সত্য। এই দুইটি জিনিষকেও আমি কিছুতেই মিলাইয়া দিতে পারিতেছি না। কিন্তু জীবনে কোনও দুইটি জিনিষকেই একসঙ্গে করিয়া মিলাইতে পারিব না, এই অপযশ কি চিরকালের জন্য আমার ললাটে লেখা আছে? তুমি অনুমতি কব, শেষ একবার লুকাইয়া দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া তাহাকে দেখিয়া চিরবিদায় হইয়া আসি। তারপর চিরকাল আত্মা এবং বস্তু এই উভয়ের বিরোধেব অনেক উপরে তোমাদের উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিব।

কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিন বীণা কহিল, "এই তাহলে শেষ?"

অজয় কহিল, "এখন অবধি ত তাই ভাবছি।"

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। অজয়ের চোখে জল, বীণাও কাঁদিতেছে। তবু দুজনেই মৃদু হাসিয়া পবস্পরকে বিদায় দিল।

হাসিতে মিনতি ভরিয়া বীণা কহিল, "আবাব দেখা হবে বন্ধু।"

অজয় কহিল, "দেখা হবে না এমন কথা জোর ক'রে বলব কি ক'রে?"

৩৭

ইহারই দিন দশ-বারো পরে বিমান একদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। সুভদ্র স্নান করিতে যাইতেছিল, তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "শুনেছ খবর?"

সুভদ্র বলিল, "কোন্ খবর বললে শুনেছি কি-না বলতে পারি।"

বিমান কহিল, "তোমার প্রিয়দাদের গাঁয়ের ষ্টীমার-ষ্টেশন থেকে অজয়কে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে।"

সুভদ্র কহিল, "সে কি? হেতু?"

বিমান কহিল, "সেইটেই কেউ জানে না। কাছেই কোথায় ডাকাতি হয়েছিল, পোলিটিকাল ডাকাতি। সে এলাকায় অজয়ের তখন থাকবার কথা নয়। কেন এসেছিল, কার কাছে এসেছিল, তার কোনো সন্তোষজনক জবাব সে দিতে পারেনি।"

সুভদ্র কহিল, "প্রিয়দাদের গাঁয়ে? অজয় কি করতে গিয়েছিল সেখানে?"

বিমান কহিল, "তা যদি জানতাম তবে ত ওকে রক্ষা করবার উপায়ই হয়ে যেত। যা দেখছি, বেশ কিছুদিনের মত ঠেলবে!"

সুভদ্র কহিল, "সে নিজে কি বলেছে?"

বিমান কহিল, "কিছুই নাকি প্রায় বলেনি। বলেছে, আমার কাজ ছিল, কিন্তু সেটা এমন একান্ত ভাবেই আমার নিজের কাজ যে তার কথা পৃথিবীর আর কাউকে বলা চলে না।"

সুভদ্র কহিল, "মাথাটা ওর একেবারেই গেছে।"

বিমান কহিল, "তা শুধু ওর কেন, আরো অনেকেরই গেছে, কিন্তু সেইটে প্রমাণ করাই যে সব-চেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার এই দেশে। সেই ন্যাংলাফ্যাচাং নন্দটাও নাকি সে সময় গিয়েছিল সেখানে মরতে! সেটাকেও ধরেছে।"

বীণা ঐন্দ্রিলাকে চিঠিতে লিখিল, 'এত দুঃখের মধ্যেও একটা এই সান্ত্বনা যে এতদিন পরে নিঃসংশয়ে বোঝা গেল, তোকে সে ভালবাসে।'

ঐন্দ্রিলা লিখিল, 'কিন্তু একটা কথা একেবারেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল না। তুমি যা বলছ তাই যদি সত্য হয় তবে সেকথাটা চাপা দেবার জন্যে কারাবাসের মত এত বড় দুঃখ বরণ করবার কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং, হয় তোমার সিদ্ধান্তে ভুল আছে, নয়ত সত্য যা তার সমস্তটাকে তুমি জানো না।

এদিকে প্রিয়গোপালবাবু বলছেন, অজয়ের কাছ থেকে তিনি নিজে যদিও কিছুমাত্র সহায়তা পাবেন ব'লে আশা করেন না, তবু পুলিশের কবল থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা যায় কি না প্রাণপণে সে চেষ্টা ক'রে দেখবেন। ডাকাতদের দলে নন্দ ব'লে তাঁদের পরিচিত একটি ছেলে ধরা পড়েছে। সে যাকে কাছে পাচ্ছে তাকেই ডেকে বলছে, তাদের দলের সঙ্গে অজয়ের কোনোরকমের সম্পর্কই নেই। এই কথাটা জানাবার জন্যেই নিজের অপরাধ সে স্বীকার করেছে। পুলিশের লোকেরা তাকে এপ্রুভার হ'তে বলছে, কিন্তু তা করতে সে নারাজ ব'লে তার জবানবন্দী প্রিয়গোপালবাবুদের কতটা কাজে লাগবে তা বলা যাচ্ছে না। শেষ অবধি কি যে হবে তা কেবল ভগবানই জানেন।

কিন্তু এই ক'দিনে একটা বিষয়ে আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। অজয়বাবু এখনই ছাড়া পান, বা কারাভোগের পরেই পান, তাঁর সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে এবারে বোঝাপড়া করব। যে অস্পষ্টতার জালে তোমার এবং আমার দুজনেরই জীবন এমন ক'রে জড়িয়ে যাচ্ছে, সেটাতে আরও বেশী ক'রে নিজেদের জড়াতে দেওয়া আমার উচিত হবে না। তুমি যা অনুমান করছ তাই যদি সত্য হয় ত সেকথা সোজাসুজি আমাকেই এসে বলা অজয়বাবুর উচিত ছিল। কিন্তু যা সাধারণ বিচারে কর্ত্তব্য তা করবার পক্ষে তাঁর স্বভাবের ভিতরেই কিছু একটা বাধা আছে, পৃথিবীতে সব মানুষ এক ছাঁচে তৈরী হয় না। সুতরাং আমার যা জানবার তাঁকে প্রশ্ন ক'রেই আমায় তা জেনে নিতে হবে।

আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হবে, তিনি আমাদের দুজনের কাউকেই আদপে ভালবাসেন কি না। আমরা যে জিনিষটাকে ভালবাসা বলি, তার সঙ্গে আমাদের অহঙ্কার নানা সূত্রে, নানা অজুহাতে যে কি গভীরভাবে মিশে থাকে, অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা সম্প্রতি আমার কিঞ্চিৎ হয়েছে। একটা কোনো মানুষের ছুতো ক'রে উনি নিজেকেই পূর্ব্বাপর ভালবাসছেন কি না, গোড়াতেই সেটা জেনে নেওয়া মন্দ হবে না। তুমি কি বল?

আমি তার পরেই অবশ্য জানতে চাইব, নিজের বাইরে অবধি সে ভালবাসাটা গিয়ে যদি পৌঁছেই থাকে ত তার সত্যিকারের গতিটা কোন্ দিকে। একথা আজ তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই, যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন একথা যদি সত্য হয়, ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর হাতে তুলে দিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না। কারণ, পৃথিবীতে এই একটা মাত্র জিনিষ আছে যার স্পর্শে মাটি সত্যিই সোনা হয়ে যায়, সাধারণ-দৃষ্টিতে যা কলুষ, যা কদর্য্যতা, তাও সুন্দর হয়ে ওঠে, অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়েই এও একটা শিক্ষা সম্প্রতি আমার হয়েছে।

শুদ্ধমাত্র নিজের প্রয়োজনেই তাঁর কাছে আমি যেতে পারি কিনা তা এখনও আমি জানি না, তাঁর দিক্‌টাই ভাবছি, তোমার দিক্‌টাও ভাবছি, কেননা তোমাকে আমি কারুর চেয়েই কম ভালবাসি না। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে কোথাও কারও জন্য কিছুমাত্র দুঃখের সৃষ্টি হোক এ আমি চাই না, তোমাদের জন্যে ত আরও চাই না। সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সকলের পক্ষেই ভাল। যদি বুঝতে পারি, তোমাকেই সে কামনা করেছে, তোমার আনন্দের ভাগ দিতে পরি, সেটুকু উদারতা আমার স্বভাবে আছে।

আমার ভয় কেবল এই ভেবে, যে, তিনি যদি ব'লে বসেন, আমাদের দুজনকেই তিনি ভালবাসেন। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই, আর পৃথিবীতে এমন ব্যাপার কখনো যে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না তাও আমি মনে করি না। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গ, মধ্যিখানে চর'—কিন্তু সে অবস্থায় তুমি বা আমি কেউ তাঁর কোনোই কাজে লাগব না, এই যা দুঃখ। ইতি, ঐন্দ্রিলা।'

বীণার নিকট হইতে চটপট এ চিঠির জবাব আসিল। সে লিখিয়াছে :

'তাকে নিজে জিজ্ঞেস ক'রে সব জেনে নিতে চাস্ এ ত খুব ভাল কথা। তবে তার নিজের সম্বন্ধে তার মুখ থেকে যা শুনবি, সেইটেকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিস্ না বোন। তাকে যদি ভালবাসিস্, তোর নিজের মনটা যদি ঠিক থাকে ত সে মুখে যাই বলুক, তার মনের কথাটা বোঝা তোর পক্ষে

কঠিন হবে না। আমি নিজে বেশ ভাল ক'রে বুঝেছি বলেই বলছি। কিন্তু আর যাই করিস্, শেষ পর্য্যন্ত কারাভোগটা যাতে ওকে না করতে হয় সেইটে দেখিস্। প্রিয়-দারা ওর জন্যে খুবই করবেন তা জানি, কিন্তু তুই ওর জন্যে যতটা আজ করতে পারিস্ ততটা কি ওঁরা পারেন? ওকে তুই ভালবাসিস্ ব'লেই বলছি, এবং যে কথাটা চাপা দেবার জন্যে সে জেলে যেতে চাইছে, ওখানে একমাত্র তুইই সেটা জানিস্ ব'লেও বলছি এত ঢাকাঢাকি করবার সত্যিই কি আর দরকার কিছু আছে এখন। ভালবাসা জিনিষটা স্বভাবতঃ আলোর মত তা ত জানিস্, তাকে লুকিয়ে কতদিন রাখতে পারবি? অজয় পাগল, তার সাংসারিক বুদ্ধি একেবারে নেই, সাহসও এক-একদিকে নেই, তাই তার আশা, যা স্বপ্রকাশ তাকে শেষ অবধি চাপা দিয়ে সে রাখতে পারবে এবং চাপা দিতে চাইছে। কিন্তু তুই ওকে এ রকম ক'রে নিজেকে বলি দিতে দিস্‌নে। তুই প্রকাশ ক'রে দে সব কথা। তুইও জানিস্, সেও জানে, তোকে দেখতেই সে ওখানে গিয়েছিল; পাছে তোর নামে কোনো কথা উঠলে তোর অসুবিধা হয়, অথবা আর যে কারণেই হোক্, কাউকে সেটা সে বলতে পারছে না। তুই ব'লে দে। পুলিশকে নিজে না বলতে পারিস্, প্রিয়দাকে দিয়ে বলা। ও বেঁচে যাবে, তুইও বেঁচে যাবি। ঐ শরীর নিয়ে জেলে গেলে ও কি আর কোনোদিন বেঁচে ফিরে আসবে, আর তুইও কি কোনোদিন নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারবি? তোর লজ্জা করবে জানি, কিন্তু একটু লজ্জাও ছাড়তে পারবি না ভালবাসার খাতিরে, তাহলে কিসের ভালবাসা তোর? অতবড় জিনিস চাইছিস্, তার জন্যে ঐটুকু দামও দিতে পারবি না? নন্দ পুরুষ হয়ে এতটা করল, তুই মেয়ে হয়ে হার মানবি? আমি পারি তোর হয়ে সব বলতে, প্রয়োজন হলে হয়ত তাই আমাকে করতে হবে, কিন্তু তাতে তুই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবি। যা ভগবানের হাত থেকে সোজা তোর পাবার কথা, তা আমার হাত দিয়ে তুই নিতে যাবি কেন?

ইতি,—বীণা।'